সানজাক-ই উসমান

অটোমানদের দুনিয়ায়

প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল

আপনি কয়জন সিরিয়াল কিলারকে চেনেন? এই জগতের ইতিহাসে ভয়ংকরতম খুনীর সাথে কি আপনার দেখা হয়েছে?

'সানজাক-ই উসমান' আপনাকে তার সাথে দেখা করিয়ে দিতে চলেছে। তাকে দেখতে হলে আমাদের উঁকি দিতে হবে আট শ বছর আগের পৃথিবীতে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই মঙ্গোলিয়ান স্তেপ থেকে যেন স্বয়ং আজরাইল হয়ে নেমে এলেন চেঙ্গিজ খান এবং তার মোঙ্গল বাহিনী। মাত্র কুড়ি বছরের ভেতর যেন নরকে পরিণত হলো সারা পৃথিবী। প্রথমে চীন, তারপর তুর্কিস্তান আর খোরাসান হয়ে মোঙ্গল ঝড় ধেয়ে এল ককেশাস, আনাতোলিয়া দিয়ে রাশিয়া আর হিন্দুস্তানের দিকে। মরে সাফ হয়ে গেল কোটি কোটি মানুষ।

মোঙ্গলদের হাত থেকে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ইরান তুর্কিস্তান থেকে আনাতোলিয়ার দিকে রওনা দিল কিছু মানুষ।

তারপর কী হলো? কী করে তারা গড়ে তুলল বিশাল এক সালতানাত? মোঙ্গলদের হাত থেকে কারা বাঁচালো মক্কা-মদিনাকে?

এটা কোনো নিয়মিত ইতিহাসের বই বা কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এটা একই সাথে ইতিহাস, ফিকশন আর থ্রিলার। আজকের পৃথিবী কী করে নির্মাণ হলো, তা জানতে এই বই আপনাকে দারুণ সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ।

This is a time travel.
Start your journey!

লেখক পরিচিতি

প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট-এর শিক্ষার্থী। জন্ম, বেড়ে উঠা রাজধানী ঢাকায়। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতির তিনি একজন উৎসাহী পাঠক। তাঁর লেখাতেও এসবের ছাপ স্পষ্ট। দেশের বৃহত্তম ফুটবল কমিউনিটিগুলোর একটি 'ফুটবল ম্যানিয়াক্স অফ বাংলাদেশ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় এই তরুণ লেখক পড়াশোনার ফাঁকে প্রায়ই বেড়িয়ে পড়েন প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানে।

স্বপ্ন দেখেন ইনসাফের ভিত্তিতে গড়ে উঠা এমন এক পৃথিবীর, যেখানে ভ্রাতৃত্ব আর ভালোবাসার বন্ধন ভিন্ন ভিন্ন মত-পথের মানুষকে একই সুতোয় বেঁধে রাখবে।

প্রচ্ছদ: অর্ণব হাসান

‘কিয়ামত তত দিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যত দিন না লাল মুখওয়ালা, ছোট ছোট তির্যক চোখ ও চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট তাতারেরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে। তারা পূর্বদিক থেকে আসবে এবং পশম লাগানো চামড়ার জুতা পরবে, আর তাদের মুখ হবে ঢালের মতো প্রশস্ত। তারা তোমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, যেমন করে পঙ্গপালের ঝাক আকাশকে ঢেকে দেয়।’ সহিহ বুখারি : ২৭৭০

সানজাক-ই উসমান

প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল

সানজাক-ই উসমান

প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
✆ ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
০২-৫৭১৬৫৫১৭

guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক:
www.rokomari.com
www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ১৬ এপ্রিল, ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : ৩০ এপ্রিল, ২০১৮

শব্দ বিন্যাস: মো: জহিরুল ইসলাম
প্রচ্ছদ : অর্ণব হাসান রিফাত
মুদ্রণ: মো: আমিনুল ইসলাম

হার্ডকভার মূল্য : ৫০০.০০
পেপারব্যাক মূল্য : ৪৫০.০০

ISBN- 978-984-8254-09-7 (Hardcover)
ISBN- 978-984-8254-10-3 (Paperback)

Sanjak-E Usman by Prince Muhammad Sajal, Published by Guardian Publication, Price Tk. 500 (HC)/Tk. 450 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

আজ থেকে আট শ বছর আগে পৃথিবীর বুকে কেয়ামতের আগেই নেমেছিল আরেক কেয়ামত। সভ্য-জগৎ থেকে অনেক দূরের মঙ্গোলিয়ান স্তেপ থেকে বর্বর এক বাহিনী নিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন ইতিহাসের ভয়ংকরতম খুনি চেঙ্গিজ খান। মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে পাল্টে গেল পৃথিবীর ক্ষমতা কাঠামো। মোঙ্গলদের তলোয়ারের নিচে পড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল সাইবেরিয়া, চীন, মধ্য এশিয়া, খোরাসান, আফগানিস্তান আর ইরানের চার কোটি মানুষ। একসাথে এত লাশ পৃথিবী আর কখনো দেখেনি!

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পরও মোঙ্গল ঝড় থামেনি। এই ঝড় অপ্রতিরোধ্যভাবে আছড়ে পড়ল রাশিয়া, ইউক্রেন আর হাঙ্গেরিতে। সর্বগ্রাসী এই বর্বর বাহিনী পঙ্গপালের মতো আঘাত হানল তুরস্কের আনাতোলিয়া আর আব্বাসীয় খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র ঐতিহাসিক বাগদাদে। নেতৃত্ব আর ঐক্যের অভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিলীন হলো পাঁচ শ বছরে গড়ে উঠা ইসলামি সভ্যতা। তৎকালীন বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্র আর শিক্ষা ও শিল্পের আভিজাত্যের প্রতীক বাগদাদ শহরের পতনের সাথে শেষ হয়ে গেল আব্বাসীয় খিলাফত।

বাগদাদের পতনের পর যখন সব আশাই শেষ, তখন বর্বর মোঙ্গলরা ফিলিস্তিনে এসে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হলো মিশরীয় এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের। ইতিহাসে যারা বাহরিয়্যা মামলুক নামে পরিচিত। বাইরে থেকে মামলুক আর ভেতর থেকে বন্দিনী মুসলিম নারীরা বদলে দিতে লাগলেন পৃথিবীর ক্ষমতা কাঠামো। এক শ বছরের মধ্যে মোঙ্গলদের বিরাট একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করল।

এদিকে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় কায়ি গোত্রের তুর্কি বীর আরতুগ্রুলের সন্তান উসমানের নেতৃত্বে উত্থান হলো এক নতুন শক্তির। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রেট অটোম্যান সাম্রাজ্য বা উসমানিয়া সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত। উসমানের নেতৃত্বে কঠোর পরিশ্রম, ইমানি চেতনা, অসাধারণ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় এরা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল এক শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্য।

সুলতান বায়েজিদের নেতৃত্বে গোটা ইউরোপের সামরিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে উসমানিয়রা যখনই এক অপ্রতিরোধ্য পরাশক্তি হয়ে উঠছিল, তখনই আনকারার ময়দানে সুলতান বায়েজিদের সাথে মধ্য এশিয়ার তৈমুর লং-এর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদের পরাজয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল উসমানীয় সাম্রাজ্য।

তারপর? কী হলো তারপর? কীভাবে উঠে দাঁড়াল উসমানীয়রা? কীভাবে সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ পূর্ণ করেছিলেন মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্সট্যান্টিনোপল জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী? কীভাবে উসমানীয়রা ঘুড়ে দাঁড়িয়ে পুরো ইউরোপে ছড়ি ঘুরিয়ে পরবর্তী প্রায় পাঁচ শ বছর পৃথিবী শাসন করেছিল?

তরুণ লেখক প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল লিখিত 'সানজাক-ই উসমান: অটোমানদের দুনিয়ায়' আপনাদের সামনে নিয়ে আসছে এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। এ গল্প কেবল রাজশক্তির উত্থানের গল্প নয়। এই গল্প মোঙ্গল আক্রমণে ছাই হয়ে যাওয়া ইসলামি সভ্যতার ফের মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ানোর গল্প। বইটি প্রকাশ করতে পেরে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' উচ্ছ্বসিত ও রোমাঞ্চিত! সম্মানিত লেখকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের একজন সুলেখক পেতে যাচ্ছে। এই বই প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত গার্ডিয়ানের কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পুরো গার্ডিয়ান টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতিহাসের পরিভ্রমণে আপনাকে স্বাগতম।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
১২ এপ্রিল, ২০১৮ ইং
বাংলাবাজার, ঢাকা।

লেখকের কথা

আমার কাছে মনে হয়, পৃথিবীতে তিন ধরনের ভালো বই আছে। প্রথম ধরনের বই আপনাকে আনন্দ দেবে, পড়বেন, ভালো লাগবে, তারপর ভুলে যাবেন। দ্বিতীয় ধরনের বই আপনাকে জীবন নিয়ে ভাবতে শেখাবে। আর তৃতীয় ধরনের বই, আপনার জীবনটাকে বদলে দেবে।

আমার এই বই এই তিন ধরনের ভালো বইয়ের ক্যাটাগরির কোনোটায় পড়বে কিনা সে নিয়ে ভাবনা চিন্তার দায়টা আমি পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই।

ইতিহাস বলতে আমরা কী বুঝি?

আমি বুঝি, ইতিহাস হলো শব্দের ক্যানভাসে সময়ের ছবি আঁকা। এই ছবি নিখুঁত করে আঁকতে পারাটাই ইতিহাস নিয়ে লেখালেখির মূল কথা। শুধু বাংলাদেশ না, সারা পৃথিবীতেই ইতিহাস নিয়ে যে সমস্যাটা জারি আছে তা হলো, সময়ের ছবি নিখুঁত করে আঁকতে গিয়ে প্রথাগত ঐতিহাসিকরা ছবিকে এত বিরক্তিকর করে ফেলেন যে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণরা সময়ের সেই ছবির দিকে আর তাকাতেই চায় না। অপরপক্ষে, ঐতিহাসিক উপন্যাস যারা লেখেন, তারা এত রকম রংচং লাগান যে আমরা অতীতের ঘটনাগুলোর সঠিক ছবিটা আর পাই না। আমি এখানে দুটো জনরার মিশেলে নতুন ক্যানভাসে, নতুন রং-তুলি ব্যবহার করে ভিন্ন এক ছবি আঁকার পথে হেঁটেছি।

বইয়ের কভারে কেবল লেখা থাকে লেখকের নাম, কিন্তু বইয়ের প্রতিটা পাতার নেপথ্যে আরও অনেকের আত্মত্যাগ মিশে থাকে।

আমার প্রথম কৃতজ্ঞতা তারিকুর রহমান শামীম ভাইয়ের প্রতি। আমাকে তিনি দেখেছেন একেবারে কিশোর বয়স থেকে, আমার চিন্তাভাবনায় তার প্রভাব কতখানি, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এই বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিতে থাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই তিনিই আমাকে যোগাড় করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমার পক্ষে সেগুলো কিনে পড়া দুঃসাধ্য ছিল। এরপরেই আসবে নাজমুস সাকিব নির্ঝর ভাইয়ের নাম। আমার মতো একজন আনকোরা লেখকের প্রচেষ্টাকে ছাপাখানার চেহারা দেখাতে নির্ঝর ভাইয়ের উদ্যোগ ছিল অসামান্য। বইয়ের রেফারেন্সিং, নামকরণ ও সম্পাদনা নিয়ে নির্ঝর ভাইকে আমি যথেষ্ট জ্বালিয়েছি, কিন্তু তিনি কখনো বিরক্ত হননি। এই বই লেখার সময় একজন অসাধারণ মানুষের অকৃত্রিম স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি, তিনি ফজলুল করিম রিয়াদ ভাই। আমার জন্য তিনি বিসিএস প্রস্তুতি বাদ দিয়ে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। এই বইয়ের নেপথ্যে থাকা আমার চিন্তার জ্বালানি সরবরাহ করতে আশফাক ভাই ও মাসরুর ভাইয়ের অবদান কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না।

এবার বন্ধুদের কথায় আসি। আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু পান্থকে রেফারেন্সিং ও এডিটিংয়ের জন্য দিনের পর দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সে সহযোগিতা না করলে এই বই এত দ্রুত আলোর মুখ দেখত না। বইয়ের প্রাথমিক কাঠামোটা বিন্যাসের কাজ করেছিল বন্ধু তন্ময়। রেফারেন্সিং করতে সময় দিয়েছে অপুও। এরা যে ভালোবাসা নিয়ে আমার জন্য কাজ করেছে, তা কোনো পেশাদারকে দিয়ে করানো সম্ভব না। বইটার কাজ যখন শুরু করি, তখন আমি জীবনের সবচেয়ে সংকটময় সময়গুলোর একটা পার করছিলাম। আমার বন্ধু শাওন, পান্থ আর সারা আমাকে আত্মবিশ্বাস আর সাহস যুগিয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় শাওন আর পান্থ আমার কাছাকাছিই আছে, আল্লাহ যেন কখনো ওদের আমার কাছ থেকে দূরে না সরান। সারা এখন সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। তার এটা মনে করার কোনো কারণ নেই আমি তাকে ভুলে গেছি।

এ ছাড়াও বন্ধু মারুফ, রাজু, মোহাইমিনুল, তৌহিদ, তুহিন, তারেক, সালমান, স্নেহের অনুজ শরিফুল, জিদান, নীল, ফারদিন ও মুজাম্মেলের কথা বলতেই হবে। পাঠকদের ভেতর চারজনকে বিশেষভাবে মনে পড়ছে। আরাফাত ভাই, রাফি ভাই, আমান ভাই ও তিমা আপু। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখবেন, এই প্রত্যাশাই করি।

আমার গোটা শিক্ষাজীবন যে ব্যক্তির কাছে ঋণী তার নামটি উল্লেখ করতে চাই, জনাব এমদাদ ইসলাম । আমি তাঁকে কখনো ভুলব না। ধন্যবাদ পাওনা আমার বাবা-মায়েরও। তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিসিএস ক্যাডার হওয়ার গড্ডালিকা প্রবাহে গা-ভাসানোর চেয়ে সব সময় আমার ইচ্ছাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ধন্যবাদের দাবিদার প্রকাশক নূর মোহাম্মাদ ভাই, যিনি এই অখ্যাত তরুণের বই প্রকাশের মতো একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হাতে নেয়ার সাহস দেখিয়েছেন। আরেকজনের কথা না বললেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক, প্রফেসর ড. ছিদ্দিকুর রহমান খান স্যার। উনার মতো একজন পণ্ডিত মানুষের কাছ থেকে যে সুহৃদ ব্যবহার আমি পেয়েছি, তা আমার জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল।

আমি ইতিহাসের একটা ভিন্ন, মানবিক বর্ণনা পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই বর্ণনা, এই ইতিহাস পাঠ্য বইয়ের প্রচলিত অনেকাংশেই ঔপনিবেশিক ইতিহাসবীক্ষণের সাথে মিলবে না। সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য পাঠককে রেফারেন্স চেক করার অনুরোধ জানাই।

নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে পৃথিবীতে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছে। পুরোনোকে আমাদের দেখতে হবে এই নতুন সময়ের চোখ দিয়ে। পৃথিবী দেখার লেন্সটাকে বদলে ফেলবেন, না পুরোনোটা দিয়েই দেখবেন, সিদ্ধান্ত আপনার। সময় থেমে থাকে না।

প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০ মার্চ, ২০১৮

মুখবন্ধ

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ক কেন্দ্রিক উমাইয়া রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করে আব্বাসিরা আরব মুসলিম বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে. তারপর কেটে যায় পাঁচ শ বছর। আব্বাসি সাম্রাজ্য তার শৈশব, কৈশোর, সোনালি যৌবন অতিক্রম করে জরাগ্রস্থ বার্ধক্যের কবলে নিপতিত হয়। ধর্মীয় চেতনাবোধ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, তদুপরি রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে আব্বাসীয় শক্তির পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয় এক নতুন শক্তি। ইতিহাসে তারা পরিচিত 'মোঙ্গল' নামে। চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে অশিক্ষিত ও প্রায় বর্বর মোঙ্গলরা নিজভূম ছেড়ে বের হয়ে আসেন এবং মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন এক নতুন সাম্রাজ্যের। চেঙ্গিজ খানের উত্তরসূরি হালাকু খান ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে ধ্বংস করেন ইসলামি সভ্যতার সোনালি যুগের অহংকার আব্বাসিদের রাজধানী বাগদাদ। এরপর গোটা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া জুড়ে চলে মোঙ্গলদের শাসন-শোষণ। তবে মোঙ্গলদের মহাপ্রতাপের যুগেই আফ্রিকার মিসরে এক নতুন রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে। 'মামলুক' নামে পরিচিত এ রাজশক্তিটি মোঙ্গল ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে কেবল সিরিয়া, মিসর ও মুসলিম বিশ্বের প্রধানতম তীর্থস্থান পবিত্র মক্কা-মদিনাকেই রক্ষা করেনি, বরং সদ্য বিলুপ্ত আব্বাসীয় খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসের গতিধারাকে নতুন পথে সঞ্চালিত করে।

আজকের দিনে মধ্যপ্রাচ্য নামে খ্যাত পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা অভিমুখী মোঙ্গল আগ্রাসন প্রতিহতকরণে যখন মিসরের মামুলকরা ব্যতিব্যস্ত, তখন আনাতোলিয়ায় (এশিয়া মাইনর ও এশিয়ান তুরস্ক নামেও পরিচিত। এ অঞ্চল নিয়েই গড়ে উঠেছে আধুনিক তুরস্কের সিংহভাগ) আরেক নতুন রাজশক্তির উত্থান ঘটে। এ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উসমান বিন তুগরুল। প্রতিষ্ঠাতা উসমানের নামানুসারে এ রাজবংশটি উসমানলি বা উসমানীয় সালতানাত নামে পরিচিত। তবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বর্ণনাসূত্রে এ সাম্রাজ্যটি অটোমান নামে বহুল পরিচিতি লাভ করে।

প্রাক-আধুনিক যুগের ইতিহাসে অটোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম রাজশক্তি। এর পরিব্যাপ্তি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এমন বিশাল আয়তনের রাষ্ট্রশক্তি প্রাচীন রোমীয় আমল ও প্রারম্ভিক মধ্যযুগের আরব প্রাধান্যের যুগ ব্যতীত দেখা যায় না। শুধু বিশাল বিস্তৃতি নয়, আয়ুষ্কালের দিক থেকেও অটোমান সাম্রাজ্য ছিল অনন্য। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে একটি সাম্রাজ্যের সাধারণ গড় স্থিতিকাল এক শ বছর। কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল ছিল ছয় শ বছরেরও অধিককাল। এ সময়ের মধ্যে বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যটি কখনো দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। দশম শতাব্দীতে আরব মুসলিম সাম্রাজ্য তিনটি খিলাফতে বিভক্ত হলেও অটোমানরা নিজেদের

কেন্দ্রীভূত শক্তিকে ধরে রাখতে পেরেছিল। মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা-মদিনার নিয়ন্ত্রণভারসহ ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে খিলাফতেরও দায়িত্বভার গ্রহণের ফলে তারা জাগতিক রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধার থেকে মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের অধিকারী হিসেবেও আবির্ভূত হয়।

তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল এর প্রথম গ্রন্থ *'সানজাক-ই উসমান : অটোমানদের দুনিয়ায়'* এতদবিষয়ে রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে একটি নতুন ও ব্যতিক্রমী সংযোজন। গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্রেই রয়েছে ইতিহাসের উপাদান। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিন্যস্ত অধ্যায় শিরোনামসহ উপজীব্য বিষয়ের উপশিরোনামগুলোও চমৎকার ও আকর্ষণীয়। অটোমান রাষ্ট্রশক্তির উত্থান ও বিকাশধারা গ্রন্থকারের মূল লক্ষ্যস্থল হলেও প্রসঙ্গক্রমে এতে স্থান পেয়েছে আব্বাসি রাজশক্তি ও আরব সভ্যতার বিপর্যয়, মোঙ্গলদের উত্থান ও বিকাশ, মিসরের মামলুকদের মোঙ্গল প্রতিরোধ ও মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় তাদের অবদান। লেখক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মধ্যযুগের ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপের ঘুরে দাঁড়ানো ও তাদের রেনেসাঁর প্রতি। আলোচনায় এনেছেন প্রাচ্য জগতে ইউরোপের কলোনি প্রতিষ্ঠা থেকে হালের গ্লোবালাইজেশন পর্যন্ত।

এটি কোনো সাধারণ ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ নয়। তাই ইতিহাস বোদ্ধারা এতে ইতিহাসের প্রণালিসিদ্ধ রচনা পদ্ধতির আলোকে বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করলে হতাশ হবেন। তবে সাধারণ পাঠকসহ ইতিহাসের পাঠক ও গবেষকের জন্য এ বইটি গুরুত্ব কম হবে না। কারণ, ইতিহাসের জ্ঞাত এবং বিশেষ করে অন্তরালে চাপা পড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার চেষ্টা রয়েছে বইটিতে। ইতিহাসের ছাত্র বা গবেষক না হয়েও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ থেকে লেখক আলোচ্য গ্রন্থটি রচনার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি তাঁর এ দুঃসাহসী আন্তরিক প্রয়াসকে স্বাগত জানাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তরুণ লেখকের ব্যতিক্রমী রচনাটি ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, ইতিহাস অনুরাগী ও সাধারণ পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

আমি *'সানজাক-ই উসমান : অটোমানদের দুনিয়ায়'* শীর্ষক গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি। অপার সম্ভাবনাময় লেখক প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল এর জন্য রইল অনেক অনেক শুভ কামনা।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল, ২০১৮

ভূমিকা

'কিয়ামত তত দিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যত দিন না লাল মুখওয়ালা, ছোট ছোট তির্যক চোখ ও চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট তাতারেরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে। তারা পূর্বদিক থেকে আসবে এবং তারা পশম লাগানো চামড়ার জুতা পরবে, আর তাদের মুখ হবে ঢালের মতো প্রশস্ত। তারা তোমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, যেমন করে পঙ্গপালের ঝাঁক আকাশকে ঢেকে দেয়।' সহিহ বুখারি : ২৭৭০

এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। সত্যি সত্যিই রাসূল (সা.)-এর ওফাতের সোয়া ছয় শ বছর পর পূর্বদিকে এক বড়সড় ঝড় উঠে, চেঙ্গিজ খানের তলোয়ারের ধারে বদলে যেতে থাকে দুনিয়ার মানচিত্র।

১২০৬ সালে মঙ্গোলিয়ার স্তেপে আধাবুনো, অর্ধসভ্য কিছু যাযাবর উপজাতিকে নিয়ে চেঙ্গিজ খান যে সাম্রাজ্যের সূচনা করেন, তা পরবর্তী কুড়ি বছরে পৃথিবী জুড়ে নিয়ে আসে কেয়ামতের আগেই আরেক কেয়ামত। চীন, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, খোরাসান, ইরান হয়ে ককেশাস থেকে একেবারে রাশিয়া পর্যন্ত চেঙ্গিজ খান হত্যা করেন কোটি কোটি মানুষকে, কায়েম করেন এক আতঙ্কের সাম্রাজ্য। এটাই ইতিহাসে মানুষের জয় করা সবচেয়ে বড় অবিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য।

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পরেও মোঙ্গলরা থামেনি, একে একে তারা কব্জা করেছে প্রায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য। ১২৫৮ সাল নাগাদ তারা এসে পড়ে বাগদাদের দোরগোড়ায়। আরব্য রজনীর সেই বাগদাদ, আব্বাসিয়া খিলাফত তথা ইসলামি সভ্যতার সোনালি যুগের প্রতীক বাগদাদ।

ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল এর বহু আগেই। রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে বহুধাবিভক্ত মুসলিম উম্মাহ মোঙ্গল আগ্রাসনের সামনে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সংস্কৃতিতে যোজন যোজন এগিয়ে থাকার পরেও ইমান, ঐক্য আর নেতৃত্বের অভাব মুসলমানদের পরিণত করে মোঙ্গলদের দাসে। চীনাদের পরিণতিও হয় একই রকম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুরোটা জুড়েই ছিল পৃথিবীর দিকে দিকে মোঙ্গলদের ত্রাসের রাজত্ব। কিন্তু এর মাঝেই নতুন এক শক্তির উত্থান ঘটে মিসরে। মামলুকরা জীবন বাজি রেখে মোঙ্গলদের হাত থেকে সিরিয়া, মিসর ও মক্কা-মদিনাকে রক্ষা করে। আইন জালুত আর হোমসের যুদ্ধের পর পাল্টে যেতে শুরু করে ইতিহাসের স্রোতধারা।

চেঙ্গিজ খানের মোঙ্গলদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে যাওয়া তুর্কি মুসলিমরা আনাতোলিয়াতে গড়ে তুলতে থাকে নতুন সভ্যতা। এদের মধ্যেই একজন ছিলেন আরতুরুল বে'র ছেলে উসমান।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে আনাতোলিয়ায় যে মুসলিম আমিরাতগুলো জন্ম নেয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আমিরাতের সুলতান ছিলেন তিনি।

এই উসমান থেকেই অটোমান সালতানাতের উত্থানের গল্পটা শুরু।

আনাতোলিয়াতে উসমানের বংশধররা যখন গড়ে তুলছিল নতুন এক ইসলামি সভ্যতা, তখন ইউরোপের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মোঙ্গল আক্রমণ থেকে মোটের ওপর বেঁচে যাওয়া ইউরোপ উচ্চ মধ্যযুগের সমৃদ্ধ সময়কে পেছনে ফেলে এসেছে।

একের পর এক ক্রুসেডে পরাজয়, পোপের সাথে সম্রাটদের বিবাদ, সামাজিক অসংগতি, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও মহামারী ইউরোপের ওপর মরণ ছোবল হানে। ব্ল্যাক ডেথ আর দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যায় ইউরোপের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

ওদিকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়াতে আবার আবির্ভাব ঘটে এক দিগ্‌বিজয়ীর। যিনি পুরো এশিয়াকে একটা বড় কবরস্থানে পরিণত করেন। তার নাম আমির তাইমুর, ইতিহাস কুখ্যাত তৈমুর লং।

একটা সাম্রাজ্যের গড় আয়ু সাধারণত এক শ থেকে দেড় শ বছর হয়, তারপর তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। কিন্তু এক শতাব্দী ধরে ক্রমেই বেড়ে উঠা অটোমান সালতানাতের ভেঙে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তাইমুরের আক্রমণে বিধ্বস্ত হবার পরেও টিকে যায় অটোমানরা। তাদের টিকে থাকার মূলমন্ত্র ছিল সুশাসন, ইনসাফ আর পুরোনোকে লালনের সাথে সাথে নতুনকে গ্রহণ করার মানসিকতা। এভাবেই অটোমানরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরিণত হতে থাকে এক বিশ্বশক্তিতে। ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর নেতৃত্বে তারা বাস্তবে রূপদান করে মহানবি (সা.)-এর আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী; কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়। মোঙ্গলদের আক্রমণে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ার দুই শ বছরের মাথায় ইসলামি সভ্যতার হাল ধরে অটোমানরাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দারিদ্র্যপীড়িত ইউরোপ ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে উঠতে থাকে। হাজার বছর ধরে চেপে থাকা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আর দুঃশাসনের মধ্যেও ইউরোপে জন্ম নিতে থাকে কালজয়ী সব চিন্তাধারা ও চিন্তানায়কেরা। এখান থেকেই শুরু ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ।

'*সানজাক-ই উসমান : অটোমানদের দুনিয়ায়*' বইটিতে আলোচনায় এসেছে মোঙ্গলদের উত্থান, সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে শুরু করে ক্রমেই তাদের দুটি বৃহত্তর মহাসভ্যতায় বিলীন হয়ে যাবার কথা, এসেছে জানবাজ মামলুকদের দাঁতে দাঁত চাপা সংগ্রামের কথা।

এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে একেবারে ধ্বংসের প্রান্ত থেকে আবার একটা সভ্যতা উঠে দাঁড়ায়।

ইতিহাসের বই হলেও এটি প্রথাগত ইতিহাস আলোচনার পথ ধরে আগায়নি। এই বইটি একাডেমিশিয়ানদের জন্য নয়, তাদের জন্য অজস্র বই রয়েছে। এই বই সাধারণ মানুষের জন্য, যারা একের পর এক সাল, তারিখ আর বাহারি নামের চক্করে পড়ে ইতিহাসকে এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গৎবাঁধা বিবরণের চেয়ে এখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যথাসম্ভব বিশ্লেষণমূলক বিবরণের।

অটোমান সালতানাত এখানে কেন্দ্রীয় উপাদান হলেও মধ্যযুগীয় ইউরোপকেও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলিম সুলতান ও সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাস লেখার সময় প্রাচ্য সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লেখকদের (ওরিয়েন্টালিস্ট) প্রভাব যথাসম্ভব উপেক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ করার সময় জাতীয়তাবাদী অতিরঞ্জন এড়ানোরও চেষ্টা করা হয়েছে, যা কোনো কোনো তুর্কি ঐতিহাসিকের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

ইতিহাসের বিভিন্ন চাপা পড়ে যাওয়া কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তাদের পেছনের ঘটনাগুলোকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে, যা অনেক ক্ষেত্রে মূলধারার ইতিহাসে উপেক্ষিত থেকে যায়।

এই বই একাডেমিক ইতিহাসের ধারা বিবরণী নয়, নয় কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাসও। এ হলো ইতিহাসের ফেলে আসা পথে কিছুক্ষণের একটা সময় পরিভ্রমণ।

অনেক কথা হলো।

এবার আমরা দেখব মঙ্গোলিয়ায় কী ঘটছে। আমরা পা রাখতে যাচ্ছি অটোমানদের দুনিয়ায়।

নির্দেশিকা

যারা ইতিহাসের নিয়মিত পাঠক নন এবং ভূগোলে যাদের দুর্বলতা আছে, তাদের জন্য আমি এই নির্দেশিকা উপস্থাপন করেছি। বইটি পড়ার আগে এখানে চোখ বুলিয়ে নিলে অপরিচিত শব্দগুলোকে চেনা তাদের জন্য সহজ হবে। যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে ইংরেজি সামরিক পরিভাষাগুলো বইতে এসেছে, এখানে সেগুলোরও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে।

আপনি একটু পর এক টাইম ট্র্যাভেলে ফিরে যেতে চলেছেন অটোমানদের দুনিয়ায়। সেই দুনিয়াকে চিনতে হলে আপনাকে সামনের কয়েকটি পাতায় ভালো করে চোখ বুলাতে হবে।

ভৌগোলিক পরিভাষা ঃ

স্তেপ ঃ বিস্তীর্ণ ঘাসে ঢাকা সমভূমি, যেখানে তেমন কোনো বড় গাছ জন্মায় না। ইউক্রেন থেকে সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল স্তেপের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলটিকে ইউরেশিয়ান স্তেপ বলা হয়। ইউরেশিয়ান স্তেপের বিভিন্ন অঞ্চলকে আবার তাদের স্থানীয় নাম যেমন, মঙ্গোলিয়ান স্তেপ, কিপচাক স্তেপ, রাশান স্তেপ নামেও ডাকা হয়ে থাকে।

ওনোন নদী ঃ আট শ আঠারো কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি খেন্তাই পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

বুরখান খালদুন পর্বত ঃ খেন্তাই পর্বতমালাতে অবস্থিত মঙ্গোলিয়ার অত্যন্ত সুন্দর একটি পর্বত। এর উচ্চতা প্রায় আড়াই হাজার মিটার।

মা ওয়ারা উন্নাহার ঃ ইরানের উত্তরে, আমু দরিয়া আর সির দরিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত এক উর্বর সমভূমি।

আমু দরিয়া ঃ আরবিতে একে বলে জাইহুন, ফারসিতে বলে আমু দরিয়া, গ্রিক নাম অক্সাস। আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, ও তাজিকিস্তানে অবস্থিত দুহাজার কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের একটি বিখ্যাত নদী।

সির দরিয়া ঃ কাজখস্তান,তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তানের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সোয়া দুহাজার কিলোমিটার দীর্ঘ আরেকটি নদী। এর আরবি নাম সাইহুন, গ্রিক ভাষায় একে বলে জাক্সার্টেস।

তুর্কিস্তান ঃ মধ্য এশিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত নদীবিধৌত উপত্যকা ও সমভূমি। উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান,তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান ও আধুনিক চীনের জিনজিয়াং নিয়ে গঠিত। এর উত্তরে সাইবেরিয়ান স্তেপ, দক্ষিণে ইরান, পূর্বে তিব্বত এবং গোবি মরুভূমি ও পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর অবস্থিত।

তিয়েনশান পর্বতমালা ঃ চীন থেকে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশের পথেই এই সুবিশাল, সুউচ্চ পর্বতমালার অবস্থান। এটি চীন, কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান জুড়ে বিস্তৃত।

খোরাসান ঃ দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান, উত্তর-পূর্ব ইরান এবং পশ্চিম আফগানিস্তান নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল। এটি মূলত প্রাচীন পারস্য সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে বিখ্যাত।

হিন্দুকুশ পর্বতমালা ঃ পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের একটি সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী।

পামির মালভূমি ঃ তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, কিরগিজস্তান ও চীনের মধ্যবর্তী পামির পর্বতমালার একটি উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমি আধুনিক তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। পামির মালভূমি পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি, এর উচ্চতা প্রায় সাত হাজার মিটার।

সিন্ধু নদ ঃ তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে গিলগিট বালটিস্তান, লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর হয়ে সমগ্র পাকিস্তানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুহাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই বিশাল নদ আরব সাগরে এসে পড়েছে।

কারাকোরাম পর্বতমালা ঃ এটি মূলত পাকিস্তান-চীন সীমান্তে অবস্থিত একটি পর্বতমালা। গিলগিট-বালটিস্তান, লাদাখ ও পূর্ব তুর্কিস্তানে বিস্তৃত। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কে-টু এই পর্বতমালার উচ্চতম বিন্দু।

আলবুর্জ পর্বতমালা ঃ উত্তর-উত্তর-পশ্চিম ইরান ও আজারবাইজানে অবস্থিত একটি পর্বতমালা।

ফোরাত নদী ঃ গ্রিক নাম ইউফ্রেতিস। দুই হাজার আট শ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী তুরস্কে উৎপত্তি লাভ করে সিরিয়া ও ইরাক হয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। দজলা ও ফোরাত নদীর মাঝামাঝি মেসোপটেমিয়া অঞ্চলেই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার জন্ম।

দজলা নদী ঃ গ্রিক নাম তাইগ্রিস। এক হাজার আট শ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটিও তুরস্ক-সিরিয়া ও ইরাকের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে।

জাযিরাতুল আরব ঃ আরব উপদ্বীপ নামে পরিচিত। আধুনিক সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, ফিলিস্তিন নিয়ে গঠিত। এর পশ্চিমে সিনাই উপদ্বীপ, উত্তরে সিরিয়া, উত্তর-পূর্বে ইরাক অবস্থিত। জাযিরাতুল আরবের তিন দিকে লোহিত সাগর, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর থাকায় আরবিতে একে জাযিরা বা দ্বীপ বলা হয়।

মাগরেব ঃ মিসরীয় মরুভূমির পশ্চিমে মূলত সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন ভূমধ্যসাগর তীরের মুসলিম দেশগুলোকে একত্রে মাগরেব বা পশ্চিম বলা হয়। আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো ও মৌরিতানিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

নীল নদ ঃ ছ হাজার আট শ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ, পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী । এটি এগারোটি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। নীল নদের উৎপত্তি মূলত আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়ায়, আর এটি এসে পড়েছে ভূমধ্যসাগরে।

অ্যাটলাস পর্বতমালা ঃ মাগরেব অঞ্চলের ভূমধ্যসাগর উপকূলঘেঁষে অবস্থিত একটি অত্যন্ত রুক্ষ পর্বতমালা।

ককেশাস পর্বতমালা ঃ কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে পর্বতমালার আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও জর্জিয়ায় অবস্থিত একটি পর্বতমালা। এর উত্তরে রাশিয়া, পশ্চিমে আনাতোলিয়া, দক্ষিণ ও পূর্বে ইরান অবস্থিত।

ককেশাস অঞ্চল ঃ মূলত আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও জর্জিয়া নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল যা কৃষ্ণ সাগর, কাস্পিয়ান সাগর,ইরান-তুরস্ক ও রাশিরা ভেতর একটি সেতুর মতো কাজ করে।

আনাতোলিয়া ঃ এশিয়া মাইনর নামেও পরিচিত এই ভূখণ্ড ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত। বর্তমান তুরস্কের প্রায় পুরোটাই আনাতোলিয়া নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চল পর্বত-উপত্যকা ও মালভূমিতে পরিপূর্ণ।

মারমারা সাগর ঃ আনাতোলিয়া ও বলকান উপদ্বীপকে বিভক্তকারী এই সাগর ইউরোপ থেকে এশিয়াকে আলাদা করেছে। এটি তুরস্কে অবস্থিত।

দার্দানেলস প্রণালি ঃ এই জলরাশি পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও মারমারা সাগরকে সংযুক্ত করেছে। এর উত্তর-পশ্চিমে গাল্লিপলি উপদ্বীপ (ইউরোপ), দক্ষিণ-পূর্বে আনাতোলিয়া (এশিয়া)।

বসফরাস প্রণালি ঃ বসফরাস প্রণালি এশিয়া ও ইউরোপকে আলাদা করেছে, আর মারমারা সাগর ও কৃষ্ণ সাগরকে সংযুক্ত করেছে।

ভূমধ্যসাগর ঃ জিব্রাল্টার প্রণালির মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত এই বিশাল সাগর ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মাঝখানে অবস্থিত। এর তীরে অনেকগুলো প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথগুলোর কয়েকটি ভূমধ্যসাগরের সাথে জড়িত।

এজিয়ান সাগর ঃ ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্বে তুরস্ক, গ্রিস ও সিরিয়ার মাঝখানে অবস্থিত সাগর।

কৃষ্ণ সাগর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, আনাতোলিয়া, ককেশাস ও রাশিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত একটি সাগর।

টরাস পর্বতমালা ঃ আনাতোলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি মাঝারি উচ্চতার, কিন্তু অত্যন্ত দুর্গম পর্বতমালা।

থ্রেস ঃ প্রাচীন গ্রিস ও বুলগেরিয়ার অংশবিশেষ।

বলকান পর্বতমালা ঃ বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ায় অবস্থিত একটি পর্বতমালা।

বলকান উপদ্বীপ ঃ ভূমধ্যসাগরের উত্তরে ও আনাতোলিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর ও পূর্বে কৃষ্ণ সাগর অবস্থিত।

দানিয়ুব নদী ঃ ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। দুহাজার সাত শ আশি কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই বিশাল নদী দশটি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, দানিয়ুব থেকে উৎপন্ন শাখা নদীগুলো বয়ে গেছে আরও প্রায় নয়টি দেশের ওপর দিয়ে। এটিকে মূলত বলকান অঞ্চলের সাথে মধ্য ইউরোপের সীমান্ত হিসেবে ধরা হয়।

ওয়ালাসিয়া ঃ রোমানীয়ার দানিয়ুব বিধৌত একটি অঞ্চল। এটি একসময় ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ ছিল।

মলদাভিয়া ঃ এটি কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত রোমানিয়ার একটি অঞ্চল।

ট্রান্সিলভানিয়া ঃ রোমানিয়ার একটি প্রদেশ। একসময় এটি হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। ওয়ালাসিয়া, মলদাভিয়া ও ট্রান্সিলভানিয়া দীর্ঘদিন উসমানিদের অধীনে ছিল।

প্যাটাগোনিয়া ঃ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও চিলিতে অবস্থিত একটি অত্যন্ত উঁচু মালভূমি।

কেইপ অফ গুড হোপ ঃ বাংলায় উত্তমশা অন্তরীপ বলে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার একেবারেই দক্ষিণে অবস্থিত এই বিন্দুতে আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগরের সাথে মিশেছে।

মালাক্কা প্রণালি ঃ বঙ্গোপসাগর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশের জলপথ। পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যপথ বলে এটি হাজার হাজার বছর ধরে বিখ্যাত।

ভোলগা নদী ঃ রাশিয়ার জাতীয় এবং ইউরোপের দীর্ঘতম এই নদী প্রায় তিন হাজার সাত শ কিলোমিটার দীর্ঘ। মধ্য রাশিয়াতে উৎপন্ন হয়ে কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিভাষা

তাতার ঃ আরব-ইরানি মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিকরা মোঙ্গলদের বোঝাতে তাতার শব্দটা ব্যবহার করলেও তাতাররা আসলে ভিন্ন একটি জনগোষ্ঠী। চেঙ্গিজ খানের আমলে তাতাররা মূলত মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়ার স্তেপ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। শারীরিক গড়নের দিক থেকে তারা মোঙ্গলদের চেয়ে তুর্কি-সাইবেরিয়ানদের বেশি কাছাকাছি।

উইঘুর ঃ একটি তুর্কি নৃগোষ্ঠী। এদের একটি বড় অংশ বর্তমান জিনজিয়াং তথা পূর্ব তুর্কিস্তানে বাস করে।

কিপচাক ঃ এরাও একটি তুর্কি নৃগোষ্ঠী। এদের প্রধান আবাস রাশান স্তেপের পশ্চিমাংশ ও কাজাখস্তানে। এদের দৈহিক গড়নে মোঙ্গল ও ককেশিয়ান উভয় নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সার্কাশিয়ান ঃ এরা মূলত সার্কাশিয়া অঞ্চলের ককেশিয়ান জনগোষ্ঠী। দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।

তুর্কমান ঃ তুর্কমান শব্দের দুটো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একটা হলো ইমানদার তুর্কি, অন্যটা হলো খাটি তুর্কি। প্রথম মতটা ইবনে কাসিরের, দ্বিতীয় মতটা মাহমুদ কাশগড়ির। এরা সর্বপ্রধান তুর্কি নৃগোষ্ঠী, এবং তুর্কিদের ভেতর এরাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অমুসলিমদের থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্যই মূলত এরা তুর্কমান নাম গ্রহণ করে।

ওঘুজ ঃ একটি তুর্কমান নৃগোষ্ঠী। সেলজুক, অটোমানসহ বহু সালতানাত এরাই গড়ে তোলে।

হুন ঃ ইউরেশিয়ান স্তেপের যাযাবর উপজাতি, খুব সম্ভবত প্রাচীন তুর্কি জাতি।

ভিসিগথ ঃ মূলত জার্মান অসভ্য জাতি।

স্লাভ ঃ রাশান/পূর্ব ইউরোপিয়ান নৃগোষ্ঠী।

ইয়াজুজ মাজুজ ঃ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে বারবার এদের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়, কেয়ামতের আগে এরা আত্মপ্রকাশ করবে এবং মানবজাতি এদের অত্যাচারে ধ্বংস হবার উপক্রম হবে।

মামলুক ঃ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাস সৈনিক। এরা সাধারণত তুর্কমান,কিপচাক বা কুর্দি নৃগোষ্ঠী থেকে আসতো।

শামান ঃ ওঝা। প্রকৃতপূজারি গোষ্ঠীগুলোতে তারা একইসাথে চিকিৎসা, গণকবিদ্যা ও পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তুর্কো মোঙ্গল প্রাচীন সমাজ কাঠামোতে শামানদের ব্যাপক প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল।

কুরুলতাই ঃ মোঙ্গল উপজাতীয় কাউন্সিল। একে আধুনিক সংসদের মোঙ্গল ভার্সন বলা যেতে পারে। কুরুলতাইতে সাধারণত সব বড় বড় গোত্রের খানরা যোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

তেংরি ঃ প্রাচীন তুর্কি ও মোঙ্গলরা এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করত। তাদের ধারণা,এই স্রষ্টার নাম তেংরি এবং তিনি আকাশে বাস করেন। মোঙ্গলরা তেংরির পাশাপাশি বিভিন্ন দেবতারও পূজা করত।

রাজনৈতিক পরিভাষা

কারা খিতাই ঃ কাজাখস্তান, দক্ষিণ সাইবেরিয়া ও পশ্চিম চীনের বিশাল অংশ জুড়ে দ্বাদশ শতাব্দীতে গড়ে উঠা একটি বৌদ্ধ সাম্রাজ্য।

জি জিয়া রাজবংশ ঃ উত্তর-পশ্চিম চীনের একটি শক্তিশালী রাজবংশ। ১০৩৮ সাল থেকে ১২২৭ সাল পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য টিকে ছিল।

জিন রাজবংশ ঃ উত্তর চীন ও উত্তরপূর্ব চীনের একটি বিশাল সাম্রাজ্য।

সং রাজবংশ ঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব চীনের একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য। জি জিয়া, জিন ও সং সাম্রাজ্য পরস্পরের সমসাময়িক ছিল।

উমাইয়া ঃ উমাইয়া ইবন আব্দ শামস ইবনে কুসাইয়ের বংশধরদের উমাইয়া বলা হয়। উমাইয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরদাদা হাশিম ইবন আব্দ মানাফের প্রতিদ্বন্দী। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধরদের মধ্যেও চলতে থাকে।

উমাইয়া খিলাফত ঃ হযরত মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা.) খিলাফতকে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। তাঁর সন্তান ও উমাইয়া বংশের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত খিলাফতকে উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) বলা হয়।

আব্বাসিয়্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের আব্বাসিয়্যা বলা হয়।

আব্বাসিয়া খিলাফত ঃ উমাইয়া খিলাফতের পতন ডেকে আনে আব্বাসিয়্যারা। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই খিলাফাহ ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামি উম্মাহর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

সেলজুক সালতানাত ঃ ওঘুজ তুর্কিদের শাখা কিনিক গোত্র থেকে উদ্ভূত তুর্কি নেতা সেলজুকের বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল সালতানাতকে সেলজুক সালতানাত বলা হয়। একাদশ শতাব্দীতে এই সালতানাত সমগ্র মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। আনাতোলিয়া জয় করে তারা ইসলামকে আনাতোলিয়ায় পৌঁছে দেয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেলজুক সালতানাত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে বিলুপ্ত হয়।

সেলজুক সালতানাত-ই রুম ঃ সেলজুক সালতানাত ভেঙে যাওয়ার পর আনাতোলিয়ায় সেলজুক সালতানাতের অবশিষ্টাংশ।

ফাতিমি খিলাফত ঃ ইসমাইলি শিয়াদের গড়ে তোলা একটি শিয়া সাম্রাজ্য। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি স্থাপিত হয় এবং দশম শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, মিসর, পশ্চিম সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও পবিত্রভূমি হিজাযের (মক্কা-মদিনাসহ পশ্চিম আরব) নিয়ন্ত্রণ আব্বাসিয়া খিলাফতের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। সেলজুকদের উত্থানের ফলে তারা সিরিয়া ও হিজাযের নিয়ন্ত্রণ হারায়। সুলতান নুরুদ্দিন জাঙ্গী তাদের সিরিয়া থেকেও বিতাড়িত করেন। শেষমেশ সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফাতিমি খিলাফতের অবসান ঘটান এবং আইয়ুবি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। সুন্নি মুসলিমদের কাছে ফাতিমিরা কখনোই খিলাফতের বৈধতা পায়নি।

আইয়ুবি সালতানাত ঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি ও তার বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইয়েমেন ও দক্ষিণ আনাতোলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সালতানাত।

মামলুক সালতানাত ঃ আইয়ুবি সালতানাতের পতনের পর মিসর, সিরিয়া, সুদান, হিজায ও ইয়েমেনে গড়ে উঠা এই সালতানাত মূলত তুর্কি দাস সৈনিকদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এটি ১৫১৭ সাল পর্যন্ত টিকেছিল।

ক্লাসিক্যাল রোমান সাম্রাজ্য ঃ সম্রাট জুলিয়াস সিজার ও অক্টাভিয়ান সিজারের সময় থেকে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩১ অব্দকে এর সূচনাকাল ধরা হয়) ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমের পতন অবধি টিকে থাকা রোমভিত্তিক সাম্রাজ্য। নিজের ক্ষমতার শিখরে রোমান সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, বলকান অঞ্চল, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, মিসর, আনাতোলিয়া, সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন নিয়ন্ত্রণ করত।

বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্য ঃ সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর কন্সট্যান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে বলকান অঞ্চল, আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া ও আনাতোলিয়ায় রোমান সাম্রাজ্য টিকে থাকে। খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর সময় মধ্যপ্রাচ্যে রোমান শাসনের অবসান ঘটে। উসমানি সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।

উপাধিসূচক পরিভাষা

খান ঃ তুর্কো-মোঙ্গল গোত্রপ্রধানদের সম্মানসূচক উপাধি।

খাকান ঃ খানদের খান, তুর্কো-মোঙ্গল বাদশাহ বা সম্রাটদের ক্ষেত্রে এই উপাধি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বে/বেগ ঃ অভিজাত ব্যক্তি।

এফেন্দি ঃ সম্মানিত ব্যক্তি।

জেলেবি/চেলেবি ঃ ভদ্রলোক(মিস্টার/জনাবের সমার্থক)।

খাতুন/হাতুন ঃ ভদ্রমহিলা

নোইয়ান ঃ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসক। এরা একই সাথে শাসক ও জেনারেলের ভূমিকা পালন করতেন।

তুরগাউদ/খেশিগ ঃ খানের বিশেষ দেহরক্ষী বাহিনী।

কাইজার ঃ রোমান সম্রাট/ইউরোপিয়ান সম্রাট।

জার/সিজার ঃ কাইজার শব্দের ল্যাটিন/স্লাভ অপভ্রংশ।

পাপাল বুল ঃ পোপের জারি করা লিখিত প্রজ্ঞাপন।

কার্ডিনাল ঃ পোপের বিশেষ প্রতিনিধি, যিনি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ক্যাথলিক চার্চের প্রধানের ভূমিকা পালন করেন।

নাইট ঃ অভিজাত ইউরোপিয়ান ভারী অশ্বারোহী সৈনিক। তবে নাইটস টেম্পলার, হসপিটালার ও টিউটনিক নাইটদের ব্যাপারটা ভিন্ন।

নাইটস টেম্পলার ঃ একটি মধ্যযুগীয় ভ্রাতৃসংঘ। এদের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করা। ধর্মযোদ্ধা হিসেবে ক্রুসেডে অসাধারণ বীরত্ব দেখানোর কারণে তারা বিখ্যাত ছিল। তাদের ছিল নিজস্ব গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ও অর্থব্যবস্থা। নাইটস হসপিটালার ও টিউটোনিক নাইটরাও অনেকটা নাইটস টেম্পলারদের মতোই ধর্মীয় সামরিক ভ্রাতৃসংঘ ছিল।

ডেস্পট ঃ সম্রাটকে কর প্রদানের বিনিময়ে রাজ্য পরিচালনার অধিকারপ্রাপ্ত শাসক।

কাউন্ট/লর্ড ঃ অভিজাত জমিদার।

ম্যাগনেট ঃ সম্ভ্রান্ত হাঙ্গেরিয়ান জমিদার।

বয়ার ঃ স্লাভ/রোমানিয়ান অভিজাত ব্যক্তি।

কাজি উল কুজ্জাত ঃ প্রধান বিচারক।

শাইখুল ইসলাম ঃ প্রধান ইসলামি আইন প্রণেতা। সুলতান বাদশাহদের তাদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কাজ করতে হতো। কোনো কোনো সালতানাতে শাইখুল ইসলামদের ক্ষমতা প্রায় সুলতান/শাসকের সমকক্ষ ছিল।

পাশা ঃ গভর্নর জেনারেল। একই সাথে সুলতানি দিউয়ানের সদস্য, একটি বড় প্রদেশের শাসক এবং জেনারেল।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : মৃত্যুর সম্রাট

বুরখান খালদুনের কোলে ২৭
খান-ই খানান ৩৩
ঘাতক মোঙ্গল ৩৬
মহাচীনে ৪১
ঝড়ের পূর্বাভাস ৪৫
ইয়াজুজ মাজুজ ৫০
তুর্কি তরুণ ৬১
গোরস্তান-ই খুরাসান ৬৪
হিন্দুকুশ থেকে হিন্দুস্তানে ৬৯
কেউ অমর নয় ৭৫
ফেরারি ৮৩
আনাতোলিয়ার কাফেলা ৮৮
আরব রজনীর স্বপ্নভঙ্গ ৯৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : জানবাজ মামলুক

মিসরের সিংহ ১০৬
বারকি খান ১১৪
ইশকিস্তান ১১৯
পাল্টা আঘাত ১২৬
মোঙ্গলদের মুখোমুখি ১৩৫
চূড়ান্ত লড়াই ১৪১

তৃতীয় অধ্যায় : গাজির ঘোড়া

আরতুরুল, এদেব আলি, উসমান ১৪৭
ডাইনামিক্স অফ আনাতোলিয়া ১৫০
গাজি ১৫৭
গাজিদের গাজি ১৬২

আখি ১৬৮
কালো মরণ ১৭৩
ইউরোপের দুয়ারে..১৮০
মুরাদ ১৮৫
মারিৎজায় রক্তগঙ্গা ১৮৯
জানিসারি ১৯৭
কূটনীতির গ্র্যান্ডমাস্টার..২০১
কসোভোর যুদ্ধ ২০৭

চতুর্থ অধ্যায় : চারিদিকে শত্রু

থান্ডারবোল্ট ২১৩
মরণপণ..২১৭
অশান্ত আনাতোলিয়া..২২৬
আলজাই ২২৯
দ্যা চেসবোর্ড..২৩১
মহাসমর ২৩৯
গৃহযুদ্ধ ২৪৭
ঘরের শত্রু ২৫৪
কমান্ডার জন ২৫৮
ভার্না হ্রদের তীরে ২৬৪
সুফি সুলতান..২৬৯
গুলবাহার ২৭৭

পঞ্চম অধ্যায় : বারুদি সালতানাত

আল ফাতিহ..২৮০
খাকান উল বাহরাইন ৩০৭
মশলা ৩১১
হেরেম-ই হুমায়ুন ৩১৪
আবার হুনয়াদি ৩২৩
ইমান , ইনসাফ , ইনসানিয়াত..৩২৯
ট্রেবিজন্ড অভিযান ৩৪১

ষষ্ঠ অধ্যায় : বীর-মহাবীর

শয়তানের ছেলে....................................৩৪৫
ড্রাকুলার মুখোমুখি ৩৫১
গেরিলা ৩৫৯
মরণপণ লড়াই ৩৬৫
সন্ন্যাসী জেনারেল ৩৭৪
সুলতানের শেষ লড়াই ৩৭৯
ড্রাকুলার গর্দান....................................৩৮৩
ক্রিমিয়ার চিঠি....................................৩৮৬
সুলতান, কাইজার, পোপ....................................৩৯০
হারিয়ে যাওয়া ঈগল ৩৯৩
আবার গৃহযুদ্ধ ৩৯৭

সপ্তম অধ্যায় : নয়া দুনিয়ায়

রিকনকুইস্তা.................................... ৪০০
আলহামরার অশ্রু ৪০৭
কলোনিয়াল দুনিয়ায় ৪১৩
আটলান্টিক ছাড়িয়ে....................................৪১৭
গ্লোবালাইজেশান ৪২১
নতুন এক পৃথিবীতে ৪২৬
Biblographi.................................... ৪২৯

প্রথম অধ্যায় : মৃত্যুর সম্রাট

বুরখান খালদুনের কোলে

এক

১১৬২ সাল, বসন্ত কাল।

পবিত্র পর্বত বুরখান খালদুনের ঢালে ওনোন নদীর তীরে নিজের দুই স্ত্রী সোচিদেই আর হুয়েলোনকে নিয়ে বেশ আমোদ করে বেড়াচ্ছিলেন বোরজিগিন গোত্রের ইয়ুসুগেই। দুই স্ত্রীর মধ্যে বড়জন সোচিদেই তার চেয়ে কয়েক বছরের বড়।

কিন্তু সোচিদেই তার প্রধান স্ত্রী নন, সে জায়গাটা রাখা তার ছোট স্ত্রী হুয়েলোনের জন্য। হালকা পাতলা গড়ন আর লম্বা চুলের এই মেয়েটিকে ইয়ুসুগেই লুট করে এনেছেন মেরকিতদের কাছ থেকে। তারপর তাকে করে নিয়েছেন নিজের প্রধান স্ত্রী।

পাহাড় থেকে নেমে নদী তীরে কিছুক্ষণ চরে বেড়ানোর পর হঠাৎ হুয়েলোন ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। নিজের পেট চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। শুরু হলো চিৎকার।

ইয়ুসুগেই প্রথমে না বুঝলেও সোচিদেই ঠিকই বুঝেছেন তার সতিনের প্রসব বেদনা উঠেছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা ঝোপের ভেতর। কয়েক মিনিটের ভেতরেই এক সুস্থ সবল শিশুপুত্রের জন্ম দিল হুয়েলোন। ছেলেটির চোখজোড়া হলুদ, ডান হাতের মুঠোতে জমাট বেঁধে আছে এক টুকরো লাল রক্ত।[১]

---

১. Charleux, I., 2009. Chinggis Khan: Ancestor, Buddha or Shaman?. Mongolian studies, 31, pp 207-258.

আকাশের দিকে তাকিয়ে মহান তেংরিকে কৃতজ্ঞতা জানালেন ইয়ুসুগেই।

হাতের মুঠোয় জমাট রক্ত নিয়ে জন্মানোর মানে এই ছেলে একদিন মহাবীর হবে।[২]

বরফের ওপর কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম শেষে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হাঁটা ধরলেন হুয়েলোন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই উঠে পড়লেন নিজের ঘোড়ায়। তিনি ওলখানি গোত্রের মেয়ে।[৩] তার গোত্রের মেয়েদের ঘোড়া থেকে নেমে বাচ্চা প্রসব করে ঘোড়ায় উঠে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। ইয়ুসুগেই ঠিক করলেন তার সন্তানের নাম রাখা হবে তেমুজিন।

ইয়েসুগেই মানুষটা সাধারণ হলেও তার বংশপরিচয় সাধারণ ছিল না। তার দাদা খাবুল ছিলেন খামাগ মোঙ্গলদের খান। তার বংশধারা গিয়ে মিলিত হয়েছে মহাবীর বুদুনচার মুনখাগের সাথে।[৪]

কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে চীনের জিন রাজবংশের অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। খাবুল খানের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে দেয়া হয়েছিল তাতারদের হাতে।[৫] জিনদের শক্তি ছিল অপরিমেয় তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো চেষ্টাই করেনি মোঙ্গলরা।

ইয়ুসুগেই চেষ্টা করছিলেন নিজের গোত্রকে আবার ঐক্যবদ্ধ করতে। কিন্তু তাতাররা আর সেটা হতে দিল না।

মূলত শক্তি বাড়ানোর জন্যই ইয়ুসুগেই বড় ছেলে তেমুজিনকে বিয়ে দিয়েছিলেন ঐঙ্গিরাত গোত্রের মেয়ে বর্তির সাথে।

মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী যারা মেয়ে দেয় তারা হলো উঁচু, আর যারা মেয়ে নেয় তারা হলো নিচু। তাই ছেলের পরিবার মেয়ের পরিবারকে যৌতুক দেয়। এই বিয়েতে যৌতুক ছিল একটা কালো স্যাবলের চামড়ার জ্যাকেট। বাবার মৃত্যু পর্যন্ত তেমুজিন মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী বর্তির বাড়িতেই থেকেছেন তিন বছর।

ইতোমধ্যে তাতাররা একদিন বিয়ে বাড়ির খাবারে বিষ দিয়ে হত্যা করে ইয়ুসুগেইকে।[৬] বাবা হারানোর খবর পেয়ে বালক তেমুজিন বাধ্য হলো মায়ের কাছে ফিরে যেতে।

ইয়ুসুগেইয়ের মৃত্যুর পর পরই গোত্রের শক্তিশালী প্রতিপক্ষরা নির্বাসনে পাঠায় তেমুজিন ও তার পরিবারকে। বনে জঙ্গলে তীব্র কষ্টের ভেতর বড় হতে থাকল তেমুজিন।

---

২. প্রাগুক্ত(১)

৩. Guida Myrl Jackson-Laufer, Guida M. Jackson. Encyclopedia of traditional epics. p. 527.

৪. Ratchnevsky, Paul (1991). Genghis Khan: His Life and Legacy. Blackwell Publishing. pp. 9–10. ISBN 0-631-16785-4.

৫. Saunders, J.J., 2001. The history of the Mongol conquests. University of Pennsylvania press.

৬. Lane, G., 2004. Genghis Khan and Mongol Rule. Hackett Publishing..pp. 15.

তাদের খাবার ছিল শিকার থেকে পাওয়া খরগোশ, হাঁস আর ঘুঘুর মাংস। কিন্তু রোজ রোজ শিকার মিলত না। তিন ভাই, দুই সৎভাই আর এক বোন ও মাকে নিয়ে জঙ্গলে টিকে থাকা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জের। এমন অনেক দিন গেছে, নেকড়ের খাওয়া মরা ষাঁড়ের মাংস খেয়ে টিকে থেকেছে তার পরিবার। এই কষ্ট আরও তীব্র হয়ে উঠে যখন তার এক সৎভাই বারগাত জোর করে তার মা হুয়েলোনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। নিজের ভাইদের মধ্যে তেমুজিন আর খাসার তখন বালক মাত্র।[৭]

চোখের সামনে সৎভাইয়ের হাতে প্রতি রাতে মাকে ধর্ষিতা হতে দেখার তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে দিনকে দিন লোহার মতো কঠিন হয়ে যেতে থাকে তেমুজিনের মন। একদিন শিকারের ভাগাভাগি নিয়ে হওয়া তুচ্ছ মারামারিতে সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ হলো।

তেমুজিন আর খাসার মিলে খুন করে ফেলল সৎভাই বারগাতকে।[৮]

এরপর এল আরও কঠিন সময়। তৈয়ুচিদ গোত্রের দস্যুদের হাতে বন্দি হয়ে দাসে পরিণত হলো তেমুজিন।[৯] অথচ এই তৈয়ুচিদরা একদিন ছিল তার বাবার বন্ধু। তিন তিনটি বছর তাকে কাটাতে হয়েছে দাসত্বের মধ্যে। কিন্তু যার ভাগ্যে আছে মহাসম্রাট হওয়া, তাকে কি আর দাসত্ব মানায়?

তৈয়ুচিদদের তাঁবু থেকে এক রাতে তেমুজিন পালিয়ে গেল। তাকে পালাতে সাহায্য করেছিল ওই তাঁবুর রক্ষীরই ছেলে চিলাউন।[১০]

এত দিন যে তেমুজিন ছিল অসহায় শিকার, ষোল বছর বয়সে এসে সে শিকারীতে পরিণত হতে চাইল। তার সাথে যোগ দিল তার ভাই খাসার, দুই বাল্য বন্ধু বর্চু আর জেলমি।

একটু একটু করে এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলল ওরা। ওদের বাহিনীতে ওপরে উঠার রাস্তা ছিল একটাই, মেধাবী আর বিশ্বস্ত হওয়া।

এই ছয় বছর তেমুজিন বনে, জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার হৃদয়ে ছিল বর্তি, তার প্রিয়তমা স্ত্রী। স্ত্রীকে নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষমতা তার আছে, মনে হবার সাথে সাথে তেমুজিন বর্তিকে নিজের কাছে নিয়ে এল।

কিন্তু ভাগ্য এবারেও তাকে নির্মম এক কষাঘাত হানল।

---

৭. Weatherford. Jack (March 22, 2005). Genghis Khan and the Making of the Modern World. p. 23. ISBN 978-0-307-23781-1.

৮. প্রাগুক্ত (৭)।

৯. Weatherford. J.. 2011. The secret history of the Mongol queens: how the daughters of Genghis Khan rescued his empire. Broadway Books.

১০. প্রাগুক্ত (১)।

যে মেরকিত গোত্র থেকে তার বাবা তার মাকে তুলে এনেছিলেন, প্রতিশোধ হিসেবে তারা এক রাতে অতর্কিত হামলা করে বসল তেমুজিনের গোত্রে। ঘোড়া কম থাকায় শুধু পুরুষরাই পালাতে পারল, ধরা পড়ে গেলেন হুয়েলোন, বর্তি ও অন্যান্য মেয়েরা।

তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা হলো মাসের পর মাস।

প্রায় এক বছর পর শক্তিশালী এক মোঙ্গল খান তঘরুলের সহায়তায় বর্তিকে আবার ফিরিয়ে আনল তেমুজিন।

মেরকিতদের ওপর সে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছিল এর অনেক অনেক দিন পর।

আট মাস পর বর্তি এক ছেলের জন্ম দিল। ছেলের নাম রাখা হলো জোচি। জোচির আসল বাবা কে, তা নিয়ে শুরু হলো গুজব। তেমুজিন বুঝল, যদি জোচিকে সে অস্বীকার করেন, তাহলে প্রিয়তমা বর্তিকেও হারাতে হবে। জোচিকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করল সে। তবে গোত্রের লোকেরা সব সময়েই জোচির পরিচয় নিয়ে সন্দেহ করেছে।

বর্তির এই অপহরণের ঘটনা তেমুজিনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে বুঝতে পারল, তাকে ক্ষমতাবান হতে হবে। মোঙ্গল স্তেপে টিকে থাকতে শক্তির কোনো বিকল্প নেই।

যেমনটা বলা আছে প্রাচীন তাতার প্রবাদে। 'ইরিন মোর নিগেন বুই'। মানবজাতির পথ একটাই। যুদ্ধ!!

দুই

যুদ্ধই কাছাকাছি এনে দিয়েছিল দুই প্রিয় বন্ধু, রক্ত শপথের ভাই (Blood Brother) জমুখা আর তেমুজিনকে। জমুখা ছিলেন তেমুজিনের বিশ্বস্ততম সহচর, সবচেয়ে কাছের বন্ধু।

জমুখা, তেমুজিন, জেলমি আর খাসার মিলে গড়ে তুলেছিলেন এক ছোট, কিন্তু দুর্ধর্ষ যোদ্ধার দল।

তেমুজিন যখন তার বাবার রক্ত শপথের ভাই তঘরুলের সহায়তায় মেরকিতদের কাছ থেকে বর্তিকে ছিনিয়ে আনলেন, তখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু সাফল্য অনেক সময়ই বন্ধুত্বে ফাটলের কারণ হয়।

মেরকিতদের সাথে লড়াইয়ের আগে মোঙ্গলদের প্রধান শামান কোচুকু ঘোষণা করেছিলেন, তেমুজিনের সাথে আছে স্বর্গের আশীর্বাদ। সে হবে এক মহান খান। এই লড়াইয়ে সেই জিতবে।[১১]

---

১১. Beckwith, C.I., 2009. Empires of the silk road: A history of central Eurasia from the Bronze Age to the present. Princeton University Press.

এই ঘোষণার কোথাও জমুখার কথা ছিল না। মোঙ্গল স্তেপে তেমুজিনের ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে জমুখার সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হতে থাকল। এর প্রধান কারণ ছিল ক্রমাগত ঈর্ষা আর সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে মতবিরোধ।

তেমুজিন চেয়েছিল বংশ মর্যাদা না, মেধার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ দিতে। কিন্তু জমুখা নিজে ছিলেন এক গোত্র প্রধান, তাই তিনি এই পদ্ধতি মানলেন না। তিনি চাইতেন চিরায়ত মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী গোত্রীয় সম্মানের ওপরেই সেনাবাহিনীর নেতা নির্বাচিত হোক।

এই বিরোধের সময়েও তেমুজিন জমুখাকে অবিশ্বাস করতেন না। তিনি ভাবতেন, জমুখা আর যাই করুক তার সাথে কোনোদিন দ্বন্দ্বে নামবে না।

কিন্তু পুরুষের নিশ্চয়তাও যেখানে ভুল হয়, সেখানে প্রায়শই সঠিক প্রমাণিত হয় নারীর অনুমান। বর্তি আগেই সন্দেহ করেছিলেন জমুখাকে।

১১৮৭ সালে জমুখা তেমুজিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন তেমুজিন।

এরপর প্রায় দশ বছর তেমুজিন কী করেছিলেন, তার কিছুই জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, এই সময়েই তিনি সম্পূর্ণ অনুগত এক বাহিনী তৈরি করেছিলেন। যাদের আনুগত্য, দক্ষতা আর বিশ্বস্ততা এমনকি হিটলারের নাজিদেরও হার মানাবে।

তেমুজিনের বাহিনীতে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা। তারা চলাফেরা করত অভেদ্য এক দেয়ালের মতো। সৈনিক থেকে খান, সবাই খাবার খেত একই সাথে। শিকার বা লুটের ভাগে ছিল সবাই সমান। নিজের খানের সাথে কোনোভাবেই মিথ্যা বলত না কোনো মোঙ্গল। কারণ, মিথ্যার শাস্তি ছিল একটাই, মৃত্যু।

প্রতি দশ জন যোদ্ধা মিলে হতো এক আরবান। দশ আরবান মিলে এক জুউন, দশ জুউন মিলে এক মিঙ্গিন আর দশ মিঙ্গিন মিলে এক টুমেন। অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার যোদ্ধা মিলে একেকটি টুমেন তৈরি হতো। প্রতি দশ জনের জন্যও নির্ধারিত ছিল কমান্ডার, যার আদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল অলঙ্ঘনীয়।[১২]

যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোর কথা কেউ ভাবতেই পারত না। কারণ, যে আরবান (ইউনিট) থেকে কোনো যোদ্ধা পালিয়ে যাবে, সেই আরবানের বাকি নয়জনকেই জবাই করা হবে।[১৩] কোনো অপরিচিত লোকের কাছ থেকে খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, যাতে সৈন্যদের বিষ খাওয়ানো না যায়। প্রবাহিত পানিতে গোসল করা ছিল নিষিদ্ধ। কারণ, তাহলে পানি দূষিত হয়ে বজ্রপাতের ড্রাগনদের বিরক্ত করতে পারে।

---

[১২]. Martin. H.D.. 1943. The Mongol Army. Journal of the royal Asiatic society. 75 (1-2). pp.46-85.

[১৩]. প্রাগুক্ত।

নদীতে পেশাব করা ছিল সরাসরি নিষিদ্ধ। কারণ, এতে ড্রাগনরা বিরক্ত হয়।[১৪] এই ধরনের অপরাধের সাজা ছিল মৃত্যু।

একই রকম খাবার, পোশাক, জীবনযাত্রা আর একই নেতার আনুগত্য তাদের ভেতর তৈরি করেছিল অসামান্য ঐক্য আর কমরেডশিপ।

তেমুজিন কাউকে তার উপাধি বা গোত্রের নামে ডাকা নিষিদ্ধ করেছিলেন। সবাইকে ডাকা হতো যার যার নিজের নামে, এমনকি তেমুজিনকেও। যুদ্ধে যারা মারা যেত, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দেখাশোনা করতেন তেমুজিনের মা। তারা বড় হতো তেমুজিনের নিরাপত্তায়। তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। শত্রুর ওপর আঘাত হানার আগে শত্রুর উদ্দেশ্য আর শক্তি সম্পর্কে শতভাগ পাকা খবর থাকত তার কাছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো তেমুজিনকে ক্রমেই শক্তিশালী করে তোলে।

১১৯৬ থেকে ১২০৩ সালের ভেতরে তিনি তাতারদের পরাজিত করেন। জমুখাকে পরাজিত করেন, পরাজিত করেন তার বাবার বন্ধু, একসময়ের সাহায্যকারী তঘরুলকেও। ১২০৩ সালে জমুখা নাইমানদের নিয়ে শেষবারের মতো তেমুজিনের মুখোমুখি দাঁড়ান। কিন্তু তার আগের রাতে জমুখার গোত্রের সবচেয়ে প্রবীণ লোকটা স্বপ্ন দেখেন, মহান স্বর্গ তাকে তেমুজিনের সাথে যোগ দিতে আদেশ করেছেন। ফলে তিনি যুদ্ধের আগে দলত্যাগ করেন। শিবিরের সবচেয়ে প্রবীণ যোদ্ধা দল ত্যাগ করেছে জানার পর জমুখার শিবিরে বুড়োর স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়ে।

অসংখ্য যোদ্ধা জমুখাকে ত্যাগ করে তেমুজিনের দলে ভিড়ে যায়। আবারও পরাজিত ও বন্দি হলেন জমুখা। তেমুজিন চেয়েছিলেন নিজের রক্ত শপথের ভাইকে ক্ষমা করে আবার বন্ধু হয়ে যেতে। কিন্তু জমুখা চাইলেন রক্তপাতহীন মহান মৃত্যু।

তাকে মেরুদণ্ড ভেঙে মেরে ফেলা হলো।[১৫]

মোঙ্গল স্তেপের শাসক হিসেবে রইলেন একজনই, তেমুজিন। তিনি ভাবলেন, এই বিশাল, বিক্ষিপ্ত, কোন্দলে লিপ্ত মোঙ্গলদের এখন একত্রিত করার সময় হয়েছে।

১২০৫ সালে মোঙ্গল স্তেপে খবর ছড়িয়ে পড়ল, খান তেমুজিন সব গোত্রের খানদের আগামী বসন্তে পবিত্র পর্বত বুরখান খালদুনের উপত্যকায় কুরুলতাইয়ে ডেকেছেন।

---

[১৪]. RiasanovsKz. V.A.. 1948. Mongol Law–A Concise Historical Survey. Wash. L. Rev. & St. BJ. 23. p.166.

[১৫]. Okada. H.. 1972. The Secret History of the Mongols. a pseudo-historical novel Journal of Asian and African Studies. 5.

খান-ই খানান

'আজ থেকে তোমাদের জন্য একে অন্যের রক্ত ঝরানো নিষিদ্ধ হলো। এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের লড়াই আর চলবে না। এই সমভূমি, যা মহান আকাশ দেবতা আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা পবিত্র। এই ভূমিতে থাকা প্রতিটি যাযাবর অধিকারের দিক থেকে সমান।

আজ থেকে কেউ কারো সাথে প্রতারণা বা মারামারি করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। কেউ কারো ঘোড়া চুরি করতে পারবে না। কারো কাছে অন্যের ঘোড়া পাওয়া গেলে তাকে অবশ্যই আরও সাতটি ঘোড়া ঘোড়ার আসল মালিককে জরিমানা দিতে হবে। ঘোড়া না থাকলে নিজের সন্তানদের দিয়ে দিতে হবে। সন্তান না থাকলে নিজের জীবন দিতে হবে।

আকাশ দেবতার এই মহান ভূমিতে আজ থেকে কোনো ভিক্ষুক বা দরিদ্রকে কেউ অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে পারবে না। কোনো বৃদ্ধকে অসম্মান করা যাবে না, কোনো মেয়েকে জোরপূর্বক অপহরণ করা যাবে না।

অন্যের স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করা যাবে না। কাউকে হত্যা করে তার স্ত্রী ও মেয়েদের ধর্ষণ করা যাবে না। এর প্রতিটি অপরাধের শাস্তি একটাই মৃত্যুদণ্ড।

আমার সাম্রাজ্যে খানদের চিরাচরিত গোত্রীয় পদমর্যাদার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব পাওয়া চলবে না। নেতৃত্ব পবিত্র, এটি স্বর্গ থেকে আসে। শুধু বীর, সাহসী, বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্তরাই এর যোগ্য।

প্রত্যেকে যার যার খানকে মেনে চলবে। নিজের খানকে মেনে চলা, আমাকে মেনে চলারই শামিল। যে নিজের খানের অবাধ্য, সে আমারও অবাধ্য। আর তেমুজিনের অবাধ্যতার পরিণাম একটাই, মৃত্যু।

মোঙ্গলরা শত শত বছর ধরে কখনো তুর্কিদের হাতে, কখনো উইঘুরদের হাতে, কখনো হান বা জিনদের হাতে মার খেয়ে এসেছে। এই মার খাওয়ার দিন আজ থেকে শেষ।

আমরা, পবিত্র ঈশ্বর তেংরির মনোনীত এক বিজয়ী জাতি। পৃথিবীকে শাসন করার জন্য মহান তেংরি এই জাতি সৃষ্টি করেছেন।

আজ থেকে এই জাতি কারও বশ্যতা স্বীকার করবে না। আমাদের ঘোড়ার গতির কাছে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসবে। মহান আকাশ দেবতার সাহায্যে আমরা বিশ্বজয় করব। সূর্যোদয়ের স্থান থেকে শেষ সাগরের তীর, যেখানে সূর্য ডোবে, সেই পর্যন্ত আমরা আমাদের ঘোড়ার পাল খেদিয়ে নিয়ে যাব। যারা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের জন্য আছে শান্তি ও পুরস্কার। যারা আমাদের বাধা দেবে, তাদের মাথার খুলি পড়ে থাকবে পথের দুধারে।

মহান তেংরি আমাদের সহায় হোন। পূর্বপুরুষদের পবিত্র আত্মা আমাদের পথ দেখাক।'

চেঙ্গিজ খানের বক্তৃতা শেষ হলো। তিনি একটা সাদা পশমী কার্পেটে বসে আছেন। কেরাইত, নাইমান, তাংগুত, উইঘুর, খামাগ, বোরজিগিন, ঐরাত আর তাতার খানেরা তাকে কার্পেটসহ মাটি থেকে ওপরে তুলে ধরলেন।

বুরখান খালদুনের নিচে মঙ্গোলিয়ান স্তেপে নেমে আসা উপত্যকা জুড়ে জমায়েত হওয়া প্রায় এক মিলিয়ন যাযাবর তখনও জানে না, তারা কী এক অপরিমেয় শক্তির জন্ম দিয়েছে।

পৃথিবীর ক্ষমতা ও সভ্যতার কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে, গোবি মরুভূমি আর সাইবেরিয়ার মাঝে, ইউরেশিয়ান স্তেপের একেবারে পূর্বে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো এবং একে অন্যের পেছনে লেগে থাকা ডজনখানেক গোত্র এক হয়ে গেলে কতবড় শক্তির জন্ম হতে পারে, তা কল্পনা করা তখন কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

এই কুরুলতাইয়ের পর মোঙ্গলদের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে গেলেন তেমুজিন। পৃথিবী যাকে চেঙ্গিজ খান নামেই চেনে। তার বয়স তখন চুয়াল্লিশ।

অস্বাভাবিক লম্বা, বিশাল কাঁধ, ভালুকের মতো ভারী শরীর নিয়ে তিনি চিতার মতো ক্ষিপ্র ছিলেন। ছিলেন হাতির মতো শক্তিশালী আর শেয়ালের চেয়েও চালাক।

বারবার তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি হেঁটে মোঙ্গলদের ঐক্যবদ্ধ এক জাতিতে পরিণত করেছেন। গোত্রীয় প্রথা-ঐতিহ্যের অনেক কিছু ভেঙে দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন মেধা আর বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে গড়ে উঠা এক যাযাবর সাম্রাজ্য। যার পশ্চিমে ইউরেশিয়ান স্তেপে কারা খিতাই, পূর্বে সাইবেরিয়ার এস্কিমো, দক্ষিণে জিয়া রাজবংশ আর দক্ষিণ-পূর্বে জিন রাজবংশ।

যাযাবরদের এই দরিদ্র নেতা, যিনি বাস করেন পশমের তাঁবুতে, আর ঘুমান কম্বল দুভাজ করে! তিনি যে পৃথিবীর ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে যাচ্ছেন, তা হয়তো তিনি নিজেও তখনো ভাবেননি।

ঘাতক মোঙ্গল

এক

প্রতিটি মোঙ্গল পুরুষ তার জন্মানোর দিন থেকেই যোদ্ধা, আর মেয়েরা যুদ্ধের সহযোগী।

মাত্র তিন বছর বয়সে মোঙ্গল শিশুদের ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ছেড়ে দেয়া হতো। তারপর ঘোড়াকে ছোটানো হতো পূর্ণ গতিতে। ছয় বছর বয়স নাগাদ এই শিশুরা নিজেরাই পুরোদস্তুর সওয়ার হয়ে উঠত। দশ বছর বয়সের মধ্যে তারা শিখে যেত তীরন্দাজী। যে পুরুষ তীর চালাতে আর ঘোড়ায় চড়তে না জানত, মোঙ্গলদের সমাজে তার পক্ষে বেঁচে থাকা ছিল অসম্ভব।

মেয়েরাও সমান তালে ঘোড়ায় চড়তে জানত, জানত তীর চালাতে। মোঙ্গলরা সওয়ার হিসেবে এতই দক্ষ ছিল যে, তারা পূর্ণ বেগে চলা ঘোড়ার ওপর থেকে নিখুঁতভাবে তীর চালাতে পারত। তারা যেকোনো সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে একদিকে কাত হয়ে ঘোড়ার পেটের সাথে লেগে থাকতে পারত। তীর চালাত ঠিক তখন, যখন ঘোড়ার চার পা মাটি থেকে শূন্যে থাকত। এতে তীরের নিশানা থাকত নিখুঁত। এমনকি তারা উল্টোদিকে ফিরেও একই দক্ষতায় তীর চালাতে পারত।

তাদের ধনুকের পাল্লা ছিল প্রায় দুই শ থেকে সাড়ে তিন শ মিটার[১]। চীনাদের ধনুকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এই পাল্লার কারণে তারা অনেক অনেক দূর থেকেই শত্রুকে ঘায়েল করতে সক্ষম ছিল।

তীরন্দাজীতে মোঙ্গলদের সেরা অস্ত্র ছিল পার্থিয়ান শট নামের দুর্দান্ত এক কৌশল। শত্রুর সামনে থেকে হঠাৎ ভয় পেয়ে পালানোর ভান করে তারা ঘোড়া উল্টোদিকে ঘুরিয়ে পালানোর ভান করত। ফলে শত্রুরা স্বভাবতই তাদের পিছু নিত। পালানোর ভান করা অবস্থাতেই হঠাৎ ছুটন্ত ঘোড়া থেকে পেছন ফিরে তীর মেরে তারা শত্রুর বুক এফোঁড়ওফোঁড় করে দিত, আর এই ফাঁদে একবার পড়ে গেলে বেঁচে ফেরা যে কারও জন্যই কঠিন হয়ে যেত।

যুদ্ধের ময়দানে তাই মোঙ্গলরা খুব কমই শত্রুর সাথে সরাসরি সংঘর্ষে যেত। তারা শত্রুকে গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধির খেলাতে হারিয়ে এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে আসত, যেন যুদ্ধ শুরুর আগেই শত্রুর পরাজয় হয়ে ওঠে অবধারিত।

দুই

চেঙ্গিজ খান কখনোই এমন কোনো যুদ্ধে জড়াতেন না, যেখানে তিনি জিততে পারবেন না। এসব ক্ষেত্রে তিনি স্রেফ যুদ্ধ এড়িয়ে যেতেন।

শত্রুর হাঁড়ির খবর রাখতে যুদ্ধের কয়েক মাস বা কয়েক বছর আগেই তিনি প্রচুর গোয়েন্দা নিয়োগ করতেন। বড় যুদ্ধগুলোয় চেঙ্গিজ খানের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ, তিনি শত্রুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখতেন। তাই তাঁর পক্ষে শত্রুর পরবর্তী চাল আন্দাজ করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। তার গোয়েন্দারা প্রায়ই শত্রুবাহিনীর ভেতরে যারা কমান্ডার কিংবা সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষেপে আছে, তাদের চিহ্নিত করত এবং সুযোগ বুঝে তাদের দলে ভিড়িয়ে নিত।

মোঙ্গলরা লড়াইয়ের সময় সাধারণত তাদের দুরন্ত ক্যাভালরি নিয়ে শত্রুর যেকোনো একটা ফ্ল্যাঙ্ক, কখনো দুই ফ্ল্যাঙ্কই ভেঙে ফেলত। এটা ছিল তাদের প্রাইমারি ট্যাকটিক্স। এতে কাজ না হলে তারা অনেক সময় একটা দুর্বল বাহিনী পাঠিয়ে শত্রুকে লড়াইয়ে নামতে উদ্বুদ্ধ করত। মূল বাহিনী লুকিয়ে থাকত চতুর্দিকে। লড়াই শুরুর পর তারা শত্রুকে হঠাৎ ঘিরে ফেলত সবদিক থেকে।[২] এই অবস্থায় সাধারণত কোনো বীর সেনাপতি জীবন বাজি রেখে শত্রুকে আক্রমণ করেন। সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হতে পারত অনেক বেশি। এই ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য মোঙ্গলরা পালানোর একটা পথ রেখে দিত শত্রুর একেবারে সামনেই। ফলে শত্রু চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে লড়াই করার ঝুঁকি না নিয়ে ওই পথ দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাত।

---

১. McLeod, W., 1965. The range of the ancient bow. Phoenix, 19(1), pp.1-14.

২. May, T., 1996. Chormaqan Noyan: the first Mongol military governor in the Middle East (Master's thesis, Indiana University).

কিন্তু এখানেই শেষ ছিল না। ওই পথের শেষের দিকে তৈরি হয়ে থাকত লুকিয়ে থাকা মোঙ্গল তীরন্দাজের দল। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর মেরে তারা পালাতে থাকা শত্রুদের মেরে সাফ করে ফেলত। এসবের সাথে সাথে মোঙ্গল বাহিনী কঠোর পরিশ্রম করে শিখেছিল যুদ্ধ কৌশলের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন ট্যাকটিক্সগুলোর একটা, ফেইন্ড রিট্রিট বা ছদ্ম পলায়ন।

লড়াই করতে করতে হঠাৎ একটা সময়ে পুরো মোঙ্গল বাহিনী পিছু হটে পালাবার অভিনয় করত। এতে শত্রুসেনাদের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত। তারা মহা সমারোহে মোঙ্গলদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এভাবে শত্রুদের নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় নিয়ে এসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত শত্রুদের ওপর, শুরু হতো হত্যাযজ্ঞ।

ঘন সন্নিবিষ্ট ব্যাটল ফরমেশনগুলোর বিপরীতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর মেরে তারা সেগুলো ভেঙে ফেলত। মোঙ্গলদের শক্তিশালী তীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চামড়ার বর্ম ভেদ করে ফেলত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধাতব বর্মও। ফরমেশন ভেঙে পাতলা হয়ে যাবার সাথে সাথে শুরু হতো হেভি ক্যাভালরি চার্জ। এটা ছিল মোঙ্গলদের চূড়ান্ত আঘাত। কাতারের পর কাতার শত্রুরা লাশ হয়ে যেত এই চেইনের মতো সাজানো একের পর এক আক্রমণ কৌশলের পুনরাবৃত্তিতে।

এই ফিল্ড স্ট্র্যাটেজিগুলো বাস্তবায়ন করতে এক একটা বাহিনীকে হতে হয় দ্রুতগতির, কিন্তু সুশৃঙ্খল, আত্মবিশ্বাসী এবং হিসেবি। চেঙ্গিজ খান বছরের পর বছর ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের বাহিনীকে গড়ে তুলেছিলেন নির্মম এক যুদ্ধের মেশিন হিসেবে। তিনি তার সেনাপতিদের ওপর চরম আস্থা রাখতেন। তাদেরকে তিনি দিয়েছিলেন নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার অবাধ স্বাধীনতা। এতে তাদের পক্ষে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল।

মোঙ্গলরা ব্যক্তিগতভাবে যোদ্ধা হিসেবে তাদের অধিকাংশ প্রতিপক্ষের চেয়েই ছিল আকারে খর্বকায়, শারীরিকভাবে দুর্বল আর অশিক্ষিত।

কিন্তু তারা এগিয়ে ছিল সাহস, একতা, আর আত্মবিশ্বাসে। তারা বিশ্বাস করত তারা ঈশ্বরের মনোনীত এক জাতি, যাদের পরাজিত করা অসম্ভব। তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল, চেঙ্গিজ খান কখনোই পরাজিত হবেন না। তাই তারা ছিল নেতার প্রতি চরমভাবে অনুগত এক জাতি। ইতালিয়ান পর্যটক জিওভান্নি লিখে গেছেন– 'The Tatars—that is, the Mongols—are the most obedient people in the world in regard to their leaders, more so even than our own clergy to their superiors. They hold them in the greatest reverence and never tell them a lie'.[৩]

যুদ্ধে জিততে যে গুণগুলো প্রয়োজন তার সবগুলোই তাদের ভেতর পুরোমাত্রায় হাজির ছিল। কিন্তু তাদের আরও অনেক এগিয়ে দিয়েছিল তাদের সরবরাহ কৌশল আর বাহন।

---

৩. De Hartog, L., 1989. Genghis Khan: Conqueror of the world. Barnes & Noble Publishing.

তিন

একটা অল ওয়েদার ভেহিকলের কথা ভাবুন, যা শূন্যের নিচে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে শূন্যের ওপরে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আরামসে পথ চলতে পারে। যা চালাতে আপনি পথে যা কুড়িয়ে পান তা দিয়েই জ্বালানীর কাজ হয়ে যায়, আবার নিজের ওজনের সমান ভার সারাক্ষণই বহন করতে পারে। যার আলাদা কোনো দেখাশোনার দরকার পড়ে না এবং যা আপনাকে খাবার, পানীয় দুটোই দিতে পারে। সেই সাথে সেটার বিভিন্ন অংশ দিয়ে আপনি পোশাক, থাকার জায়গা আর অস্ত্র তৈরি করতে পারেন। এমন কোন জাদুকরী বাহন কি আসলেই আছে?

মোঙ্গলদের ছিল, আর তা ছিল মোঙ্গল ঘোড়া। এই ঘোড়াগুলো আরবি বা তুর্কি ঘোড়ার চেয়ে আকারে অনেক ছোট। মঙ্গোলিয়ার কঠিন, রুক্ষ আর প্রচণ্ড ঠান্ডায় টিকে থাকার জন্য এই আকারে ছোট হওয়াটা খুবই প্রয়োজন।

মোঙ্গল ঘোড়া প্রতি শীত ও বসন্তে নিজেদের শরীরের প্রায় ৩০ শতাংশ ওজন হারায়। কারণ, এসময় তারা খুব সামান্য খাবার খেয়েই টিকে থাকে। এই ওজন তারা গ্রীষ্মে জন্মানো তাজা ঘাস খেয়ে আবার পূরণ করে ফেলে। শীতের মধ্যে চলতে পারার কারণে যেখানে মধ্যযুগের যেকোনো বাহিনী শীতকালে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হতো, সেখানে মোঙ্গলরা ছুটে বেড়াত প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও।[৪]

প্রতিটি মোঙ্গল সৈনিকের সাথে তিন থেকে পাঁচটা ঘোড়া থাকত। কোনো একটা ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেলে তারা সাথে সাথেই ঘোড়া বদলে ফেলত। এভাবে পালা করে চার পাঁচটা ঘোড়ায় চড়তো বলে তারা অনায়াসে কোথাও না থেমেই পার হয়ে যেত বিশাল দূরত্ব। একজন মোঙ্গল সওয়ার দৈনিক একশ বিশ মাইল পথ পাড়ি দিত, যা সেই সময়ের মানুষের কাছে ছিল অকল্পনীয়।

এই ঘোড়াগুলো ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠত মোঙ্গল স্তেপে, যেখানে ঘাস ছাড়া খাওয়ার আর তেমন কিছুই নেই। এদের আলাদাভাবে কোনো যত্ন নেবার প্রয়োজন হতো না। আকারে ছোট হওয়াতে খাবার লাগত তুলনামূলকভাবে কম।

এরা পানি খেত খুবই কম, দিনে তিন থেকে চারবার মাত্র। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে এরা বরফের গুড়ো খেয়ে টিকে থাকতে পারে। অন্যান্য জাতের চেয়ে এদের স্ট্যামিনাও হয় বেশি। একটা ২৫০ কেজি ওজনের মোঙ্গল ঘোড়া পিঠে ৩০০ কেজি ওজন নিয়ে দিনে ৬০ কিলোমিটার পথ চলতে পারে ক্লান্তি ছাড়াই। আর একজন সওয়ার নিয়ে ৬০ কিলোমিটার রেসে হারিয়ে দিতে পারে অন্য সব ঘোড়াকে।

মোঙ্গলদের প্রধান খাবার ছিল ঘোড়ার মাংস, বার্লি আর ঘোড়ার দুধ। তাদের জাতীয় পানীয় হলো ঘোড়ার দুধ দিয়ে বানানো এক রকম অ্যালকোহল, আইরাগ।

---

[৪]. Rossabi, M., 1994. All the Khan's horses. Natural history, 103, pp.48-48.

তাদের সবার কাছেই থাকত এক বড় ব্যাগ ভরা বোর্ট, (শুকনো ভেড়ার মাংসের গুড়ো) যা তাদের জন্য দূরপাল্লার যাত্রায় দিনের পর দিন খাবারের যোগান দিত। শুকনো অবস্থায় বা স্যুপ হিসেবে খাওয়ার জন্য এটা ছিল খুবই কার্যকর একটি খাবার। প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের সময় ঘোড়ার শিরা কেটে রক্ত পান করে বেঁচে থাকত মোঙ্গলরা। শুধু ঘোড়ার দুধ আর রক্ত পান করেই তারা টিকে থাকতে পারত পুরো এক মাস।

এমন একটা বাহিনীর জন্য লজিস্টিক সাপ্লাইয়ের কোনো দরকার পড়ত না। তাদের শুধু একটা জিনিসই খেয়াল রাখতে হতো, চলার পথে যেন ঘোড়াদের খাওয়ার জন্য প্রচুর ঘাস থাকে। এই সুবিধাগুলো মোঙ্গল সেনাবাহিনীকে পরিণত করেছিল তার সময়ের চেয়ে কয়েক শ বছর এগিয়ে থাকা এক যুদ্ধের মেশিনে।

সংখ্যা, শক্তি বা প্রযুক্তির চেয়ে মোঙ্গলরা অনেক বেশি এগিয়ে ছিল মানসিকতায়। অসভ্য এক সমাজে বেড়ে ওঠায় তারা ছিল অন্য যেকোনো জাতির তুলনায় ভয়ডরহীন। নিজেদের যাযাবর ঐতিহ্য তাদের দিয়েছিল অবিরাম শত শত কিলোমিটার পথ চলার সামর্থ্য আর শিকারকে ধাওয়া করার প্রবৃত্তি। সেই সাথে, তাদের নেতা ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সর্বকালের সেরা জেনারেল, চেঙ্গিজ খান।

মহাচীনে

এক

উত্তরের তাতার আর সাইবেরিয়ার বুনো উপজাতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চেঙ্গিজ খানের খুব বেশি সময় লাগেনি। এরপর তিনি নজর দিলেন চীনের দিকে। চীন তখন বিভক্ত তিনটি বড় বড় সাম্রাজ্যে; জি জিয়া, জিন আর সং। এরা ছিল একে অপরের মরণপণ শত্রু। বিগত শতাব্দীগুলোতে জি জিয়া আর জিন সম্রাটরা যাচ্ছেতাই রকম অত্যাচার করেছিলেন মোঙ্গলদের ওপর।

শিকারী বাঘের মতো ওঁত পেতে থাকা চেঙ্গিজ এবার তার বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করলেন। তার গোয়েন্দারা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চীনা সাম্রাজ্যগুলোর ভেতর। ১২০৭ সাল থেকে ১২০৯ সাল, এই তিন বছরের কিছু খুঁটিনাটি সংঘর্ষ শেষে চেঙ্গিজ খান জিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলেন। অভিযানের ঠিক আগে জিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি জিন সাম্রাজ্যের কাছ থেকে পেলেন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

হোয়াংহো নদীর তীরে লড়াইয়ে নামার আগেই চেঙ্গিজ খানের হাতে চলে এসেছিল শত্রুর বাহিনীর সমস্ত তথ্য।

চিরাচরিত সামন্ত সেনাবাহিনী নিয়ে লড়াইয়ে নামা জিয়া সেনাপতি চোখের সামনে দেখলেন মোঙ্গলদের দুর্বার গতি। লড়াইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবারও মোঙ্গলদের গতির কোনো জবাব তিনি দিতে পারেননি। হেলেন পর্বতমালা থেকে ইয়েচুয়ান পর্যন্ত সাড়ে তিন লাখ চীনা সৈন্য শেষ হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টা ভয়াবহ মোকাবেলায়।[১]

নিরুপায় জিয়া সাম্রাজ্য যখন জিনদের কাছে সাহায্য চাইল, জিন সম্রাট মজা করে বললেন- শত্রুর আঘাতে শত্রুকে মরতে দেখা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।[২]

তখন কে জানত, দুবছর পর এই আঘাত তার নিজের ঘাড়েই পড়বে!

---

১. Man. J.. 2014. The Mongol Empire: Genghis Khan, his heirs and the founding of modern China. Random House.

২. Man 2004, pg.131. Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection. New York City: St. Martin's Press. ISBN 9780312366247

দুই

জিন রাজবংশ আসলে এসেছিল চীনের বাইরে থেকে। তাদের বলা হতো জুরচেন। সাইবেরিয়ার শিকারীরা ছিল তাদের আদিপুরুষ।[৩] কিন্তু তাদের শাসিত জনগোষ্ঠীর প্রায় পুরোটাই ছিল হান গোষ্ঠীর মানুষ। টানা যুদ্ধের ফলে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া করের বোঝা দিনকে দিন শুধু বাড়ছিল।

১২১১ সালে মোঙ্গলরা যখন জিন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসল, তখন জিন প্রশাসনে থাকা হানেরা পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করল সম্রাটের সাথে। গানপাউডার সজ্জিত বিশাল বাহিনী, যা ছিল সংখ্যায় মোঙ্গলদের অন্তত আটগুণ[৪], তারাই কিনা মোঙ্গলদের সামনে দাঁড়াতেই পারল না। মোঙ্গলদের শৃঙ্খলা আর হানদের বিশ্বাসঘাতকতার মুখে প্রযুক্তি, সম্পদ আর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে জিনরা কিছুই করতে পারল না।

১২১৪ সালের মাথায় চেঙ্গিজ খানের সাম্রাজ্য পূর্বে জাপান সাগর থেকে পশ্চিমে কাজাখিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেল, মাত্র আট বছরে। তার এই উত্থানে যতটা তার নিজের কৃতিত্ব, ঠিক ততটাই তার প্রতিপক্ষের।

নিজেদের ধ্বংস করতে তারা যা করেছিল, সেটাই তাদের পতন ডেকে এনেছিল।

তিন

জিনদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় পৃথিবীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেয়েছিল, মোঙ্গলরা আসলে কতটা নির্মম হতে পারে। যে পথ দিয়েই তারা গেছে দুপাশে রেখে গেছে মানুষের কাটা মাথা দিয়ে বানানো পিরামিড, চেঙ্গিজ খানের বিজয়ের স্মৃতিসৌধ।

তারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে অন্তত দশটা বিশাল শহর, যেগুলোর প্রতিটির জনসংখ্যা দুই লাখের বেশি ছিল। কোনো কোনোটির জনসংখ্যা ছিল এক মিলিয়নের বেশি। এগুলোকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে, সেখান থেকে উঠে দাঁড়াতে সময় লেগেছে অন্তত দুটো শতাব্দী। প্রতিটি শহরের সদর দরজায় চেঙ্গিজ খান রেখে গিয়েছিলেন মানুষের কাটা মাথার পিরামিড। সেগুলোর কোনো কোনোটায় পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ মাথাও ছিল।

প্রথম দিকে মোঙ্গলরা শহর অবরোধের পদ্ধতি জানত না। এই ঘাটতি দূর করতে তারা ব্যবহার করে দুটো কৌশল। কোনো শহর অবরোধের আগে তারা শহরের চারিদিকে বাস করা সব গ্রামের মানুষদের ধরে নিয়ে আসত। তারপর প্রথমে তাদেরই জোর করে পাঠাত শহরের দেয়াল ভাঙতে।

---

৩. Chan, H.L. and Wang, O., 1993. The fall of the Jurchen Chin: Wang E's memoir on Ts' ai-chou under the Mongol siege (1233-1234) (Vol. 66). Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH

৪. Man, J., 2014. The Mongol Empire: Genghis Khan, his heirs and the founding of modern China. Random House

চীনা সেনাবাহিনীর আক্রমণের প্রায় পুরো ধাক্কাটাই মূলত যেত বন্দি সাধারণ মানুষের ওপর দিয়ে। এরপর দেয়াল যখন ভেঙে যায় যায়, তখন শত্রুর সেনাবাহিনীকে আক্রমণের প্রলোভন দেখিয়ে ময়দানে নিয়ে এসে কচুকাটা করা হতো। তারপর বিনা বাধায় দখল করা হতো শহর।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটা ছিল অভিনব। বেশিরভাগ চীনা শহরই গড়ে উঠেছে নদীর আশেপাশে। চেঙ্গিজ খান অবরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে শহরের কাছাকাছি থাকা নদীর বাঁধ ভেঙে দিতেন। এমনকি কোনো কোনো সময় নদীর গতিপথ বদলে দিতেন। ফলে নদীর প্লাবনে শহর ডুবে যেত।

প্রথম কয়েকটি শহর এভাবে জয় করার পর চেঙ্গিজ খানের হাতে এল কয়েক লাখ বন্দি। এদের মধ্য থেকে বাছাই করা হলো সেরা কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার আর সমর বিশারদদের। তারপর তাদের পাঠানো হলো তার রাজধানী কারাকোরামে।

একটা শহর দখলের পর কাদের হত্যা করা হবে আর কাদের হত্যা করা হবে না সে বিষয়ে চেঙ্গিজ খানের একটা সাধারণ নীতি ছিল। গরুর গাড়ির চাকার চেয়ে উচ্চতায় ছোট, এমন শিশুদের ও মেয়েদের সাধারণত মারা হতো না। কিন্তু প্রায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে শহরের সবাইকে মাঠের মধ্যে ডেকে এনে হত্যা করা হতো। কারিগর-শিল্পী, ডাক্তার-প্রকৌশলী আর বিজ্ঞানীদের হাতে পেয়ে চেঙ্গিজের হাতে চলে এল অনেক অনেক প্রযুক্তি। তার সেনাবাহিনীর কারিগরি দক্ষতা বেড়ে গেল কয়েকগুণ, চিকিৎসার মান এক লাফে উঠে গেল অনেক উঁচুতে।

সেই সাথে এখন তার হাতে চলে এল অঢেল সম্পদ, বিশাল সংখ্যক করদাতা প্রজা, শহর অবরোধের পদ্ধতিতে চরমভাবে দক্ষ প্রকৌশলী এবং ভয়ংকর মারণাস্ত্র গানপাউডার।[৫]

চার

বেশিরভাগ মোঙ্গলরা ছিল খুবই গরিব। মঙ্গোলিয়ার শীতল মরুভূমিতে গজানো সামান্য ঘাস তাদের ঘোড়া, ভেড়া, ইয়াক আর উটের পেটই ভরাতে পারত না। তাই প্রতিনিয়ত তাদের খুঁজতে হতো পশু চরানোর নতুন ভূমি। চীন থেকে আনা বিপুল সম্পদ সাধারণ মোঙ্গলদের তাঁবুতে খুব বেশি পৌঁছায়নি। বেশিরভাগ সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছিল খানদের হাতে। তার ওপর সাধারণ মোঙ্গলদের হাতে আসা পশুপালের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায়, তাদের জন্য নতুন চারণভূমির প্রয়োজন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

---

৫. (the University of Michigan)John Merton Patrick (1961). Artillery and warfare during the thirteenth and fourteenth centuries. Volume 8. Issue 3 of Monograph series. Utah State University Press. p. 13.

পরস্পরের সাথে আজীবন লড়াই করে আসা কতগুলো উপজাতির একটা সমষ্টিকে আইন করে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীতে পরিণত করেছিলেন চেঙ্গিজ। কিন্তু তিনি জানতেন, এদের ঠিকমতো খাওয়াতে পরাতে না পারলে এরা কোনো আইনের ধারই ধারবে না।

ভরণ-পোষণের বাইরেও তাদের ছিল বাড়তি এক প্রয়োজন সহিংসতা।

খুনোখুনি না করে মোঙ্গলরা থাকতে পারত না। খানের ওপর তাই আরেকটা দায়িত্ব ছিল, মোঙ্গলদের জন্য খুনোখুনির ব্যবস্থা করে রাখা। যদি বাইরের মানুষকে খুন করার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে এরা নিজেদের মধ্যেই আবার শুরু করবে খুনোখুনি। ভেঙে পড়বে চেঙ্গিজ খানের শাসন। চেঙ্গিজ তাই কিছুদিন পর পরই তার বাহিনীকে এদিক ওদিক অভিযানে পাঠিয়ে দিতেন।

ইতোমধ্যেই উইঘুর, কিরগিজ আর তাজিকরা চেঙ্গিজ খানের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ায় তার ক্ষমতা আরও অনেক বেড়ে গেল। তিনি এবার সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছিলেন, ভাগ্য পৃথিবীর বৃহত্তম বাণিজ্যপথে প্রবেশের একটা পথ তার সামনে খুলে দিয়েছে।

জিন সাম্রাজ্য জয়ের পর সেনাপতি জেবে নোইয়ন আর সুবুদাই বাহাদুরকে তাই তিনি পাঠিয়ে দিলেন কারা খিতাইদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। মধ্য এশিয়াতে মোঙ্গলদের প্রবেশের এখানেই শুরু।

এরা প্রথমে ঝাড়েবংশে সাফ করে দিল মেরকিতদের। তারপর দখল করে নিল কারা খিতাই সাম্রাজ্য। সিল্ক রোডে সরাসরি প্রবেশের অধিকার পেলেন চেঙ্গিজ খান।

সেই সাথে তিনি দেখলেন তার সাম্রাজ্য এখন এমন এক সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে এসেছে, যাদের অধীনে আছে চার লাখের বেশি যোদ্ধা, আর প্রায় পুরো সিল্করোডের হৃদপিণ্ড। চেঙ্গিজ শাহে খাওয়ারিজম আলাউদ্দিন মুহাম্মাদকে চিঠি লিখলেন– 'I am Khan of the lands of the rising sun while you are sultan those of the setting sun: Let us conclude a firm agreement of friendship and peace.'[৬]

৬. Ratchnevsky, Paul (1991). Genghis Khan: His Life and Legacy. Blackwell Publishing. pp. 120 . ISBN 0-631-16785-4.

ঝড়ের পূর্বাভাস

এক

বাহাসের ময়দানের বাইরে মারামারি লেগে গেছে। এক আশ'আরি ইমামের সাথে ইসমাইলি শিয়া ইমামের বাহাসের এক পর্যায়ে দুজনের সমর্থকরাই উত্তেজিত হয়ে মারামারি শুরু করে দেয়। ইতোমধ্যেই মাথা ফেটে গেছে বেশ কয়েকজনের, রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের হাসপাতালের দিকে নেয়া হচ্ছে।

খলিফা আন নাসিরের কাছে নালিশ গেল। তিনি দুই ইমামের সাথে আলাদা আলাদা করে দেখা করবেন বলে ভাবলেন।

সবাই ভাবল, এবার বুঝি ঘটনার একটা সমাধান হবে।

সন্ধ্যার পর খলিফার দরবার থেকে কিছু সময়ের ব্যবধানে দুই ইমামকেই বের হতে দেখা গেল। দুজনের মুখেই ছিল খুশি খুশি ভাব। খলিফা শাস্তির বদলে দুজনকেই বখশিস দিয়েছেন।

মারামারির কারণ ছিল আলি (রা.) হকের ওপর, নাকি মুয়াবিয়া (রা.) হকের ওপর- তা নিয়ে বিবাদ।

আশ'আরি আর ইসমাইলি দুই পক্ষেরই বাগদাদে বিপুল সমর্থক। এরা নিজেরা নিজেরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেগে থাকলে খলিফারই লাভ। আন নাসির জানেন, তার মতো স্বৈরাচারী শাসকদের জন্য জনগণকে বিভক্ত রাখা খুবই জরুরি। ঐক্যবদ্ধ জনগণ স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের ভেতর ছোট ছোট অহেতুক ব্যাপারে বিভক্তি জিইয়ে রাখতে হয়।

আন নাসির প্রায় দুই শ বছর পর আবার বাগদাদের খলিফার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। তিনি ইতোমধ্যেই গোটা ইরাকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন।

সেলজুক সুলতান তুঘরুলের বিরুদ্ধে তুর্কমান সেনাপতি আলাউদ্দিন তেকিশকে লাগিয়ে দিয়ে ইরানে সেলজুকদের ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।[১] তিনি চান, আব্বাসিয়ারা আবার গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত নেতার আসনে সমাসীন হোক।

আন নাসিরের চাওয়ায় কোনো দোষ ছিল না, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছিল নোংরা।

দুই

মুসলিম উম্মাহর ওপর খলিফাদের নেতৃত্ব শক্তিশালী ছিল ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী জুড়ে। আল মুতাসিমের মৃত্যুর পর তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। দশম শতাব্দীতে খলিফার পরিবর্তে ক্ষমতা কাঠামোর চূড়ায় চলে আসতে থাকেন সুলতানরা। খলিফার অনুমোদন নিয়ে তারা একচ্ছত্র শাসন চালাতে থাকেন, সেই সাথে করতে থাকেন রাজত্ব বিস্তার। খলিফার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে মূলত বাগদাদ ও তার আশেপাশের এলাকায়।

একাদশ শতাব্দীতে এসে মুসলিম উম্মাহ প্রথমবারের মতো মোটা দাগে দুটি শিয়া ও সুন্নি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিমে মিসর ভিত্তিক ফাতিমি খিলাফত আর পূর্বে ইরান ভিত্তিক সেলজুক সালতানাত। ফাতিমিদের সাথে সেলজুকদের এই বিরোধের কারণেই মূলত প্রথম ক্রুসেড এতো সহজে সফল হয়েছিল।

ফাতিমিদের আনুষ্ঠানিক পতন ঘটে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির হাতে। আর তারপর আইয়ুবি সালতানাতের পতাকার নিচে মিসর, সিরিয়া, উত্তর ইরাক, হেজায ও ইয়েমেন, সুদান ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্রুসেডের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১১৮৭ সালে সালাহউদ্দিন উদ্ধার করেন জেরুসালেম।

তৃতীয় ক্রুসেডের সময় তিনি বারবার বাগদাদের খলিফার সাহায্য চেয়েছেন। কিন্তু সালাহউদ্দিনের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত আন নাসির একজন সৈন্য দিয়েও সালাহউদ্দিনকে সাহায্য করেননি।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি তৃতীয় ক্রুসেড লড়ার কিছুদিন পরই ইন্তেকাল করেন। বিশাল আইয়ুবি সালতানাত তিনি গুছিয়ে রেখে যেতে পারেননি। তার ইন্তেকালের পর সিরিয়া, জাযিরা আর মিসরকে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে নেন তার ভাইয়েরা। শুধু মিসর থাকে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। ইরাক, সিরিয়া আর ইয়েমেনে আইয়ুবি শাহজাদারা স্বায়ত্তশাসিত সরকার কায়েম করে, যারা ছিল কার্যত স্বাধীন।

সালাহউদ্দিনের উত্তরসূরিদের কেউই ক্ষমতা, যোগ্যতা বা ইমানদারীতে তার ধারে কাছেও ছিলেন না।

এসময় হেজায চলে আসে মক্কার শরিফ পরিবারের কাতাদা ইবন ইদ্রিসের নিয়ন্ত্রণে।

---

[১]. J. A. Boyle. ed. (1968). The Cambridge History of Iran. Volume 5. Cambridge University Press. p. 191. ISBN 978-0-521-06936-6.

আইয়ুবি সালতানাত যখন অন্তর্কোন্দলে ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, তখন পোপ আর হোলি রোমান এম্পেরর ফ্রেডরিখ পঞ্চম ক্রুসেডের ডাক দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

তিন

মোঙ্গলদের উত্থানের আগে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র (১২০৬ সাল)

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির যখন এই অবস্থা, তখন পূর্বে জন্ম নিচ্ছিল দুই শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য। কুতুবউদ্দিন আইবেক এবং তারপর ইলতুতমিশের নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল দিল্লি সালতানাত।

মধ্য এশিয়াতে আলাউদ্দিন তেকিশের গড়ে তোলা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সাথে তার ছেলে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইরান ও আফগানিস্তান যুক্ত করলেন। এটি তখন পরিণত হলো এক বিশ্ব শক্তিতে। প্রায় সাড়ে চার লাখ যোদ্ধার এক ভয়ংকর সেনাবাহিনী নিয়ে এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলোর একটি।

কিন্তু খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য তখন দুটো সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ভেতর-বাহির থেকে এই সালতানাতে চলছিল ক্ষমতার লড়াই। সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ নিজেকে শাহ ও ইসলামের রক্ষক বলে দাবি করতেন। তার দরবারের আলেমদের কাছ থেকে তিনি এই মর্মে ফতোয়াও যোগাড় করেছিলেন।

কিন্তু বাগদাদের খলিফা নাসির মুহাম্মাদের শাহ হওয়াটা মেনে নিলেন না। সুলতান উপাধিটা অন্তত কাগজে কলমে হলেও খলিফার নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। কিন্তু শাহ উপাধির ধারকরা তা স্বীকার করে না। শাহ একটি স্বাধীন উপাধি।

খলিফার নামে খুতবা পড়ানো বন্ধ করে দিয়ে খাওয়ারিজম শাহ খলিফাকে আরও ক্ষুব্ধ করেন। কিন্তু পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি সেনাবাহিনী নিয়ে তার সাড়ে চার লাখের বাহিনীর মুখোমুখি হবার ক্ষমতা আন নাসিরের ছিল না।

বাহির থেকে দৃশ্যমান খুব শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য আসলে ভেতর থেকে ছিল দুর্বল। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের মূল শক্তি ছিল তুর্কমানরা। শাহ মুহাম্মাদ তাদের বদলে কিপচাকদের দিনকে দিন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। সাম্রাজ্যের যেকোনো বিষয়ে কিপচাকদের মতকেই গুরুত্ব দেয়া হতো। ফলে তুর্কমানদের মধ্যে জমা ছিল তীব্র ক্ষোভ। কিপচাকরা তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করত।

তাদের এই বাড়াবাড়ির পেছনে ছিল হেরেমের রাজনীতি। শাহ মুহাম্মাদের স্ত্রী আই জিজেক ছিলেন তুর্কমান মেয়ে এবং মা তুর্কান খাতুন ছিলেন কিপচাক খানের মেয়ে। তুর্কান খাতুন ছিলেন অসম্ভব ধূর্ত এক মহিলা। তিনি নিজেকে সাম্রাজ্যের কর্ত্রী বলে মনে করতেন। কিন্তু আই জিজেক ছিলেন শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির, তিনি ক্ষমতার এই দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতেন। (কিছু সূত্র উল্লেখ করে, আই জিজেক ছিলেন তুর্কান খাতুনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। তাই ঈর্ষা করে তুর্কান খাতুন প্রায়ই তাকে তুর্কমান কুত্তি বলে গালি দিতেন। আই জিজেকের গর্ভে জন্মানো শাহের বড় ছেলে জালালও দাদির এই রাগ থেকে রেহাই পাননি।)

শাহজাদা জালাল উদ-দীন মিংবার্নু ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সেনাবাহিনী আর জনগণের কাছে তার জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। শাহ মুহাম্মাদ তার কিপচাক মায়ের প্ররোচনাতে জালাল উদ-দীনকে বাদ দিয়ে নিজের ছোট ছেলে কুতুব উদ্দিন উজলা শাহকে উত্তরসূরি ঘোষণা করায় বোঝা গেল, এই সাম্রাজ্যে কিপচাক ছাড়া আর কারও দাম নেই।

কিপচাক খান আর বেগদের নিয়ে সরকারের সমান্তরালে আরেক সরকার গড়ে তুলেছিলেন তুর্কান খাতুন।[১]

শাহ মুহাম্মাদ তার মাকে যতটা না শ্রদ্ধা করতেন, তার চেয়ে বেশি ভয় পেতেন। এই মহিলার কূটকৌশল করার ক্ষমতা সম্পর্কে তার জানা ছিল। আর কিপচাকদের নিয়ন্ত্রণ করতে তাকে তার প্রয়োজনও ছিল।

খাওয়ারিজম শাহ ছিলেন এক অত্যাচারী শাসক। তার সাম্রাজ্যে আইনের শাসন বলে কিছু ছিল না। সাহসী যোদ্ধা হবার পরেও জনগণের কাছে ছিলেন ঘৃণার পাত্র। কারণ, কিছুদিন পর পর খানদের পরামর্শে জনগণের ওপর তিনি চাপাতেন নতুন করের বোঝা।

---

১. http://www.guide2womenleaders.com/Iran_Heads.htm

চার

হজ নিয়েও তখন চলছিল নোংরা রাজনীতি।

আন নাসির শাহের ওপর ক্ষোভ মেটাতে না পেরে মধ্য এশিয়ার হজযাত্রীদের ওপর তার ঝাল ঝাড়েন। তাদের অপমান করে ফিরিয়ে দেয়া হয় ইরাক থেকে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের দরবারে থাকা খলিফার এক উজিরকে হত্যা করে বসেন শাহ মুহাম্মাদ।

ওদিকে মক্কা-মদিনার পবিত্র ভূমিতে তখন শরিফ পরিবারের ভেতর শুরু হয়েছিল ক্ষমতা দখলের ইঁদুর দৌড়।

ক্ষমতার প্রতি হুমকি হয়ে উঠায় হেজাযের শরিফ কাতাদা ইবন হারিস তার ছেলে হাসানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনা জানতে পেরে হাসান প্রথমে নিজের চাচাকে ও পরে বাবাকে হত্যা করে ফেলে। হাসানের ভাই রাজিহর সাথে শুরু হয় তার গৃহযুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত আইয়ুবিদের হস্তক্ষেপে থামে এই লড়াই।

ওদিকে আন নাসিরের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে শাহ মুহাম্মাদ ১২১৬ সালের শীতের মধ্যেই নিজের বাহিনী নিয়ে বাগদাদের দিকে রওনা হন। কিন্তু জাগ্রোস পর্বতের তুষারঝড়ে পড়ে তার অর্ধেক সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি ভাবতে থাকেন, খলিফার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোতে আল্লাহ তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

সুযোগ বুঝে খলিফা আন নাসির মেতে উঠেন ঘৃণ্য আরেক ষড়যন্ত্রে। তার দূত ছুটে গেল উত্তরে, খাওয়ারিজম শাহের বিরুদ্ধে জোট গড়ে তোলার চিঠি নিয়ে। এই চিঠির জবাব এসেছিল কী না, ইতিহাস তা জানে না।

ইতিহাস জানে, এই প্রথমবারের মতো একজন খলিফা কোনো মুসলিম শাসককে আক্রমণ করতে কোনো অমুসলিম শাসককে আহবান জানালেন।*

উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা ঝড় কত ভয়াবহ হবে তা আন নাসির কেন, কেউই কল্পনা করতে পারেনি।

এই ঝড় পরবর্তী দশকগুলোতে পুরো এশিয়াকে পরিণত করবে কবরস্থানে। ঝড়ের নাম চেঙ্গিজ খান।

---

*. খলিফা আন নাসিরের আগে আর কোনো খলিফা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সাথে জোট করেননি।

ইয়াজুজ মাজুজ

এক

উত্তর চীন-মঙ্গোলিয়া-সাইবেরিয়া থেকে মধ্য এশিয়াতে ঢুকতে সিল্করোড যে শহরকে প্রথমে অতিক্রম করে, তার নাম ওতরার। ওতরার থেকে আরও এগোলে পড়ে বুখারা আর সমরকন্দ, মা ওয়ারা উন্নাহারের দুই প্রসিদ্ধ শহর। সেখান থেকে আরও পশ্চিমে এগোলে পড়ে উরগঞ্জ, খাওয়ারিজম শাহের রাজধানী।

১২১৮ সালের শেষ দিকে মেরকিতদের মেরে সাফ করার পর চীনা অমাত্য ইয়েলিউ চুতসাইয়ের পরামর্শে সিল্করোডের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াবার চিন্তা ভাবনা করলেন চেঙ্গিজ খান। এই লক্ষ্যে চীন থেকে লুট করে আনা অসাধারণ সব শিল্পকর্ম আর বিলাসদ্রব্যে বোঝাই সাড়ে চার শ বণিকের এক বিশাল কাফেলা উপহার হিসেবে পাঠানো হলো শাহের কাছে। উরগঞ্জে যেতে হলে প্রথমেই তাদের পার হতে হবে ওতরার।

ওতরারের খান ছিলেন কাইর ইনালচিক খান, শাহের চাচা। তার কাছে খবর গেল, এই সাড়ে চার শ বণিক আসলে চেঙ্গিজ খানের গুপ্তচর।

পুরো কাফেলাকে বন্দি করলেন তিনি। তারপর একে একে হত্যা করা হলো সবাইকে। এই খবর চেঙ্গিজ খানের কাছে পৌঁছলে তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে নিজের দুই সেনাপতির সাথে অতি প্রিয় মুসলিম দূত ইবনে কেফরেজ বোঘরাকে শাহের সাথে কথা বলার জন্য পাঠালেন। শাহের কাছে গিয়ে চেঙ্গিজ খানের আদেশ অনুসারে কাইর ইনালচিক খানের মাথা দাবি করল ইবনে কেফরেজ বোঘরা।

শাহের সামনে তার চাচার মাথা দাবি করার দুঃসাহস দেখানো মানতে পারল না কিপচাক খানেরা। কয়েক মুহূর্তের ভেতর তাদের তলোয়ারের ফলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ইবনে কেফরেজ। দুই সেনাপতির দাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হলো, মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে তাদের ফেরত পাঠানো হলো চেঙ্গিজ খানের কাছে।

দুই

কারাকোরামের কাছে চেঙ্গিজ খানের শিবির ফেলা হয়েছে এক পার্বত্য উপত্যকায়। চীন থেকে লুট করে আনা বিশাল সোনালি হলুদ তাঁবুর চারপাশে এক হাজার কালো তাঁবু। এগুলোতে থাকে তার দেহরক্ষীরা।

দুপুরের তীব্র রোদে যখন সবার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময়ে শিবিরের কাছে সেনা চৌকিতে এসে পৌঁছাল দাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, মাথা কামানো দুই দূত। তাদের দ্রুত পাঠানো হলো চেঙ্গিজ খানের কাছে। খান তখন কেবল মধ্যাহ্নভোজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার সামনে হাজির করা হলো দুই দূতকে।

দূতদের মুখে প্রিয় ইবনে কেফরেজের হত্যার খবর শুনে খানের দুই গাল বেয়ে নেমে এল অশ্রুর রেখা।

হঠাৎ তিনি লাফিয়ে উঠলেন তখত ছেড়ে। মাটিতে থুতু ফেললেন খান! তারপর নিজের পোশাকের বুকের দিকটা ছিঁড়লেন এক হ্যাঁচকা টানে, মাথার টুপি খুলে ফেললেন। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন নিজের ঘোড়ার দিকে।

খুঁটি থেকে এক টানে ছাড়িয়ে নিলেন প্রিয় ঘোড়া নাইমানকে। তারপর জিন ছাড়াই তার পিঠে চড়ে বসলেন কেশর আকড়ে ধরে। ঘোড়া ছোটানো হলো বুরখান খালদুনের দিকে। পিছে পিছে ছুটলেন চেঙ্গিজ খানের ছেলেরা এবং অন্যান্য মোঙ্গল খানেরা।

বুরখান খালদুনের চূড়ায় উঠে নিজের কোমরবন্ধ খুলে গলায় ঝুলালেন চেঙ্গিজ খান। এটা ছিল মহান আকাশ দেবতার ইচ্ছের কাছে নিজেকে সমর্পণের ইঙ্গিত।[১]

তারপর তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল তার আর্তনাদ। কিছুক্ষণ পর তিনি নেমে এলেন পর্বত থেকে। তাকে তখন দেখাচ্ছিল প্রশান্ত ও আত্মসমাহিত।

'মহান তেংরি আমাদের প্রতিশোধ ও বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। লড়াইয়ের জন্য তোমরা তৈরি হও। মুসলমানদের শাহকে আমরা শেষ করব, দুনিয়া থেকে মুসলমানদের শাসন আমরা উৎখাত করে ছাড়ব। ওদের জমি কেড়ে নেব। পশুর পাল দখল করে নেব। ওদের ঝাড়ে বংশে হত্যা করে বউ-বাচ্চাকে আমাদের গোলাম বানাব।'

উপত্যকার দুপ্রান্ত থেকে মোঙ্গলদের হিংস্র হুংকার ভেসে এল হু...হু...হু...

চেঙ্গিজ খানের ছোট্ট এক চিঠি গেল শাহের কাছে। ছয় শব্দের সেই চিঠিতে লেখা ছিল, 'সমরের সাধ ছিল, সে সাধ মেটাব।'

---

[১] চেঙ্গিজ খান,ভাসিলি ইয়ান,অনুবাদ : অরুণ সোম, পৃ : ১৩২,বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র,প্রথম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

তিন

মাত্র দুসপ্তাহের মাথায় ওতরার অবরোধ করলেন চেঙ্গিজ খানের বড় ছেলে জোচি খান। বীরের মতো লড়াই করে যেতে থাকলেন কাইর ইনালচিক খান। চেঙ্গিজ খানের কাছ থেকে পালিয়ে আসা কারা খিতাই মহাবীর গুরখান তার সাথে এসে যোগ দিলেন। ওদিকে চেঙ্গিজ তৈরি হতে থাকলেন তার নিজের মতো করে।

বড় বড় শহর অবরোধের জন্য চীন থেকে নিয়ে আসা হলো শত শত দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য আনা হলো চিকিৎসক। সেইসাথে এল নতুন এক অস্ত্র, এশিয়া যা আগে দেখেনি। গান পাউডার।

খাওয়ারিজম শাহ মুহাম্মাদের গোয়েন্দারা তাকে জানিয়েছে, চেঙ্গিজ খানের মোঙ্গল সেনাবাহিনী শহর অবরোধ করতে পারে না। সিজ ট্যাকটিক্সে দুর্বলতার কারণে তারা জিন সাম্রাজ্যের রাজধানী জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। নগরীর উঁচু দেয়াল ভেদ করা তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য দুরূহ ব্যাপার।

দূত হত্যার পর শাহ বুঝতে পেরেছিলেন, যুদ্ধ এড়ানো অসম্ভব। তিনি তাই সাম্রাজ্যের খান আর বেগদের নিয়ে মজলিশ ডাকলেন। তুর্কমান খান ও বেগদের শাহের মজলিশে আগে থেকেই অবহেলা করা হতো, এবারেও তাই হলো। পুরো মজলিশ জুড়ে বকবক করে গেলেন কিপচাক খানেরা। দূত হত্যার মতো কলঙ্কিত কাজ করার সময় যারা সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছিল, এবার তারা রীতিমতো ভেড়ার মতো আচরণ করতে লাগল।

কোনো কোনো খান বললেন, উঁচু উঁচু দেয়ালের ওপর ভরসা করে বুখারা, সমরকন্দ আর উরগঞ্জকে ছেড়ে দেয়া হোক। এই সময়ে শাহ ইরানে নতুন ফৌজ তৈরি করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন। কেউ বললেন, চেঙ্গিজ খানকে এখানে এসে লড়াই করার জন্য গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সময় দেয়া হোক। গরমে খান অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে তখন তার ওপর হামলা করা যাবে। কেউ বললেন, এসব তাতারদের স্বভাব আমাদের ভালো করেই জানা আছে। এদের লুট করার সুযোগ দেয়া হোক। খেয়ে দেয়ে পেট ভরে গেলে এমনিতেই এরা চলে যাবে।

এরই মধ্যে রাস্তাঘাটে-হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ল গুজব। মোঙ্গলরা ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর[২]। তারা দেড় মানুষ সমান উঁচু, তাদের গায়ে তীর লাগলে তীর বিঁধে না, তলোয়ার দিয়ে তাদের কাটা যায় না, তারা বাতাসের বেগে দিনে পঞ্চাশ ফারসাখ* পথ চলতে পারে। তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু নেই, এসব কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ইয়াজুজ মাজুজের ভয়ে মানুষের আত্মা খাঁচাছাড়া হবার দশা হলো।

এই ভয় পাওয়া মানুষদের মধ্যে সম্ভবত শাহ নিজেও ছিলেন। বড় শাহজাদা, বীর জালাল উদ-দীন আর প্রধান সেনাপতি তিমুর মালিক মুখোমুখি লড়াইয়ে চেঙ্গিজ খানকে

---

২ Boyle, John Andrew (1979). "Alexander and the Mongols", The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (2):p.126, JSTOR 25211053 /

*. ফুটনোট : ফারসাখ হলো ৫ কিলোমিটার সমান দূরত্ব।

মোকাবেলা করার পরামর্শ দিয়ে শাহের কোপে পড়লেন। তিমুর মালিককে বদলি করে খোজেন্ত নামের এক ছোট শহরের সেনাপ্রধান করে পাঠানো হলো। মসজিদের ইমাম ও মোল্লা সম্প্রদায়ের বড় এক অংশ ছিল শাহের খয়ের খা। শাহের মতিগতি টের পেয়ে তারা সত্য বলার ঝুঁকি না নিয়ে উঁচু দেয়ালের পেছনে সুরক্ষিত থেকে অবরোধ প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দিলেন।

জুম্মার খুতবায় শাহ মুহাম্মাদ জানালেন, মোঙ্গলরা সিজ ট্যাকটিক্সে একেবারেই অদক্ষ। ওতরারের মতো ছোট একটা শহর পাঁচ মাস ধরে অবরোধ করেও তারা দখল করতে পারছে না। ইতোমধ্যেই ওতরার থেকে তাদের হটিয়ে দিতে আরও বিশ হাজার কিপচাক সওয়ার পাঠানো হয়েছে।

মোঙ্গলদের মূল ফৌজ আসতে আসতে শাহ দক্ষিণে ইরানের দিকে সরে গিয়ে সেখানে ইমানদারদের নিয়ে নতুন শক্তিশালী ফৌজ গড়ে তোলার ঘোষণা দিলেন। যত দিন না তিনি ফিরে আসছেন তত দিন নগরের শক্তিশালী দুর্গ ও দেয়ালের পেছনে নগরবাসীকে শত্রুর মোকাবেলা করার পরামর্শ দিয়ে শাহ তার বক্তব্য সমাপ্ত করলেন।

শাহ তখনও জানতেন না, তার উজিরে আযম ও শাইখুল ইসলাম উভয়েই মোঙ্গলদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন।

মসজিদ থেকে শাহ বেরোনোর পর পরই খবর এল, ওতরার রক্ষার জন্য তিনি যাদের পাঠিয়েছেন সেই বিশ হাজার কিপচাক সওয়ার চেঙ্গিজ খানের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

ওতরারের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

চার

চেঙ্গিজ খান ১২১৯ সালের শরতে তিয়েনশান পর্বতমালা পেরিয়ে মধ্য এশিয়াতে পা রাখলেন।
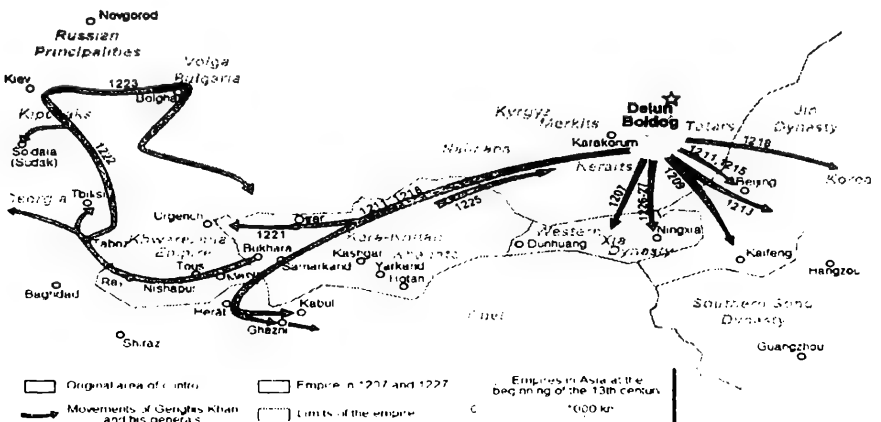
মোঙ্গল আক্রমণের গতিপথ

শুরুতে তার বাহিনীতে ছিল প্রায় এক লাখ মোঙ্গল যোদ্ধা। পশ্চিমে এগোনোর সাথে সাথে তার সাথে যোগ দিতে লাগল উইঘুর, কিরগিজ আর তাতাররা।

খবর পেয়ে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিলেন শাহ মুহাম্মাদ। সিল্ক রোডের যে পথ দিয়ে চেঙ্গিজ আসবেন বলে ধারণা করা হলো, তার আশেপাশের সমস্ত গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হলো। ফলে গ্রামের লোকজন ক্ষেপে গিয়ে মোঙ্গলদের দলে যোগ দিল।

এভাবে ১২১৯ সালের শীতে মোঙ্গল বাহিনীর যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়াল দুই লাখে। যোদ্ধা ছাড়াও নারীদের সংখ্যাও ছিল প্রায় সমান। তারা মূলত রসদ সরবরাহের কাজ করত। চীন থেকে আনা দাসীরা সৈন্যদের যৌনচাহিদা মেটাত।

দুই লাখ যোদ্ধার প্রত্যেকেরই ছিল কমপক্ষে চারটি করে ঘোড়া।

প্রায় ছয় লাখ মানুষ! দশ লাখের বেশি ঘোড়া এবং তার চেয়েও বেশি ইয়াক। উট আর ভেড়া মিলিয়ে মোঙ্গল বাহিনীকে যতটা না মনে হতো সেনাবাহিনী, তার চেয়ে বেশি মনে হতো মূর্তিমান কোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগ।

পাঁচ মাস অবরোধ ঠেকিয়ে রাখার পর সাহায্যের অভাবে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, ইনালচিক খান।

ওতরার জয় করার পর নাক, চোখ ও মুখ দিয়ে গরম রূপা ঢেলে তাঁকে হত্যা করা হলো। পুরো ওতরার শহরকে মাটিতে এমনভাবে মিশিয়ে দেয়া হলো, যেন এর কোনোদিন অস্তিত্বই ছিল না।

ছেলেবুড়ো সবাইকে হত্যা করে তাদের মাথা দিয়ে একটি পিরামিড বানিয়ে রাখা হলো শহরের প্রবেশপথে। মোঙ্গল আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল গোটা মধ্য এশিয়া।

পাঁচ

ওতরার পার হয়ে চেঙ্গিজ খান প্রথমেই অভিজ্ঞ জেনারেল সুবুদাই আর জেবে নোইয়নের নেতৃত্বে বিশ হাজার যোদ্ধা পাঠিয়ে দিলেন শাহকে তাড়া করার জন্য।

শাহ তার অধীনে চার লাখ যোদ্ধাকে ভাগ করে দিয়েছিলেন বিভিন্ন শহরে। তবুও তার হাতে অবশিষ্ট যা ছিল, তা দিয়ে তিনি অনায়াসে মোঙ্গলদের সাথে লড়াই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি পালালেন।

উত্তর দিক থেকে যাতে শাহের বাহিনীতে নতুন কোনো সেনাদল যোগ দিতে না পারে। এজন্য সেদিকে জোচি খানকে পাঠানো হলো ত্রিশ হাজার যোদ্ধা দিয়ে। চেঙ্গিজ খান তার মেজ ও সেজ ছেলে চাগাতাই আর ওগেদাইকে নিয়ে আগালেন পুরো মধ্য এশিয়ার জ্ঞানভাণ্ডার খ্যাত ও পবিত্র বলে বিবেচিত শহর বুখারার দিকে।

বুখারার দেয়াল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। লড়াইয়ের জন্য ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার যোদ্ধা ও প্রচুর রসদ। কিন্তু চতুর্দিকে তখন ইয়াজুজ-মাজুজ আতঙ্ক।

মোঙ্গলরা যেদিকে এগিয়ে গেল, শুধু ভয়েই সেসব অঞ্চল খালি হয়ে যেতে থাকল। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষকে বন্দি করে মোঙ্গলরা খেদিয়ে নিয়ে চলল বুখারার দিকে। বুখারাকে অবরোধ করে ক্যাটাপুল্ট দিয়ে একের পর এক বিশাল সব পাথরের খণ্ড ছুঁড়ে মারা হতে থাকল দেয়ালের গায়ে।

কিছুক্ষণ পর পর বিশ ফুট লম্বা বিশাল ধনুক দিয়ে গান পাউডার লাগানো তীর নিক্ষেপ করা হতে থাকল শহরের দেয়ালে। অবরোধের তৃতীয় দিনে বুখারার সেনাদল ঠিক করল, তারা মোঙ্গলদের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে। পরদিন লড়াই শুরু হবার কিছুক্ষণ পরেই মোঙ্গল বাহিনী পালিয়ে যাবার ভান করলে মুসলিম বাহিনী তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে। চেঙ্গিজ এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিলেন। পালিয়ে যাওয়া কেবল একটা ভান ছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী ভাবল মোঙ্গলরা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, তাই তারা দ্রুত মোঙ্গলদের তাড়া করল, ভেঙে গেল শৃঙ্খলা। তিনদিক থেকে ঘেরাও দিয়ে বুখারার সেনাবাহিনীকে টুকরো টুকরো করে ফেলে মোঙ্গল বাহিনী। এর পরেও শহরে যা ছিল, তা দিয়ে অন্তত কয়েক মাস টিকে থাকা যেত।

কিন্তু বুখারার অভিজাত সমাজ ও মোল্লারা ভাবলেন লড়াই করে লাভ নেই। তার চেয়ে আত্মসমর্পণ করলে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচানো যাবে। এক বিরাট সভা শেষে ঠিক করা হলো, চেঙ্গিজ খানের কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া হবে। তারা চেঙ্গিজ খানের কাছে শান্তির প্রস্তাব দিলে খান তাতে সম্মতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো, নগরবাসী যদি অস্ত্র না ধরে, তবে কারও ক্ষতি করা হবে না।

কিন্তু এটা ছিল একটা প্রবঞ্চনা মাত্র। শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই অধিবাসীদের বাড়িঘর লুট করতে শুরু করল মোঙ্গল বাহিনী। খাদ্যের গুদাম উজাড় করে দিল মোঙ্গল ঘোড়ার পাল। কেবল ইশতিয়াক কুশলু নামের এক সেনানায়ক বারো হাজার যোদ্ধা নিয়ে শহরের ভেতরের দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, প্রাণ থাকতে লড়াই করা থামাব না।

মোঙ্গলরা শহরের প্রতিটি পুরুষকে বাধ্য করল দুর্গের দেয়াল ভাঙার কাজে অংশ নিতে। নিজেরা শক্তি সঞ্চয় করছিল চূড়ান্ত আঘাতের জন্য। মোঙ্গলদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে দুর্গের দেয়ালে হামলা চালাল বন্দিরা। বারো দিন লড়াই করার পর শেষ পর্যন্ত শহিদ হলেন ইশতিয়াক কুশলু ও তার বাহিনী।

ছয়

-'আচ্ছা, এই লোকটা মাথায় এত কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছে কেন?'

-'উনি মক্কায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে গিয়েছিলেন।'

-'সেখানে কি তোমাদের আল্লাহ থাকেন?'

-'নাহ, আল্লাহ আসমানে থাকেন।'

-'তাহলে তোমরা সেখানে যাও কেন? আমার ঈশ্বরও আকাশে থাকেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা সবখানেই করা যায়।'

নগর রক্ষক আর কিছু বললেন না। কোন কথায় এই লাল দাড়িওয়ালা লোকটা কখন চটে যায়, বলা যায় না। বিশাল কাঁধ, চওড়া বুকের ছাতি, ভাবলেশহীন চেহারা, আধবোজা হলুদ চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা এই মরুচারী সম্রাটের নাম চেঙ্গিজ খান। যেই কিজিল কুম মরুভূমি কোনো মানুষ পাড়ি দিতে পারে না বলে জনশ্রুতি ছিল। মাত্র তিন দিনে সেই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এসেছেন তিনি।

এই খবর শুনে বুখারার মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হলো, এরাই সেই ইয়াজুজ-মাজুজ, কুরআনে যাদের কথা বলা হয়েছে। এবার আর কারও রক্ষা নেই। কেয়ামত এসে গেছে। বাঁচতে চাইলে এদের কাছে আত্মসমর্পণ ভিন্ন কোনো পথ খোলা নেই। বুখারাবাসী তাই আত্মসমর্পণ করল।

বুখারার জামে মসজিদের ভেতর ঘোড়া নিয়ে উঠে গেলেন চেঙ্গিজ খান।

তাকে খুশি রাখতে বুখারার খান, বেগ, বণিক আর মোল্লারা নিজেদের সব চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টাটা যদি যুদ্ধ করার জন্য তারা করতেন; তাহলে হয়তো তাদের এভাবে পদে পদে অপমানিত হতে হতো না।

সন্ধ্যার পর শহর থেকে ধরে আনা সেরা সেরা সুন্দরীদের নিয়ে চেঙ্গিজ খান মসজিদে নাচ গানের আসর বসালেন।

এই আনন্দ চলল তিন দিন পর্যন্ত।

নগর দুর্গের পতনের পর শুরু হলো গণধর্ষণ।

বাবার সামনে মেয়ে, স্বামীর সামনে স্ত্রী, ভাইয়ের সামনে বোন, ছেলের সামনে মা মোঙ্গলদের হাতে বিবস্ত্র হলো, খোলা ময়দানে। বুখারার কাপুরুষরা চোখের সামনে দেখল মা-বোন-স্ত্রী-কন্যার লাঞ্ছনা। তাদের দুহাত তখন পিছমোড়া করে বাঁধা। কিছু প্রতিবাদী তরুণ লড়াইয়ের চেষ্টা করল। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বুখারাকে মিশিয়ে দেয়া হলো মাটির সাথে।

বুখারা ধ্বংসের আগে চেঙ্গিজ খান শহরের মুসলিমদের বলেছিলেন– 'I am the flail of God for sins you have done. If you were not so sinful, God didn't send such a punishment like me on you.'[৩]

---

৩ Genghis Khan: The History of the World Conqueror. Manchester University Press. 1997

সাত

বুখারা জয়ের পর চেঙ্গিজ রওনা হলেন আরেক বিখ্যাত শহর সমরকন্দ জয় করতে। সমরকন্দের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল বুখারার চেয়ে অনেক অনেক শক্তিশালী। শহরে রক্ষিত ছিল প্রায় এক লাখ যোদ্ধা।[৪] খাবার-পানি ও ওষুধের মজুদ ছিল প্রায় এক বছর টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট।

মোঙ্গল বাহিনী সমরকন্দ ঘেরাও করে তাদের চীনা প্রকৌশলী ও কারিগরদের নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। তারা প্রচুর গ্রেনেড, ন্যাপথা বোমা ও আগুনের তীর বানাল।

প্রথম দিন আক্রমণে নেতৃত্ব দিলেন চেঙ্গিজের সেনাপতি জেলমে বাহাদুর। বীরের মতো মোকাবেলা করে গেল সমরকন্দের যোদ্ধারা। দ্বিতীয় দিন সমরকন্দের সদর দরজায় তীব্র আঘাত হানল মোঙ্গল বাহিনী। কিন্তু আল্‌প এর খান, সিউঞ্জ খান আর বালান খানের নেতৃত্বে তুর্কমান যোদ্ধারা তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিল। এই সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে পরদিন মোঙ্গলদের ওপর আম হামলার সিদ্ধান্ত নিলেন, সমরকন্দের শাসক তুগাই খান। এই কিপচাক খানের লড়াইয়ের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তার শাসক হবার একমাত্র কারণ ছিল তিনি ছিলেন তুর্কান খাতুনের ভাই।

পরদিন মুসলিম বাহিনী হামলা শুরু করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পালানোর ভান করল মোঙ্গলরা! আবারও তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে শৃঙ্খলা হারাল মুসলিম বাহিনী। দুর্ভাগ্য, এদিন মোঙ্গলদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন চেঙ্গিজ স্বয়ং।

নিজেদের সুবিধামতো জায়গায় মুসলিম বাহিনীকে টেনে এনে তিনদিক থেকে ঘেরাও করে কচুকাটা করল মোঙ্গলরা। এক দিনে সাফ হয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা।

কোনোমতে মোঙ্গল বেষ্টনী ভেদ করে শহরে পৌঁছলেন আল্‌প এর খান আর বালান খান।

এই লড়াইয়ের ফলাফল শুনে ভড়কে গেল শহরের আমির ওমরাহরা। তুগাই খান ভাবলেন, আত্মসমর্পণ করলে অন্তত প্রাণে বাঁচা যাবে। শহরের বাইরে তিনি তার ত্রিশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে চেঙ্গিজ খানের সেবায় হাজির হলেন।

চেঙ্গিজ খান তাদের সাথে করলেন এক নির্মম তামাশা।

প্রথমে তিনি তাদের জানালেন, তার বাহিনীতে কাজ করতে গেলে দেখতে মোঙ্গলদের মতো হতে হবে। তাই তুগাই খানসহ তার সব যোদ্ধাকে মাথার দুপাশ কামিয়ে ফেলতে হবে।

তারা মাথা কামিয়ে যখন হাজির হলো, তখন তাদের নতুন হাতিয়ার দেয়ার কথা বলে হাতিয়ার কেড়ে নেয়া হলো। তারপর সবাইকে একে একে জবাই করা হলো, তাদের লাশ ছিড়ে খেল শেয়াল-শকুন। ভয়ে অস্থির হয়ে শহরের কাজি উল কুজ্জাত ও শাইখুল ইসলামসহ অভিজাতরা চেঙ্গিজ খানের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলেন।

---

৪ Raphael, K., 2009. Mongol Siege Warfare on the Banks of the Euphrates and the Question of Gunpowder (1260–1312). Journal of the Royal Asiatic Society, 19(3), pp 355-370

চেঙ্গিজ খান বললেন– যারা আমার বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরবে না, তাদের সবাইকে শহরের বাইরের মাঠে জমায়েত করা হোক। যারা এ আদেশ মানবে না, তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।

অস্ত্র ছেড়ে দিল বেশিরভাগ যোদ্ধা।

শেষমেশ মাত্র দুই হাজার তুর্কমান যোদ্ধা জানবাজি রেখে দুই লাখ মোঙ্গলের সাথে লড়াই করে শহিদ হয়ে গেল। আর এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে মোঙ্গল বেষ্টনী ভেঙে পালিয়ে গেলেন আল্‌প এর খান।

কাপুরুষদের শহরে বাস করা বীরদের ভাগ্যে দুর্ভোগের কোনো সীমা থাকে না।

সমরকন্দের প্রতিটা প্রাণীকে মাঠে জড়ো করে নির্বিচারে জবাই করা হলো। কোনো নারী-শিশু বা বৃদ্ধ, এমনকি একটা কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত বাঁচতে দেয়া হলো না। এরপর অন্তত দেড় শ বছর ধরে সমরকন্দ-বুখারা হয়ে রইল ভুতুড়ে শহর, যার পথের দুধারে শুধু পড়েছিল মানুষের সাদা সাদা হাড়।*

এবার চেঙ্গিজ খান নজর দিলেন খাওয়ারিজম শাহের রাজধানী, তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহরগুলোর একটা, উরগঞ্জের দিকে।

উরগঞ্জ শাসন করছিলেন শাহের মা তুর্কান খাতুন। তাকে শাহ বলে গিয়েছিলেন তিনি না ফেরা পর্যন্ত শহর ধরে রাখতে। শাহ ভেবেছিলেন চেঙ্গিজ খানের সমরকন্দ আর বুখারা জয় করতে কম করে হলেও এক বছর লাগবে।

তার হিসাব সঠিক ছিল, কিন্তু বাদশাহ যখন ভেড়ার মতো পালায়, জনগণের কাছ থেকে সাহসের আশা করা তখন বাতুলতা। বুখারা ও সমরকন্দবাসীর কাপুরুষতায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়েও দুটো শহরের পতন ঘটল মাত্র এক মাসে।

এরই মধ্যে তুর্কান খাতুনের কানে খবর এল, শাহ মুহাম্মাদ মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেছেন যুবরাজ জালাল উদ-দীন মিংবার্নুকে।

আট

জালাল উদ-দীন জঙ্গি সুলতান জালাল উদ-দীন উপাধি গ্রহণ করে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছেন। দুর্ধর্ষ তুর্কি সেনাপ্রধান তিমুর মালিক যোগ দিয়েছেন জালাল উদ-দীনের সাথে।

তুর্কান খাতুনকে বলা হলো হেরেমের মেয়ে ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে তিনি যেন শহর ছেড়ে জালাল উদ-দীনের সাথে যোগ দেন। জালাল উদ-দীন শিগগিরই ফৌজ নিয়ে উরগঞ্জ রক্ষা করতে আসবেন।

---

* ফুটনোট : আমির তাইমুরের আমলে সমরকন্দকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়, তার আগে প্রায় দেড় শ বছর ধরে শহর দুটো বসবাসের অনুপযোগী ছিল।

ওদিকে চেঙ্গিজ খানও তুর্কান খাতুনকে চিঠি পাঠিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে তার ক্ষমতা অটুট রাখা হবে বলে আশ্বস্ত করলেন।

চতুর তুর্কানকে চেঙ্গিজ বহু কৌশলেও বোকা বানাতে পারলেন না। শহর ছেড়ে পালালেন তিনি।

কিন্তু এই অহংকারী মহিলা হেরে গেলেন নিজের অহংবোধের কাছে।

জালাল উদ-দীনের মা আই জিজেককে তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাই জালাল উদ-দীনের কাছে না গিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন মরুভূমির ভেতরের এক দুর্গে। চার মাস টিকে থাকার পর শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলদের হাতে পতন হলো দুর্গের।

শাহের হেরেমের মেয়েদের, আত্মীয় স্বজনদের দাসী হিসেবে নিজের ছেলে ও ঘনিষ্ঠদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিলেন চেঙ্গিজ খান।

তুর্কান খাতুনকে ছেড়ে দেয়া হলো কুকুরের মতো লোভী একদল সৈনিকের মাঝে। প্রায় সত্তর বছর বয়সে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের শিকার হওয়া এই মহিলার শেষ জীবন কেটেছে চেঙ্গিজের তাঁবুর দরজায় বসে বিলাপ করে।

চেঙ্গিজ খান মাঝেমধ্যে তার খাওয়া দু একটা হাড় তার দিকে ছুঁড়ে দিতেন। এককালে যিনি নিজেকে তামাম দুনিয়ার নারীদের সম্রাজ্ঞী ভাবতেন, তার পতনটা হয়েছিল অকল্পনীয় নির্মম।

নয়

উরগঞ্জের বাসিন্দারা বুখারা বা সমরকন্দের মানুষের মতো কাপুরুষ ছিল না। মাত্র বিশ হাজার যোদ্ধা নিয়েও তাই তারা লড়াই চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিল।

চেঙ্গিজ খানের বড় ছেলে জোচি খান উত্তর দিক থেকে, মেজ ছেলে চাঘাতাই খান পশ্চিম থেকে আর ওগেদাই দক্ষিণ থেকে শহর অবরোধ করলেন। তাদের তীব্র আক্রমণে উরগঞ্জ বহির্বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মোঙ্গলরা দেখল, আমু দরিয়ার তীরের এই শহরে তাদের চাইনিজ সিজ ট্যাকটিক্স কাজে আসছে না। এখানে বড় বড় পাথর নেই, যা দেয়ালের ওপর ছুঁড়ে মেরে দেয়াল ধ্বসিয়ে দেয়া যায়। এখানকার মাটিও নরম, সিজ ইঞ্জিনগুলো বসানো তাই মুশকিল হয়ে গেল। মোঙ্গলরা তাই শত শত লিটার ন্যাপথা-কেরোসিনে কাঠ চুবিয়ে সেগুলো ক্যাটাপুল্ট দিয়ে ছুঁড়ে মেরে শহরের বিরাট অংশে আগুন লাগিয়ে দিল।

তবু হাল না ছেড়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল শহরের মানুষ। এবার জোচি খানের তীব্র হামলায় শহরের উত্তরের দরজা খুলে যাচ্ছিল। কিন্তু কারাকুমের তুষার চিতা খ্যাত বেদুইন কারা কনচারের তিন হাজার তুর্কমান যোদ্ধা ত্রিশ হাজার মোঙ্গলের ওপর এত হিংস্র হামলা করে বসল যে, প্রায় দুই হাজার লাশ ফেলে তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হলো।

দক্ষিণ থেকে ওগেদাইয়ের আক্রমণের জবাবে শহরের সাধারণ মানুষ গরম পানি আর তেল ঢেলে দিল দুর্গের ওপর থেকে। আরও কয়েক হাজার মোঙ্গল এসময় মারা যায়।

চেঙ্গিজ খান বলে উঠেন- দুর্গের দেয়ালের শক্তি নির্ভর করে তার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত জনগণের সাহসের ওপর।

কোনোভাবেই শহরে প্রবেশ করতে না পেরে চাঘাতাই খান আমু দরিয়ার তীরে থাকা শহর রক্ষা বাঁধ ভেঙে দিলে নদীর জলে শহরের প্রাচীরের বড় এক অংশ ভেঙে যায়।[৫] উত্তরে জোচি খানের জবাবী হামলা ছিল আরও মারাত্মক। প্রচুর গ্রেনেড আর মাইন ব্যবহার করে তিনি উত্তর দিকের যোদ্ধাদের প্রতিরোধ চুরমার করে ফেলেন, অবশ্যই বড় রকম ক্ষয়ক্ষতির পর। এরপর মোঙ্গলরা বানের পানির মতো ঢুকে পড়ে শহরে।

এবার শহরের মেয়েরা তলোয়ার-তীর নিয়ে বেরিয়ে আসে খোলা রাজপথে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা লড়াই করে চলে মোঙ্গলদের সাথে। কিন্তু ততক্ষণে পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেল।

লড়াই শেষে বন্দির সংখ্যা গণনার পর চেঙ্গিজ খান নিজের বাহিনীর প্রতিজন সৈনিককে চব্বিশটি করে মাথা নিয়ে আসার আদেশ দেন। আর তার সৈনিকেরা সন্ধ্যার মধ্যেই সেই আদেশ পালন করে। উরগঞ্জের বারো লাখ অধিবাসীর প্রত্যেককে হত্যা করা হয় একদিনে।[৬]

উরগঞ্জ অবরোধ সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের একটি।

চেঙ্গিজ খান চরম প্রতিশোধ নিয়েছিলেন শাহে খাওয়ারিজম ও খাওয়ারিজমবাসীর প্রতি। এমনকি পৃথিবীর বুকে যেন শাহের কোনো চিহ্ন না থাকে, সেজন্য তিনি শাহের জন্মস্থানে যে নদীটা বয়ে গেল, তা পর্যন্ত বুজিয়ে দিয়েছিলেন।

শাহের হেরেমের মেয়েদের ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়ার সময় তার এক উক্তি জানান দেয়, তিনি কতটা নৃশংস ছিলেন।

'A man's greatest happiness is to break his enemies, to drive them before him, to take from them all the things that have been theirs, to hear the weeping of those who cherished them, to take their horses between his knees and to press in his arms the most desirable of their women.'[৭]

চেঙ্গিজ খানের বিজয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল তীর-ধনুক বা গান পাউডার নয়, বরং আতঙ্ক। তার এই সাম্রাজ্য ছিল মানুষের কাটামুণ্ডুর পিরামিডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আতঙ্কের সাম্রাজ্য।

---

৫. প্রাগুক্ত(১),পৃঃ২৪৮

৬. Boyle, JA.1997.*Genghis Khan: The History of the World Conqueror*. Manchester University Press.

৭. Weatherford, J.M., 2004. *Genghis Khan and the making of the modern world*. Broadway Books

তুর্কি তরুণ

এক

মৃত্যুর আগে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন শাহ আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ।

কথায় বলে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। শাহ যতক্ষণে ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, ততক্ষণে তার সাম্রাজ্য মোঙ্গলদের দখলে চলে গেছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন বঞ্চিত শাহজাদা জালাল উদ-দীনকে। তিমুর মালিকসহ সেনাপতিদের তিনি বলে গিয়েছিলেন শাহজাদার পাশে থাকতে।

ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে জালাল উদ-দীন বললেন, তিনি শাহ উপাধি ধারণ করতে চান না। বরঞ্চ তিনি খলিফার অধীনে একজন সুলতান হিসেবেই থাকতে চান। তারপর দ্রুত নিজের কাছাকাছি থাকা যোদ্ধাদের নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু তুর্কমেন মায়ের সন্তান জালালকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল কিপচাক খানেরা। তার কাছে খবর আসতে থাকল, প্রতিদিনই চেঙ্গিজ খানের দলে যোগ দিচ্ছেন কোনো-না-কোনো খান।

ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে দ্রুত রাজধানী থেকে মাত্র তিন শ বিশ্বস্ত তুর্কমেন যোদ্ধাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জালাল।

মোঙ্গলদের চোখ এড়িয়ে দিনরাত খেটে শত শত মাইল ঘুরে যোদ্ধা সংগ্রহ করতে লাগলেন তিনি। তার চোখে তখন স্বদেশকে মোঙ্গলদের কাছ থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন। এভাবে কয়েক মাসের ভেতর জালাল উদ-দীন ইরানি, তুর্কমেন ও কিছু কিপচাক তরুণকে নিয়ে প্রায় বিশ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী গড়ে তুললেন।

জালাল উদ-দীনের বীরত্ব সম্পর্কে চেঙ্গিজ খানের উঁচু ধারণা ছিল। তিনি জানতেন, এই বীর তরুণ সুযোগ পেলেই মোঙ্গলদের ঘাড়ে মরণকামড় বসাবে। তাই খুতুখু নোইয়ানের অধীনে একটা শক্তিশালী বাহিনীকে তিনি জালাল উদ-দীনকে পাকড়াও করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

প্রবাদ আছে, দুর্বল শিশুকে অবজ্ঞা করো না, সে শিশু সিংহশাবকও হতে পারে।

দুই

জালাল উদ-দীন জানতেন, মোঙ্গলরা তার পিছু নেবেই। তিনি তাই তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন কাবুলের উত্তরে পানশিরের কাছে পারওয়ান উপত্যকায়।

মোঙ্গল ঘোড়া এত উঁচু পাহাড় বেয়ে অভ্যস্ত না। হিন্দুকুশ পর্বতের পাতলা বাতাসে তাদের ঊর্ধ্বশ্বাস উঠে গেল।

জালাল উদ-দীন তিমুর মালিককে বাহিনীর একেবারে সামনে রেখে ডানে আমান মালিক, বামে সাইফ উদ-দীনকে রেখে নিজে থাকলেন ঠিক মাঝখানে। তারপর পারওয়ান উপত্যকার কাছে গহীন পর্বতের চড়াইয়ে ওঁৎ পেতে রইলেন শত্রুর অপেক্ষায়।

মোঙ্গলরা উপত্যকায় এসে লড়াইয়ের হাঁক ছাড়তেই নিজের বাহিনী নিয়ে নেমে এলেন জালাল উদ-দীন।

মোঙ্গলরা প্রথমেই তাদের রাইট উইংয়ের হেভি ক্যাভালরি নিয়ে আঘাত হানল সাইফ উদ-দীনের ওপর। সাইফ উদ-দীনের আফগানরা সাহসী হলেও তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল মামুলি। মোঙ্গলদের ক্যাভালরি চার্জের মুখে তারা কয়েক শ গজ পিছিয়ে গেল। সাইফ উদ-দীন পিছিয়ে যেতেই আচমকা তাদের করে দেয়া জায়গায় বেরিয়ে এলেন জালাল উদ-দীন মিংবার্নু।

'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর' রব তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তুর্কমান সওয়ারেরা।

ভয়াবহ এই আক্রমণে তুর্কিরা মোঙ্গলদের রাইট উইংকে ফালাফালা করে ফেলল। উল্টোদিকে ঘুরে পিছিয়ে গেল মোঙ্গল রাইট উইং হেভি ক্যাভালরি। ওদিকে তুর্কি রাইট উইং দিয়ে আমান মালিক, সেন্টারে তিমুর মালিক হিন্দুকুশ পর্বতের বোল্ডারের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মোঙ্গলদের ছোড়া ঝাঁক ঝাঁক তীর, বর্শা আর গ্রেনেডের মুখে।

তিমুর মালিকের প্রচুর যোদ্ধা শহিদ হতে থাকল। কারণ, গ্রেনেডের জবাব তাদের কাছে ছিল না। মোঙ্গলদের রাইট উইং ভেঙে যেতেই জালাল উদ-দীন আমান মালিক আর সাইফ উদ-দীনকে দুই উইং দিয়ে একসাথে পাল্টা হামলার আদেশ দিলেন। সেদেরি নোইয়ন দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন।

দুই দিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে শেষ চেষ্টা চালালেন খুতুখু নোইয়ন। এর মধ্যে তিমুর মালিককে সরিয়ে দিয়ে 'হাইদির আল্লাহ' ডাক হেঁকে ঠিক মোঙ্গল সেন্টারে ঢুকে গেলেন জালাল উদ-দীন।

পেছন পেছন উল্কার মতো এগিয়ে গেল তার বাহিনী। কিন্তু মোঙ্গলদের আগুনে তীর আর গ্রেনেডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল তাদের। সাইফ উদ-দীনের হামলায় ততক্ষণে মোঙ্গল রিজার্ভ ফোর্সও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

জালাল উদ-দীনের চূড়ান্ত আক্রমণের পর প্রাণপণে পালাতে লাগল সেই মোঙ্গল বাহিনী, যারা অন্তত ত্রিশ লাখ মুসলিমের রক্তে গোসল করেছে গত দুই বছরে।

পারওয়ানের এই পরাজয় চেঙ্গিজ খানের জীবদ্দশায় মোঙ্গল বাহিনীর একমাত্র পরাজয়।

এই খবর আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। বালখের জনগণ শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসে মোঙ্গলদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিল। তুসের মোঙ্গল গভর্নরকে হত্যা করে জনতা শহরের শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়ে নিল। মার্ভের যোদ্ধারা অবরোধ করতে আসা মোঙ্গল বাহিনীকে ধাওয়া দিয়ে আফগানিস্তানের উত্তর সীমা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এই অপমানজনক পরাজয়ের খবর পেয়ে গর্জে উঠলেন চেঙ্গিজ খান। তারপর নিজেই দুই লাখ যোদ্ধার বাহিনীর পুরোটা নিয়ে রওনা হলেন আফগানিস্তানের দিকে।

তিন

ক্লান্ত, কিন্তু বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল মুসলিম বাহিনী উৎসব করছিল। বিজয় উৎসব।

গনিমতের মাল নিয়ে ভাগাভাগির সময় সাদা রঙের এক আরবি ঘোড়ার দখল নিয়ে এক কিপচাক খানের সাথে আগ্রাক নামের এক পাঠান সরদারের ঝগড়া লেগে গেল।

কিপচাক খান আফগান সরদারের মাথায় ছড়ি দিয়ে ঘা দিলেন। শুরু হয়ে গেল কিপচাক আর আফগানদের ভেতর মারামারি। কিপচাক খানটি ছিলেন আমান মালিকের বাহিনীর এক কমান্ডার, আর আগ্রাক ছিলেন সাইফ উদ-দীনের বাহিনীর। শেষে এই ঝগড়া সাইফ উদ-দীন আর আমান মালিকের ঝগড়ায় রূপ নিল।

সাইফ উদ-দীন ও আমান মালিক দুজনেই ঘোষণা দিলেন, ন্যায়বিচার না হলে তারা ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবেন। জালাল উদ-দীন অনেক অনুনয় বিনয় করেও তাদের শান্ত করতে পারলেন না।

রাতের খাবার রান্না হয়েছিল জালাল উদ-দীনের ক্যাম্পে। সেই খাবারের অর্ধেকটা পড়ে রইল। অর্ধেক যোদ্ধা নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে রাতেই চলে গেলেন আফগান সেনাপতি সাইফ উদ-দীন।

সামান্য এক আরবি ঘোড়া নিয়ে বিবাদ আর নিজেদের আত্মঅহংকার নিয়ে বাড়াবাড়িতে যুদ্ধ জয়ের পরপরই ভেঙে গেল জালাল উদ-দীনের বাহিনী।

গোরস্তান-ই খুরাসান

এক

বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ তার তেরো বছরের ছেলে জালাল আর যুবতী স্ত্রী মুমিনা খাতুনকে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। প্রিয় বালখ ছাড়ার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। এখানে আছে তার শত শত ভক্ত আর গুণগ্রাহী।[১] কিন্তু সত্যিকারার্থে এখানে আর থাকা সম্ভব না।

বালখের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বাহাউদ্দিন সন্তুষ্ট না। শাহের ফৌজের কোনো খবরও পাওয়া যাচ্ছে না। ফৌজ থাকলে তিনি বউ বাচ্চাকে বাড়িতে রেখে যুদ্ধে যেতেন, কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি নেই।

মোঙ্গলরা মাত্র দুই দিনের অবরোধে তিরমিজ শহরকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে। একজন মানুষও প্রাণে বাঁচেনি, মেয়ে বা শিশু কাউকেই জীবিত রাখা হয়নি। এমন নিষ্ঠুরতার কথা না আগে কেউ শুনেছে, না দেখেছে।

বালখ শহরটার বয়স প্রায় চার হাজার বছর। সেই যে বৈদিক যুগের আর্যরা শহরটা গড়েছিল, তারপর থেকে চলছে তো চলছেই।

সাইরাস, আলেকজান্ডার, দারিয়ুসদের প্রত্যেকের জন্যেই বালখ ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক শহর। নিজের বিশেষ অবস্থানের কারণে এটি সিল্করোডের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিখ্যাত ছিল। আরও বেশি বিখ্যাত ছিল তার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির জন্য।

নাসির খসরু, ইবনে সিনা, আমির খসরু, সিনাই, রাবিয়া বালখির মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্মভূমি এই বালখ ফারসি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন।

বাহাউদ্দিন বেরিয়ে পড়েছেন নিশাপুরের উদ্দেশ্যে।

নিশাপুরে একটা শক্তিশালী ফৌজ আছে, সেখানে গেলে অন্তত লড়াই করে মরা যাবে।

---

১. Franklin Lewis. Rumi: Past and Present. East and West. Oneworld Publications. 2008 (revised edition). pp. 90–92.

দুই

উরগঞ্জ দখলের পর চেঙ্গিজ খান বসে থাকেননি। নিজে মধ্য এশিয়াতে মোঙ্গল শাসন শক্তিশালী করার জন্য থেকে গেলেও ছোট ছেলে তলুই খানকে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা, তিন হাজার আগুনের তীর ছোড়া যন্ত্র, তিন শ ক্যাটাপুল্ট দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ন্যাপথা ছুঁড়ে মারার জন্য সাত শ ম্যাগনোলেনস, চার হাজার মই, খানা-খন্দ ভরাট করার জন্য আড়াই হাজার বস্তা মাটি আর দুই হাজার প্রকৌশলী দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন দক্ষিণে।[২]

সিল্ক রোডের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য যে পরিমাণ জনবল দরকার, চেঙ্গিজ খানের হাতে তা ছিল না। এতগুলো শহর দখল করে রাখতে গেলে তাকে সামনের দিনগুলোতে বিদ্রোহ সামলানো নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। খান তাই সিদ্ধান্ত নিলেন, সিল্ক রোডে পড়া প্রতিটি শহরের সব মানুষকে তিনি মেরে ফেলবেন। এতে দুটো সুবিধা হবে।

প্রথমত, বিদ্রোহ করার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, এদের পরিণতি দেখে ভয়ে অন্য অনেক রাজ্য হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

চেঙ্গিজ পুত্র তলুইয়ের প্রথম মিশন ছিল তিরমিজ। মাত্র দুই দিনে তিরমিজের দেয়াল গুঁড়িয়ে দিলেন তলুই। তার সাথে থাকা ন্যাপথা আর গান পাউডারের বিস্ফোরণে টিকে থাকতে পারেনি তিরমিজের দুর্বল প্রাচীর।

এরপর তলুই আঘাত হানলেন বালখে। ছবির মতো সুন্দর শহরটা পাঁচ দিন টিকে থাকার পর দেয়াল গুঁড়িয়ে গেল তলুইয়ের প্রকৌশলীদের প্রযুক্তির কাছে।

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের প্রিয়তমা রোখসানার শহর, উম্মুল বিলাদ খ্যাত বালখের প্রতিটি দালান মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হলো, হত্যা করা হলো প্রায় পাঁচ লাখ অধিবাসীর সবাইকে।

এরপর চেঙ্গিজ খান নিজেই এগিয়ে এলেন হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে। রক্তের স্বাদ না নিয়ে কত দিনইবা থাকা যায়?

তিন

ধারণা করা হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বৃহত্তম শহর ছিল মার্ভ।[৩]

প্রায় দুই লাখ অধিবাসী ছাড়াও শহর ঘিরে বাস করত আরও প্রায় দেড় মিলিয়ন মানুষ। এদের জীবন ও জীবিকা ছিল মার্ভকে ঘিরেই। বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানের এক কেন্দ্র ছিল মার্ভ। যাকে বলা হতো দুনিয়ার বুকে বেহেশতের টুকরো।

---

[২] Kenneth Warren Chase (2003). Firearms: a global history to 1700 (illustrated ed.). Cambridge University Press. p. 58

[৩]. Bennison, A.K. and Gascoigne, A.L. eds., 2007. Cities in the pre-modern Islamic world: The urban impact of religion, state and society (Vol. 3). Routledge.

জুইভানি লিখেছেন–

> 'In extent of territory it excelled among the lands of Khorasan, and the bird of peace and security flew over its confines. The number of its chief men rivaled the drops of April rain, and its earth contended with the heavens.'[৪]

তলুই খান মার্ভ অবরোধ করার সময় মার্ভের গ্যারিসন ছিল বারো হাজার যোদ্ধা। মোঙ্গলদের সাথে পাল্লা দিয়ে তারা চার দিন লড়াই করল। পাঁচ দিনের মাথায় শহরের সেনানায়ক বুঝলেন, মোঙ্গলরা যত বেশি সময় পাবে, শহরের প্রাচীর ভাঙতে তাদের ততই সুবিধা হবে। চাইনিজ মর্টারের সামনে তাদের দেয়াল খুব বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

পরদিন মার্ভের সেনাবাহিনী প্রবল আঘাত হানল মোঙ্গলদের ওপর, কিন্তু মোঙ্গলরা তাদের হামলা ঠেকিয়ে দিল। এই হামলায় নিহত হলো এক হাজারের বেশি মোঙ্গল।

পরদিন মোঙ্গলরা আবার হামলা চালালে প্রাণপণে তাদের ঠেকিয়ে রাখল শহরের যোদ্ধারা। কিন্তু শহরের ভেতরে থাকা অভিজাতরা সিদ্ধান্ত নিলেন চেঙ্গিজ খানের কাছে আত্মসমর্পণ করে দয়া ভিক্ষা চাইতে যাওয়াটাই ভালো হবে। এই দেয়াল আর এক সপ্তাহের বেশি টিকবে না।

অবরোধের সপ্তম দিনে শহরের অভিজাতরা খুলে দিলেন সদর দরজা। সব অধিবাসীকে বলা হলো শহরের বাইরের ময়দানে জড়ো হতে।

পৃথিবীর ইতিহাসে হওয়া ভয়ংকরতম গণহত্যাগুলোর একটার শিকার হয়েছিল মার্ভ।

জুইভানির মতে, প্রতিজন মোঙ্গল সেদিন তিন শ থেকে চার শ মুসলিমকে হত্যা করেছিল।[৫] অথচ এরা যদি খালি হাতেও লড়াইয়ে নামত, অন্তত কয়েক লাখ মানুষ পালানোর সুযোগ পেত। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের আতঙ্ক তাদের এতটাই গ্রাস করে রেখেছিল যে তারা তলোয়ার ধরার মতো সাহসই পায়নি।

মার্ভ পড়ে রইল এক মহাশ্মশানের মতো, যার চারিদিকে লাখ লাখ মুণ্ডু কাটা শরীর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে একেকটা কাটা মাথা দিয়ে বানানো পিরামিড সাক্ষ্য দিচ্ছিল- 'জগতে যে আক্রমণ করতে জানে না, তার কোনো রক্ষা নেই'।

চার

শিল্প আর শিল্পীদের শহর নিশাপুরের রাস্তায় হইচই পড়ে গেছে।

লোকজন বলাবলি করছে, মোঙ্গলরা মার্ভের লোকজনকে খতম করে এদিকেই আসছে।

---

৪ Juvani. A.A.M.. Tarikh-t-Jahan-i-Gusha. Tr. JA Boyle in. 2. pp.598-605.

৫. প্রাগুক্ত(৪)

নিশাপুর বিখ্যাত ছিল তার ক্যালিগ্রাফি, টাইলস, গালিচা আর চোখ ধাঁধানো তাঁতশিল্পের জন্য। এই শহরেই জন্মেছিলেন ইমাম মুসলিম, আবুল খাইর ইরান শহরি, উমার খাইয়ামরা। তলুই খানের সাথে চেঙ্গিজ নিশাপুর দখল করতে আরও একজনকে পাঠালেন। শুটকো ঢ্যাঙা সেনাপতি তখুচার নোইয়ন, খানের মেয়ে জামাই।

অবরোধের প্রথম দিনেই নিশাপুরবাসীর আক্রমণে মোঙ্গল বাহিনীর বড় ধরনের ক্ষতি হলো। নিহত হলেন তখুচার নোইয়ন। তলুই খান প্রতিজ্ঞা করলেন, বোনের স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে পুরো নিশাপুরকে তিনি মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। পরেরদিন মোঙ্গলদের সর্বাত্মক হামলায় চুরমার হয়ে গেল নিশাপুরের দেয়াল। এখানেও হত্যা করা হলো পনেরো লাখের বেশি মানুষকে।[৬] এমনকি শহরের কোনো কুকুর, বিড়ালকেও জীবিত রাখা হয়নি।

নিশাপুর থেকে যে গুটিকয়েক মানুষ পালাতে পেরেছিলেন তাদের ভেতরে ছিলেন বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ ও তার পরিবার আর একজন দরবেশ। তার নাম হাজি বেকতাশ ওয়ালি।[৭]

বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের কিশোর ছেলে নিশাপুরের কবি আত্তারের বড় ভক্ত ছিল।

আত্তারও খুব পছন্দ করতেন এই কিশোরকে। রাস্তায় হাঁটার সময় একদিন বাহাউদ্দিনের পেছন পেছন জালাল নামের একজনকে হাঁটতে দেখে তিনি বলেছিলেন– 'ওই দেখো, সমুদ্রের পেছনে হাঁটছে মহাসমুদ্র'![৮]

এই জালালই ভবিষ্যতের মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি। নিশাপুর ছেড়ে তারা যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, আত্তার সেদিন জালালকে উপহার দিয়েছিলেন কবিতার বই 'আসরারনামা'।

আত্তার নিজে শহর ছেড়ে গেলেন না। মানুষের মাথা দিয়ে বানানো অনেক অনেক পিরামিডের কোনোটাতেই তার মাথা পাওয়া যায়নি। তিনি আটাত্তর বছর বয়সে তলোয়ার হাতে লড়াই করে শহিদ হয়েছিলেন নিশাপুরের রাস্তায়।[৯]

পাঁচ

> 'If any one ask thee which is the pleasantest of cities, Thou mayest answer him aright that it is Herāt. For the world is like the sea, and the province of Khurāsān like a pearl-oyster therein, The city of Herāt being as the pearl in the middle of the oyster.' — Rumi, 'The Geographical Part of the NUZHAT-AL-QULŪB'

---

৬. প্রাগুক্ত(৪)

৭ Balcıoğlu, Tahir Harimi, Mezhep cereyanları - Madh'habmovements, p. 184, Ahmed Said tabÕı, Hilmi Ziya neşriyâtı, 1940.

৮. al-Dīn 'Aṭṭār, F., 2009. Farid Ad-Din 'Attār's Memorial of God's Friends: Lives and Sayings of Sufis. Paulist Press.

৯. Boyle, J.A., 1979. The Religious Mathnavīs of Farīd Al-Dīn Attar. Iran, 17(1), pp.9-14.

মার্ভ আর নিশাপুরের সাথে সেলজুক আর গজনভি আমলে পাল্লা দিয়ে যে আফগান শহরটা বেড়ে উঠেছিল তার নাম হেরাত।

বিশাল এই শহরের জনসংখ্যা ছিল এক মিলিয়নের বেশি।

এই শহর অবরোধ করতে এসে তলুই খান চেঙ্গিজ খানের সাহায্য চাইলেন। চেঙ্গিজ খান শহরের সামনে আসার পর হেরাতের অধিবাসীরা ভয়ে লড়াই না করেই আত্মসমর্পণ করল।

তাদের ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেন খান। তবে ধারণা করা হয়, তাদের ছেড়ে দেয়ার একটা বড় কারণ ছিল হেরাতের ধাতু শিল্প। এখান থেকে চেঙ্গিজ খান তার সেনাবাহিনীর জন্য প্রচুর অস্ত্র বানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা শহর ধ্বংস করলে হয়তো পাওয়া যেত না।

এই সময় তার কানে এল জালাল উদ-দীন মিংবার্নুর হাতে খুতুখু নোইয়নের অপমানজনক পরাজয়ের সংবাদ।

চেঙ্গিজ খান দ্রুত দুই লাখ যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালার দিকে এগোতে লাগলেন। পথে পড়ল অতি প্রাচীন শহর বামিয়ান।

শহর অবরোধের নির্দেশ দিলেন খান। অবরোধের তিন দিনের মাথায় শহরবাসীর ছোঁড়া গরম তেলে পুড়ে মারা গেল চেঙ্গিজ খানের মেজ ছেলে চাগাতাইয়ের প্রথম সন্তান, খানের প্রিয় নাতি মুতুগান।

শোকে মুহ্যমান চেঙ্গিজ বামিয়ানকে এমনভাবে ধ্বংস করলেন, বহু বছর তার কোনো চিহ্নই থাকল না।

এই অভিযানে চেঙ্গিজ হত্যা করেছিলেন পঞ্চাশ লাখের বেশি মানুষ।

আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান আর খোরাসানকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে তিনি এবার ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন খাইবার পাসের দিকে। নতুন গন্তব্য ভারত।

জালাল উদ-দীন ছোকরাটা নাকি সেদিকেই গেছে।

হিন্দুকুশ থেকে হিন্দুস্তানে

এক

হেমন্তকাল।

নভেম্বরের শুরুতে উত্তর মেরু থেকে নেমে আসা হিমেল হাওয়া সাইবেরিয়ান স্তেপ হয়ে নেমে আসে দক্ষিণে, বাড়ি মারে তিয়েনশানের গায়ে। তারপর সফেদ এই পবিত্র পর্বতমালার গা ঘেঁষে ক্রমেই আরও ভারী হয়ে নেমে আসতে থাকে নিচের দিকে। পরতে পরতে বাতাস জমে তৈরি হয় উচ্চচাপ।

তিয়েনশান তার গায়ে এত চাপ সহ্য করতে না পেরে ফাঁকফোঁকর দিয়ে সেগুলোকে ঠেলে দেয় তুর্কিস্তানে। শীতের হাড় জমিয়ে দেয়া বাতাস বইতে থাকে দক্ষিণে, আবার থামে আফগানিস্তানের ওপর, পামির মালভূমিতে।

পামির আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যাচ্ছে।

মাত্র বরফজমা শুরু করেছে হিন্দুকুশের গায়ে। মাঝে মাঝেই হালকা তুষারঝড় ঝাপটা মারছে ঘোড়াদের চোখে মুখে। মোঙ্গল ঘোড়া কড়া শীতে অভ্যস্ত, এই ঠান্ডা তাদের কাছে বেশ আনন্দের ব্যাপার।

চেঙ্গিজ খানের বাহিনী এখন পৃথিবীর ছাদ পামিরে।

এখান থেকে খাইবার পাস হয়ে তারা দ্রুত এগোচ্ছে লাহোরের দিকে। জালাল উদ-দীন সেদিকেই গেছেন। খানের নির্দেশ, যে করেই হোক, এই বীর তরুণকে পাকড়াও করতে হবে।

জালাল উদ-দীন পারওয়ানের যুদ্ধে জিতে গিয়ে হয়তো পিছু হটতেন না। হাতে ষাট হাজার যোদ্ধা ছিল, সাথে আরও হাজার ত্রিশেক যোদ্ধা যোগ দেবার সম্ভাবনাও ছিল। আর সেটা সম্ভব হলে তিনি এই বাহিনী চালিয়ে দিতেন খোরাসান হয়ে সোজা উজবেকিস্তানে, চেঙ্গিজ খানের বুকের ওপর। কিন্তু তুচ্ছ কারণে বিবাদ করে আফগানরা তার বাহিনী থেকে বেরিয়ে গেল।

আফগানরা এর চরম মাশুল দিয়েছিল। মার্ভ, বালখ, বামিয়ান, গজনি, কান্দাহার আর তুসকে সম্পূর্ণ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন খান। হত্যা করেছিলেন কমপক্ষে ত্রিশ লাখ আফগানকে।

নিরুপায় জালাল উদ-দীন হাতে থাকা পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে পিছু হটে গেলেন হিন্দুস্তানের দিকে। প্রথমে লাহোর, তারপর পেশোয়ার হয়ে মুলতান। সেখানেও টিকতে না পেরে আরও দক্ষিণে সিন্ধু নদ পার হয়ে পাঞ্জাবে ঢোকার পরিকল্পনা করলেন তিনি।

চেঙ্গিজ আগাচ্ছেন সুচিন্তিত, ধীর কদমে, প্রায় দুই লাখ যোদ্ধা নিয়ে।

তার সামনে জালালকে ধাওয়া করে এগিয়ে যাচ্ছে সেদেরি নোইয়ন আর বালা নোইয়ন। তাদের সাথে দুই টুমেন সৈন্য।

জালাল দিনে খুব একটা পথ চলেন না। সারা রাত ঘোড়া চালান মোঙ্গলদের ফাঁকি দেয়ার জন্য, কিন্তু তাতে বড় একটা লাভ হয় না।

মোঙ্গলদের লোকে এমনি এমনি ইয়াজুজ-মাজুজ বলত না। তাদের ইন্দ্রিয় ছিল প্রায় পশুর মতো শক্তিশালী। কথিত আছে, একজন মোঙ্গল অনায়াসে খোলা ময়দানে চার পাঁচ মাইল দূরে থাকা জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখতে পেত। ছয় সাত মাইল দূরে কিছু পোড়ানো হলে তার গন্ধ তারা বুঝতে পারত। অনেকেই প্রায় বিশ মাইল দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ বুঝতে পারত।

এমনকি আট শ বছর পর এই এখনো মোঙ্গলরা তাদের দূরপাল্লার দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তির জন্য বিখ্যাত।

দুর্দান্ত এই ট্র্যাকারদের ফাঁকি দেয়া ছিল তাই প্রায় অসম্ভব। জালাল উদ-দীনের অবস্থান ধরা পড়ে গেল মোঙ্গলদের কাছে। তিনি ভেবেছিলেন সিন্ধু পেরিয়ে হিন্দুস্তানে সুলতান ইলতুতমিশের সালতানাতে চলে যেতে পারলে, সেখান থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। চেঙ্গিজ খান ভারতের জন্যেও হুমকি, এই অসাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাই ইলতুতমিশের সাথে তিনি জোটও গড়তে পারবেন।

কিন্তু সিন্ধু নদে কেউ নামতেই পারছিল না। যে নামছিল, সেই ভেসে যাচ্ছিল।

অনেক চেষ্টা করেও যখন কোনো গতি করা গেল না, জালাল উদ-দীনকে তখন থামতে হলো। এভাবে কেটে গেল দুদিন।

হিমালয় আর কারাকোরামের বরফ গলা জলে বান ডেকেছে খরস্রোতা সিন্ধুতে।

জালাল উদ-দীন চরম দুশ্চিন্তায় আছেন। তার দুই পাশে পাহাড়, সামনে বিশাল সিন্ধু।

পেছনে ছুটে আসছেন চেঙ্গিজ খান।

দুই

চেঙ্গিজ খুব সাবধানে তার লড়াইয়ের ছক এঁটেছেন। এই কাজে তার প্রধান সঙ্গী জেনারেল সুবুদাই বাহাদুর আর জেলমে বাহাদুর। এই লড়াই তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জালাল উদ-দীন যদি কোনোভাবে টিকেই যায়, সেক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের সুলতানের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে সে আবার খাওয়ারিজম ফিরে পেতে আসবে। যে ছেলে মাত্র একুশ বছর বয়সে ষাট হাজার যোদ্ধা নিয়ে মোঙ্গলদের হারাতে পারে, যা চীনের ঝানু ঝানু জেনারেলরা লাখো সৈন্য নিয়ে পারেনি, তাকে এই সুযোগ দেয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ না। ভাগ্যিস সাইফ উদ-দীন জালালকে ছেড়ে চলে গেছে, নয়তো এই মুহূর্তে চেঙ্গিজ খানকে জালালের আশি থেকে নব্বই হাজার যোদ্ধার এক উজ্জীবিত বাহিনীর মোকাবেলা করতে হতো। যার নেতৃত্বে থাকত জালাল উদ-দীন, তিমুর মালিক, আল্‌প এর খান, আমান মালিক আর সাইফ উদ-দীন। ব্যাপারটা মোঙ্গলদের জন্য যে খুব একটা ভালো হতো না, তা বলা বাহুল্য।

মূল বাহিনীর নেতৃত্বে চেঙ্গিজ নিজেই।

তার স্কাউটরা নিশ্চিত খবর এনেছে, জালাল উদ-দীন এখন তার বাহিনী ও পরিবার পরিজন নিয়ে নদী পার হবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তীব্র স্রোত তাদের নৌকাগুলো উল্টে দিচ্ছে।

ভোরে অন্ধকারের মধ্যে খুব সাবধানে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন চেঙ্গিজ। তার এই বাহিনী জালাল উদ-দীনকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে নদীর দিকে চাপাতে চাপাতে ডুবিয়ে দেবে। যুদ্ধে যদি তুর্কিরা নাও মারা যায়, নদীতে ডুবে তারা মারা যাবে।

লড়াইয়ের ঠিক আগে, একটা বিশেষ হুকুম জারি করলেন খান।

কোনোমতেই জালাল উদ-দীনকে হত্যা করা যাবে না। তাকে জীবিত ধরে নিয়ে আসতে হবে যেকোনোভাবে। তার দিকে যে তীর ছুড়বে, তার গর্দান যাবে।[১]

এই সিংহের বাচ্চাকে খান নিজের হাতে পরখ করতে চান।

ডানে সুবুদাই, বায়ে জেলমেকে রেখে একেবারে সামনে জেবে নোইয়নকে নিযুক্ত করলেন খান। নিজে রইলেন বাহিনীর ঠিক মাঝে, তার ঠিক পেছনে আছে তলুই খান।

নদীর পাড়ে যে জায়গাটা থেকে জালাল সিন্ধু পাড়ি দেবার চেষ্টা করছিলেন। সে জায়গাটার এক দিকে ছিল উঁচু পর্বত, আরেক দিকের পর্বত অনেকটাই নিচু, পেছনে উঁচু খোলা ময়দান আর সামনে সিন্ধু।

হঠাৎ দিগন্তে দেখা গেল ধুলার ঝড়।

বাতাস কাঁপছে মোঙ্গলদের রণ হুংকারে...

হু...হু...হু...

---

১. Lane, G., 2004. Genghis Khan and Mongol Rule. Hackett Publishing.

তিন

কিছু বোঝার আগেই শূন্য থেকে উদয় হওয়া মোঙ্গলদের স্বভাব।

জালাল উদ-দীন চরম বেকায়দায় পড়ে গেলেন! তার বাহিনী এখন এমন এক জায়গায় যেখানে তিনি কোণঠাসা বেড়ালের মতো আঁচড়-কামড় দেয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না।

দ্রুত নিজের বাহিনীকে তীর থেকে বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে নিলেন তিনি।

সামনে আল্প এর খান, আমান মালিক, বায়ে তিমুর মালিককে রেখে বাহিনীর ঠিক মাঝখানে তিনি অবস্থান নিলেন। এই জায়গাটার ডান দিকে উঁচু পর্বত, এদিক দিয়ে কোনোভাবেই মোঙ্গলরা হানা দিতে পারবে না। আমান মালিক তাই নিশ্চিন্তে চেঙ্গিজ খানের বাম বাহুতে থাকা জেলমে বাহাদুরের বাহিনীর ওপর আঘাত হানতে পারবেন। পেছন দিক থেকেও ভয় নেই, লড়াই হবে সামনের দিকে। এই ময়দান বেশ সংকীর্ণ, তাই মোঙ্গলরা সংখ্যায় বেশি হয়েও একসাথে বড় রকমের হামলা করতে পারবে না।

লড়াই শুরু হয়ে গেল। আমান মালিকের বাহিনীর দশ হাজার যোদ্ধা জেলমের ত্রিশ হাজারের সাথে সমানে লড়ে যেতে থাকল। বায়ে তিমুর মালিকের আক্রমণে সুবুদাই বাহাদুর চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

সুবুদাই কয়েক দফা পিছিয়ে গিয়ে নিজের সৈনিকদের রক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতে জেবে নোইয়নের ভ্যানগার্ডরা শত্রুর মুখে উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এবার আল্প এর খানের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জালাল। প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হলো, তুর্কমানদের তীব্র গতির হামলায় চুরমার হয়ে গেল মোঙ্গলদের অগ্রভাগ। তিমুর মালিকের হামলা বায়ে আরও জোরদার হলো। দশ হাজার সওয়ার নিয়ে তিনি সুবুদাইয়ের চল্লিশ হাজারকে খেদিয়ে নিয়ে চললেন পেছনের গিরিপথের দিকে।

এবার জালাল উদ-দীন স্বয়ং চেঙ্গিজ খানের বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। ঝানু যোদ্ধার সাথে তরুণ বীরের লড়াই শুরু হলো যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে।

জালাল হুংকার দিয়ে উঠলেন 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার'!

কুড়ি হাজার তুর্কমানের আক্রমণের বিরুদ্ধে চেঙ্গিজ খানের কমান্ডে থাকা এক লাখ যোদ্ধা মিলেও টিকে থাকতে পারল না। ডান দিক থেকে তিমুর মালিক আর সামনে থেকে জালালের দুঃসাহসী হামলায় দলে দলে মোঙ্গলরা পালাতে লাগল। এমনকি চেঙ্গিজ খানের চিৎকারেও কাজ হচ্ছিল না তখন।

খানের বাছাই করা তুরগাউদ বাহিনীর দশ হাজার বাহাদুর দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে এল জালালের সামনে। এবার লড়াই আরও ভয়ানক রূপ ধারণ করল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল দুধারেই।

তুর্কমান সওয়ারদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শহিদ হয়ে গেল এবার।

কিন্তু জালাল থামলেন না। তার বাহিনীর জওয়ানদের তরবারির আঘাতে কাতারের পর কাতার মোঙ্গল বাহাদুর মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

চরম বিপদ দেখে ভয়ে পিছু হটে পাহাড়ের ওপর চলে গেলেন চেঙ্গিজ খান। তাকে ধাওয়া করে অনেকখানি সামনে এগিয়ে গেলেন জালাল উদ্দিন। ঠিক এমন সময় বোরচু বাহাদুরের ত্রিশ হাজার সওয়ার ডানে আমান মালিকের ওপর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানলেন।

বোরচুকে আগেই চেঙ্গিজ খান পাহাড়ের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আচমকা হামলা করার জন্য। আমান মালিক কল্পনাই করতে পারেননি যে, এই উঁচু পাহাড় এত কম সময়ে ডিঙিয়ে মোঙ্গলরা এখানে আঘাত হানতে পারবে।

কিছু বোঝার আগেই আমান মালিকের বুকে, কপালে, পেটে গোটা দশেক তীর বিঁধে গেল। তার সুঠাম শরীরটা ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই মুসলিম বাহিনীর পুরো ডানবাহু ভেঙে গেল। এবারে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তীরের মতো হামলে পড়লেন জেবে আর জেলমে। জালাল উদ-দীন তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেলেন শত্রুদের মাঝে।

চেঙ্গিজ খান এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তার মোঙ্গল বাহিনীকে তিনি চালিয়ে দিলেন জালাল উদ-দীনের কুড়ি হাজার যোদ্ধার ওপর দিয়ে।

তিমুর মালিক ছিটকে গেলেন মূল বাহিনী থেকে।

সুলতানকে রক্ষা করতে গিয়ে মাত্র তিন হাজার সওয়ার নিয়ে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন আল্প এর খান, কিন্তু তিনি আধঘণ্টাও টিকলেন না।

মোঙ্গলদের ঘেরাওয়ে পড়ে গেলেন সুলতান জালাল উদ-দীন।

দেড় লাখ মোঙ্গলের মাঝে পড়ে পাইকারিভাবে শহিদ হয়ে যেতে থাকল তুর্কমান যোদ্ধারা। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা সমানে সমান লড়ছিল, ঠিক তাদের সুলতানের মতোই।

জালাল বুঝলেন, এখানে টিকে থাকা অসম্ভব।

নিজের বর্ম খুলে ফেললেন তিনি! তারপর বেপরোয়া ষাঁড়ের মতো ভীমবেগে তলোয়ার চালাতে থাকলেন। সেদিন তার সামনে যে পড়েছিল সে আর বাঁচেনি।

ঘেরাওয়ের একটা অংশ লাশের স্তূপে পরিণত করে জালাল যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তার সাথে ছিল মাত্র সাতাশজন তুর্কমান যোদ্ধা।

পেছনে মোঙ্গল বাহিনী, সামনে সিন্ধু নদ। সাথে মা, আর দুই স্ত্রী, তিন ছেলে।

সেনাবাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

জালাল উদ-দীন এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন।

তার মা আই জিজেক তখনো সুন্দরী, দুই স্ত্রী তো বটেই। তিনি ঠিক করলেন, মোঙ্গলদের হাতে ছেড়ে দিলে এদের বেঁচে থাকা হবে মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাময়। কয়েকজন সৈনিককে ডেকে সুলতান তাদের বললেন নিজের মা ও স্ত্রীদের দুই ছেলেসহ বস্তায় বেঁধে নদীতে ফেলে দিতে।[২]

হুকুম পালন করা হলো।

মোঙ্গলরা একেবারে নাকের ডগায় চলে এসেছিল, তাদের ওপর আবার হামলে পড়লেন সুলতান জালাল উদ-দীন। তিনি আর তার সাতাশ তুর্কমান মিলে আরও প্রায় হাজার খানেক মোঙ্গলের লাশ ফেলে তারপর নদীর দিকে ফিরলেন।

একে একে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল যোদ্ধারা, কেউ বাঁচল, কেউ ভেসে গেল।

সবার শেষে পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে নিজের তুর্কি ঘোড়া নিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়লেন সুলতান। নদীর ওপারে উঠে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে চেঙ্গিজ খানকে তলোয়ার দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি আবার যুদ্ধ করবেন।

সেদিন সন্ধ্যায়, চেঙ্গিজ খান সিন্ধুর তীরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চীনের জিন সাম্রাজ্যের দশ লাখ যোদ্ধা তার যে ক্ষতি করেনি, একুশ বাইশ বছরের এই ছোকরা পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে তার কয়েকগুণ ক্ষতি করে গেল। আর অল্প একটু হলে খানের জীবনটাই গিয়েছিল এর হাতে।

বিস্মিত হয়ে উচ্চারণ করলেন চেঙ্গিজ খান-'ধন্য সেই মা, যে এমন ছেলে পেটে ধরেছে। বাপের তো চাই এমনই এক ব্যাটা!

আহ, আমার যদি এমন একটা ছেলে থাকত!'[৩]

---

২ Dajani-Shakeel, H. and Messier, R.A., 2011. The Jihad and its Times.

৩. Craughwell, T.J., 2010. The Rise and Fall of the Second Largest Empire in History: How Genghis Khan's Mongols Almost Conquered the World. Fair Winds Press

কেউ অমর নয়

এক

মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম পুরুষটিও ভালোবেসেছিলেন। তাকে শাসন করার অধিকার শুধু দুজন নারীরই ছিল। প্রথমজন তার মা হোয়েলুন, দ্বিতীয়জন বোর্তি।

একমাত্র বোর্তিরই ছিল দুই খানের সামনে সোজাসাপ্টা যেকোনো কথা বলে ফেলার মতো সাহস। তাই মধ্য এশিয়া অভিযানের আগে তিনি খানকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, খানের এখন বয়স হয়েছে, তার উচিত নিজের উত্তরাধিকারী ঠিক করে দেয়া। নয়তো তার মৃত্যুর পর ব্যাপারটা নিয়ে ভয়াবহ রক্তপাতের সূচনা হতে পারে।[১]

খান কথা দিয়েছিলেন অভিযান থেকে ফিরে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করবেন। বোর্তিকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে, কেবল বোর্তির সন্তানদেরই নিজের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। বোর্তির চার ছেলে– জোচি খান, চাঘাতাই খান, ওগেদেই খান আর তলুই খানকে ১২২৩ সালের বসন্তে এক বিশাল কুরুলতাই ডেকে খান নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই চারজনের ভেতর খাকান কে হবেন, তা নিয়ে বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল বিরোধ।

বড় ছেলে জোচি খান নিঃসন্দেহে ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য। দেখতে বাবার মতোই লম্বা চওড়া, ভারী আর মজবুত দেহ, দুরন্ত ঘোড়সওয়ার, নিখুঁত তীরন্দাজ, যোদ্ধা হিসেবে ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও ছিল দেখার মতো! শাসক হিসেবে তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিন্তু এটাই তার বাবার ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জোচির এতসব গুণের ভেতর একিলিস হিল হয়ে ছিল এক দুর্বলতা, যা নিয়ে সারা জীবন তাকে মোঙ্গলদের খোঁটা শুনতে হয়েছে।

তার মা বোর্তিকে একবার মেরকিত গোত্রের লোকেরা অপহরণ করে! আট মাস পর চেঙ্গিজ খান যখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, বোর্তি তখন সন্তান সম্ভবা।

---

১. Forbes Manz, B., 2000. Mongol History rewritten and relived. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, (89-90), pp.129-149.

মাসখানেকের মধ্যেই জন্ম হয় জোচির। তাই তার বাবা আসলেই চেঙ্গিজ খান কিনা, এ নিয়ে মোঙ্গলদের ভেতর তখন তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়।[২]

জোচির পিতৃ পরিচয় নিয়ে চেঙ্গিজ খানের মনেও তখন সন্দেহ ছিল। কিন্তু যদি তিনি জোচিকে অস্বীকার করতেন, তবে মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী বোর্তিকেও অস্বীকার করতে হতো। আর খানের জন্য তা ছিল অসম্ভব।

তিনি বোর্তিকে শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন জোচি তার সন্তান কিনা! এরপর আর কখনোই জোচিকে তিনি অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। জোচি বড় হয়েছে খানের বড় ছেলের উপযুক্ত সম্মান নিয়েই।

কিন্তু তার পিতৃ পরিচয় নিয়ে একটা কানাঘুষা সব সময়েই ছিল। আর এটাকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগান তারই ছোট ভাই চাঘাতাই।

চাঘাতাই ছিলেন রগচটা, মদ্যপ কিন্তু শক্তিশালী যোদ্ধা। রাজনৈতিক জ্ঞানের দিক থেকে তিনি জোচির চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি শতভাগ কাজে লাগিয়েছিলেন জোচির দুর্বলতাকে। কুরুলতাইয়ের আগে তিনি সফলভাবে মোঙ্গলদের ভেতর জোচির পিতৃ পরিচয় নিয়ে উঠা গুজবটাকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন, যা চেঙ্গিজ খানের কপালেও দুশ্চিন্তার ছাপ ফেলে দেয়।

খান ভালো করেই জানতেন মেজ ছেলে চাঘাতাইয়ের ক্ষমতা কত দূর। তার রাজনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে জোচির বিরোধিতা করার ক্ষমতাই বেশি।

কিন্তু খানের জোচির ওপর আস্থা ছিল না।

জোচি ছিলেন প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা, নিজের যা ঠিক মনে হতো তাই করতেন। অনেক সময়েই তিনি খানের আদেশ মানতেন না। তার বিপুল জনপ্রিয়তা এবং সর্বোপরি বোর্তির কারণে খান জোচিকে কিছুই বলেননি। এমনকি জোচির বিরুদ্ধে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগের পরেও।

কিন্তু তিনি জোচিকে কৌশলে সরিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে। তাকে দেয়া হয়েছিল বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উত্তর পশ্চিমে থাকা কিপচাক স্তেপের শাসনভার।[৩] সেখান থেকে রাজধানী কারাকোরামে ফিরতে সময় লাগে প্রায় এক বছর।

খান নিজের বিচারবুদ্ধিকে ব্যবহার করলেন আবার, যার ওপর চিরকাল তিনি ভরসা রেখেছেন, যা তাকে প্রতি যুদ্ধের আগে শত্রুর উদ্দেশ্য নির্ভুলভাবে অনুমান করে নিতে সাহায্য করেছে।

জোচি অবাধ্য, শক্তিশালী যোদ্ধা ও নেতা, কিন্তু তাকে খাকান করলে চাঘাতাই মানবে না। মোঙ্গলদের ভেতর তার পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ আছে, চাঘাতাই এটা কাজে লাগাবে।

মোঙ্গল সাম্রাজ্য দুই টুকরো হবে, জোচি চাঘাতাইকে হত্যা করবে। কিন্তু যুদ্ধ হবে বছরের পর বছর ধরে, মোঙ্গলদের এই শক্তি আর থাকবে না।

---

২. প্রাগুক্ত(১)

৩. Mirgaleev, I.N.M., 2013. The Golden Horde Policies toward the Ilkhanate. Золотоордынское обозрение, (2), pp.217-227.

চাঘাতাই রগচটা, রাজনীতিতে পাকা নয়, প্রায়ই ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেয়ে বড় কথা, সে জোচিকে মোকাবেলা করতে পারবে না। বড় ভাইদের এই দ্বন্দ্বে ভাগ্য খুলে গেল তৃতীয় সন্তান ওগেদেই খানের।

তিনি যোদ্ধা হিসেবে জোচি বা তলুইয়ের মতো দুর্ধর্ষ ছিলেন না। বরং বলা চলে চার ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে তিনিই ছিলেন কিছুটা দুর্বল। কিন্তু তার খুলির নিচে ছিল এক সচল মগজ। তিনি ছিলেন পিতার অনুগত সন্তান, ঠান্ডা মাথার শিকারি।

সাইবেরিয়ান বাঘের মতো নিখুঁত পরিকল্পনা সাজাতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। জোচি আর চাঘাতাইয়ের ঝগড়ায় উরগঞ্জ দখল যখন পণ্ড হচ্ছিল, তখন ওগেদেইয়ের নেতৃত্বেই মোঙ্গলরা বিজয় ছিনিয়ে আনে।

মদের নেশা ওগেদেইয়েরও ছিল, কিন্তু সেটা তাকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারত না। তার খরচের হাত ছিল লম্বা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ করে বেড়ানোতেই তার আগ্রহ ছিল বেশি। কিন্তু রাজনৈতিক বা সামরিক সিদ্ধান্ত নিতে তিনি খুব কমই ভুল করতেন।

চেঙ্গিজ খান তাই ওগেদেইকেই পরবর্তী খাকান হিসাবে ঘোষণা করলেন।

মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী বড় ছেলে বাবার জমির সবচেয়ে বড় অংশটা পাবে। তারপর মেজ ছেলে, তারপর সেজ ও সবশেষে ছোট ছেলে পাবে কেবল বাবার উনুন ও ঘরের দখল, সাথে বাবার পশুপালের মালিকও হবে সে।[৪]
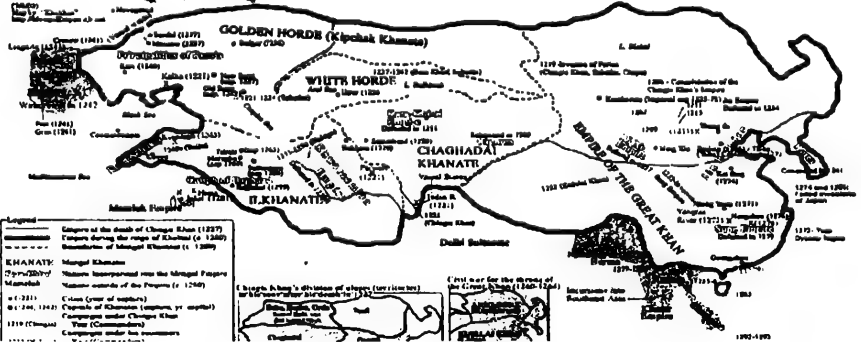
মোঙ্গল সাম্রাজ্য চার ভাগ করে চেঙ্গিজ খান নিজের বড় সন্তান জোচি খানকে দেন পশ্চিমের কিপচাক খানাত, মেজ চাঘাতাইকে দেন মধ্য এশিয়া ও খোরাসানের চাঘাতাই খানাত, মঙ্গোলিয়ান মূলভূমি পায় ছোট ছেলে তলুই খান আর চীনের বিশাল অংশসহ সাম্রাজ্যের খান-ই খানান হন ওগেদেই খান।

৪ Fletcher, J., 1986. The Mongols: ecological and social perspectives. Harvard Journal of Asiatic Studies, 46(1), pp.11-50.

এই হিসেব অনুযায়ী জোচি খানকে দেয়া হলো পশ্চিমে কাজাখস্তান, মধ্য ও পশ্চিম সাইবেরিয়াসহ ইউরেশিয়ান স্তেপের প্রায় পুরো পশ্চিম অংশ।

চাঘাতাইকে করা হলো তুর্কিস্তানের খান-ই খানান। তিয়েনশান থেকে কাস্পিয়ান পর্যন্ত, দক্ষিণে ইরান পর্যন্ত হলো তার খানাত। ওগেদেইকে করা হলো চীনের খান, সেই সাথে পুরো মোঙ্গল সাম্রাজ্যই তার অধীনে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হলো। তার আদেশ তার ভাইদের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে বলে চেঙ্গিজ খান আইন জারি করলেন।

ছোট ছেলে তলুইকে দেয়া হলো মূল মোঙ্গলভূমি ও মাঞ্চুরিয়া(কোরিয়া), পিতার উনুন ও বসতভিটা।

যেহেতু বাবার পশুপালের মালিক হয় ছোট ছেলে। অতএব, খাঁটি মোঙ্গল যোদ্ধাদের একত্রিত করে সেখান থেকে এক লাখ এক হাজার যোদ্ধা দেয়া হলো তলুইকে। বাকি ভাইদের সবাই পেল চার হাজার করে যোদ্ধা।[৫] এরা মোঙ্গল বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশ। কিন্তু মোঙ্গল সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশ ছিল উইঘুর, কারা খিতাই আর কিরগিজরা।

তাদের খাকান ওগেদেইয়ের অধীনে দেয়া হলো।

কুরুলতাইয়ে চেঙ্গিজ খান ডেকে পাঠিয়েছিলেন জোচিকে। জোচি আদেশ অমান্য করে রয়ে গেলেন কিপচাক স্তেপে। চাঘাতাই এই সুযোগে রটিয়ে দিলেন, জোচি প্রকাশ্যে চেঙ্গিজ খানকে বুড়ো শয়তান বলে ডাকে। সে বলে খানের নাকি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, নয়তো তিনি এভাবে মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালাতেন না।

চেঙ্গিজ খান কাউকে কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। তারপর এক সুযোগে পাঠিয়ে দিলেন ছোট ভাই উৎচিগিনকে।

দুই বছর পর রাশান স্তেপে শিকার করার সময় একবার নিজের বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গেলেন জোচি খান। তার ঘোড়ার কপালে এসে বিঁধল একটা তীর।

জোচি ঘোড়া থেকে নামতেই কুড়িজন যোদ্ধা ছুটে এল চারদিক থেকে। তারপর তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে একটা চাপ দিয়ে মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেয়া হলো।

কাজটা চেঙ্গিজ খানেরই ছিল, কোনো সন্দেহ নেই।[৬]

মোঙ্গল প্রথা অনুযায়ী, অভিজাত সন্তানের রক্ত মাটিতে পড়তে দিতে নেই।

খান তাই নিজের সন্তানের রক্ত মাটিতে পড়তে দেননি।

---

৫. প্রাগুক্ত(৪)

৬. Khan, A. and Khan, K., 1996. Who are the Mongols. State, Ethnicity and the Politics of Representation in the PRC.Ó Negotiating Ethnicities in China and Taiwan. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California. pp.125-59.

দুই

১২২৬ সাল নাগাদ চেঙ্গিজ খান মোঙ্গল সাম্রাজ্যকে ভাগ করে দিয়েছিলেন তার সন্তানদের ভেতর। তিনি বুঝতে পারছিলেন, মৃত্যু তার দিকে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সেই চিন্তা তার শিকারের অভ্যাসে কোনো পরিবর্তন আনতে পারল না।

শীতে বনের ভেতর বুনো শুয়োর শিকার করতে গিয়ে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল, যা আদৌ সম্ভব বলে কেউ ভাবতে পারেনি।

চেঙ্গিজ খান ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। এক দাঁতাল বুনো শুয়োর যেটাকে তিনি তাড়া করছিলেন, সেটা তার সামনে এসে একা পেয়েও তাকে দাঁত দিয়ে খুঁচিয়ে ছিন্নভিন্ন না করে মাথা নেড়ে চলে গেল।

চেঙ্গিজ এই ঘটনাকে ধরে নিলেন ঈশ্বরের সংকেত হিসেবে। তিনি ভাবলেন, মৃত্যুর আগে ঈশ্বর তাকে নিজের শেষ শত্রু, জি জিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট বুরখানকে হত্যা করার একটা সুযোগ দিয়েছেন।

চেঙ্গিজ বুকের খাঁচার ব্যথার কথা কাউকে না বলে চুপচাপ নিজের সোনালি তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন।

রাতে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে গেল।

সকালে কাছে থাকা দুই ছেলে ওগেদেই আর তলুইকে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন– মহান তেংরি আমার প্রত্যাশিত শেষ অভিযানের ইশারা দিয়েছেন। তার ইচ্ছায় আমি তোমাদের জন্য জয় করেছি এক মহাসাম্রাজ্য, যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে সময় লাগে এক বছর। আমি যা যা বলছি, এখন খেয়াল করে শোনো। আমার পর তোমরা নিজেরা নিজেরা কলহ করে আমার এই সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবে না। বন্ধুদের কদর করবে, শত্রুদের ধ্বংস করবে। আমার মৃত্যুর পর আমার আইন ইয়াসা লঙ্ঘন করা বা বিকৃত করার দুঃসাহস যেন কারও না হয়। সবাই শান্তিতে ঘরে মরতে চায়, কিন্তু আমি চাই যুদ্ধের ময়দানে আমার মৃত্যু হোক। লড়াইয়ের জন্য তোমরা তৈরি হও।

দুই লাখ যোদ্ধার বাহিনী দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে গেল। মঙ্গোলিয়া থেকে তারা বেরিয়ে পড়ল জি জিয়া সাম্রাজ্য জয় করতে। এক দিন এই সাম্রাজ্যের সম্রাট মোঙ্গলদের দাস জ্ঞান করত, শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা মোঙ্গলদের সাথে যা ইচ্ছে তাই করেছে। কিন্তু সময় এখন মোঙ্গলদের।

চেঙ্গিজ খান সিদ্ধান্ত নিলেন, জি জিয়া সাম্রাজ্যের নাম নিশানা তিনি দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেবেন। প্রথমে তিনি অবরোধ করলেন কারাখোতি নামের এক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর। কিছুদিনের মধ্যে কারাখোতি জয় করার পর খান এগিয়ে চললেন। একের পর চীনা শহর তার বাহিনীর সামনে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে থাকল।

এই অভিযান ছিল নিষ্ঠুরতায় খোরাসান অভিযানের সমকক্ষ। মোঙ্গলরা তাদের চলার পথে যা পাচ্ছিল, মানুষ, পশু এমনকি গাছ, সব জ্বালিয়ে দিচ্ছিল।

দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব শহর ধ্বংস করে চেঙ্গিজ নজর দিলেন জি জিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানীর ওপর। এখানে তাদের সেনাবাহিনী প্রায় সাড়ে তিন লাখ সৈন্য নিয়ে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

মোঙ্গল ঘোড়সওয়াররা আরও একবার অপরাজেয় বলে প্রমাণিত হলো। সাড়ে তিন লাখ চীনা সৈনিকের তিন লাখই হোয়াংহো নদীর যুদ্ধে নিহত হলো।[৭]

চেঙ্গিজ খান এই যুদ্ধের পর লড়াইয়ের দায়িত্ব সুবুদাইকে দিয়ে নিজে তাঁবুতে ফিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন জিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানীর পতন ঘটে।

তলুইকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, সম্রাটের লোকেরা সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে এলে তাদের বলবে শহরের বাইরে যেন পুরো সেনাবাহিনী নিরস্ত্র হয়ে আত্মসমর্পণ করে। তারপর তাদের সবাইকে হত্যা করবে।

তিন

খানের বুকের ভেতর একটা ইঁদুর অনবরত কিচ কিচ আওয়াজ করে যাচ্ছে। শ্বাস নিলেই ইঁদুরটা আওয়াজ করে, শ্বাস থামালে ইঁদুরও থেমে যায়।

কালো কম্বল গায়ে দিয়ে খান ভাবছিলেন, শেষ সাগর পর্যন্ত বিজয় অভিযান আর করা হলো না। দুনিয়ার অর্ধেকটা জয় করা তখনো বাকি।

পাশে থাকা প্রিয়তমা বোর্তির হাত ধরে তিনি বলতে লাগলেন– আমি যখন মোঙ্গল স্তেপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব যাযাবরদের একত্র করছিলাম, তখনো আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। ঘোড়ার জিন টানটান হয়ে গিয়েছিল, বেঁকে গিয়েছিল লোহার রেকাব। কিন্তু এত কষ্ট আমার আর কখনো হয়নি। আসলে মৃত্যুকে ঠেকানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

প্রধান অমাত্য ইয়েলিউ চুত সাই দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশে। তাকে খান জিজ্ঞেস করলেন, বল তো, আমি আমার সারা জীবনে ভালো কী করেছি? আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজ কী?

ইয়েলিউ চুত সাই অনেকক্ষণ ভাবার পর উত্তর দিলেন, ইয়াসা। এই ইয়াসা যদি আপনার বংশধররা মেনে চলে তবে তারা দশ হাজার বছর এই পৃথিবী শাসন করবে।

খান বললেন, হ্যাঁ, কেবল তখনই আসবে কবরের শান্তি...সারা দুনিয়া জুড়ে দাবড়ে বেড়াবে মোঙ্গলদের ঘোড়া।

---

৭. Tucker, Spencer C., ed. (2010). A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East: From the Ancient World to the Modern Middle East. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. p. 276 ISBN 1851096728.

আচ্ছা, আমার ছেলে জোচিকে কি হত্যা করা হয়েছে? উত্তরের রাজ্য এখন কে শাসন করছে?

তাকে বলা হলো, জোচি খান এখন মৃত। তার বদলে সিংহাসনে বসেছেন তার বড় ছেলে, আপনার প্রিয় নাতি বাটু খান।

খান হাঁপাতে হাঁপাতে, জড়িয়ে আসা গলায় বললেন– তরুণ হবার মজা আছে, এমনকি গলায় বেড়ি নিয়ে হলেও। চারদিক থেকে তখন বিজয়ের আলো ঝলকায়। তোমরা শুনে রাখো, আমার মৃত্যুর পর বাটুকে দেখাশোনা করবে আমার বিশ্বস্ততম অনুচর, ঠ্যাঙে কামড় খাওয়া তুষার চিতা সুবুদাই। ও এখনো অনেক ছোট, ভুল করবে, সুবুদাই পাশে থেকে ওকে শুধরে দেবে, যুদ্ধ করতে শেখাবে। সুবুদাই মোঙ্গলদের বিজয়রথ আমার নাতিকে নিয়ে পৌঁছে দেবে জগতের শেষ প্রান্তে, শেষ সাগরের তীর পর্যন্ত। মনে রেখো, 'মানবজাতির পথ একটাই, যুদ্ধ'।

খানের কণ্ঠ থমকে গেল। তার বাম চোখটা স্থির হয়ে গেল, শুধু ডান চোখে দেখা গেল জীবনের স্পন্দন।

কিছুক্ষণ পর ডান চোখটাও স্থির হয়ে গেল।*

চার

খানের মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ গোপন রাখা হলো।

তার জন্য কালো কাঠের একটা কফিন বহু আগেই তৈরি করা ছিল। সেটায় খানের সাথে দেয়া হলো তার তলোয়ার, তীর, ধনুক, বর্শা, মোঙ্গল স্তেপের ঐতিহ্যবাহী ছুঁচালো টুপি, আর নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস। বারোটি ষাঁড় দিয়ে টানা বিশাল এক গাড়িতে তোলা হলো সেই কফিন।

কফিন টেনে নিয়ে মঙ্গোলিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকল তার পরিবার আর দেহরক্ষীদের একটা দল। মৃত্যুর খবর গোপন রাখতে এই শবযাত্রার সামনে যেই পড়ল, তাকে হত্যা করা হলো।

মঙ্গোলিয়াতে কাফেলা পৌঁছানোর পর জেবে নোইয়ন বললেন, বহুকাল আগে এক দিন শিকার করতে এসে খান পবিত্র পর্বত বুরখান খালদুনের গহীনে একটা প্রাচীন বিশাল দেবদারু গাছের নিচে তাকে কবর দিতে বলেছিলেন।

খানকে জেবে নোইয়নের দেখানো জায়গায় কবর দেয়া হলো।

ধারণা করা হয়, তার কবরে ঢেলে দেয়া হয়েছিল বিপুল সম্পদ। অন্তত চল্লিশজন সুন্দরীকে হত্যা করে কবর দেয়া হয়েছিল পরকালে তার সেবার জন্য। তার সাথে কবর দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন দেশ জয় করে আনা ৭৮ জন রাজার মুকুট।

---

* চেঙ্গিজ খান, ভাসিলি ইয়ান, অনুবাদ : অরুণ সোম, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অবলম্বনে এই অধ্যায়টি লেখা।

কবর খোড়ার কাজে ব্যবহার করা আড়াই হাজার শ্রমিকের সবাইকে কাজের শেষে হত্যা করা হলো। তারপর একশ ঘোড়া চালিয়ে দেয়া হলো কবরের ওপর, যেন কোনো চিহ্ন সেখানে না থাকে।

চারিদিকে প্রচুর গাছ লাগিয়ে দেয়া হলো।

তারপর একে একে আত্মহত্যা করল সেখানে উপস্থিত থাকা সৈন্যরা, যেন খানের কবর কোথায় তা কেউ জানতে না পারে। তারপর পুরো এলাকাটা মোঙ্গল অভিশাপ দিয়ে মন্ত্রপূত করা হলো।

চেঙ্গিজ খানের নির্দেশ অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল জিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী, হত্যা করা হয়েছিল সেখানকার সব মানুষকে।[৮]

মৃত্যুর পরেও লাখ লাখ মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন স্বঘোষিত ঈশ্বরের অভিশাপ, মৃত্যুর সম্রাট চেঙ্গিজ খান।
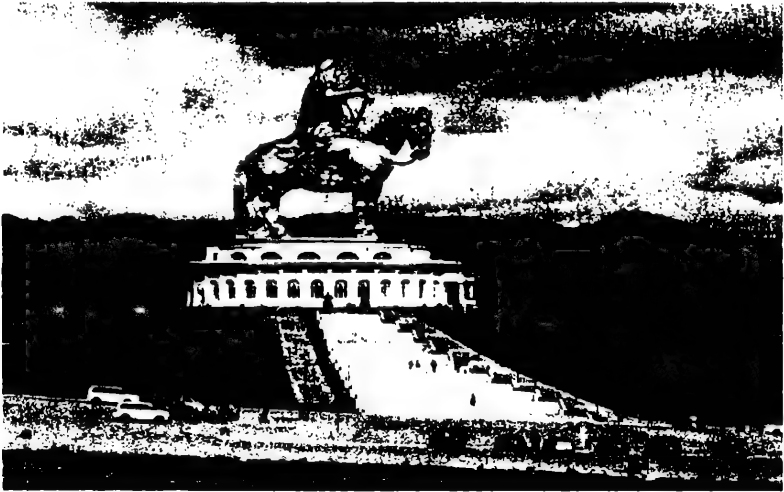
মোঙ্গল অভিশাপে বেঁধে দেয়া তার সমাধি খোঁজার চেষ্টা চলছে আজ আট শ বছর ধরে। কেউ তা বের করতে পারেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়ংকরতম হত্যাকারীর সমাধি নিরাপদেই লুকিয়ে আছে বুরখান খালদুনের গভীরে।

যেখানে একদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন।

---

[৮]. Mote, Frederick W. (1999). Imperial China: 900-1800. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 256. ISBN 0674012127.

ফেরারি

এক

চেঙ্গিজ ১২২৪ সাল নাগাদ মধ্য এশিয়া ছেড়ে ফিরে যান মঙ্গোলিয়ায়। মধ্য এশিয়ার সাবেক খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য হয় তার মেজ ছেলে চাঘাতাইয়ের অধীন।

সুলতান জালাল উদ-দীনকে মানুষ খুব ভালোবাসত। সাহসী এই তরুণ যেখানেই গেছেন, সেখানেই পেয়েছেন মানুষের ভালোবাসা। তিনি ছিলেন এক বীর সেনাপতি। তাই তার সেনাদলে যোগ দিতে মোঙ্গলদের হুমকি উপেক্ষা করে ছুটে আসত তরুণেরা।

১২২৬ সাল নাগাদ লড়াইয়ের উপযোগী একটা বাহিনী দাঁড় করিয়ে মোঙ্গলদের হাত থেকে কিরমান ও সিস্তান কেড়ে নেন জালাল।

এরপর তার নজর পড়ে ফারস প্রদেশের ওপর। এখানে পুরো বসন্ত ঘুরে ঘুরে জনগণকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন তিনি। ইসফাহানে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ক্যাম্প ফেলে শক্তিবৃদ্ধি করেন জালাল। এরপর পশ্চিম ইরানে গিয়ে তাবরিজ আর কাজভিনে গড়ে তোলেন আরও দুটি প্রতিরোধ ঘাঁটি।

চেঙ্গিজ খান যখন চীনের মহাপ্রাচীরের ধারে জি জিয়া সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে জালাল উদ-দীন সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের সাথে জোট তৈরি করেন। আলাউদ্দিন বুঝতে পেরেছিলেন, এই যুবক মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ইসলামি জাহানের ঢালের মতো। ইরানের পরেই ইরাক, সিরিয়া আর আনাতোলিয়ার পালা, মোঙ্গলদের ঠেকাতে না পারলে কেউই বাঁচবে না।

সুলতান জালাল বারবার চিঠি পাঠাচ্ছিলেন বাগদাদের খলিফা নাসিরের কাছে। কিন্তু জালালের কথা শোনার মতো সময় তার ছিল না।

যখন শক্তি ছিল, তখন খারেজমিয়ারা তার হাড় জ্বালাতন করেছে। তুষার ঝড়ে না পড়লে ১২১৭ সালের জাগ্রোস অভিযানে হয়তো জালালের বাবা আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ

তখন বাগদাদ জয় করে নিতেন। খলিফা আন নাসির ভাবলেন, এই ছোকড়াকে সৈন্য ধার দেয়া আর খাল কেটে কুমির আনার মধ্যে আসলে কোনো তফাত নেই; বরং সে নিজের বাবার চেয়েও মারাত্মক।

একই রকম জবাব এল সিরিয়ার আইয়ুবি সুলতান আল আশরাফের কাছ থেকে।

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর চাঘাতাই খান জালাল উদ-দীনকে দমনের জন্য শক্তিশালী একটি বাহিনী পাঠালেন। কিন্তু জালাল উদ-দীন তাদের পরাজিত করে ইরান ছাড়া করলেন।

যুদ্ধের ময়দানের দুরন্ত নায়ক ভূ-রাজনীতির ময়দানে ছিলেন কাঁচা খেলোয়াড়। মোঙ্গলদের মোকাবেলায় নিজের শক্তিকে রিজার্ভ রাখার বদলে তিনি এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন জর্জিয়ার ওপর।

ব্যাটল অফ গ্রাভিতে তিনি জর্জিয়ানদের পরাজিত করে জর্জিয়া জয় করে নেন। জয়ের পর রাজধানী তিবলিসিতে ঢুকে চালান এক গণহত্যা। কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়, জ্বালিয়ে দেয়া হয় পুরো শহর, ভেঙে ফেলা হয় অনেক গির্জা।[১] এই জয় তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তিনি আরও পশ্চিমে এগিয়ে পূর্ব আনাতোলিয়ার আরজিনজানের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক শহর আখলাট জয় করে নেন, যেটা ছিল তুর্কিদের জন্য একটি পবিত্র শহর।[২] তার এই আক্রমণ বদলে দেয় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির হিসাব নিকাশ।

আল আশরাফ দেখলেন, আখলাট জালালের কাছে থাকা মানে সেলজুকদের সাথে জালালের সংঘর্ষ লাগার সম্ভাবনা এক শতে এক শ।

এরই মধ্যে জালাল আবার হামলা চালালেন খলিফার এলাকা খুজেস্তানে। এবার খলিফা নিজে কূটনীতিতে নামলেন। আন নাসির আর আল আশরাফ মিলে সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, জালাল উদ-দীনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য আনাতোলিয়া ও ইরাক।

আলাউদ্দিনও তাই সন্দেহ করছিলেন। কারণ, দিনে দিনে জালাল উদ-দীনের গতি ক্রমেই পশ্চিমে আগাচ্ছিল।

আইয়ুবি আর সেলজুকদের মধ্যে জোট ঠিকই গঠিত হলো, তবে তা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে নয়, খাওয়ারেজমিদের বিরুদ্ধে।

আখলাট ছেড়ে দেয়ার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন সুলতান জালাল উদ-দীনকে চিঠি লিখলেন। জালাল উদ-দীন রাজি হলেন না।

রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল।

---

১. Peacock, A.C., 2006. Georgia and the Anatolian Turks in the 12th and 13th centuries. Anatolian Studies, 56, pp.127-146

২. KoUzmijan, D., 2000. Van under Mongol, Turkmen, Persian and Ottoman domination. Armenian Van/Vaspurakan, UCLA Armenian history and culture series, historic armenian cities and provinces, 1, pp.117-131.

আইয়ুবি-সেলজুক জোট সিদ্ধান্ত নিল, জালাল উদ-দীনের কাছ থেকে আখলাট এবং পূর্ব আনাতোলিয়া কেড়ে নিয়ে তাকে ইরানে হটিয়ে দেয়া হবে। সেখানে যদি সে মোঙ্গলদের সাথে লড়ে টিকে থাকতে পারে তো থাকবে, নয়তো তাকে মরতে হবে।

ঘাড়ের ওপর যখন মোঙ্গলরা বসে আছে, এমনই সময় ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে নামলেন সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ আর আল আশরাফ। তাদের সাথে ইয়াসিজামানের যুদ্ধে জালাল উদ-দীনের প্রায় পুরো বাহিনীই ধ্বংস হয়ে গেল। সেই সাথে দারুণ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেন আলাউদ্দিন আর আশরাফও।

দুই

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর সিংহাসনে ওগেদেই খানের অভিষেক হতে প্রায় দুই বছর লেগে যায়।

১২২৯ সাল নাগাদ ক্ষমতায় বসেই ওগেদেই খবর পান, জালাল উদ-দীন আবার খাওয়ারিজমি সাম্রাজ্যকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। কোনো প্রকার দেরি না করে তিনি 'তরবেই' নামের এক নোইয়ানকে পাঠিয়ে দেন জালাল উদ-দীনকে আক্রমণ করার জন্য। ১২৩০ সালের শেষদিক নাগাদ তরবেই খোরাসানে পৌছান। সেখান থেকে তিনি ইরানে প্রবেশ করেন।

জালাল তখন বিষণ্ন, চরমভাবে অবসাদগ্রস্ত। সেলজুকদের সাথে লড়াইয়ে তার গোটা বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার সৈন্যও তার হাতে নেই।

তরবেইকে মোকাবেলা করার জন্য তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইরানের উত্তরে এগিয়ে যেতে হলো। তরবেই তার বিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে আলবুর্জ পর্বতের এক উপত্যকায় শিবির ফেলেছিলেন। জালাল উদ-দীনের এক গোয়েন্দা ভুল সংবাদ দিয়ে তরবেইকে এক গিরিখাদের পাশে নিয়ে আসে।

মাত্র চার হাজার তীরন্দাজ নিয়ে বরফের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন জালাল উদ-দীন। তিনি তরবেইয়ের বাহিনীর উপর আহত এক তুষার চিতার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পাঁচগুণ বেশি সৈন্য নিয়েও তরবেই পালাতে বাধ্য হলেন।

এই সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ ওগেদেই এবার গোটা মধ্যপ্রাচ্য অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। এবার তিনি চোরমাকান নোইয়ানকে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী দিয়ে পাঠান।[৩]

---

[৩] Smith Jr. J.M., 2012. Hülegü moves west: high living and heartbreak on the road to Baghdad. Beyond the legacy of Genghis Khan, 64, p.111.

খবর পেয়ে জালাল উদ-দীন খলিফার কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। সাহায্যের আবেদন গেল সুলতান আলাউদ্দিন আর আল আশরাফের কাছে।

মরিয়া জালাল উদ-দীনের চিঠিতে লেখা ছিল–

> 'Please lend me some soldiers, so that I can fight and resist the army of Ogedei. I am the last shield of Islam against those barbar mongols. If I am removed, their sword will be drawn over the rest of Muslim ummah.'[৪]

অতীতের তিক্ততার কারণে কেউই তাকে একজন সৈন্যও দিলেন না।

১২৩১ সালের গ্রীষ্মে চোরমাকান প্রথম কিরমান দখল করে নেন। এরপর তিনি এগিয়ে যান ইসফাহানের দিকে। তীব্র প্রতিরোধ গড়েও ইসফাহানের অধিবাসীরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। জালাল উদ-দীন ফারস থেকে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন জেনে মোঙ্গলরা ফারসে হামলা চালায়।

উপায়ান্তর না পেয়ে তিনি তাবরিজের দিকে পালিয়ে যান। তখন তার সাথে ছিল মাত্র হাজার পাঁচেক যোদ্ধা।

তাবরিজের কাছে মোঙ্গলদের সাথে আবার মুখোমুখি যুদ্ধে নেমে পড়েন জালাল উদ-দীন। তার পুরো বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায় এবার। কিন্তু মোঙ্গলদের এত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যে, তারা যুদ্ধে জেতার পরেও আর সামনে আগাতে সাহস করেনি।

চোরমাকান ওগেদেইয়ের দেয়া নতুন বাহিনী নিয়ে আবার ধাওয়া করেন জালাল উদ-দীনকে। সেই সাথে তাকে হত্যা করার জন্য ইসমাইলি হাশাশিন বাহিনীর আততায়ীদেরও ভাড়া করা হয়।

১২৩১ সালের শীতে আজারবাইজানের একটি গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন জালাল উদ-দীন, সাথে পঞ্চাশ জনের মতো সঙ্গী। মোঙ্গলরা ঝটিকা হামলা চালায় সেই গ্রামে। কিন্তু তিনি আবার তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান।

এরপর মোঙ্গলদের ভুল তথ্য দিয়ে আবার তিনি বিভ্রান্ত করে চলে আসেন কুর্দিস্তানে।

শেষ দিকে এসে তিনি জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সারা দিন পড়ে থাকতেন মদ, সংগীত আর নর্তকী নিয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ত্রয়োদশ শতকের পৃথিবী তার মতো জালাল উদ-দীনের চেয়ে বাগদাদের আন নাসিরের মতো লোকের জন্যই বেশি উপযুক্ত।

---

[৪]. Smith Jr. J.M., 2012. Hülegü moves west: high living and heartbreak on the road to Baghdad. Beyond the legacy of Genghis Khan, 64, p.111.

কুর্দিস্তান থেকে তিনি ফের তাবরিজের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ, তাবরিজে তার প্রচুর সমর্থক ছিল। রাস্তায় এক গিরিপথ পার হবার সময় একদল দস্যু তাকে ঘিরে ধরে। তার কাছে থাকা দামি কাপড় ও মোহরের লোভে তারা তাকে হত্যা করে।[৫]

এভাবেই শেষ হয় ইসলামের পতন যুগের সেরা বীরদের একজন, জালাল উদ-দীন মিংবার্নুর জীবন।

তার প্রজারা তাকে খুব ভালোবাসত। তার সাথে মধ্য এশিয়া থেকে পালিয়ে আসা মানুষেরা তার মৃত্যুর অনেক বছর পরেও নিজেদের খাওয়ারিজমিয়া বলে পরিচয় দিত। তারা বীর যুবক জালাল উদ-দীনকে কোনোদিন ভুলতে পারেনি।

আজও জালাল উদ-দীনকে তুর্কিরা মিংবার্নু বা মাঙ্গুবের্দি বলে ডাকে। এর মানে God given, খোদার দান।

ইতিহাস হয়তো তাকে দিগ্‌বিজয়ী চেঙ্গিজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো এক রক্ত গরম তরুণ হিসেবেই দেখবে। কিন্তু মুক্তিকামী তুর্কিরা তাকে মনে রেখেছে সর্বগ্রাসী মোঙ্গল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো এক একরোখা বীরযোদ্ধা হিসেবে, মরার আগে যে এক মুহূর্তের জন্যও মরেনি।

সুলতান জালাল উদ-দীন মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যুর পরে তার ভেঙে যাওয়া সালতানাতের ওঘুজ অধিবাসীরা যখন আনাতোলিয়াতে পাড়ি দিচ্ছিল, তখন কিপচাকদের একটা অংশ চলে গেল সিরিয়া আর মিসরে।

তিন

জালাল উদ-দীনের ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হতে তখনো বাকি।

ওগেদেই খান চাইনিজ জিন সাম্রাজ্য নিয়ে তখন ব্যস্ত।

জিনদের খতম করা শেষ হলেই তিনি আবারও মধ্যপ্রাচ্য অভিযানের নির্দেশ দেবেন। ওদিকে পশ্চিমে, কিপচাক স্তেপে নতুন অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জোচি খানের ছেলে বাটু খানকে তৈরি করছেন জেনারেল সুবুদাই বাহাদুর। বাটু খানকে নিয়ে তিনি পালন করতে চান তার মৃত প্রভু চেঙ্গিজ খানের আদেশ। পৃথিবীর বাকি অর্ধেক জয় করা এখনো বাকি। পুরো বিশ্বকে আনা চাই মোঙ্গল ঘোড়ার খুরের তলায়।

প্রাচীন তাতার প্রবাদ বলে, 'মানবজাতির পথ একটাই, যুদ্ধ।'

---

৫. Lane, G., 2012. The Mongols in Iran.

আনাতোলিয়ার কাফেলা

এক

পুরোনো জোব্বা পরা একজন বৃদ্ধ মৃদুস্বরে কথা বলছেন, তার চারপাশে ভিড় করেছে প্রচুর মানুষ।

বৃদ্ধ বলে চলেছেন, 'তোমরা কি আল্লাহ নামের প্রথম হরফ আলিফের হাকিকত বোঝ?'

জনতা বলল, 'না শায়খ, আমরা বুঝি না। আপনিই বলুন।'

শায়খ বললেন, 'প্রথম হরফ আলিফ মানে আল্লাহতেই সমস্ত কিছুর শুরু। তিনি সব কিছুর উৎস। আলিফের আগে যেমন কোনো হরফের অস্তিত্ব নেই, তেমনি আল্লাহর আগেও অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকার প্রশ্ন আসে না।'

ভিড়ের ভেতর থেকে প্রশ্ন করা হলো– 'শায়খ, তাহলে আলিফের পরে যে লাম এসেছে, তার হাকিকত কী?'

শায়খ বললেন, 'আলিফের পর যে দুটো লাম এসেছে, তার প্রথম লাম হলো আল্লাহর তারিফের জন্য। আর দ্বিতীয় লাম হলো প্রথম লামে জোর দেয়ার জন্য। এই দুই লামের পর আছে হা। মাখলুক যেন সহজেই তার দমে আল্লাহকে ধারণ করতে পারে, সেজন্য শেষ হরফ হিসেবে এসেছে হা। তোমরা দম নাও। দেখো, প্রতি দমে তোমরা দুইবার হা পেশ হু উচ্চারণ করো।

কামিল ইনসান প্রতিবার দম নেয়ার সময়েই আল্লাহকে স্মরণ করে, আর গাফিল ইনসান তার নিশ্বাসের ভেতরে থাকা হা সম্পর্কে বেখবর থাকে।'*

এই শায়খের নাম মুহিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল আন্দালুসি।[১]

---

* ফুটনোট : এটি আল্লাহ নামের সুফি ব্যাখ্যা।

১. Hasan, M., 2007. Sufism and English Literature: Chaucer to the Present Age. Adam Publishers.

ইবন আল আরাবি নামে সবাই তাকে চেনে। ভক্তরা তাকে ডাকেন শায়খ আল আকবার নামে। জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে তার বিচরণ ছিল না। ধারণা করা হতো, ত্রয়োদশ শতাব্দীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি তিনি।[২]

এক অদ্ভুত স্বপ্ন তাকে আন্দালুসিয়া থেকে আনাতোলিয়ায় নিয়ে এসেছে।[৩]

দুই

পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে, দূরে তুমুল যুদ্ধ চলছে।

একপক্ষে সৈন্য সামন্ত কম, অন্য পক্ষে খানিকটা বেশি। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, কোন পক্ষে কারা আছে।

পাহাড়ের ওপরে থাকা জঙ্গলে বসে যারা এই যুদ্ধ দেখছে, তাদের নিজেদের অবস্থাও তেমন ভালো না। কাবিলার মুরুব্বিদের কথা উপেক্ষা করে তারা আনাতোলিয়ায় এসেছে। এক সময় তারা মার্ভে থাকত, চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে মার্ভ শ্মশান হবার আগেই তারা মার্ভ ছেড়ে পালাতে পেরেছিল।

পাহাড়ের ওপর থেকে দলটা দেখতে পাচ্ছিল, অপেক্ষাকৃত ছোট সেনাবাহিনীটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। বড় সেনাবাহিনীটা তাদের ঘিরে ফেলছে ধীরে ধীরে।

দলনেতা এক তরুণ তুর্কমেন বে। তিনি ভাবলেন, এই লড়াইয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট দলটাকে সাহায্য করা তার কর্তব্য। কারণ, এরা মজলুম। আর তুর্কমেন কখনো জালিমের হাতে মজলুমকে ছেড়ে যায় না।

দলের যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে তিনি হাক ছাড়লেন, 'কস!'

কয়েক মুহূর্তের ভেতর লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে গেল যোদ্ধারা। তাদের বুঝিয়ে দেয়া হলো কার বিরুদ্ধে তারা লড়তে যাচ্ছে।

অর্ধবৃত্তাকারে বড় সেনাবাহিনীটাকে ঘিরে ধরল তুর্কমেন যোদ্ধারা, পাহাড়ের অনেক ওপর থেকে। তারা সংখ্যায় সামান্য, কিন্তু প্রত্যেকে একেকজন পরীক্ষিত ওঘুজ যোদ্ধা। তাদের তীর শত্রুর মৃত্যু ডেকে আনে।

তরুণ দলপতি একবার বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ধনুকের ছিলা টানটান করে ধরলেন, তারপর উচ্চারণ করলেন প্রভুর নাম, ইয়া হাক![৪]

---

১. Khizer. M.M.. 1991. Sufism and social Integration. Sufism and Inter-tR" Understanding. p.94
২. Hasan. M.. 2007. Sufism and English Literature: Chaucer to the Present Age. Adam Publishers.
৩ ফুটনোট : কস প্রাচীন তুর্কিদের যুদ্ধের ময়দানে আগে বাড়ার স্লোগান, এর অর্থ, এগিয়ে যাও!!

তীর ছুটে গেল, একে একে চার শ তীর।

অপেক্ষাকৃত বড় বাহিনীটার সৈন্যরা তীর কোত্থেকে আসছে বুঝে উঠার আগেই অতর্কিত তীরে নিহত হলো অনেকেই।

তারপর হঠাৎ তারা দেখতে পেল পাহাড় থেকে ধুলোর ঝড় তুলে নেমে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর পালাতে বাধ্য হলো শক্তিশালী সেনাবাহিনীটা।

দুর্বল বাহিনীর প্রধান তুর্কমেন বে কে কৃতজ্ঞতা জানালেন। আনাতোলিয়ার মানুষের মুখে মুখে শোনা যায় এই লড়াইয়ের কথা।[৫]

যাকে সাহায্য করা হয়েছিল, তিনি সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ। আর যিনি সাহায্য করেছিলেন, তার নাম আরতুরুল বে। সুলেইমান শাহের ছেলে, কায়ি গোত্রের আরতুরুল বে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে সহযোগিতা করার পুরস্কার হিসেবে সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ তাকে সোগুত নামের একটা জেলা দান করলেন।[৬]

সোগুত ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তের একেবারে কাছে। এই সীমান্ত শুধু সেলজুক-বাইজান্টাইন সীমান্তই না, ইসলামি জাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তও বটে।

তিন

খোরাসান থেকে আনাতোলিয়ায় পালিয়ে এসেছিলেন আরও অনেকে।

এদেরই একজন শায়খ নাসরুদ্দিন আবুল হাকায়িক মাহমুদ বিন আহমাদ আল খোয়ি। এই বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন একই সাথে কারিগর, ব্যবসায়ী ও সুফি। তিনি বিশ্বাস করতেন, হালাল রুজি উপার্জন হলো আল্লাহর কাছাকাছি যাবার সর্বোত্তম উপায়। আর হালাল রুজি উপার্জন করার সবচেয়ে ভালো উপায় হালাল ব্যবসা।

ব্যবসা এমন একটা পেশা, যেখানে ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদক তিন পক্ষই যদি সৎ না হয়, তাহলে কোনো একপক্ষ বেশি দিন সততা ধরে রাখতে পারে না।

নাসরুদ্দিনের ডাকনাম ছিল 'আখি এভরান'। তিনি সৎ ব্যবসায়ে আগ্রহী তরুণদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক বিশাল ভ্রাতৃসংঘ, যা আখিলিক নামে বিখ্যাত।

---

[৪] http://www.turkishculture.org/military/arms/archery-748.htm

[৫]. Uzar, M. and Erickson, E.J., 2009. A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. ABC-CLIO

[৬] Ali Anooshahr. The Ghazi Sultans and the Frontiers of Islam. pg. 157

আখিলিকের মূল কথাই হলো হালাল রুজি উপার্জন, আত্মশুদ্ধি আর মানবকল্যাণ।[৭]

আখি এভরানকেও সুলতান আলাউদ্দিন জমি দিয়েছিলেন আনকারায়। আরতুরুল বের বিলেজিক বেইলিক ছিল আনকারার কাছেই, সুফি শায়খ আখি এভরানের সুফি বণিক সংঘের সাথে আরতুরুল বে গড়ে তুললেন সুসম্পর্ক।

ধীরে ধীরে আখি এভরানের সুফি বণিক সংঘ ছড়িয়ে পড়তে লাগল আনাতোলিয়ার শহর থেকে শহরে।

চার

বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ তার স্ত্রী মুমিনা খাতুন আর ছেলে জালাল উদ্দিনকে নিয়ে সেই যে খোরাসান ছেড়েছিলেন, আর ফিরতে পারেননি। তিনি তার সঙ্গী সাথিদের নিয়ে একে একে ঘুরেছেন বাগদাদ, সেখান থেকে হেজায, ইয়েমেন, দামেশক, আলেপ্পো, মালাতিয়া হয়ে তিনি সন্ধান করছিলেন এমন এক টুকরো জমিনের যা মোঙ্গলদের হাত থেকে নিরাপদ।

সুলতানুল উলামা খ্যাত এই শিক্ষক নিজের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এমন সময় তার কাছে সুলতান আলাউদ্দিনের চিঠি এল। সুলতান তাকে কোনইয়ার রাজকীয় মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তিনি।

দিনে দিনে আনাতোলিয়ায় বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের খ্যাতির কথা ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই সাথে ছড়িয়ে পড়ছিল তার সন্তান জালাল উদ্দিনের কথাও। অনেক কম বয়সেই সে ফিকাহ সম্পর্কে অনবদ্য জ্ঞান অর্জন করেছে।

১২৩৩ সালে মারা গেলেন বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ, তার জায়গায় মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন তার ছেলে জালাল উদ্দিন।

পাঁচ

অগণিত ইরানি-তুর্কি শরণার্থী আনাতোলিয়াকে এক বিচিত্র সংস্কৃতির অধিকারী করে তুলেছিল।

---

[৬] Karatop, B., Karahan, A.G. and Kubat, C., 2011. First Application Of Total Quality Management In Ottoman Empire: Ahi Organization. In 7th Research/Expert Conference with International ParticipationsÓ QUALITY (pp. 1109-1114).

[৭] Ersever, O.G., 1999. The Humanistic Philosophies of Mevlana Rumi and Carl Rogers: Principles of Effective Communication to Promote Universal Peace. Peace Research, 31(3), pp.42-50

মোঙ্গল আক্রমণে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর এদের সাফল্যের সাথে সেলজুকদের পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন। কিন্তু এই কাজটা মোটেই সহজ ছিল না।

এই শরণার্থীদের একটা বড় অংশই ছিল একেবারে নও মুসলিম, যারা এক বা দুই পুরুষ আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। নিরক্ষর হবার কারণে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানত খুবই কম। কুরআন বা হাদিসের চেয়ে শায়খের মুখের কথাই ছিল ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস।

এদের প্রাচীন ধর্মে শামানদের গুরুত্ব ছিল অনেক। ইসলামে ধর্মান্তরিত হবার পরেও তা খুব একটা বদলায়নি। আর তাকে পুঁজি করে এই সরল, অশিক্ষিত মানুষদের নিজের দলে ভিড়িয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন এমন এক পীর, যিনি আসলে মুসলিমই ছিলেন না।

জাদুবিদ্যার ভেলকি দেখিয়ে নিজেকে কামিল বলে প্রচার করা বাবা ইসহাক আসলে ছিলেন বাইজান্টাইন কমনেনস বংশের এক রাজকুমার।[৯] তার লক্ষ্য ছিল পীর হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের মাধ্যমে বিদ্রোহ সংঘটিত করে সেলজুক সালতানাতকে ভেতর থেকে ভেঙে দেয়া।

জাদুবিদ্যার ভেলকির সাথে সাথে বাবা ইসহাক এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যা তার তরিকার অনুসারীর সংখ্যা রাতারাতি বাড়িয়ে তুলেছিল। তিনি বলতেন মুসলমান হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা বা হজ, যাকাতের কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তরে স্রষ্টার স্মরণই আসল কথা। তিনি বলতেন, জগতের শুরু বা শেষ বলে আসলে কিছু নেই, জগৎ চিরন্তন। নিজেকে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন রাসূল আল্লাহ।[১০]

তার এসব চটকদার ঘোষণা আধা শামানিস্ট তুর্কি যাযাবরদের ভেতর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ওদিকে সুলতান আলাউদ্দিন হঠাৎ মারা যান ১২৩৭ সালে।

সুযোগ পেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বাবা ইসহাক ও তার অনুসারীরা। এই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'বাবা বিদ্রোহ' বলে বিখ্যাত।

সুলতান আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারী কায়খসরু বাবা বিদ্রোহ ঠেকাতে সক্ষম হন ঠিকই, কিন্তু এর ধাক্কা সামলাতে গিয়ে সেলজুক সালতানাতের পুরো কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

---

[৯] Vryonis, S., 1969. The Byzantine legacy and Ottoman forms. Dumbarton Oaks Papers, 23, pp.251-308

[১০] Turan, O. and Lieser, G., 1985. Kaykhusraw II Ghiyath al-Din. Journal of the Pakistan Historical Society, 33(2), p.81

মধ্যপ্রাচ্যের নতুন মোঙ্গল শাসক বাইজু নোইয়ান দেখলেন আনাতোলিয়ায় আঘাত হানা এখন আর খুব একটা কঠিন নয়।

১২৪৩ সালে মোঙ্গলদের সাথে কোস দাঘ পর্বতের গিরিপথে মুখোমুখি হয় সেলজুক বাহিনী।

বাইজু নোইয়ানকে মোকাবেলা করতে সেলজুক সুলতান এক অনভিজ্ঞ কমান্ডারকে পাঠান, যার বাহিনীকে প্রথম দফাতেই চুরমার করে দেন বাইজু নোইয়ান।[১১] এই অবস্থা দেখে আতঙ্কিত সুলতান কায়খসরু উল্টোদিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে পালিয়ে যান। সংখ্যায় বেশি হবার পরেও পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কারণে সুলতানের কমান্ডাররা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। আনাতোলিয়া চলে আসে মোঙ্গলদের নিয়ন্ত্রণে। সেলজুক সুলতান পরিণত হন মোঙ্গলদের ভৃত্য।

কিন্তু তুর্কি উপজাতিদের নিয়ন্ত্রণ করা যে সহজ না, তা মোঙ্গলরা ভালোভাবেই জানত। তারা তাই পরোক্ষভাবে সেলজুক সালতানাতকে শাসন করত পুতুল সুলতানের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে যাওয়ার ফলে একের পর এক তুর্কমেন বে প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের আমিরাত গড়ে তুলতে শুরু করেন। মধ্য আনাতোলিয়ায় কারামান বে, পশ্চিমে জারমিয়ানি বে, হামিদ বে, আয়দিন বে, আরতুরুল বের নেতৃত্বে সূচনা ঘটে ছোট বড় প্রায় ১৫টি আমিরাতের।

১২৫৬ সাল নাগাদ ধীরে ধীরে ধীরে সেলজুক সালতানাত থেকে তুর্কি গোত্রগুলো স্বাধীন হয়ে নিজেদের আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল।

মোঙ্গলরা এবার নজর দিল স্বয়ং আব্বাসিয়া খলিফার দিকে।

খলিফাকে তারা মোঙ্কি খানের দরবারে গিয়ে হাজিরা দিতে বলল।[১২]

এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাগদাদ দখলের ছুতো মাত্র।

---

১১ Jackson, P. ed., 2017. The Mission of Friar William of Rubruck: His Journey to the Court of the Great Khan Möngke, 1253–1255. Routledge.

১২ Jackson, P. ed., 2017. The Mission of Friar William of Rubruck: His Journey to the Court of the Great Khan Möngke, 1253–1255. Routledge.

আরব রজনীর স্বপ্নভঙ্গ

এক

মসুলের আমিরের কাছে দুটো চিঠি এসেছে। একটা বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে, পরেরটা এসেছে তাতার ইলখানের কাছ থেকে।

মসুলে বাস করে হাজার হাজার কারিগর। এখানে জুতোর ফিতা থেকে শুরু করে তৈরি করা হয় বড় বড় সিজ ইঞ্জিনও।

আমির চিঠি দুটো পড়লেন।

বাগদাদের খলিফা তাকে উন্নতমানের কিছু সেতার আর বেহালা পাঠাতে অনুরোধ করেছেন।

মোঙ্গল ইলখানের চিঠিটা অন্যরকম। তিনি চেয়েছেন সিজ ইঞ্জিন।

আমিরের বুঝতে অসুবিধা হলো না, কে কী উদ্দেশ্যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছেন।

মোঙ্গল ইলখান বাগদাদ অবরোধ করতে চান আর আব্বাসিয়া খলিফা চান সংগীতের আসর আরও জমিয়ে তুলতে।

আমির বদরুদ্দিন আফসোস করে ওঠলেন, হায় ইসলামি জাহান! তোমার নেতৃত্ব আজ কাদের হাতে!

দুই

দজলা, ফোরাত, ভোলগা আর ওনোন নদীতে অনেক জল গড়িয়ে গেছে।

জোচি খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গলদের বিজয়ের ঝাণ্ডা কিপচাক স্তেপের বহু পশ্চিমে উড়িয়ে নিয়ে গেছেন বাটু খান, বারকি খান আর ওর্দা খানেরা। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বর্ষীয়ান জেনারেল সুবুদাই বাহাদুর। মোঙ্গলদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জনপদের পর জনপদ।

রাশিয়াতে অন্তত ছয় লাখ, হাঙ্গেরির প্রতি দুজনের একজন, ইউক্রেনে দুই লাখ, বোহেমিয়ার প্রতি দুজনের একজন, পোল্যান্ডে লাখের ওপর মানুষ মোঙ্গলদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। রোমানিয়ার রাজ্যগুলোকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল মোঙ্গলরা। গ্রেট হাঙ্গেরিয়ান প্লেইনে যতদূর চোখ যায়, দেখা যায় কেবল আগুন আর লাশ।[১]

মোঙ্গলদের লক্ষ্য ছিল আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত তাদের পতাকা উড়িয়ে দেয়া। কিন্তু ভিয়েনা অবরোধের ঠিক আগে কারাকোরাম থেকে খবর এল, খান-ই খানান ওগেদেই খান মারা গেছেন। পবিত্র পর্বত বুরখান খালদুনে কুরুলতাই ডাকা হয়েছে, সেখানে নতুন খাকান নির্বাচন করা হবে।[২]

খাকান হতে কে না চায়! ঘোড়ার মুখ পূর্বদিকে ফেরালেন বাটু খান।

পতনের ঘণ্টাধ্বনি থেকে বেঁচে গেল পশ্চিম ইউরোপ।

কারাকোরামে গিয়ে বাটু খান দেখলেন রাজনীতি যুদ্ধের চেয়ে অনেক জটিল। বাটু খানের শৌর্য-বীর্যের খবর জানা ছিল বোরজিগিন (চেঙ্গিজের পরিবার) পরিবারের সবারই। ছেলে যে বাবা ও দাদার মতোই মহাবীর হয়েছে, সে নিয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু রাজনীতির কূটচালে বাটুকে ঘোল খাইয়ে সিংহাসনের দখল নিলেন ওগেদেই খানের ছেলে গুয়ুক খান।[৩]

গুয়ুক খান ভালোভাবেই জানতেন, যুদ্ধ লেগে গেলে বাটুর সামনে তিনি টিকবেন না। বাটু খানকে তাই আগা খান (খানদের সম্মানিত বড় ভাই) উপাধিতে ভূষিত করা হলো।

বাটু খান ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বুঝলেন, মোঙ্গলভূমি ছেড়ে চলে আসা তার বাবার সাথে রাজধানীর যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা আর কোনোদিন ঘুচবে না।

গুয়ুক খান ওগেদেই খানের সন্তান ছিলেন। চাঘাতাই খান আর ওগেদেই খানের সন্তানরা নিজেদের ক্ষমতাকে তলুই খান ও জোচি খানের সন্তানদের বিরুদ্ধে টিকিয়ে রাখতে জোট গড়লেন।

মোঙ্গল প্রিন্সদের ওপর বাটু খানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তিনি দ্রুত চাচা তলুই খানের সন্তানদের সাথে একটা রাজনৈতিক জোট গড়ে ফেললেন। নিজের যেহেতু খান হবার সম্ভাবনা কম, তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সরাসরি সিংহাসনে যাওয়ার বদলে তিনি খানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে মোঙ্গল সাম্রাজ্যকে পরিচালনা করবেন।

সুযোগ এল ১২৪৮ সালে। গুয়ুক খান মারা যাবার পর দ্রুত তলুই খানের বড় ছেলে, বাটু খানের একান্ত অনুগত মোঙ্কি খানকে ক্ষমতায় বসালেন বাটু খান।

---

১. Saunders. John Joseph. The history of the Mongol conquests. University of Pennsylvania press. 2001.

২ Arpi, Claude. "China's Leadership Change and Its Tibet Policy." Strategic Analysis 37. no. 5 (2013): 539-557.

৩ Kim. Hodong. R. Amitai. and M. Biran. "A reappraisal of Güyüg Khan." BRILLÕS INNER ASIAN LIBRARY (2005): 309.

মোঙ্কি খান ক্ষমতায় গিয়েই আগে ওগেদেই খান আর চাঘাতাই খানের ছেলেদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন পীড়ন চালালেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা খানের ওপর কালো জাদু করেছে।[৪]

এই অপরাধের শাস্তি ছিল কেবল মৃত্যুদণ্ড।

এসব ঝামেলা শেষ হতে হতে চলে এল ১২৫৪ সাল।

বাটু খানের আর ইউরোপ জয় করা হয়ে উঠল না। সুবুদাই মারা গেছেন আরও সাত বছর আগে।

১২৫৫ সালে বাটু খানও মারা গেলেন। তার জায়গায় কিপচাক খানাতের সোনালি লাল ঝাণ্ডা হাতে নিলেন তার ছোট ভাই, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বারকি খান।

ঘরের ঝামেলা সামলে উঠে আবার বিশ্বজয়ের দিকে নজর দিল মোঙ্গলরা।

মধ্যপ্রাচ্যে মোঙ্গল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ইরাক পর্যন্ত। ইরাকের উত্তরে মসুল ছিল কুর্দি আমির বদরুদ্দিন লুলুর অধীনে। আর দক্ষিণে ছিল বাগদাদ, মধ্যযুগের স্বপ্ন, আরব্য রজনীর শহর বাগদাদ।

বাগদাদের খলিফা তখন আল মুস্তাসিম। তার প্রধান দুই কাজ ছিল বাগদাদের বাহাসের ময়দানে গিয়ে ইসমাইলি আর আশয়ারিদের বাহাস শোনা, আর নর্তকীদের সাথে গান আর মদে ডুবে থাকা।[৫]

ওগেদেই খানের আমল থেকে মোঙ্গলরা দাবি করে আসছিল, বাগদাদের খলিফাকে মোঙ্গলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে।[৬]

খলিফা ভাবতেন, কিছু উপহার পাঠিয়ে এই বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু মোঙ্কি খান খলিফাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, তোমাকে অবশ্যই আমার বশ্যতা স্বীকার করে আমার দরবারে আসতে হবে। অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস করতে আমি হালাকুকে পাঠাচ্ছি।

তিন

বাগদাদের সমাজ তখন দারুণভাবে বিভক্ত ছিল। যেকোনো প্রশ্নে এই সমাজ হাজারো মত, হাজারো পথ, হাজারো ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যেত।

---

৪. Sinor, Denis. "The Making of a Great Khan." Altaica Berolinensia. The Concept of Sovereignty in the Altaic Worlds (1993): 241-256.

৫. Giv, Ahmad Lamei. "The Effective Reasons for the Rise and fall of Abbasids State." Mediterranean Journal of Social Sciences 7, no. 3 S1 (2016).

৬. Wickens, G M. "Nasir ad-Din Tusi on the Fall of Baghdad: A Further Study." Journal of Semitic Studies 7 (1962).

মাযহাব আর ফেরকা তাদের এত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, ঘাড়ের ওপর আটত্রিশ বছর ধরে নিশ্বাস ফেলা মোঙ্গল বিপদকে তারা অনুধাবন করতে পারেনি।

খলিফার দরবার ছিল ভাঁড়, কবি আর গল্পকথকদের আড্ডাখানা। সাথে ছিল দরবারি আলেম, যারা যেকোনো ব্যাপারে খলিফার মতের সপক্ষে কুরআন-হাদিস থেকে ব্যাখ্যা বের করত, হোক তা মনগড়া।

আল মুস্তাসিমের বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে ছিল না কোনো ধারণা। তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করত উজির ইবন আল আলকামির পরামর্শের ওপর। নিজে কোনোদিন যুদ্ধ করেননি, সামরিক বিষয়েও তার ছিল না কোনো রকম অভিজ্ঞতা।[৭]

যৌক্তিকভাবে ধর্মীয় বিষয়ের ফায়সালা করার শুভ উদ্দেশ্য একসময় যে বাহাস শুরু হয়েছিল, কালে কালে সেই বাহাস পরিণত হয়েছিল বিভেদের হাতিয়ারে।

বাগদাদের সমাজকে হুঁশিয়ার করার চেষ্টা যে করা হয়নি, তা নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে মুজাহিদরা এসে মোঙ্গল বিপদ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের। কিন্তু যে সমাজের মাথায় পচন ধরে, তার পতন আর কে ঠেকাতে পারে?

হালাকু খান বাগদাদ জয় করতে আসছে শুনে অপদার্থ আল মুস্তাসিম এই বিষয়ে ইবন আল আলকামির মত চাইলেন।

আলকামি জানালেন, বাগদাদে তাতারিরা হামলা চালালে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে মুসলিমরা বাগদাদ রক্ষা করতে অগ্রসর হবে। আপনার কোনো ভয় নেই।[৮]

কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আলকামি তা আল মুস্তাসিমকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। তার পরিকল্পনা ছিল বাগদাদ মোঙ্গলদের হাতে তুলে দিয়ে মোঙ্গলদের সাথে সমঝোতা করে শিয়াদের রক্ষা করা।

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্ব থেকে বাগদাদের খলিফা ছিলেন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

পশ্চিমে আইয়ুবি শাহজাদারা নিজেদের ভেতর যুদ্ধে ব্যস্ত, মিসরে ইতোমধ্যেই তারা ক্ষমতা হারিয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে সেলজুক রুমের পতন হয়েছে। আর পূর্বের দিল্লি সালতানাত থেকে সাহায্য আসার যে একমাত্র পথ, সেই ইরান-আফগানিস্তান মোঙ্গলদের দখলে।

খলিফা আন নাসির খাওয়ারিজম শাহকে আক্রমণ করতে একদিন যাদের চিঠি লিখেছিলেন, সেই মোঙ্গলরাই তার বংশকে একদিন ধ্বংস করবে, তা তিনি ভাবতেও পারেননি।

---

৭. Alavijeh, Elham Shafiee, and Saeed Mohammadkhani. 'Analysis of the role and position of Ibn Alqami in the fall of the Abbasid caliphate.' Journal of American Science 9, no. 4s (2013).

৮. Davis, Paul K. (2001). Besieged: 100 Great Sieges from Jericho to Sarajevo. New York: Oxford University Press. p. 67.

চার

মোঙ্গলরা বিশাল প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে এল বাগদাদের দিকে।

মোঙ্গল যোদ্ধা প্রায় এক লাখ। তাতার, উইঘুর, কিরগিজ আর কিপচাক আরও একলাখ। সেই সাথে আর্মেনিয়া থেকে আনা চল্লিশ হাজার ক্রুসেডার, জর্জিয়া থেকে আনা আরও চল্লিশ হাজার ক্রুসেডার, সাথে চীনা যোদ্ধা মিলিয়ে সেনাবাহিনীর মোট আকার দাঁড়াল তিন লাখে।[৯] এক লাখকে রিজার্ভ রেখে বাকি দুই লাখ নিয়ে বাগদাদের দিকে এগোতে থাকলেন হালাকু। এই অভিযানে বাগদাদের দেয়াল ভাঙতে তিনি সাথে এনেছিলেন এক হাজার চীনা প্রকৌশলী আর প্রায় দশ হাজার কারিগর।

তারা যখন বাগদাদের কাছাকাছি এসে গেল, তখন খলিফার সেনাপ্রধান দাওয়াতদার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি তাদের বাধা দেবেন।

খলিফা এতে খুব একটা ভরসা পেলেন না। আলকামিও বাধা দিলেন। কিন্তু দাওয়াতদারের পক্ষে শহরের উলামারা শক্তিশালী মত পেশ করায় খলিফা লড়াইয়ের অনুমতি দিলেন।

দাওয়াতদারের বিশ হাজার যোদ্ধার বেশিরভাগই ছিল কুর্দি গোত্রগুলো থেকে আনা ভাড়াটে যোদ্ধা। আর একটা অংশ ছিল খলিফার দাস সৈনিকদের বিশেষ বাহিনী।[১০]

১২৫৮ সালের ১১ জানুয়ারি দজলা নদীর তীরে মোঙ্গলদের দশ ভাগের এক ভাগ যোদ্ধা নিয়ে লড়াইয়ে নামলেন দাওয়াতদার। দফায় দফায় তুমুল যুদ্ধের পর মোঙ্গলরা পালাতে বাধ্য হলো। সন্ধ্যার দিকে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠল দাওয়াতদারের বাহিনী। রাতভর চলল ভোজ।

সকালে উঠে দাওয়াতদার দেখলেন তার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে।

তার বাহিনী যে চরে ক্যাম্প করেছিল, মোঙ্গলরা সেটার তিন দিকে পরিখা খনন করে রাতের ভেতরে চরটাকে নদীর মধ্যে নিয়ে গেছে।

নদীর স্রোতে কিছুক্ষণ পর ডুবে যেতে থাকল দাওয়াতদারের ক্যাম্প। যারা সাঁতরে তীরে উঠল, সবাইকে হত্যা করল মোঙ্গলরা। পালাতে পারল মাত্র চারজন, যাদের একজন দাওয়াতদার নিজে। এটাই ছিল বাগদাদের খলিফার শেষ প্রতিরোধ।

উপায়ান্তর না দেখে খলিফা জরুরি ভিত্তিতে শহরের নিরাপত্তা দেয়াল মেরামতের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

খলিফার চিঠি গেল আইয়ুবি আর মামলুকদের কাছে। কিন্তু অন্যের বিপদে যারা পাশে দাঁড়ায় না, তারা নিজের বিপদে কাউকে পাশে পায় না, এটাই স্বাভাবিক।

---

[৯]. Khanbaghi, Aptin. 2006. The fire, the star, and the cross: minority religions in medieval and early modern Iran. London: I. B. Tauris

[১০]. Davis, Paul K. (2001). Besieged: 100 Great Sieges from Jericho to Sarajevo. New York: Oxford University Press. p. 67.

২৯ জানুয়ারি হালাকু খান বাগদাদ অবরোধ শুরু করলেন।[১১]

অসংখ্য সিজ ইঞ্জিন, র‍্যাম, ক্যাটাপুল্ট আর গানপাউডার ব্যবহার করে বাগদাদের শতাব্দী প্রাচীন দেয়ালকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা শুরু হলো।

বাগদাদ থেকে অল্প কিছু তরুণ প্রাণপণে লড়াইয়ে নামল।

এই যুবকদের বীরত্বের কারণে প্রথম তিন দিন অত্যন্ত শক্তিশালী প্রযুক্তি ব্যবহার করেও মোঙ্গলরা দেয়ালের ওপর উঠতে হিমশিম খাচ্ছিল। কিন্তু সময় পেরোনোর সাথে সাথে শহরের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল।

গান পাউডারের বিস্ফোরণে নানা জায়গায় শহর রক্ষা দেয়ালে ফাটল তৈরি হতে থাকল। সেই সাথে মোঙ্গলদের আগুনে তীরের বৃষ্টিতে দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই করাও অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল।

প্রায় দশ দিনের অবরোধের পর যেখানে বাগদাদবাসীর সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার, সেখানে তারা সন্ধি করে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। বাগদাদ থেকে প্রধান উজির ইবন আলকামির নেতৃত্বে তিন হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির এক দল গেল হালাকু খানের কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে।

হালাকু খান তাদের সবাইকে মেরে বস্তায় ভরে লাশ বাগদাদে পাঠিয়ে দিলেন।[১২]

পাঁচ

অবশেষে ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মোঙ্গল বাহিনী বাগদাদে প্রবেশ করল।[১৩] চেঙ্গিজ খানের নাতি হিসেবে যা করা দরকার, হালাকু খান তাই করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, শহরের বাহাসের ময়দান ও শহরের প্রাচীরের বাইরে দজলার তীরে যারা সমবেত হবে, তাদের হত্যা করা হবে না। নেতৃত্বহীন লাখ লাখ মানুষ দ্রুত ময়দানের দিকে ছুটল।

ময়দানে যাবার পর একে একে সবাইকে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর শুরু হলো পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়ংকরতম গণহত্যাগুলোর একটি। দজলার তীরে মুহূর্তে মুহূর্তে মুসলিমদের কাটা মুণ্ডু ছিটকে ছিটকে পড়ছিল মোঙ্গলদের তলোয়ারের ঘায়ে। হালাকু খান বাগদাদ লুট করার নির্দেশ দিলেন। বুভুক্ষু জানোয়ারের মতো বাগদাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার সেনারা।

শহরের ভেতর সামান্য কিছু লোক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লড়াই করে শহিদ হবে। তাদের সাথে মোঙ্গলদের লড়াই বেঁধে গেল।

---

[১১]. Frazier, Ian. "Destroying Baghdad." New Yorker 25 (2005).

[১২]. Fattah, Hala. A Brief History of Iraq. Checkmark Books. p. 101.

[১৩]. Saunders, J.J. The History of the Mongol Conquests. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001. ISBN 0-8122-1766-7.

কিছু মহল্লার লোকজন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে কয়েক ঘণ্টা টিকে রইল। কিন্তু এরপর যখন মোঙ্গলরা মহল্লায় ক্যাটাপুল্ট দিয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল, তখন জীবন্ত কাবাব হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইল না।

মোঙ্গলরা কাউকে ছাড়ল না। পুরুষদের যেখানে পেল, সাথে সাথে সেখানেই হত্যা করে মাথাটা কেটে বস্তায় ভরল। মাথা দিয়ে সৌধ বানাতে হবে যে!

শিশু ও বৃদ্ধদের শরীর মাঝখান থেকে দু টুকরো করে ফেলছিল তারা।

মেয়েদের সাথে যা হলো, তা ছিল সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক।

ইচ্ছেমতো ধর্ষণ করা হচ্ছিল তাদের। ধর্ষণ শেষে ভালো লাগলে বেঁধে মোঙ্গল শিবিরে নিয়ে যাওয়া হতো আর নয়তো মাথাটা আলাদা করে দেয়া হতো ধড় থেকে। সম্ভবত মোঙ্গলদের দাসী হবার চেয়ে এটাই সহজ ছিল।

আল মুস্তাসিমকে বন্দি করে নিয়ে আসা হলো হালাকু খানের সামনে।

মুস্তাসিমের হেরেম থেকে তার মা, স্ত্রী, মেয়ে ও দাসীদের বের করে আনা হলো। তারপর তার সামনেই তার দাসী, প্রিয় স্ত্রী ও মাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হলো।[১৪]

আল মুস্তাসিমকে কী করা হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন হালাকু খান। তাকে বলা হয়েছিল, খলিফা মহানবি (সা.)-এর আত্মীয়, তার রক্ত মাটিতে পড়লে মহাদুর্যোগ নেমে আসতে পারে।

তাই খাঁচায় আটকে রাখা হলো খলিফাকে।

মার্কো পোলো লিখেছেন, খলিফাকে নাকি তার বিপুল ধন সম্পদসহ সোনার খাঁচায় ঢুকিয়ে তালা মেরে রাখা হয়েছিল।[১৫]

আল মুস্তাসিম চোখের সামনে পরিবারের চরম লাঞ্ছনা দেখে দিশেহারা হয়ে হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছিলেন। এ ছাড়া তার আর বিশেষ কিছু করার ছিল না।

এদিকে খলিফাকে হত্যা করা নিয়ে হালাকুর দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে এগিয়ে এল তার পক্ষে যোগ দেয়া কিছু শিয়া মুনাফিক। তারা বলল, খোদ রাসূল (সা.)-এর নাতি ইমাম হুসাইন (রা.)-কে যখন হত্যা করা হয়, তখনো পৃথিবীতে কোনো দুর্যোগ হয়নি। অতএব, খলিফাকে হত্যা করলেও কিছুই হবে না।

এই কথা শুনে হালাকু খান খুশি হলেন, কিন্তু তার মনের ভয় গেল না। শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, খলিফাকে গালিচায় পেঁচিয়ে তার ওপর দিয়ে এক শ ঘোড়া চালিয়ে দেয়া হবে।

এতে রক্ত গালিচায় মাখবে, মাটিতে পড়বে না। আর তাহলে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ও থাকবে না।

---

[১৪]. http://www.statemaster.com/encyclopedia/Battle-of-Baghdad-%281258%29

[১৫]. https://www.thedailybeast.com/in-threatening-baghdad-militants-seek-to-undo-800-years-of-history

মুস্তাসিম বিল্লাহকে খাঁচায় প্রবেশ করানো হচ্ছে।

বাগদাদ দখলের তিন দিনের মাথায় সোনার খাঁচায় ভরে রাখা খলিফাকে হালাকু জিজ্ঞেস করলেন, কী, ক্ষুধা পেয়েছে?

খলিফা বললেন, হ্যাঁ, পেয়েছে।

হালাকু বললেন, তাহলে খাও।

মুস্তাসিম বললেন, কী খাবো? এখানে তো কোনো খাবার নেই!

হালাকু বললেন, এই যে বছরের পর বছর যে সম্পদ জমিয়েছ, তা খাও। এই সোনাদানা জমিয়ে না রেখে যদি নিজের সেনাবাহিনীর পেছনে খরচ করতে, যদি বাগদাদের দেয়ালের পেছনে খরচ করতে, তাহলে আজ আমার দয়ার ভিখারি হয়ে তোমাকে মরতে হতো না। খাও, আজ তোমার সম্পদ তুমিই খাও।[১৬]

আল মুস্তাসিম হা করে চেয়ে রইলেন।

তাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হলো।

তারপর গালিচায় মুড়িয়ে ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে হত্যা করা হলো।[১৭]

ছয়

অপদার্থ আল মুস্তাসিমের মৃত্যুতে জগতের তেমন কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটেনি।

কিন্তু বাগদাদের পতন ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন এক আঘাত, যা মানবজাতিকে অনেক অনেক পিছিয়ে দিয়েছিল।

---

১৬. Boyle, J. A. (1961). The death of the last'Abbasid caliph: a contemporary Muslim account. Journal of Semitic Studies, 6, 145.

১৭. http://www.statemaster.com/encyclopedia/Battle-of-Baghdad-%281258%29

প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের এক সংগ্রহশালা ছিল বাগদাদের বায়তুল হিকমাহ।

সেই খলিফা হারুন উর রশিদের আমল থেকে প্রায় সাড়ে চার শ বছর ধরে গ্রিস, রোম, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, মিসর, সিরিয়া, তুর্কিস্তান, প্রাচীন ভারত ও চীনের যাবতীয় জ্ঞানভান্ডার আব্বাসিয়া খলিফারা সাড়ে চার শ বছর ধরে জমা করেছিলেন এই বায়তুল হিকমাহতে। এখান থেকেই মধ্যযুগে মানবজাতির সেরা আবিষ্কারগুলো হয়েছিল। ধারণা করা হয়, তৎকালীন পৃথিবীর প্রতি দশটি বইয়ের নয়টি ছিল বাইতুল হিকমাহতে।

বাইতুল হিকমাহ ছিল জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এক স্বপ্নপুরী।

মোঙ্গলদের কাছে এসবের কোনো মূল্য ছিল না। বাগদাদের প্রতিটি দালানকোঠা ধ্বংস করা হয়েছিল। বাইতুল হিকমাহকেও বাদ দেয়া হয়নি।

বাগদাদের এই পতনে আনুমানিক প্রাণহানীর সংখ্যা ছিল দুই লাখ থেকে দশ লাখের মাঝামাঝি।[১৮]

ফোরাত নদীর পানি প্রথমে মানুষের রক্তে লাল হলো, এরপর কালো হয়ে গেল বায়তুল হিকমাহর পুড়ে যাওয়া বইয়ের ছাইয়ে।[১৯] সাত দিন ধরে লুট করার পর লাশের গন্ধে টিকতে না পেরে হালাকু খান বাগদাদ ছেড়ে চলে গেছেন।[২০] বাগদাদে পড়ে রইল লাখ লাখ মানুষের মাথার খুলি, পঁচা লাশ, পোড়াবাড়ি, লুট হওয়া ফাঁকা দোকান, বাজার, গুদাম আর ছাই হয়ে যাওয়া লাইব্রেরি।

বাগদাদ আর কোনোদিন তার আগের রূপে ফিরতে পারেনি।

মধ্যযুগীয় আব্বাসিয়া খিলাফতের কবর তারা নিজেরাই খুঁড়েছিল গত তিন শতাব্দী ধরে। মোঙ্গলদের মাধ্যমে সেই কবরে আব্বাসীয় খিলাফতের দাফন সম্পন্ন হলো।

---

১৮. Frazier, Ian (25 April 2005). "Annals of history: Invaders: Destroying Baghdad". The New Yorker. p. 4.

১৯. MUHAMMAD, MUHAMMAD IMRAN "THE FORGOTTEN HISTORY: CONTRIBUTION OF MUSLIMS TO MODERN SCIENCE" (2012)

২০. Caliphate, Mongols Abbasid, and Hulagu Khan. "Encyclopedia> Battle of Baghdad (1258)."

পূর্ণ হলো হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। 'কিয়ামত তত দিন পর্যন্ত আসবে না, যত দিন না তোমরা ছোট ছোট চোখ ও লালচে মুখবিশিষ্ট জাতির লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যাদের মুখ হবে ঢালের মতো চওড়া, নাক হবে চ্যাপ্টাচ্যাপ্টা, তারা চামড়ার পোশাক পরা থাকবে আর তাদের জুতা হবে পশমের তৈরি। সহিহ বুখারি : ২৭৭০

সাত

বাগদাদ কোনো সাধারণ শহর ছিল না। বাগদাদ ছিল একটা প্রতীক। ইসলামি সভ্যতার প্রতীক। খিলাফতের প্রতীক। মধ্যযুগের জ্ঞান, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষের প্রতীক।

খলিফা আল মনসুরের আমল থেকে এই শহর ছিল ইসলামি সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু, আব্বাসিয়া খিলাফতের রাজধানী। বাগদাদ তার উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছায় খলিফা হারুন-অর-রশিদের আমলে। পরের প্রায় দুই শ বছর বাগদাদই ছিল ইসলামি সভ্যতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক কেন্দ্র।

পরবর্তী সময়ে সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির ভরকেন্দ্র বাগদাদ থেকে সরে গেলেও বাগদাদ ছিল খলিফার শহর।[২১]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আব্বাসিয়া খিলাফত ছিল সত্যিকারার্থে সপ্তম শতাব্দীর খুলাফাহ-ই রাশিদার এক অযোগ্য উত্তরাধিকারী মাত্র, যা না বহন করত খলিফার আধ্যাত্মিকতা, আর না পালন করতে সক্ষম ছিল খিলাফতের রাজনৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু তবু খিলাফতের শেষ চিহ্ন হয়ে হলেও টিকে ছিল আব্বাসিয়ারা। রাজনৈতিকভাবে খিলাফতকে যারা অবিনশ্বর ভাবত, তাদের ঘোর ভাঙল এক তীব্র ধাক্কার মধ্যে দিয়ে।

এই আঘাত আর কখনোই পুরোপুরি সারেনি।

আট

হিটলারের হলোকাস্ট বা রুজভেল্টের হিরোশিমা নাগাসাকি অথবা স্ট্যালিনের হলোডোমোর চেঙ্গিজ খানের মোঙ্গল বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের কাছে কিছুই না।[২২]

এশিয়ার বাণিজ্যিক কেন্দ্র মা ওয়ারা উন্নাহারের সমরকন্দ, উরগঞ্জ আর খিভায় খানের বাহিনী হত্যা করেছিল আড়াই মিলিয়ন মানুষ। এশিয়ার শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের কেন্দ্র খোরাসানে চেঙ্গিজ খান চালিয়েছিলেন মানব ইতিহাসের ভয়ংকরতম হত্যাকাণ্ড।

---

[২১]. Kennedy, Hugh. When Baghdad Ruled the Muslim World: The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty. Da Capo Press. 2006.

[২২]. Weatherford, J. McIver. Genghis Khan and the making of the modern world. Broadway Books. 2004.

বলা হয়, হলোকাস্টে ষাট লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। আর খোরাসান অভিযানে কেবল নিশাপুর, হিরাত, বামিয়ান, মার্ভ, তিরমিয আর বালখ, এই পাঁচ শহরেই চেঙ্গিজ খান ষাট লাখের বেশি মুসলিমকে হত্যা করেছিলেন।[২৩]

মোঙ্গল আক্রমণের ফলে খোরাসান প্রায় সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে পড়ে। ইরানের জনসংখ্যা নেমে আসে তার পূর্বের জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগে। এই ধাক্কা সামলে উঠতে ইরানের লেগেছিল সাত শ বছর।[২৪]

চেঙ্গিজ খান জি জিয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস করার সময় আগের চেয়েও বেশি মানুষকে হত্যা করেছেন। একক অভিযানে এত মানুষ হত্যা পৃথিবী এর আগে কোনোদিন দেখেনি।

চেঙ্গিজের সুযোগ্য (!) পুত্র ওগেদেই খান বাবার চেয়ে কোনো অংশে কম হত্যাযজ্ঞ চালাননি।

তার সেনাবাহিনী জিন সাম্রাজ্যে অন্তত দেড় কোটি মানুষকে হত্যা করে। রাশিয়ায় প্রায় পাঁচ লাখ মানুষকে হত্যা করে। হাঙ্গেরির গোটা জনসংখ্যার অর্ধেককে হত্যা করা হয় তার আমলে। বোহেমিয়া, পোল্যান্ডের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশকে মোঙ্গলরা ওগেদেই খানের সময়েই হত্যা করে।[২৫]

মোঙ্কি খানের আমলে হালাকু খানের বাগদাদ অভিযানে নিহত হয় আনুমানিক দশ লাখ মানুষ।[২৬] ইরান-ইরাকের হাজার হাজার বছরের সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় মোঙ্গলরা। ফলে যারা গণহত্যা থেকে বেঁচে গেল, কৃষিজমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে খাদ্যাভাবে তারা মারা যেতে থাকে।

মোঙ্গল আক্রমণ মানব ইতিহাসের এমন এক ঘটনা, যার সাথে এর আগে-পরের কোনো কিছুরই তুলনা করা যায় না। এই আক্রমণ পুরোপুরি বদলে দেয় মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও উত্তর চীনের ডেমোগ্রাফি।

পৃথিবীর সবচেয়ে সফল বায়োলজিক্যাল ফাদার হিসেবে চেঙ্গিজ খান রেখে গেছেন তার জিনের কপি, যা এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার ০.৫% তার বংশধর।

---

২৩. Ara, Aniba Israt, and Arshad Islam. Chinggis Khan And His Conquest Of Khorasan: Causes And Consequences. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.

২৪. Ara, Aniba Israt, and Arshad Islam. Chinggis Khan And His Conquest Of Khorasan: Causes And Consequences. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.

২৫. Herbert Franke; Denis Twitchett; John King Fairbank (1994). The Cambridge History of China: Volume 6, Alien Regimes and Border States. Cambridge University Press.

২৬. Frazier, Ian (25 April 2005). "Annals of history: Invaders: Destroying Baghdad". The New Yorker. p. 4.

নয়

ইসলামের শুরুর দিকের আরব মুসলিমদের বেশিরভাগই ছিলেন নিরক্ষর মানুষ। কিন্তু এক শতাব্দীর ভেতরে বিষয়টা পুরোপুরি বদলে যায়। মধ্যযুগের শুরুতে ইসলাম এক শিক্ষা বিপ্লব হিসেবে হাজির হয়েছিল। যা পরের দুই শ বছরে আল আন্দালুস থেকে শুরু করে সিন্ধু, কাজাখস্তান থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুর দিকে অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারীদের চেয়ে মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক বেশি ছিল।

বাগদাদ, বুখারা, সমরকন্দ, কর্দোবা, সেভিল, বালখ, নিশাপুর, তিরমিয, মার্ভ, তুস, গজনি, আলেপ্পো, কায়রো, দামেশক, গ্রানাডা নামের শহরগুলো ছিল জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখার মতো।

মোঙ্গল আক্রমণে এশিয়াতে থাকা এসব শহরের ভেতর দামেশক বাদে বাকি সব শহর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এসব শহরের অধিবাসী যেসব পণ্ডিত ছিলেন, তাদের বেশিরভাগই গণহত্যার শিকার হন।

প্রায় একই সময়ে কর্দোবা, সেভিলসহ আল আন্দালুসের শহরগুলো পড়ে স্প্যানিশ ক্রুসেডারদের হাতে।

সেই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়া শুরু, গত আট শ বছরে তা আর সামলে উঠা সম্ভব হয়নি। (এর মানে এই না যে মোঙ্গল আক্রমণই মুসলিমদের শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার একমাত্র কারণ)।

১২১৯-১২৬০ সালের ভেতর মোট শিক্ষিত মুসলিমদের সিংহভাগ চেঙ্গিজ খান ও তার উত্তরাধিকারীদের তলোয়ারের নিচে জীবন দেয়।

পুরো একটা সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হবার যোগাড় হয়।

হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংসের পর বিধ্বস্ত করে দেন আলেপ্পোকেও। দামেশক থেকে ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান আইয়ুবি শাহজাদারা।

মোঙ্গলদের পরবর্তী লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মিসর।

এই সময়েই ক্রুসেডাররা পরিকল্পনা করতে থাকে, মোঙ্গলদের সাথে জোট বেঁধে তারা দখল করবে জেরুসালেম। তারপর গুঁড়িয়ে দেবে মুসলিমদের পবিত্র তীর্থভূমি, মক্কা ও মদিনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জানবাজ মামলুক

মিসরের সিংহ

এক

মামলুকরা আমির আন নাসির ইউসুফকে খুঁজছে। তাকে হত্যা করতে হবে।

আমির দামেশককে হালাকু খানের হাতে তুলে দিতে চান, যা মামলুকরা কোনোভাবেই মানতে রাজি না। তাকে খুঁজতে শহর তোলপাড় করে ফেলল মামলুকরা।

সারা রাত খুঁজেও আন নাসির ইউসুফকে পাওয়া গেল না।

দুদিন পর জানা গেল, তিনি মিসরের দিকে রওনা দিয়েছেন। তার অধিকাংশ আমির, যারা মুখে লড়াইয়ের কথা বলতেন, তারা সবাই যার যার ধন-সম্পদ, বউ-বাচ্চা নিয়ে ছুটেছেন মিসরের দিকে।

মোঙ্গলরা এমন এক দুর্যোগ, যা থেকে মানুষ কেবল পালাবার কথাই ভাবতে পারে।

মিসর সীমান্তে আসার পর নাসির জানতে পারলেন, তাকে মিসরে ঢুকতে দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

তিনি আশ্রয় চেয়ে চিঠি লিখলেন মিসরের সুলতান সাইফ উদ্দিন কুতুজের কাছে।

কুতুজ জবাব দিলেন, জনগণের দেয়া করের টাকায় এত দিন আমিরি ফলাতে থেকে এখন তাদের ফেলে আমার কাছে আসা হয়েছে? মিসরে তোমার মতো কাপুরুষের কোনো জায়গা নেই।[১]

আন নাসির ইউসুফের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সুলতানের আদেশে কেড়ে নেয়া হলো তার সমস্ত সম্পদ। তার স্ত্রী-সন্তানকে মানবিক কারণে মিসরে ঢুকতে দেয়া হলো। কিন্তু তাকে ও তার আমিরদের ঢুকতে দেয়া হলো না।[২]

---

১. Al-Maqrizi. Al Selouk Leme'refatt Dewall al-Melouk. Dar al-kotob. 1997. p. 509/vol. 1

২. Al-Maqrizi. Al Selouk Leme'refatt Dewall al-Melouk. Dar al-kotob. 1997. p. 509/vol. 1

আমিররা কয়েক দিনের ভেতরেই নাসিরকে ছেড়ে পালালেন। তারপর এক দিন তাকে বন্দি করে মামলুকরা পাঠিয়ে দিল হালাকু খানের কাছে।

কাপুরুষদের বাহরিয়্যা মামলুকরা মনে-প্রাণে ঘৃণা করত।

দুই

সুলতান সাইফ উদ্দিন কুতুজের কাছে হালাকু খানের চিঠি এসেছে।

চিঠিতে লেখা–

'পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত রাজাদের রাজা, সম্রাটদের সম্রাট, খানদের খান খাকানের পক্ষ থেকে মামলুক কুতুজের প্রতি, যে কী না আমাদের তলোয়ারের নিচ থেকে পালিয়েছে, শোনো!

অন্য সাম্রাজ্যগুলোর কী হয়েছে, একবার চিন্তা করে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, আমরা এক বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেছি এবং পৃথিবীর বুকে যে বিশৃঙ্খলা-জঞ্জাল জমেছিল, তা সাফ করেছি। আমরা বিশাল এক ভূখণ্ড জয় করে পাইকারীভাবে হত্যা করেছি সেখানে বসবাসরত জনগণকে। তুমি আমাদের সেনাবাহিনীর ত্রাস থেকে কোনোভাবেই পালাতে পারবে না।

তুমি কোথায় পালাবে? আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুতগামী, আমাদের তীর ধারালো, আমাদের তলোয়ার বজ্রের মতো, আমাদের হৃদয় পর্বতের মতো অনড়, আমাদের সৈন্যসংখ্যা মরুভূমির বালির মতো অগণিত।

আমাদের না সেনাবাহিনী দিয়ে ঠেকানো যায়, না থামানো যায় দুর্গ দিয়ে। তোমাদের স্রষ্টার কাছে করা কান্নাকাটি আমাদের বিপরীতে কোনো কাজেই আসবে না। আমরা না চোখের পানিতে গলে যাই আর না মধুর কথায় ভুলে যাই।

তারাই আমাদের তলোয়ার থেকে বাঁচতে পারে, যারা আমাদের কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা করে। যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার আগেই এই চিঠির জবাব দাও। যদি লড়াই কর, তবে তোমরা চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। আমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিব। আমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর দুর্বলতাগুলোকে প্রকাশ করে দেবো। আর তোমাদের ছেলে-বুড়োকে একসাথে হত্যা করব। এই মুহূর্তে তোমরা ছাড়া লড়াই করার মতো আর কোনো শত্রু আমাদের নেই।'[৩]

সুলতান চিঠির জবাব লিখিতভাবে দিলেন না। যে দুই দূত চিঠি নিয়ে এসেছিল, প্রথমে তাদের শরীর কোমর থেকে শরীর করাত দিয়ে কেটে দু টুকরো করে ফেলা হলো, তারপর মাথা আলাদা করে কায়রোর আল জুওয়েলিয়া গেটে বর্শায় গেঁথে ঝুলিয়ে দেয়া হলো।[৪]

---

৩. Tschanz, David W. "Saudi Aramco World : History's Hinge: 'Ain Jalut".

৪. Man, John (2006). Kublai Khan: From Xanadu to Superpower. London: Bantam. pp. 74–87. ISBN 978-0-553-81718-8.

তিন

এই খবর শুনে ক্ষোভে বারুদের মতো ফুঁসে উঠলেন হালাকু খান। তিন লাখ যোদ্ধা নিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু ভাগ্য এখানে হস্তক্ষেপ করল।

১২৬০ সালের বসন্তে হালাকু খানের কাছে খবর এল, খাকান মোঙ্কি খান দক্ষিণ চীনে অভিযান চলাকালীন অবস্থায় মারা গেছেন। কারাকোরামে জরুরিভাবে কুরুলতাই ডাকা হয়েছে। চেঙ্গিজ খানের সব বংশধরকে অনতিবিলম্বে কারাকোরামে হাজির হতে হবে। সেখানে তাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে নতুন খাকান।

খাকান হতে কে না চায়? আর সব মোঙ্গল প্রিন্সের মতো হালাকু খানকেও ছুটতে হলো কুরুলতাইয়ে। কিন্তু যাবার আগে তিনি দূত হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য দুই টুমেন যোদ্ধা রেখে গেলেন কিতবুকা নোইয়নের নেতৃত্বে। তার কাছে গোয়েন্দা প্রতিবেদন ছিল, মামলুকদের পরাজিত করতে এই দুই টুমেন (১৫-২০ হাজার) যোদ্ধাই যথেষ্ট। কিতবুকাকে অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে হালাকু রওনা হলেন মঙ্গোলিয়ার দিকে।

আরও অনেক উত্তরে পোল্যান্ড থেকে কারাকোরামের দিকে রওনা দিচ্ছিলেন আরেক মোঙ্গল প্রিন্স বারকি খান। তিনি কেবলই পোল্যান্ডে একদফা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফিরছিলেন।

এত দিন মোঙ্গলদের সাথে ক্রুসেডারদের সম্পর্ক ভালোই ছিল। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে পোপ ধারণা করলেন, মোঙ্গলদের ধর্ম নিয়ে খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। মুসলিমদের শেষ করে পরবর্তী আঘাত তারা খ্রিষ্টান বিশ্বের ওপরেই হানবে। প্রায় একই কথা পোপকে লিখে পাঠালেন মোঙ্গল খানের দরবার ঘুরে আসা পোপের প্রতিনিধি উইলিয়াম অফ রুবরাক।[৫]

পোপ আলেকজান্ডার পাপাল বুল জারি করলেন, মোঙ্গলদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে তাদের ক্যাথলিক গির্জা একঘরে করে দেবে। তারা খ্রিষ্টান বিশ্ব থেকে বহিষ্কৃত বলে ধরে নেয়া হবে।[৬] এই খবরে ভড়কে গেল সিরিয়া-ফিলিস্তিনের ক্রুসেডার রাজ্যগুলোর নেতারা। কারণ, তারা এত দিন মোঙ্গলদের সাথে নিয়ে মুসলিমদের শেষ করার স্বপ্ন দেখছিল। সবচেয়ে বিপদে পড়লেন এন্টিয়কের রাজা বোহেমন্ড। আলেপ্পো দখলের সময় তাকে মোঙ্গলদের সাথে রাস্তায় রাস্তায় ক্রুশ হাতে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল।

সামরিক কৌশলগত দিক থেকে ক্রুসেডারদের অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগর উপকূল ঘেঁষে মোঙ্গল ইলখানাত আর মামলুক সালতানাতের মাঝামাঝি জায়গায়। তাদের সমর্থন উভয়পক্ষের জন্যই খুবই জরুরি ছিল। পাপাল বুল জারির ফলে বাধ্য হয়ে তারা মোঙ্গল-মুসলিমদের এই লড়াইয়ে নীরব ভূমিকা পালন করল।

---

৫. Montalbano, K.A., 2015. Misunderstanding the Mongols: intercultural communication in three thirteenth-century Franciscan travel accounts. Information & Culture, 50(4), pp.588-610.

৬. Jackson, P., 1991. The Crusade Against the Mongols (1241). The Journal of Ecclesiastical History, 42(1), pp.1-18.

চার

কিতবুকা নোইয়ন এগিয়ে আসছে। খবরটা কায়রোতে চাউর হয়ে গেছে।

কয়েক দিনের ভেতর ফাঁকা হয়ে গেছে শহরের বেশিরভাগ।

মাগরেবিরা পালিয়েছে মরক্কোর দিকে। আরবরা বেশিরভাগ পালিয়েছে ইয়েমেনের দিকে। শহরের গ্যারিসনে থাকা মামলুক সৈন্যরা ছাড়া তেমন কেউ নেই। আলেম ওলামারাও নিস্তব্ধ। কায়রোর পতন যে নিশ্চিত, তাতে কারও সন্দেহ নেই। অতি আশাবাদীরাও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

এর আগে মোঙ্গলদের দূত হত্যার সাহস দেখিয়েছিলেন খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ, তার পরিণতি হয়েছিল ভয়ংকর। একই কাজ করেছেন মামলুক সুলতান সাইফ উদ্দিন কুতুজ।

কিতবুকা নোইয়ন সিরিয়া থেকে রওনা হবার খবর শুনে দ্রুত জরুরি পরামর্শ সভা ডেকেছেন সুলতান।

পরামর্শ সভায় আরও অনেকের সাথে যোগ দিয়েছিলেন বাইবার্স আর কালাউন। আমিরদের বেশিরভাগ পালানোর বাহানা দিতে ব্যস্ত থাকলেও বাইবার্স কালাউনের মতো অভিজ্ঞ কমান্ডারদের সমর্থন পেয়ে সুলতানের মনোবল বেড়ে গেল।

কিন্তু তাতেও পরামর্শ সভাকে যুদ্ধের পক্ষে রাজি করানো গেল না। শেষে সুলতান বলে বসলেন, 'আমিরবৃন্দ, আপনারা দেশের খেয়ে, দেশের সম্পদে ধনী হয়ে এখন যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করছেন। ঠিক আছে, আমি একাই যুদ্ধে যাচ্ছি। যার ভালো লাগে সে আমার সাথে এসো, যার ভালো লাগে না, সে ঘরে ফিরে যাও। কিন্তু যে আমার সাথে যুদ্ধে যাবে না, তাকে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হবার পাপ হাশরে বহন করতে হবে।[৭]

এই কথার পর মাথা নিচু করে সুলতানের আদেশ মেনে নিতে বাধ্য হলেন আমিররা। যুদ্ধের নীল নকশা কাটা শুরু হলো।

মূল পরিকল্পনার দায়িত্ব নিলেন বাইবার্স, অথচ তিনি ছিলেন কুতুজের পরম শত্রু। কিন্তু ইসলামের এই চরম বিপদের মুহূর্তে তারা সবাই বুঝতে পারছিলেন, বড় শত্রুর সামনে ছোট শত্রুতা ভুলে না গেলে ধ্বংস অনিবার্য।

কুতুজ বললেন, এত দিন মোঙ্গলরা সবাইকে আগে আক্রমণ করেছে। তাই যুদ্ধের স্থান-কাল সব সময় তারা তাদের সুবিধামতো বেছে নিতে পেরেছে। এবার আমরা আগে আক্রমণ করব। ওরা আমাদের বেধে দেয়া জায়গায় লড়াই করতে বাধ্য হবে, একমাত্র তখনই ওদের সাথে আমাদের জেতা সম্ভব।

---

৭. Al-Maqrizi, p. 515/vol. 1

বাইবার্স সিরিয়া-ফিলিস্তিনে ছিলেন অনেক বছর। তিনি পরিকল্পনা করলেন, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মোঙ্গলদের কৌশলেই লড়াই করা হবে। তাদের টেনে আনা হবে সিরিয়ার মরুভূমির ভেতর দিয়ে ফিলিস্তিনে। সেখানে তাদের ধোঁকা দিয়ে নিয়ে আসা হবে পাহাড়ী অঞ্চলে, যেখানে মোঙ্গলরা এনভেলপিং ট্যাকটিক্স ব্যবহার করতে পারবে না।

এই সময়েই মিসরের বিজ্ঞানীরা নিয়ে এলেন নতুন এক অস্ত্র, মিদফ। মধ্যযুগীয় হ্যান্ড ক্যাননের আদিপুরুষ। এটা দিয়ে ভলি ফায়ার করে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায়, বিকট শব্দও সৃষ্টি করা যায়। 'মিদফা' ব্যবহারের দায়িত্ব দেয়া হলো একটা ইউনিটকে।

ঠিক করা হলো, সিনাই উপদ্বীপ দিয়ে ফিলিস্তিনে ঢুকে কিতবুকার বাহিনীকে ফিলিস্তিনের পাহাড়ী অঞ্চল নাজারেথে নিয়ে আসা হবে। তাদের চ্যালেঞ্জ করা হবে সেপ্টেম্বরের তীব্র গরমে। যখন মোঙ্গল ঘোড়ারা আরবের উত্তাপে হাঁপাতে শুরু করবে।
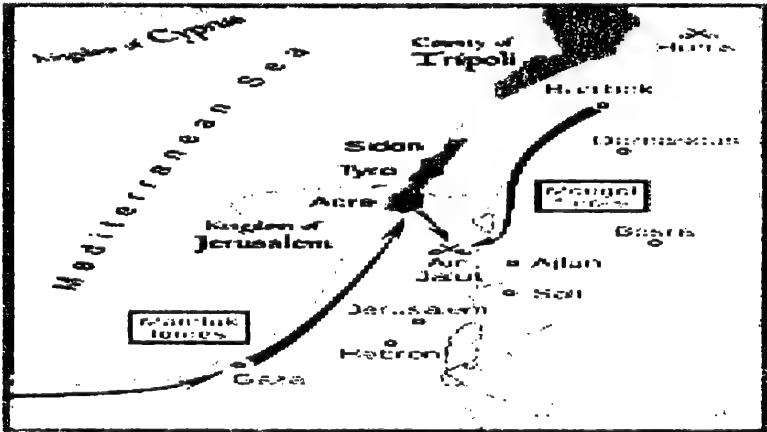
দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে যাওয়ার পথটা মুসলিম বাহিনীর গতিপথ, আর উত্তর থেকে দক্ষিণে যে গতিপথটা দেখা যাচ্ছে তা মোঙ্গলদের গতিপথ।

আগস্টের মাঝামাঝিতে বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুলতান সাইফ উদ্দিন কুতুজ। এই যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। হয় তারা জিতবেন, নয় ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে।

পাঁচ

কিতবুকার বাহিনীকে দূর থেকে আতশ কাচ ফেলে দেখতে পেয়েছে গোয়েন্দারা। আর মোঙ্গলরা তাদের দেখতে পেয়েছে খালি চোখেই। মোঙ্গলরা খালি চোখে প্রায় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখতে পায়।

মোঙ্গলদের দেখা গেছে শুনে বাইবার্স তার বাহিনীর দিকে ফিরে হুংকার দিয়ে উঠলেন, আগাও!

মোঙ্গলদের মুখোমুখি হওয়ামাত্রই প্রবল এক ক্যাভালরি চার্জ করে বসল বাইবার্সের বাহিনী। মোঙ্গলদের ছোঁড়া তীরে কিছু মামলুক সওয়ার শহিদ হয়ে গেলেন। দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে গেল মোঙ্গল বাহিনী। বাইবার্স ঘোড়া ঘুরিয়ে পিছু হটে গেলেন।

আরবি ঘোড়ার সাথে দৌড়ে পারা মোঙ্গল ঘোড়ার কাজ নয়। কিতবুকা বাইবার্সকে ধরতে পারলেন না।

একটু পর বাইবার্স আবার এক ক্যাভালরি চার্জ শানালেন। আবার পিছু ধাওয়া করলেন কিতবুকা, আবারও ফসকে গেলেন বাইবার্স।

এভাবে বেশ কয়েক দফা আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের পর বিরক্ত হয়ে কিতবুকা সিদ্ধান্ত নিলেন বাইবার্সকে তাড়া করে ধরবেন, তারপর শেষ করে ক্ষান্ত হবেন। ধারে কাছে কোথাও আর কোনো মুসলিম ফৌজ দেখা যাচ্ছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে কিতবুকার খুব বেশি দ্বিধায় ভুগতে হয়নি।

বাইবার্স মোঙ্গলদের টেনে নিয়ে গেলেন আইন জালুতের পাহাড়ি এলাকায়। বেশ উঁচুতে পৌঁছানোর পর হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে কিতবুকার মুখোমুখি হলেন তিনি।

কিতবুকা বিকট গর্জন করে মামলুকদের দিকে এগোতে লাগলেন।

কিন্তু তার হিসাবে একটা ভুল হয়ে গেল।

পেছন থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছিলেন সুলতান কুতুজ। বাইবার্সের বাহিনী আসলে মামলুকদের মূল বাহিনীর একটা অংশ মাত্র, মূল বাহিনী আছে সুলতান কুতুজের সাথে।

কিতবুকা বুঝে গেলেন, তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। তার সঙ্গী জেনারেলেরা জিজ্ঞেস করলেন, কী করা যায়?

কিতবুকা বললেন, আর পিছু হটার উপায় নেই। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে মরতে চাই। খান দীর্ঘজীবী হোন।[৮]

বীর বিক্রমে মোঙ্গলরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মামলুকদের ওপর। কিন্তু তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাওয়ায় তারা ট্যাকটিক্যাল দিক থেকে কোনো সুবিধাই পাচ্ছিল না। কোনো ক্ল্যাসিক্যাল মোঙ্গল ট্যাকটিক্সই এই ধরনের ন্যারো টেরেইনে কাজ করে না। ফলে যুদ্ধ পরিণত হলো রক্তাক্ত হাতাহাতি লড়াইয়ে।

কিতবুকার প্রচণ্ড হামলায় মামলুকদের লেফট উইং ভেঙে গেল। প্রচুর মামলুক ফারিস শহিদ হয়ে গেল। এক পর্যায়ে মনে হতে লাগল লেফট উইং গুঁড়িয়ে দিয়ে কিতবুকা বেরিয়ে যাবে।

---

৮. Buell, P.D., 2010. The A to Z of the Mongol World Empire (Vol. 151). Scarecrow Press.

পাহাড়ের একটু উপরে নিজের ব্যক্তিগত ইউনিট নিয়ে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন সুলতান। যুদ্ধের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় 'ওয়া ইসলামাহ! ওয়া ইসলামাহ!' (আমার ইসলাম, আমার ইসলাম)[৯] বলে হুংকার দিয়ে নিজের শিরস্ত্রাণ ছুঁড়ে ফেলে লেফট উইংয়ে ছুটে গেলেন তিনি।

লড়াইয়ের ভয়ংকরতম জায়গায় কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই মহাবিক্রমে লড়ছিলেন কুতুজ। সুলতানের বীরত্বে উজ্জীবিত হয়ে নতুন করে লড়াই শুরু করল পুরো বাহিনী। সুলতান মরু সাইমুমের মতো তলোয়ার চালাচ্ছিলেন আর চিৎকার করছিলেন, ইয়া আল্লাহ! তোমার গোলাম এই কুতুজকে আজকে বিজয়ী করো![১০]

কিতবুকা মরিয়া হয়ে শেষবারের মতো ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন।

দুর্দান্ত এক ক্যাভালরি চার্জ করে তার বাহিনী মামলুকদের ফরমেশনের কয়েকটি জায়গা ভেঙে ফেলল। তারপর আরও একটি চার্জ করে ফরমেশন পুরোপুরি ভেঙে দিতে এগিয়ে এল।

এই সময়েই মিদফা ইউনিট দফায় দফায় হ্যান্ডক্যাননের বিস্ফোরণ ঘটালো। আগুনের হলকা আর তীব্র আওয়াজে ভড়কে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল মোঙ্গলদের ঘোড়া।

এবার অল আউট এসল্টের নির্দেশ দিলেন সুলতান কুতুজ।

এই হামলা সহ্য করার ক্ষমতা মোঙ্গলদের ছিল না।

১২৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখ বিকেল নাগাদ আইন জালুতের ময়দান ভরে গেল মোঙ্গলদের লাশে। লাশে ভরা ময়দানের মাঝামাঝি দেখা যাচ্ছিল, সাইফ উদ্দিন কুতুজ সিজদায় পড়ে আছেন।

আইন জালুত পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দেয়া একটা লড়াই।

---

৯. (Al-Maqrizi, p. 516/vol. 1) – (Ibn Taghri, pp. 105–273/ Al-Muzafar Qutuz)

১০. Shayyal, Jamal, Prof. of Islamic history, Tarikh Misr al-Islamiyah (History of Islamic Egypt), dar al-Maref, Cairo 1266, p. 123/vol.2 ISBN 977-02-5975-6

ছয়

আপাত দৃষ্টিতে মাঝারি আকারের একটা যুদ্ধ হলেও এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছিল বিশাল। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা প্রথম বুঝতে পারে, মোঙ্গলরা অপরাজেয় নয়। মারাত্মকভাবে ভেঙে যায় মোঙ্গলদের আত্মবিশ্বাস। ঠিক উল্টোটা ঘটে মুসলিমদের ক্ষেত্রে।

সুলতান কুতুজের নির্দেশে যুদ্ধের পর পালিয়ে যাওয়া মোঙ্গলদের ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান বাইবার্স। সিরিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত যত মোঙ্গল গ্যারিসন আছে, সব খালি করে পালাতে থাকে হালাকু খানের সেনারা।

মোঙ্গলদের আইন জালুত থেকে একটানা প্রায় তিন শ কিলোমিটার পর্যন্ত ধাওয়া করে ইরাক পর্যন্ত নিয়ে যান বাইবার্স।

আইন জালুতের যুদ্ধের মাধ্যমে আরেকটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেবার মতো কোনো আরব রাজনৈতিক-সামরিক শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। নেতৃত্ব চলে গেছে তুর্কি মামলুকদের হাতে।

বারকি খান

এক

মোঙ্কি খানকে মোঙ্গলদের সিংহাসনে বসানোর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল জোচি খানের বড় ছেলে বাটু খান আর তার প্রিয় ছোট ভাই বারকি খানের।[১] মোঙ্কি খানের অভিষেক কুরুলতাইয়ের পুরোটা অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন বারকি খান। তার ও তার ভাইয়ের তলোয়ারকে সবাই যথেষ্ট সমঝে চলত। তাদের ধমনিতে বইছিল চেঙ্গিজ খানের বিদ্রোহী পুত্র জোচি খানের রক্ত।

মোঙ্কিকে সিংহাসনে বসিয়ে কিপচাক স্তেপে ফিরছিলেন বারকি খান। তিনি তখন তেতাল্লিশ বছরের মধ্যবয়সী যুবক। তার নেতৃত্বের গুণের কথা কিপচাকভূমি থেকে কারাকোরাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

কারাকোরাম থেকে সারাই ফেরার পথে তিনি বুখারায় থামলেন। সেখানে তিনি এক কাফেলাকে থামিয়ে তাদের ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সেই কাফেলাতে ছিলেন বিখ্যাত সুফি সাধক সাইফ উদ-দীন দরবেশ। সাইফ উদ-দীনের সাথে কথা বলার পর বারকির মনে তোলপাড় শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বারকি ইসলাম গ্রহণ করলেন। চেঙ্গিজ খানের প্রথম বংশধরদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলামের ছায়াতলে আসেন।

চেঙ্গিজ খান ইসলামি জাহানের ভূমি জয় করেছেন বটে; কিন্তু ইসলাম এবার চেঙ্গিজের বংশধরদের জয় করতে শুরু করল।

বারকি খানকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে তার ভাতিজা দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সেনাপতি নোগাই খানও মুসলিম হয়ে গেলেন। বিখ্যাত মোঙ্গল নোইয়ন নিকুদারসহ বারকির বাহিনীর অধিকাংশ জেনারেল ইসলাম গ্রহণ করলেন কয়েক বছরের ভেতর।[২]

---

১. Knobler, A., 1996. Pseudo-Conversions and Patchwork Pedigrees: The Christianization of Muslim Princes and the Diplomacy of Holy War. Journal of World History, 9(2), pp.181-197.

২. Williams, B.G., 2001. The Crimean Tatars: the diaspora experience and the forging of a nation (Vol. 2). Brill.

এরই মধ্যে মোঙ্কি খান হালাকু খানের মাধ্যমে বাগদাদ অভিযান শুরু করলেন। এর কিছুদিন আগেই বাটু খানের মৃত্যু হয়। নিজের রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকা বারকি বাগদাদ পতনের খবর পান ঘটনার প্রায় ছয় মাস পর।

খলিফার মৃত্যুর ঘটনা, বাগদাদের মুসলমানদের ওপর মোঙ্গলদের পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা নওমুসলিম বারকি খানের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। খাকান মোঙ্কি খানকে তিনি প্রকাশ্যে জানান, 'হালাকু মুসলিমদের সব শহর ধ্বংস করেছে, সে খলিফাকেও হত্যা করেছে। আল্লাহর সাহায্যে আমি তার কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ নিষ্পাপ মানুষের রক্তের বদলা নিয়ে ছাড়ব।'[৩]

খাকানের কাছে এই ধরনের চিঠি লেখার সাহস তখন বারকি খান ছাড়া আর কারও ছিল না।

খুব ঠান্ডা মাথায় বারকি হালাকুর বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধ শুরু করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই মোঙ্কি খান মারা গেলেন। কুরুলতাইতে গেলেন আরিক বোকে, হালাকু খান, কুবলাই খান, বারকি খান, কাইদু খানসহ চেঙ্গিজ বংশের সব প্রিন্স।

বারকি জানতেন, হালাকুর ক্ষমতার মূল উৎস এত দিন ছিল তার ভাই মোঙ্কি খান আর কুবলাই খান। মোঙ্কি এখন মৃত, যদি কুবলাই খানকে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসা থেকে ঠেকানো যায় তাহলে হালাকুকে বিপদে ফেলা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

মোঙ্গল সিংহাসনের লড়াইয়ে বারকি খান কুবলাই খানের বিরুদ্ধে আরিক বোকেকে সমর্থন করলেন। প্রচুর অর্থ ও সামরিক প্রভাব খাটিয়ে মোঙ্গল খানদের একটা বড় অংশকে আরিক বোকের পক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলেন। শুরু হয়ে গেল আরিক বোকের সাথে কুবলাই খানের যুদ্ধ। কুরুলতাই ভেঙে গেল।

মোঙ্গল সিংহাসন নিয়ে প্রথমবারের মতো শুরু হলো রক্তক্ষয়ী সংঘাত।

রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। আর মঙ্গোলিয়ায় যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল, তখন বারকি খান হালাকু খানের ওপর খলিফা হত্যার প্রতিশোধ নিতে তৈরি হতে লাগলেন।

দুই

আইন জালুতের চরম পরাজয় হালাকু খান এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি। ইরানে ফিরেই তিনি মামলুকদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বাহিনী তৈরি করতে শুরু করেন। প্রায় দেড় লাখ যোদ্ধা যোগাড় করে তিনি আবার সিরিয়ার দিকে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

---

৩. Biran, M., 2002. The Chaghadaids and Islam: The Conversion of Tarmashirin Khan (1331-34). Journal of the American Oriental Society, pp.742-752.

মামলুকদের পক্ষে এত বড় বাহিনীকে মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। এরই মধ্যে সুলতান বাইবার্স জানতে পারলেন, কিপচাক খানাতের খান বারকি মুসলিম হয়ে গেছেন।

তিনি বারকিকে ভাই সম্বোধন করে কয়েকজন দরবেশকে সাথে পাঠিয়ে একটা চিঠি লিখলেন।[৪]

বারকি খান জবাবে বাইবার্সকে চিন্তিত হতে নিষেধ করলেন। নিজের দুই সন্তান হুসসাম আর আলাউদ্দিনকে বারকি কায়রোতে পাঠিয়ে দিলেন কয়েক হাজার সুঠামদেহী দাস দিয়ে। সাথে জানিয়ে দিলেন, হালাকু খানের মূল বাহিনীকে তিনি মিসরের দিকে যেতে দেবেন না; বরং তাদের নিজের দিকে টেনে আনবেন।

মিসরও বাঁচবে, সেই সাথে মুসলিমদের রক্তের বদলা আর ককেশাস নিয়ে হিসেব-নিকেশ, সবই মেটানো যাবে।

তিন

বারকি খান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, হালাকু খানকে হয় তিনি শেষ করবেন নয়তো তার জীবন এমনভাবে বিষিয়ে দেবেন যেন, সে একরাতও শান্তিতে ঘুমাতে না পারে।

আজারবাইজানে তিনি তার দুরন্ত ভাতিজা নোগাইকে চার টুমেন যোদ্ধা দিয়ে অভিযান চালাতে বললেন। এই অঞ্চল নিয়ে হালাকুর সাথে আগে থেকেই তার সম্পর্ক খারাপ ছিল।

এদিকে হালাকু খান তার ছেলে আবাকা খানকে নোগাইয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে বললেন। নোগাইকে থামাতে ব্যর্থ হয়ে আবাকা হালাকুকে এগিয়ে আসতে বললেন। বিপদ দেখে নোগাই খান ডাকলেন বারকি খানকে।

তারিক নদীর তীরে ১২৬২ সালে ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল।

মোঙ্গলদের সাথে মোঙ্গলদের এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো ককেশাসে। যেখানে মোঙ্গলদের একপক্ষ হালাকু খানের সাথে রণদেবতা সুলদের নামে যুদ্ধ করছিল। আরেকপক্ষ বারকি খানের নেতৃত্বে লড়ছিল মুখে তাকবির ধ্বনি দিয়ে।

সারা দিন ধরে ভয়াবহ যুদ্ধের পর বারকি খানের সোনালি বাহিনী (গোল্ডেন হোর্ড) হালাকু খানের ইলখানি বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করল। এই যুদ্ধে হালাকুর লক্ষাধিক যোদ্ধা নিহত হয় বলে ধারণা করা হয়।

বাধ্য হয়ে হালাকু খানকে ইরানের দিকে পালিয়ে যেতে হয়।

---

[৪]. Broadbridge, A.F., 2001. Mamluk Legitimacy and the Mongols: The Reigns of Baybars and Qalawun. Mamluk studies review, 5, pp.95-118.

কিন্তু যুদ্ধে বারকি খানেরও বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছিল। তিনি যুদ্ধ চলাকালীন আফসোস করে বলেছিলেন– মোঙ্গলদের তলোয়ারে মোঙ্গলরা মরছে। যদি আমরা নিজেরাই নিজেদের না মারতাম, তবে আমরা বিশ্বজয় করতে পারতাম।[৫]

চার

হালাকু খান এদিকে হেরে গেলেও মঙ্গোলিয়ার গৃহযুদ্ধে জিতে গেলেন তার ভাই কুবলাই খান। কুবলাই খান ক্ষমতায় আসামাত্রই দ্রুত হালাকুর জন্য ত্রিশ হাজার মোঙ্গল যোদ্ধার এক বাহিনী পাঠালেন।

মঙ্গোলিয়ার নিয়ন্ত্রণ বারকির হাত থেকে একেবারেই চলে গেল।

এখন মোঙ্গলদের খাকান কুবলাই খান হালাকুর আপন ভাই। হালাকুর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করতে গেলে তাকে পূর্বে কুবলাই আর দক্ষিণে হালাকুর সাথে একসাথে লড়ার ঝুঁকি নিতে হবে। তাই তিনি সেবারের মতো থামতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু তার প্রতিশোধের নেশা গেল না।

পশ্চিমে আনাতোলিয়ার পরাধীন সেলজুক সুলতান কায় খসরুকে তিনি অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করলেন। আর পূর্বে নিকুদার নোইয়নকে পাঠালেন আফগানিস্তান থেকে হালাকুর অধিকৃত অঞ্চলে ঘন ঘন হামলা চালাতে।

হালাকুর অনুরোধে পশ্চিম থেকে বাইজান্টাইন সম্রাট মাইকেল সেলজুক সুলতানকে বন্দি করলেন।

এই খবর পেয়ে নোগাই খানকে বুলগেরিয়া ও থ্রেস আক্রমণের নির্দেশ দিলেন বারকি। নোগাইয়ের ভয়ংকর আক্রমণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল।

সম্রাট মাইকেল নিজের মেয়েকে নোগাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে বারকি খানকে উপহার পাঠিয়ে নিশ্চিত করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে সেলজুক বা মামলুকসহ মুসলিম কোনো সুলতানের সাথে কোনো প্রকার ঝামেলায় যাবেন না। সেই সাথে বুলগেরিয়া থেকে পাওয়া রাজস্ব গোল্ডেন হোর্ডকে (কিপচাক খানাত-বারকির সাম্রাজ্য) দেয়া হবে।[৬]

পূর্ব-পশ্চিম আর উত্তর থেকে টানা বারকি খানের আঘাতের পর আঘাতে হালাকু খানের জীবন বিষময় হয়ে ওঠেছিল। আইন জালুতের পরাজয়ের প্রতিশোধ তিনি আর কখনো নিতে পারেননি।

---

৫. Johan Elverskog (6 June 2011). Buddhism and Islam on the Silk Road. University of Pennsylvania Press. pp. 186–. ISBN 0-8122-0531-6.

৬. Sinor, D., 1999. The Mongols in the West. Journal of Asian History, 33(1), pp.1-44.

১২৬৫ সালে তার মৃত্যু ঘটে। দুবছর পর মারা যান বারকি খানও।

মোঙ্গল পরিচয়ের চেয়ে বারকি খানের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল মুসলিম পরিচয়।

অসাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতায় তিনি হালাকু খানের বিশাল বাহিনীকে সিরিয়ার দিকে মার্চ করা থেকে দূরে রেখেছিলেন। বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন হালাকুর সামরিক শক্তি। জীবনের শেষ সাত বছর তিনি ব্যয় করেছেন হালাকু খানের হাত থেকে পবিত্রভূমিকে রক্ষা করতে। বারকি খান সে সময় বাধা হয়ে না দাঁড়ালে মামলুকদের পক্ষে মোঙ্গলদের বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না।

বারকির সাথে হালাকুর এই যুদ্ধ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের সমাপ্তির লক্ষণ হয়ে দেখা দেয়। কুবলাই খানের বিরুদ্ধে সিংহাসনের লড়াইয়ে আরিক বোকেকে সমর্থন দিয়ে বারকি চিরদিনের জন্য মোঙ্গল সাম্রাজ্যকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেন।

এই বিভক্তি আর কোনোদিন থামেনি।

বারকি খানের ইন্তেকালের পরেও কিপচাক খানাতে ইসলাম ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

একই সাথে চাঘতাই খানাত (মধ্য এশিয়া) ও ইলখানাতেও ধীরে ধীরে মোঙ্গলদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ইসলামের আলো। মোঙ্গলদের ভেতর ইসলাম প্রচারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে সেই মুসলিম মেয়েরা, যাদের তারা দাসী হিসেবে ধরে নিয়ে ইচ্ছামতো ধর্ষণ করেছে। ক্রমেই তারা উন্নত স্বভাব ও আচার-আচরণের অধিকারী মুসলিম মেয়েদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে। এই স্ত্রীরা মূলত ভালোবাসা দিয়ে ভেতর থেকে জয় করে নিতে থাকে মোঙ্গলদের সাম্রাজ্যগুলো, যার মোকাবেলা তলোয়ার দিয়ে করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী মোঙ্গল প্রজন্মগুলো মুসলিম মায়েদের প্রভাবে আরও বেশি পরিমাণে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। বারকি খানের মা সুলতান খাতুনও ছিলেন একজন মুসলিম।

বারকি খান ইসলামের ইতিহাসের সেই কজন ধর্মান্তরিত মুসলিমদের একজন, যাদের ইসলাম গ্রহণ ইতিহাসের ধারাকে চিরতরে বদলে দিয়েছে।

ইশকিস্তান
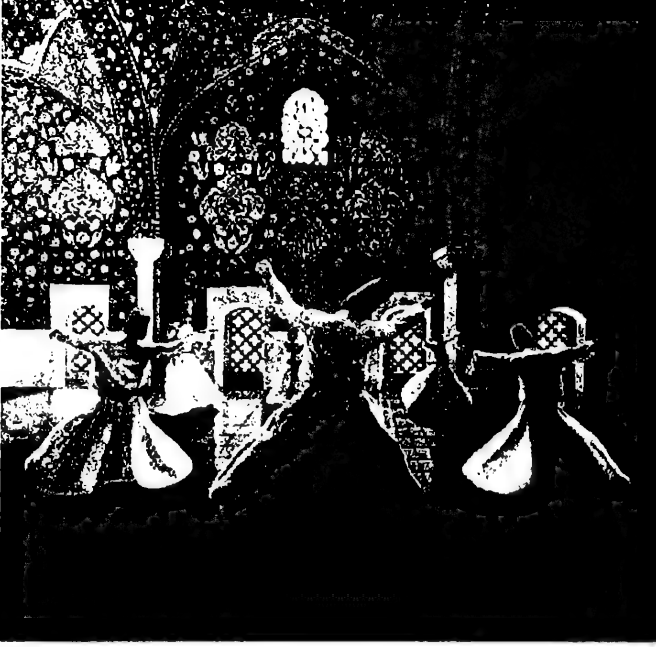
এক

জামে মসজিদের পাশে প্রায়ই এক বুড়ো ফকিরকে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। উস্কো খুস্কো চুল, লম্বা দাড়ি, ময়লা পাগড়ি পরা বুড়োর বয়স ষাটের ওপরে।

তার চোখ প্রায়ই লাল হয়ে থাকে।

বুড়ো প্রায় সারা দিনই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেন, দেখলে মনে হয় তিনি কী যেন খুঁজছেন।

এমনিতে শান্ত হলেও কেউ কথা বলতে এলেই বুড়ো একেবারে খেঁকিয়ে ওঠেন। এজন্য কেউ তাকে দেখতে পারে না।

অদ্ভুত এই বুড়ো কারও কাছে ভিক্ষা করেন না, কিছু চানও না, আবার কিছু করেনও না। কিন্তু তাকে প্রায়ই তাজা ফলমূল খেতে দেখা যায়। এমন সব ফল, যা শহরের বাজারগুলোতে পাওয়া যায় না।

বুড়োকে একই সময় দুই বা তিন জায়গায় দেখা যায় মাঝে মাঝে। এটা নিয়ে শহরের লোকেরা অবাক হয়। এমনকি মাঝে মাঝে তাকে একই দিনে আনকারা আর কোনইয়াতেও দেখার কথা শোনা গেছে মুসাফির আর বণিকদের মুখে।

বুড়ো পথে পথে ঘুরেন, আর একজনকে খোঁজেন। তাকে তিনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে খুঁজছেন।

রাতে তিনি স্রষ্টার কাছে এই প্রার্থনা করে ঘুমাতে যান যে, জীবদ্দশায় যেন তিনি সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষকে খুঁজে পান, যাকে নিজের যাবতীয় বিদ্যা তিনি শিখিয়ে যেতে পারবেন। যে তার আগুনে মেজাজ সহ্য করতে পারবে।

এই বুড়োর নাম শামস। তিনি তাবরিজ থেকে এসেছেন।

কোনইয়ার চিনি ব্যবসায়ীদের সরাইখানায় একদিন তিনি এক যুবককে দেখলেন। তার কেন যেন মনে হলো, তিনি যাকে খুঁজছেন, তাকে এবার তিনি পেয়ে গেছেন।

সেদিন রাতে শামস এক রহস্যময় কণ্ঠকে বলতে শুনলেন, 'তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেতে পারো বটে, কিন্তু সেজন্য তোমাকে তোমার জীবন দিতে হতে পারে।'

দুই

১৫ নভেম্বর, ১২৪৪।

সুদর্শন এক মাঝবয়সী উলামা ঘোড়ায় চড়ে মাদরাসা থেকে বাজারে যাচ্ছেন। তার পেছন পেছন আসছে ছাত্রদের এক ছোটখাট মিছিল। তিনি যেখানেই যান, ছাত্ররা তার সাথে আঠার মতো লেগে থাকে।

এই উলামা বেশ বিখ্যাত। আনাতোলিয়া তো বটেই, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ইরাকেও তার নাম-ডাক আছে। বালখ থেকে আসা এই উলামার নাম জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ।

রাজপথে হঠাৎ তার ঘোড়ার লাগাম ধরলেন বুড়ো ফকির। দুচোখ লাল, মুখ ধুলায় ধূসর।

শামস-ই তাবরিজি।

শামস জালালকে প্রশ্ন করলেন– এই উলামা, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তারপর এখান থেকে তোমাকে আমি যেতে দিব।

জালাল বললেন, বলুন শুনি কী আপনার প্রশ্ন।

শামস বললেন, বায়েজিদ বোস্তামি আর মুহাম্মাদ (সা.)-এর মধ্যে কে বড় সুফি?

উলামা জবাব দিলেন, এটা তো সহজ প্রশ্ন।

শামস বললেন– বায়েজিদ তো একবার বলেছিলেন, সমস্ত গৌরব আমার হোক। কী চমৎকারই না আমার এই গৌরব! আর মুহাম্মাদ (সা.) বলতেন– আমার আরও ভালোভাবে অনুভব করা উচিত ছিল, আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

জালাল এবার জবাব দিলেন– বায়েজিদ আল্লাহকে খুব সীমিতভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি এক মুহূর্তের জন্য বলে উঠেছিলেন, সমস্ত গৌরব আমার হোক। আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি মুহূর্তেই তার রবের আরও নিকটবর্তী হতে থাকতেন। যতই নিকটবর্তী হতেন, ততই তিনি তার আগেকার অবস্থা নিয়ে আফসোস করতেন।

তাই নবিয়ে কারিম মুহাম্মাদ (সা.)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি।

আপাদমস্তক কালো আলখাল্লা পরা শামস-ই তাবরিজির মনে হলো, তিনি তার আকাঙ্ক্ষিত ছাত্রকে পেয়ে গেছেন। তিনি সরাসরি জালাল উদ্দিনের চোখের ভেতরে তাকালেন।

জালাল উদ্দিনের মনে হলো, তার মাথার তালু থেকে আকাশের দিকে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়া উঠতে উঠতে তা যেন জান্নাতকে স্পর্শ করছে।

তিনি জ্ঞান হারিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান ফেরার পর জালাল উদ্দিন শামস-ই তাবরিজিকে নিজের শায়খ হিসেবে গ্রহণ করলেন। তারা প্রায় সব সময়েই একসাথে থাকতেন। দিনরাত তাদের ভেতর অত্যন্ত রহস্যময় ভাষায় কথাবার্তা হতো। শামস-ই তাবরিজির সাথে জালাল উদ্দিন চল্লিশ দিন ধরে নির্জনে সাধনা করেছিলেন। এই চল্লিশ দিন সাধনার পর থেকে জালাল উদ্দিন হয়ে গেলেন পুরোপুরি অন্য মানুষ।

প্রায় আড়াই বছর তাকে বিভিন্ন বিদ্যা শেখানোর পর একদিন হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেলেন শামস-ই তাবরিজি। তাকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১]

শামস-ই তাবরিজির এই হারিয়ে যাওয়ার কষ্ট উলামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদকে পরিণত করল এক বিরহকাতর কবিতে।

ইনিই জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ রুমি আল বালখি।

মানুষ তাকে মাওলানা বলে ডাকে।

---

১. Schimmel, A., 2001. Rumi's World: The Life and Works of the Greatest Sufi Poet. Shambhala Publications.

তিন

মাওলানা রুমি তার প্রিয়তম বন্ধু শামসকে হারিয়ে তাকে খুঁজতে পথে নামলেন। দামেশকের দিকে যাবার সময় তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল–

Why should I seek? I am the same as He.
His essence speaks through me.
I have been looking for myself![২]

তারপর তিনি থেমে গেলেন, ফিরে চললেন কোনইয়ার দিকে।

কোনইয়াতে যাবার পর তার মুখ থেকে একের পর এক কবিতার লাইন বেরিয়ে আসতে লাগল। এসব কবিতার বেশিরভাগ তার ছাত্ররা লিখে রাখতেন, অনেকেই মুখস্ত করে রাখতেন।

তার কাব্যের প্রথম সংকলন দিউয়ান-ই শামস-ই তাবরিজি। এতে আছে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার লাইন কবিতা।[৩]

রুমির জীবনের সেরা কাজ বলা হয় মসনবি-ই মানাভিকে। শিষ্য হুসামউদ্দিন চেলেবির অনুরোধে তিনি মসনবি-ই মানাভি লেখার অনুমতি দেন।[৪]

মসনবির ভূমিকায় মাওলানা বলেছেন–

'This is the book of the Masnavi, and it is the roots of the roots of the roots of the (Islamic) Religion and it is the Explainer of the Qur'ân.'[৫]

তার মুখ থেকে একের পর এক ঝরে পড়া পঞ্চাশ হাজার লাইনের একটিও বাদ পড়েনি তার ছাত্রদের কলমের গ্রাস থেকে। মসনবি সম্পর্কে প্রবাদ আছে, কুরআন যদি ফারসি ভাষায় নাযিল হতো, তবে মসনবিকে কুরআন বলে চালিয়ে দেয়া যেত।

প্রকৃতপক্ষে মসনবির ভাব ও গড়ন, বর্ণনারীতি নেয়া হয়েছে কুরআন আর হাদিস থেকে।

রুমি বলেন–

> I am the servant of the Qur'an as long as I have life.
> I am the dust on the path of Muhammad, the Chosen one.
> If anyone quotes anything except this from my sayings,
> I am quit of him and outraged by these words.[৬]

---

২. The Essential Rumi. Translations by Coleman Barks, p. xx.

৩. Franklin D. Lewis, Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teaching, and Poetry of Jalâl al-Din Rumi, rev. ed. (2008), p. 314:

৪. Papan-Matin, F., 2003. The Crisis of Identity in Rumi's Tale of the Reed. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 23(1), pp.246-253.

৫. brahim Gamard, Rumi and Self Discovery, Dar al Masnavi

ইরানি গবেষক হাদি আল হারিরি দেখিয়েছেন, মসনবির প্রায় ছয় হাজার লাইন আসলে কুরআনের আয়াতের প্রায় সরাসরি অনুবাদ।[৭]

এজন্যেই ইরানে চালু আছে আরেকটি প্রবাদ বাক্য– 'তিনি রাসূল নন, তবে তারও একটা কিতাব আছে।'

চার

রুমিকে বলা হয় ভালোবাসার কবি। তার একটা বিখ্যাত উদ্ধৃতি হচ্ছে–

> There are many ways to find Allah.
> Amongst them, I have chosen love.[৮]

ধর্মের ভয়কেন্দ্রিক প্রচারের চেয়ে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকে।

মাওলানার মতে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন সমগ্র মাখলুকাতের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ হয়ে। তাই তার শিক্ষাকে শুধু নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া সংকীর্ণ চিন্তার পরিচায়ক। এই শিক্ষা সবার জন্য।

The Light of Muhammad does not abandon a Zoroastrian or Jew in the world. May the shade of his good fortune shine upon everyone! He brings all of those who are led astray into the Way out of the desert.[৯]

মাওলানা শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে ভালোবাসতে। সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে যেতে।

তাই তিনি লিখেছেন–

> On the seeker's path, wise men and fools are one.
> In His love, brothers and strangers are one.
> Go on! Drink the wine of the Beloved!
> In that faith, Muslims and pagans are one.[১০]

রুমি দেখিয়ে গেছেন, ইসলামকে অনুসরণ করেই কীভাবে শত মত, ধর্ম, ভাষা ও গোষ্ঠীর মানুষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে।

---

৬. About the Masnavi, Dar Al-Masnavi

৭. Seyyed Hossein Nasr, "Rumi and the Sufi Tradition," in Chelkowski (ed.), The Scholar and the Saint, p. 183

৮. Renard, J., 1994. All the King's Falcons: Rumi on Prophets and Revelation. SUNY Press.

৯. Ibrahim Gamard, Rumi and Islam, p. 177

১০. Rumi: 53 Secrets from the Tavern of Love, trans. by Amin Banani and Anthony A. Lee, p. 3

তুরস্ক, আফগানিস্তান আর ইরান, এই তিনটি দেশের তিনি জাতীয় কবি। তুর্কিরা তাকে ডাকে মেভলানা, আফগানরা মাওলানা আর ইরানিরা মৌলভি। পাকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবাল এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামও মাওলানা রুমির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। রুমির ভালোবাসার কবিতা ছাড়িয়ে গেছে ধর্ম, দেশ, ভাষা আর সংস্কৃতির সীমানা।

আজ আট শ বছর পরেও রুমির কবিতা পড়া হয় ফারসি, তুর্কি, আরবি, উর্দু, স্প্যানিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, রুশসহ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জনবহুল ভাষায়।[১১]

যেমনটা তিনি ভাবতেন–

Love, however, has its own many other dialects.[১২]

একজন মুসলিম হবার পরেও তার লেখা গজল শোনা যায় হিন্দুর মন্দির থেকে শিখের গুরুদুয়ারা, জৈন আশ্রম থেকে বৌদ্ধ মঠ, খ্রিষ্টানের গির্জা থেকে ইহুদির সিনাগগ সর্বত্র।

ভালোবাসা থেকে রুমি কাউকে বঞ্চিত করতে চাননি। তিনি বলেছেন–

Come, come, whoever you are,
Wanderer, idolater, worshiper of fire,
Come even though you have broken your vows a thousand times,
Come, and come yet again.
Ours is not a caravan of despair. [১৩]

তাই হয়তো আজ তাঁর ভালোবাসার আহবান ছড়িয়ে গেছে সবার ভেতর।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইউএস বিলবোর্ড টপচার্টের অল টাইম টপ টোয়েন্টিতে আছেন রুমি। তার লেখা গজল আর কবিতায় তিনি উড়ছেন আটলান্টিকের ওপারের মার্কিন মুলুকে, আট শ বছর পরও।[১৪] গত কুড়ি বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক পঠিত কবির নাম মাওলানা জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ রুমি। তার প্রভাব পশ্চিমা শোবিজ তারকাদের মধ্যেও উপস্থিত। ম্যাডোনা, ডেমি মুর, হিউ গ্র্যান্ট, কেট উইন্সলেটের মুখে শোনা যায় তার কবিতা। বেয়ন্স নোয়েলস নিজের সন্তানের নাম রেখেছেন রুমি।

রুমির শক্তি আসলে ভালোবাসার শক্তি, এই শক্তিকে অন্য কিছুই স্পর্শ করতে পারে না।

---

১১. Azadibougar, O. and Patton, S., 2015. Coleman Barks' Versions of Rumi in the USA. Translation and Literature, 24(2), pp.172-189.

১২. Franklin Lewis, Rumi: Past and Present, East and West, Oneworld Publications, 2000.

১৩. Hanut, Eryk (2000). Rumi: The Card and Book Pack : Meditation, Inspiration, Self-discovery. The Rumi Card Book. Tuttle Publishing. xiii. ISBN 978-1-885203-95-3.

১৪. Curiel, Jonathan, San Francisco Chronicle Staff Writer, Islamic verses: The influence of Muslim literature in the United States has grown stronger since the Sept. 11 attacks (February 6, 2005). Available online (Retrieved Aug 2006)

পাঁচ

১২৭৩ সালের শীতের শুরুতে মাওলানা রুমি বুঝতে পারেন, তার মৃত্যুর সময় এসে গেছে। তিনি তার সন্তান ও ছাত্রদের জানিয়ে দেন তার মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে।

এসময়েও তার কাব্য রচনা থেমে থাকেনি।

If your thought is a rose, you are a rose garden.
If your thought is a thorn, you are fuel for the fire.[১৫]

ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখ তিনি বিদায় নিলেন।

মাওলানার কবরের এপিটাফে লেখা আছে তারই একটা কবিতা,

'When we are dead,
seek not our tomb in the earth,
but find it in the hearts of men.'

[১৫]. Harvey, A., 1999. Teachings of Rumi. Shambhala Publications.

পাল্টা আঘাত

এক

প্রিন্সেস মারিয়াকে তাবরিজে আনা হয়েছে। তিনি বাইজান্টাইন সম্রাট অষ্টম মাইকেল পালাইলোগোসের অবৈধ সন্তান।[১]

তাকে তাবরিজে পাঠানোর উদ্দেশ্য, মোঙ্গলদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল তার অতীত গৌরবের ছায়ামাত্র। অনেকটা আব্বাসিয়া খিলাফতের মতোই। এককালে যারা ছিল সমগ্র খ্রিষ্টান বিশ্বের রক্ষাকর্তা, সময়ের আবর্তনে তারা নিজেদের রক্ষা করতেই অক্ষম হয়ে পড়েছিল।

খ্রিষ্টান বিশ্ব তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিভক্তির শিকার হয় ১০৫৪ সালে, যখন গ্রিক অর্থডক্স চার্চ রোমান ক্যাথলিক চার্চ (ল্যাটিন) থেকে আলাদা হয়ে যায়।[২]

ক্রুসেড সাময়িকভাবে ইউরোপের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত রাজ্যগুলোকে একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করলেও যিশুখ্রিষ্টের লাস্ট সাপারের রুটি শুকনো ছিল না ভেজা ছিল, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব দূর করতে পারেনি।

বাইজান্টাইন কাইজারের সাথে পোপের দ্বন্দ্ব, অর্থডক্স চার্চের সাথে ল্যাটিন চার্চের দ্বন্দ্ব এখান থেকেই শুরু।

প্রথম তিনটি ক্রুসেড মুসলিমদের ওপর চালানোর পর চার নম্বর ক্রুসেড খ্রিষ্টানরা নিজেদের ওপরেই চালায়। ল্যাটিনরা ভেনিসের সাথে জোট করে দখল করে নেয় কনস্ট্যান্টিনোপল, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অপরাজেয় রাজধানী। প্রকৃতপক্ষে এটি যুদ্ধ

---

১. Nicol. D.M., 1964. Mwied Marriages in Byzantium in the Thirteenth Century. Studies in Church History. 1. pp.160-172.

২. Madeley. J., 2003. A framework for the comparative analysis of church–state relations in Europe. West European Politics. 26(1). pp.23-50.

করে নয়, ষড়যন্ত্র করে জয় করা হয়েছিল। যুদ্ধ করে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করা তখনকার সময়ে অসম্ভব একটা বিষয় ছিল।[৩]
কনস্ট্যান্টিনোপল হারিয়ে বাইজান্টাইনরা আনাতোলিয়ার পশ্চিম, থ্রেস, মোরিয়া উপদ্বীপ, আর ট্রেবিজান্ডসহ সামান্য কিছু এলাকা নিয়ে কোনোমতে টিকে ছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী অপেক্ষার পর ১২৬১ সালের ১৫ আগস্ট মাইকেল পালাইলোগাস পুনরায় জয় করেন কনস্ট্যান্টিনোপল।

তত দিনে বিশ্বরাজনীতিতে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছে।

মোঙ্গলরাই তখন পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। বাইজান্টাইনদের চিরশত্রু আনাতোলিয়ার সেলজুকরা তাদের করদ রাজ্য মাত্র।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উত্তরে আছে ইউরোপের ত্রাস কিপচাক খানাত তথা গোল্ডেন হোর্ড। বারকি খানের এই সাম্রাজ্য ইউরোপ পদানত করার চেয়েও বেশি আগ্রহী মামলুকদের সাথে মিলে হালাকু খানের ইলখানাতকে ধ্বংস করতে। কারণ, ইলখানাত টিকে থাকা মানেই ইলখানি মোঙ্গলদের হাতে ইসলামের পবিত্রভূমির পতন।

এই বাস্তবতায় বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন কিছু জোটের জন্ম হয়।

মামলুক ও কিপচাকদের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইনরা ইলখানাতের সাথে জোট করে। এর আরেকটা দিক ছিল, মোঙ্গল খানের মিত্র হলে পোপ বা ল্যাটিনরা তার সাথে যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না। সেই সাথে কিপচাক খানাতের আক্রমণ থেকেও সামরিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

মূলত এই কারণেই হালাকুর সাথে বিয়ে দিতে প্রিন্সেস মারিয়াকে তাবরিজে পাঠানো হয়েছিল। মারিয়া গিয়ে দেখলেন হালাকু খান মারা গেছেন। সিংহাসনে বসেছেন তার ছেলে আবাকা খান, পিতার মতোই মুসলিমবিদ্বেষী।

যেহেতু বিয়েটা ছিল রাজনৈতিক, তাই বাপ আর ছেলেতে খুব একটা ফারাক করা হলো না।

মারিয়ার সাথে আবাকা খানের বিয়ে হয়ে গেল।

এই বিয়ের ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কিছুটা হলেও নিরাপদ হলো বটে। কিন্তু বারকি খানের বংশধররা হালাকু খানের বংশধরদের শান্তিতে থাকতে দিলেন না।

উত্তর দিক থেকে আবার কিপচাক খানাত ইলখানাতকে আক্রমণ করে বসল।

---

৩. Noble, P., 2002. Eyewitnesses of the Fourth Crusade: the Reign of Alexius V. COSTERUS, 144, pp.178-189.

দুই

মোঙ্গলদের রাজনৈতিকভাবে বলা যেতে পারে একেবারে খাঁটি সেক্যুলার একটি পরাশক্তি।

মোঙ্গল খানরা প্রায়ই সুবিধামতো তাদের ধর্ম বদলে ফেলতেন। যখন যে নৌকাতে চড়া দরকার, সে নৌকায় চড়ে বসতেন। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার- ব্যাপারটা মোঙ্গল খাকানের জন্য ছিল একেবারে জুতসই একটা কথা। তার রাজধানী কারাকোরামে শামানিজম থেকে ইসলাম, সব ধর্মের উৎসবই পালন করা হতো। খাকানের অভিযানে সাধারণত বাছবিচার না করে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষভাবেই গণহত্যা চালানো হতো।

আবাকা খান ধর্মে বৌদ্ধ হলেও খ্রিষ্টানদের অনেক রীতিনীতিই তিনি অনুসরণ করতেন। যেহেতু ল্যাটিন ক্রুসেডার এবং ইলখানি মোঙ্গলদের সাধারণ শত্রু মুসলিমরাই ছিল, সেহেতু তিনি পোপের কাছে চিঠি লিখে নতুন ক্রুসেড চালানোর অনুরোধ জানালেন।[৪]

কিন্তু তখন ইউরোপের রাজনীতিতে নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে।

ক্রুসেড একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সম্রাটদের ক্ষমতার বিপরীতে চার্চ ও পোপের ক্ষমতার যে ভারসাম্য তৈরি করেছিল, সালাহউদ্দিন আইয়ুবি আমলে একবার ও আস সালিহ আইয়ুবির আমলে আবার জেরুসালেম জয়ের ফলে ইউরোপের সম্রাট-রাজাদের কাছে পোপ সেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন।

একেকটা ক্রুসেডের জন্য ইউরোপিয়ান রাজ-রাজড়াদের অন্তত দুই বছর ধরে অভিযান চালাবার প্রয়োজন পড়ত। আর এ ধরনের অভিযানে প্রয়োজন হতো বিপুল অর্থের। এই বিপুল অর্থ ও শ্রম ব্যয়ের পরেও জয়ের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। বিশেষ করে সপ্তম ক্রুসেডে ফ্রান্সের নবম লুইয়ের শোচনীয় পরাজয়ের পর ইউরোপ জুড়ে সম্রাটদের ক্রুসেডার স্পিরিটে ব্যাপক অবক্ষয় শুরু হয়।

ক্রুসেডার স্পিরিটের এই অবক্ষয়কে কাজে লাগাতে দক্ষিণে আগ্রহী হয়ে উঠেন সুলতান বাইবার্স।

বাইবার্সের যুদ্ধনীতি স্বাভাবিক ইসলামি যুদ্ধনীতির চেয়ে ছিল আলাদা।

সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের ঠিক বুকের ওপর ছিল বেশ কটি ক্রুসেডার রাজ্য। আর্মেনিয়ান কিংডম অফ সিলিসিয়া ছিল আনাতোলিয়া আর সিরিয়ার মাঝামাঝি কৌশলগত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অবস্থানে থাকা রাজ্য। এখান থেকে ক্রুসেডারদের পক্ষে আনাতোলিয়া, সিরিয়া বা ইরাক এই তিন ভূখণ্ডের যেকোনো একটিতে অভিযান চালানো সম্ভব ছিল।

প্রিন্সিপ্যালিটি অফ অ্যান্টিয়ক ছিল সিরিয়ার একটি বড় এলাকা জুড়ে, সেই সাথে ছিল কাউন্টি অফ ত্রিপোলি।

---

[৪]. Richard. J., 1969. The Mongols and the Franks. Journal of Asian history. 3(1). pp.45-57.

জেরুসালেমের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে ছিল কিংডম অফ জেরুসালেম। রিচার্ড দ্যা লায়নহার্ট সালাহউদ্দিন আইয়ুবিকে হারিয়ে এই ভূমিটুকু ক্রুসেডারদের দখলে রেখেছিলেন। আর ইউরোপ থেকে আসা ক্রুসেডারদের জাহাজগুলো এখানেই ভিড়ত।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ সাইপ্রাস, আক্রা আর রোডসে ছিল ক্রুসেডারদের শক্তিশালী সামরিক উপস্থিতি।

ওদিকে সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ছিল ইসমাইলি আততায়ী হাশিশিনদের নয়টি দুর্গ।

এতগুলো শত্রু ছিল বাইবার্সের ঠিক ঘাড়ের ওপরে, যাদের কৌশলগত মিত্র ছিল মোঙ্গল ইলখানাত।

বাইবার্স লক্ষ্য করেছিলেন, যখনই ক্রুসেডাররা যুদ্ধে হেরে যায়, তখনই তারা সন্ধি করার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। আর যখনই সন্ধি হয়, তখনই তারা মোঙ্গলদের সাথে জোট পাকাতে শুরু করে।

একসাথে এই দুই শত্রুর মুকাবিলা করা আসলে মামলুকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মামলুকরা তাই কিপচাক খানাতের সাথে একটা যৌথ সামরিক পরিকল্পনা করল।

কিপচাক খানাতের অমুসলিম খান মোঙ্কি তেমুর এতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নোগাই খান ও অন্যান্য মুসলিম খান ও নোইয়ানদের চাপে পড়ে এই লড়াইয়ে জড়াতে বাধ্য হন।

উত্তর দিক থেকে নোগাই খান ও নিকুদার নোইয়ান আবাকা খানের সীমান্তে বার্কের হামলা চালানো শুরু করেন। ফলে আবাকা খান ব্যস্ত হয়ে পড়েন উত্তর সীমান্ত, মধ্য এশিয়ায়।[৫]

এদিক থেকে সুলতান বাইবার্স সিদ্ধান্ত নেন, ক্রুসেডার রাজ্যগুলোর একটাকেও তিনি এবার রেহাই দেবেন না। একদিকে আবাকা যখন কিপচাকদের সাথে লড়বে, অন্যদিকে তিনি তখন ক্রুসেডার রাজ্যগুলোকে সিরিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

এই অভিযান হবে নির্দয়। কোনো শহর রক্ষা পাবে না। কোনো দুর্গ জয় করার পর তা আর মেরামত করা হবে না। সব শহর ধ্বংস করে দেয়া হবে, দুর্গগুলোকে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। আর বন্দিদের সবাইকে হয় হত্যা করা হবে, নয়তো পরিণত করা হবে দাসে।

তিন

নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্রুসেডার রাজ্যগুলো ভেতর থেকে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন। শেষ পঞ্চাশ বছর তারা টিকে ছিল আইয়ুবি সুলতানদের একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে এবং জাঙ্গিদের বিরুদ্ধে আইয়ুবিদের, আইয়ুবিদের বিরুদ্ধে সেলজুকদের লাগিয়ে দিয়ে।

---

৫. Amitai-Preiss, R., 2005. Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-1281. Cambridge University Press.

মুসলিম সালতানাতগুলোর আমিরদের প্রায় সবার হেরেমেই ছিল ক্রুসেডারদের গুপ্তচর। তাদের মদ ও নারী প্রীতিকে কাজে লাগিয়ে ক্রুসেডাররা সহজেই তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত।

ক্রুসেডারদের প্রধান অবলম্বন ছিল দুটি।

প্রথমত, নিজেকে সেরা ধর্মযোদ্ধা প্রমাণ করতে ইউরোপিয়ান রাজ-রাজড়াদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, যা তাদের কিছুদিন পর পর ডেকে আনত জেরুসালেমের দিকে।

দ্বিতীয়ত, ষড়যন্ত্র।

ক্রুসেডার স্টেটগুলোর সাথে পোপের যোগাযোগ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু যখনই কোনো দৃঢ় চরিত্রের মুসলিম সুলতান ক্ষমতায় এসেছেন, তখনই ক্রুসেডাররা অস্তিত্ব সংকটে ভুগেছে। সুলতান নুরুদ্দিন জাঙ্গি, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি আর সুলতান আস সালিহ আইয়ুবি এর উদাহরণ।

সুলতান বাইবার্স ছিলেন একজন বাহরিয়্যা মামলুক।

একজন মামলুক ফারিস তার জীবন শুরু করত দাস হিসেবে। সেখান থেকে বছরের পর বছর কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে কঠিন নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করা হতো।

একজন মামলুক ফারিস অনায়াসে দশ কেজি ওজনের ভারী বর্ম, সাড়ে চার কেজি করে ওজনের দুটি তলোয়ার, প্রায় ছয় কেজি ওজনের বর্শা, তীর ও ধনুকসহ প্রায় চল্লিশ কেজি ওজন নিয়ে অনায়াসে একটা ছুটন্ত আরবি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে আরেকটি ছুটন্ত আরবি ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়তে পারত। বর্শা ছুড়ে পঞ্চাশ গজ দূর থেকে ভেদ করতে পারত শত্রুর বর্ম। তরবারির আঘাতে কেটে ফেলতে পারত বিশ রিম কাগজের নিচে রাখা কয়েক সেন্টিমিটার পুরু তামার পাত।

ক্লোজ কোয়ার্টার কমব্যাটে মধ্যযুগে মামলুকদের মতো ভয়ংকর যোদ্ধা খুব কমই ছিল। শুধু নাইটস টেম্পলার আর কাপিকুলু সিপাহীদেরকেই তাদের সাথে তুলনা করা যায়।

মেধার পরিচয় দিলে সময়ের সাথে সাথে মামলুক ফারিস দাসত্ব থেকে আজাদি পেত। তারপর ধীরে ধীরে পদোন্নতি পেয়ে হতে পারত আমির, এমনকি সুলতানও। বাহরিয়্যা মামলুক সালতানাত ছিল প্রকৃতপক্ষে দাসদের সাম্রাজ্য।

একজন সাধারণ দাস থেকে সুলতান হয়ে উঠতে যে প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, মেধা ও জনপ্রিয়তার প্রয়োজন হতো, তার ফলাফল হিসেবে মামলুক সুলতানরা হতেন প্রচণ্ড সাহসী, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী এবং নিষ্ঠুর।

বাইবার্স তার পূর্বসূরি বিজেতা সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি বা আস সালিহ নাজিমের পথে হাঁটলেন না। এই দুই আইয়ুবি সুলতান ক্রুসেডারদের প্রতি দয়া ও নমনীয়তা দেখিয়েছিলেন। যার ফল হিসেবে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন উপকূলে ক্রুসেডারদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি।

বাইবার্স সম্পূর্ণ নতুন এক পথে হাঁটলেন, যা মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে অনেকটা মোঙ্গলদের মতো।

১২৬৫ সালে মোঙ্গল আতঙ্ক একটু কমে আসার প্রথম সুযোগেই তিনি জয় করে নেন আরসুফ। যেখানে রিচার্ড দ্যা লায়ন হার্ট সালাহ উদ্দিন আইয়ুবিকে হারিয়েছিলেন।[৬]

পরের তিন বছর তিনি নিজের সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করেন। প্রতি সপ্তাহেই তিনি নিজে ফারিসদের অনুশীলনে যোগ দিতেন। এতে সৈনিকদের উৎসাহ বাড়তে থাকত।

১২৬৮ সালের বসন্তে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর তিনি অ্যান্টিয়ক দখল করে নেন।

অ্যান্টিয়কে চালানো হয় নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ। কয়েক হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়, বাকিদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়। অ্যান্টিয়কের পরাজয় সিরিয়ায় ক্রুসেডারদের অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দেয়।[৭]

এই সময় ক্রুসেডাররা মোঙ্গলদের কাছে বারবার সিরিয়া আক্রমণের অনুরোধ করে চিঠি পাঠালেও কিপচাক খানাতের সাথে ইলখানাতের গৃহযুদ্ধের কারণে মোঙ্গলরা তাদের কোনো সহায়তাই দিতে পারেনি।

এর তিন বছর পর বাইবার্স কেরাক ডি শ্যাভেলিয়ার দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গের সৈন্যরা প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে প্রতিরোধ চালিয়ে গেলে সুলতান নাইটস হসপিটালার গ্র্যান্ডমাস্টারের নামে এক ভুয়া চিঠি পাঠিয়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন।[৮] সেই চিঠিকে আসল চিঠি ভেবে দুর্গের কমান্ডার এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে, তাদের মুক্ত করে দিতে হবে।

এরপর বাইবার্স কাইসারিয়ার ক্রুসেডার দুর্গ জয় করে নেন মাত্র ১২ দিনের অবরোধে। এই বিজয়ের পর তিনি ত্রিপোলি অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন। ত্রিপোলি ছিল সিরিয়ার মূল ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের শেষ আশ্রয়।

ত্রিপোলি অবরোধের খবর শুনে সিসিলি থেকে বাইবার্সকে আক্রমণ করতে ছুটে আসেন ইংল্যান্ডের প্রিন্স এডওয়ার্ড।

শুরু হলো নবম ক্রুসেড।

---

৬. Markowski, M., 1997. Richard Lionheart: bad king, bad crusader?. Journal of medieval history, 23(4), pp.351-365.
৭. Thomas F. Madden, The Concise History of the Crusades (3rd ed. 2014), p. 168
৮. King, D. J. Cathcart (1949). "The Taking of Le Krak des Chevaliers in 1271", Antiquity, 23 (90): 83–92.archived from the original on 2012-12-23

চার

প্রিন্স এডওয়ার্ডের স্ট্র্যাটেজি ছিল, তিনি তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে সাইপ্রাসে ক্রুসেডারদের সাথে মিলিত হবেন। তারপর কিংডম অফ সিলিসিয়া উত্তর থেকে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। তাদের সাথে জর্জিয়ানরাও যোগ দেবে।

তিনি সাইপ্রাস থেকে শক্তিশালী ইংরেজ নৌবাহিনী নিয়ে মিসর বা ফিলিস্তিন উপকূলে নামবেন আর পূর্বদিক থেকে আসবে আবাকা খানের মোঙ্গল বাহিনী।[৯]

এই যৌথ মোঙ্গল-ক্রুসেডার আক্রমণের মুখে চুরমার হয়ে যাবে বাইবার্সের সেনাবাহিনী।

বাইবার্স পাল্টা পরিকল্পনা নিলেন। তিনি নোগাই খানকে আবার ইলখানাতের উত্তরে অভিযান চালানোর অনুরোধ করলেন। নোগাই নিজে অভিযান না চালিয়ে চাঘাতাই প্রিন্স বারাক খানকে উস্কে দিলেন আবাকার বিরুদ্ধে। ব্যস, আবার লেগে গেল গৃহযুদ্ধ। আবাকা খান চাঘাতাইদের সামলাতে খোরাসানের দিকে ছুটলেন।

বাইবার্স এডওয়ার্ডকে প্রথমেই আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে নিজেই সাইপ্রাস আক্রমণ করলেন।

বাইবার্সের নৌবাহিনী ক্রুসেডারদের পতাকা তুলে ইংরেজ নৌবাহিনীর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে হামলা চালাল। কিন্তু শক্তিশালী ইংরেজ নৌবাহিনীর সাথে আনকোরা মামলুল নৌবাহিনী টিকে থাকতে পারল না। চব্বিশটি জাহাজের উনিশটিই সাগরে ডুবিয়ে দিল ইংরেজরা।[১০]

সাইপ্রাস থেকে সিরিয়াতে নেমে পরপর তিনটি সংঘর্ষে মামলুকদের পরাজিত করলেন এডওয়ার্ড।

১২৭১ সালের শরতের শেষ দিকে বিপদের মাত্রা চরমে পৌছল। এডওয়ার্ড নাজারেথে প্রবেশ করে প্রায় দশ হাজার মুসলিমকে হত্যা করলেন। অক্টোবর নাগাদ নাজারেথ থেকে আরও দক্ষিণে এগিয়ে কাকুনে প্রায় দেড় হাজার মুসলিমকে সে হত্যা করলেন। এরই মাঝে দৃশ্যপটে হাজির হলো মোঙ্গলরা।[১১]

মোঙ্গল জেনারেল সামাগারের নেতৃত্বে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে এগোতে লাগল দশ হাজার অশ্বারোহী। তুর্কিস্তান ও খোরাসানের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা আবাকা খানের পক্ষে এর বেশি যোদ্ধা পাঠানো তখন সম্ভব ছিল না।

---

৯. Boyle, J.A., 1976. The il-khans of Persia and the Princes of Europe. Central Asiatic Journal, 20(1/2), pp.25-40.

১০. The Later Crusades, 1189-1311", Kenneth M. Setton, Robert Lee Wolff. Page 616.

১১. Holt, P.M., 1989. Mamluk-Frankish diplomatic relations in the reign of Qalāwūn (678–89/1279–90). Journal of the Royal Asiatic Society, 121(2), pp.278-289.

কিন্তু মোঙ্গলরা বেশি দিন থাকল না। তুর্কিস্তানের পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় সামাগারকে সেদিকে চলে যেতে হলো।

নভেম্বর নাগাদ বাইবার্স শুরু করলেন চূড়ান্ত আক্রমণ।

বাইবার্সের বাহিনী মিসর থেকে সিরিয়ায় ঢুকেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সব ঘাস কেটে নিয়ে গেল, জ্বালিয়ে দিল সব গাছ। এর ফলে মোঙ্গলদের পক্ষে তাদের ঘোড়ার পাল নিয়ে সিরিয়াতে ঢোকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

তারপর বাইবার্স এডওয়ার্ডের দিকে এগোতে থাকলেন। বাইবার্সের মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত সৈন্য হাতে না থাকায় তিনি আক্রায় ফিরে গেলেন। বাইবার্স এবার সিলিসিয়ায় হামলা করলেন। সিলিসিয়া ছিল মোঙ্গলদের করদ রাজ্য। বাইবার্সের হুমকির মুখে সিলিসিয়ার রাজা কিং হিথাম সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

বাইবার্স হিথামের ওপর বিরাট অঙ্কের কর বসালেন।

এডওয়ার্ড বাইবার্সের গতিবিধি লক্ষ্য করে বুঝতে পারছিলেন, সুযোগ পেলেই বাইবার্স আক্রাতেও তার পিছু ধাওয়া করবেন।

এরই প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ঘুমন্ত এডওয়ার্ডের ওপর এক আততায়ী হামলা চালাতে গিয়ে নিহত হলো।

পাঁচ

এডওয়ার্ডের চিন্তা ক্রমেই বাড়ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, অন্যের শক্তিতে ভরসা করে নিজের লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব।

জেরুসালেম জয় করতে হলে চাই সমগ্র ইউরোপ থেকে আনা সম্মিলিত বাহিনী, যা ঠেকানো মামলুক বা মোঙ্গলদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিন্তু ইউরোপের রাজনীতিতে অন্তর্কোন্দল তখন চরমে।

ছয় হাজার কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রাচ্যে অভিযান চালানোর মতো সামর্থ্য তখন কোনো ইউরোপিয়ান সম্রাটেরই ছিল না।

একের পর এক পরাজয় ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। ইউরোপের জনগণের মধ্যে ধর্মযুদ্ধের আবেগ তাজা থাকলেও তারা ছিল নির্যাতিত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আর সময়ের তুলনায় পশ্চাৎপদ।

ইউরোপিয়ান শাসকরা তত দিনে ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছিল, ক্রুসেডে ধর্মের স্বার্থের চেয়ে পোপ আর নাইটদের স্বার্থটাই বড়।

ক্রুসেড পশ্চিমের সাথে পূর্বের সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বদলে দেয়। ক্রুসেড ও মোঙ্গল আক্রমণের প্রভাব মুসলিম মানসে এক দীর্ঘস্থায়ী, তীব্র ঘৃণার জন্ম দেয়, যা ছিল অভূতপূর্ব।

ক্রুসেডের এই পরাজয় ইউরোপিয়ান মানসপটে পূর্বের (মুসলিম এশিয়া বা Orient) এক নিষ্ঠুর চিত্র অঙ্কিত করে।

এই তিক্ততা আর কোনোদিন শেষ হয়নি।

বিখ্যাত এই ছবিটার নাম দ্যা লাস্ট ক্রুসেডার। বারবার ক্রুসেডে হেরে যাওয়ার ইউরোপিয়ান হতাশা এই ছবির বৃদ্ধ নাইটের চেহারায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। এই হতাশা শুধু এই বৃদ্ধের নয়, পুরো ইউরোপের হতাশা।

ক্রুসেড পশ্চিমকে পূর্বের বিপুল ধন সম্পদ আর প্রাচুর্য, চমৎকার শহর, বাগিচা আর বিশাল সব প্রাসাদের সন্ধান দেয়। আর সন্ধান দেয় অকল্পনীয় ঐশ্বর্যময় আরব-মুসলিম জ্ঞানভান্ডারের।

ক্রুসেডাররা পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যায় নতুন ধ্যান ধারণা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রযুক্তি।

নবম ক্রুসেড ছিল ফিলিস্তিনমুখী সর্বশেষ ক্রুসেড। এরপর ক্রুসেডাররা দীর্ঘদিন ফিলিস্তিন অভিযান থেকে বিরত ছিল।

কিন্তু জেরুসালেম দখলের স্বপ্ন পশ্চিমা মানসপট থেকে কোনোদিনই মুছে যায়নি

মোঙ্গলদের মুখোমুখি

এক

চেঙ্গিজ খান এবং তার সন্তানরা মুসলিমদের দাসের জাত বলে ডাকতেন। তারা চিরকাল দেখে এসেছেন, মুসলিমদের আক্রমণ করলেই সাধারণত তারা দুই এক দফা লড়ে পালিয়ে যায়। তারপর তাদের মধ্যে থেকে শান্তির প্রস্তাব আসে। সেই শান্তির প্রস্তাবে রাজি হওয়া মাত্রই তারা অস্ত্র ছেড়ে দেয়। তখন তাদের মনের সুখে হত্যা করা যায়, আয়েশ করে তাদের নারীদের ধর্ষণ করা যায় এবং শেষমেশ তাদের দলে দলে দড়িতে বেঁধে দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া যায়। এমনও হয়েছে, একজন নিরস্ত্র মোঙ্গল গ্রাম ভরা মানুষের মধ্যে গিয়ে একে অপরকে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে নিতে বলেছে। তারপর সবাইকে দাস হিসেবে নিয়ে নিশ্চিন্তে হাজির হয়েছে দারুগাচির (দারোগা) কাছে। মোঙ্গলদের ভয় মানুষের ভেতর এত তীব্রভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, তারা আসছে শুনলে মানুষের হাত-পা জমে যেত। তাদের মুখোমুখি হলে মানুষ চোখে অন্ধকার দেখত। এর প্রধান কারণ ছিল মোঙ্গলদের নৃশংসতা, আর মুসলিমদের কাপুরুষতা।

কাপুরুষতার ফল হিসেবে শাসকের জাত মাত্র চার বছরের মধ্যে রাতারাতি পরিণত হলো দাসের জাতে। এই চার বছরে মোঙ্গলরা সুনামির মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কাজাখস্তান থেকে সিন্ধু, কাশগড় থেকে আজারবাইজান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ, হত্যা করেছে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ।

মুসলমানরা শুধু জাগতিক কারণেই যে মোঙ্গলদের ভয় পেত, তা নয়। তারা মোঙ্গলদের ভাবত ইয়াজুজ-মাজুজ, যারা কিয়ামতের পূর্বে বিধ্বংসী জাতি হিসেবে হাজির হবে খোদার গজব হিসেবে।

যে দুর্দান্ত দাপট নিয়ে মোঙ্গলরা শুরু করেছিল, তাদের শক্তি-সামর্থ্য আর দানবীয় নিষ্ঠুরতা নিয়ে যে কিংবদন্তীর জন্ম হয়েছিল, তা প্রথমবারের মতো বড় ধরনের ধাক্কা খায় আইন জালুতের যুদ্ধে সাইফ উদ্দিন কুতুজের হাতে কিতবুকার পরাজয়ে।

এরপর কয়েকবার মোঙ্গলরা চেষ্টা করেছে ক্রুসেডারদের সাথে জোট করে শেষ মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি মামলুকদের কাছ থেকে সিরিয়া কেড়ে নিতে। কিন্তু সুলতান বাইবার্সের একের পর এক নির্মম অভিযান ক্রুসেডারদের ধীরে ধীরে শেষ করে দিতে থাকে। ১২৬১ সাল থেকে ১২৭৭ সালের মধ্যে সিরিয়া, আনাতোলিয়া ও ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের অস্তিত্বই সংকটের মুখে পড়ে যায়।

১২৭৭ সালের শীতে সুলতান বাইবার্স সিদ্ধান্ত নেন, আনাতোলিয়াকেও মোঙ্গলদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে আনতে হবে।

আনাতোলিয়ার সেলজুকরা এর আগেও একবার মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। মোঙ্গলদের শক্তির সামনে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

সেলজুকরা তখন পরিণত হয়েছিল এক নামেমাত্র রাজনৈতিক-সামরিক শক্তিতে, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল মোঙ্গল ইলখানের ক্রোধ থেকে নিজেদের চামড়া বাঁচানো।

কিন্তু সেলজুকদের বাইরেও আনাতোলিয়ার ক্ষমতার খেলায় ছিল আরও খেলোয়াড়। মোঙ্গল আক্রমণ থেকে পালিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে আনাতোলিয়াতে আসা তুর্কমেন যাযাবর গোত্রগুলো ছিল কট্টর মোঙ্গলবিরোধী।

সুলতান বাইবার্স হিসেব কষে দেখলেন, একবার আনাতোলিয়ায় মোঙ্গলদের হারাতে পারলে মানুষের মন থেকে মোঙ্গল জুজুর ভয় অনেকটাই কেটে যাবে। আনাতোলিয়ার তুর্কমেনরা একবার যদি বুঝতে পারে যে মোঙ্গলদেরও হারানো সম্ভব, তাহলে মোঙ্গলদের পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

দুর্ধর্ষ সমরনায়ক বাইবার্স আরেকবার লড়াইয়ের স্থান আর সময় বিবেচনায় অন্য সবাইকে হতবুদ্ধি করে দিলেন।

তিনি ঠিক করলেন, আনাতোলিয়ায় থাকা মোঙ্গল বাহিনীকে বসন্তের মাঝামাঝিতে আক্রমণ করা হবে। লড়াই করা হবে কোনইয়া বা কায়সেরির কাছাকাছি কোথাও, যেখান থেকে আনাতোলিয়ার সবখানে দ্রুত লড়াইয়ের খবর পৌঁছতে পারে।

বসন্তের মাঝামাঝি লড়ার উদ্দেশ্য ছিল মোঙ্গলদের গরমের ভয়। মোঙ্গলরা মধ্যপ্রাচ্যের গরমকে এড়াতে চাইত। তাই বসন্তে মোঙ্গলদের একবার হারাতে পারলে পরের চার পাঁচ মাসের ভেতর খানের বাহিনী অভিযানে নামতে পারবে না। তত দিনে তুর্কমেন বে'দের দিয়ে আনাতোলিয়াতে একটা জোরদার বিদ্রোহ তৈরি করা যাবে।

সুলতান যোগাযোগ শুরু করলেন সেলজুকদের উজিরে আযম মুইন উদ-দীন পারওয়ানের সাথে।[১]

---

১. Cobb, P.M., 2014. The Race for Paradise: An Islamic History of the Crusades. Oxford University Press.

পারওয়ানের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে বাইবার্সের বাহিনী সিরিয়া থেকে আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হলো এপ্রিলের শুরুতে।

সামনে কুরবানির ঈদ। সুলতান এমন একটা সময়ে মোঙ্গলদের ঘাড়ের ওপর পড়তে চান, যখন তারা তা কল্পনাও করবে না।

দুই

এপ্রিলের শুরুতে রওনা হয়ে পরের সপ্তাহে মামলুক বাহিনী আনাতোলিয়াতে প্রবেশ করল। পুরো পথেই তারা দিনে বিশ্রাম নিয়ে রাতে ডাবল মার্চ করেছে, এসেছে অপ্রচলিত মরুভূমির পথ ধরে।

এপ্রিলের ১২ তারিখ নাগাদ মামলুকরা কায়সেরির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। যেখানকার পাহাড়ী এলাকায় তারা মোঙ্গলদের ওপর আঘাত হানবে বলে ভেবেছিল। পাহাড়ে মোঙ্গলরা না পারে ফ্ল্যাঙ্কিং করতে, আর না পারে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে।

এই কারণে সুলতান মোঙ্গল শিবিরের কাছাকাছি ঘাঁটি গাড়লেন পাহাড়ের ওপর।

মোঙ্গলরা তার অগ্রগতির খবর পেয়েছিল মাত্র দশদিন আগে। তাই তাবরিজে আবাকা খানের কাছে সাহায্য না চেয়ে তারা সরাসরি সেলজুক সুলতান কায়খসরুকে সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাতে বলল।

মোঙ্গলদের চাপে তড়িঘড়ি করে বাহিনী তৈরি করে এগিয়ে এলেন উজিরে আযম পারওয়ানে। সাথে নিয়ে এলেন সেলজুকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা তুর্কমেন যোদ্ধাদেরও।[২]

মোঙ্গলদের রিইনফোর্সমেন্ট হাজির হলো জর্জিয়া থেকেও।

পারওয়ানে হিসাব কষছিলেন, কীভাবে যুদ্ধে জড়ানো থেকে দূরে থাকা যায়। মামলুক আর মোঙ্গলদের এই বাঘে-মহিষে লড়াইয়ের ভেতর সেলজুকরা পড়া মানে স্রেফ চিড়ে চ্যাপ্টা হওয়া। মামলুকদের পক্ষে থাকলে মোঙ্গলরা যখন পুরো বাহিনী নিয়ে আনাতোলিয়ার দিকে মার্চ করবে, তখন তাকে মরতে হবে। আর মোঙ্গলদের পক্ষে থাকলে মোঙ্গলরা যদি হারে, সুলতান বাইবার্স হাতে পেলে তাকে আস্ত রাখবেন না। সেই সাথে তুর্কমেন বে'রাও তার রাতের ঘুম হারাম করে ছাড়বে।

লড়াইয়ের ঠিক আগে পারওয়ানে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি এই যুদ্ধে কিছুই করবেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ দেখবেন, তারপর যেই জিতুক, তার পক্ষে যোগ দেবেন।

এরই মধ্যে সুলতান বাইবার্স আনাতোলিয়ায় এসেছেন শুনে অনেক তুর্কমেন বে'রা মোঙ্গলদের ওপর আঘাত হানার জন্য অস্থির হয়ে ওঠলেন। আনাতোলিয়ার সবচেয়ে বড়

---

২. Amitai-Preiss, R., 2005. Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-1281. Cambridge University Press.

দুই আমিরাতের একটি কারামানি আমিরাতের আমির মেহমেদ বে বাইবার্সের সাথে যোগ দেয়ার জন্য রওনা হলেন।[৩]

মোঙ্গলরা একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রায় আশি কিলোমিটার পিছু হটে এলবিস্তানের সমভূমিতে চলে গেল, যেখানে তারা মামলুকদের সাথে তাদের ট্যাকটিক্সে লড়তে পারবে।

মামলুক জেনারেলরা হিসেব করে দেখলেন আরব বেদুইন যোদ্ধা, দশ হাজার সেলজুক, চার হাজার কারামানিসহ তাদের মোট যোদ্ধার সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। মোঙ্গলদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজারের মতো হবে, তাই একটা ঝুঁকি নেয়াই যায়।

এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ সকালে লড়াই শুরু হলো।

তিন

মামলুকদের রাইট উইংয়ে ছিল তাদের হেভি ক্যাভালরি ডিভিশন, লেফটে ছিল বেদুইন ব্রিগেড আর সেন্টারে সুলতান বাইবার্সের মূল বাহিনী। সেন্টারের আগে ছিল একটা ভ্যানগার্ড ফোর্স। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই মোঙ্গল আর মামলুকদের মাঝামাঝি একটা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছে সেলজুক বাহিনী।

সুলতান অবাক হয়ে খেয়াল করলেন, মোঙ্গলদের সংখ্যা তার ধারণার চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। জর্জিয়ানরা যোগ দেয়াতে এই সংখ্যা বেড়ে তার বাহিনীর অর্ধেকের সমান হয়েছে।[৪]

যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠল। ধুলোর ঝড় ওঠল এলবিস্তানের ময়দানে। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম দুই ক্যাভালরি আবার একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছে, মামলুক আর মোঙ্গল।

মোঙ্গলরা শুরু থেকেই মামলুকদের লেফট উইংকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে থাকল। লেফট উইংয়ে ছিল মূলত অনিয়মিত বেদুইন যোদ্ধারা। মোঙ্গলদের সুগঠিত সুশৃঙ্খল আক্রমণের সামনে তারা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মোঙ্গলরা বারবার হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে বেদুইনদের ঘোড়াগুলোকে ভড়কে দিতে থাকল। আর তাদের দূরপাল্লার তীরের ঝাঁক অনেক দূর থেকেই বেদুইনদের ওপর বৃষ্টির মতো পড়তে থাকল।

মামলুকদের রাইট উইংও সমান তালে হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল মোঙ্গল লেফটের ওপর। কিন্তু জর্জিয়ান হেভি ক্যাভালরির কঠিন প্রতিরোধের কারণে তারা সুবিধা করতে পারছিল না।

সুলতানের দূত কয়েক দফা পারওয়ানের কাছে ছুটে গেল যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য; কিন্তু পারওয়ান নীরব রইলেন।

---

৩. Labib, S., 1979. The Era of Suleyman the Magnificent: Crisis of Orientation. International Journal of Middle East Studies, 10(4), pp.435-451.

৪. Mikaberidze, Alexander (2011). "Battle of Elbistan". In Mikaberidze, Alexander. Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia. Vol. 1. ABC-CLIO p. 25.

ওদিকে লেফটে মামলুকদের ক্ষয়ক্ষতি বাড়তেই লাগল। অসংখ্য বেদুইন যোদ্ধার মৃত্যু ঘটল মোঙ্গলদের তীরে। লেফট উইং ভেঙে যাচ্ছে দেখে সুলতান বাইবার্স নিজে ছুটে গেলেন সেখানে। শুরু হলো ভয়ংকর সংঘর্ষ।

মোঙ্গলরা পিছিয়ে গেলে বাইবার্স তাদের সামনে টেনে আনেন। আবার মোঙ্গলরা এগিয়ে আসলে বাইবার্স পিছু হটে যান। বারবার ফেইন্ড রিট্রিট ট্যাকটিক্স প্রয়োগ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইবার্স মোঙ্গলদের আক্রমণের তীব্রতা কমিয়ে দিলেন।

এরপর পুরো মামলুক বাহিনী ক্রিসেন্ট ফরমেশন নিয়ে মোঙ্গলদের ঘিরে ধরে ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে লাগল।

তিনদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গিয়ে কমান্ডারের নির্দেশে ঘোড়া থেকে নামলো মোঙ্গলরা। একে অন্যের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো লড়তে থাকল তারা। এরই মধ্যে মামলুকদের সাথে এসে যোগ দিল কারামানি তুর্কমেনরা। তাদের বেপরোয়া ক্যাভালরি চার্জের সাথে যোগ হলো মামলুক হেভি ক্যাভালরি রিজার্ভ বাহিনীর চার্জ।

মোঙ্গলদের অবস্থা ভালো না বুঝে পারওয়ানে নিজের বাহিনী নিয়ে পালালেন। খবর পাওয়ামাত্র মামলুকদের একটা অংশকে তার পিছু ধাওয়া করতে পাঠানো হলো।

মোঙ্গলরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়েও আত্মসমর্পণ না করে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে গেল।

মোঙ্গল আর জর্জিয়ান মিলে এই লড়াইয়ে মোট নিহত হয়েছিল মোঙ্গল বাহিনীর প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা।[৫]

---

৫. Mikaberidze, Alexander (2011). "Battle of Elbistan". In Mikaberidze, Alexander. Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia. Vol. 1. ABC-CLIO. p. 25.

মামলুক লেফট উইং পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল, শুধু বাইবার্সের অসীম সাহসিকতায় এই যুদ্ধে জিতে গেল মামলুকরা।

চার

যুদ্ধ শেষে সোজা আনাতোলিয়ার একেবারে কেন্দ্রের দিকে মার্চ করলেন বাইবার্স। মোঙ্গলদের কয়েকটা দুর্গকে গুঁড়িয়ে দিয়ে কায়সেরিতে কুরবানির ঈদ পালন করলেন তিনি।

পারওয়ানে আবার প্রতারণা করলেন বাইবার্সের সাথে। তিনি বাইবার্সকে আনাতোলিয়ায় আরও কিছুদিন অবস্থান করতে অনুরোধ করলেন।

ঝানু খেলোয়াড় বাইবার্স পারওয়ানের উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন। পারওয়ানে চাইছিলেন বাইবার্সকে দিয়ে আনাতোলিয়ায় সময় নষ্ট করিয়ে সেই সুযোগে আবাকা খানের মূল মোঙ্গল বাহিনীর মুখে বাইবার্সকে ফেলে দিতে। মিসর থেকে এত দূরে আবাকার সাথে যুদ্ধে বাইবার্সের জেতার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।

এসময় ইজ্জউদ্দিন আয়বেগ নামের এক মামলুক কমান্ডার সিরিয়ায় বেইমানি করে যোগ দিল আবাকা খানের বাহিনীতে। ফলে মামলুকদের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

সুলতান বাইবার্সকে আনাতোলিয়া থেকে ফিরে আসতে হলো সিরিয়ায়।

এলবিস্তানের ভয়াবহ যুদ্ধে শত্রুব্যুহের মধ্যে ঢুকে পড়ার সময় আঘাত পেয়েছিলেন সুলতান, আঘাত ক্রমেই খারাপ হতে লাগল।

জুলাই মাসের এক তারিখ দামেশকে মারা গেলেন মিসরের সিংহ বাইবার্স।

পাঁচ

আগস্টে আবাকা খান আনাতোলিয়া অভিযানে বেরোলেন।

আনাতোলিয়ায় কিছুদূর পর্যন্ত এগোনোর পরেই প্রচণ্ড গরমে তাকে পিছিয়ে আসতে হলো। আনাতোলিয়া হয়ে তিনি সিরিয়ায় গিয়ে মামলুকদের ওপর আঘাত হানার চিন্তাভাবনা করছিলেন। কিন্তু গরম আর মামলুকদের শক্তির কথা বিবেচনা করে খান এই পরিকল্পনা বাদ দিলেন।

এবার তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল পারওয়ানের ওপর।

পারওয়ানেকে পশ্চিম আনাতোলিয়া পর্যন্ত ধাওয়া করে ধরে আনা হলো। তারপর তাকে জবাই না করেই গা থেকে মাংস খুলে নেয়া হলো একটু একটু করে।

সেই মাংস বন্ধুবান্ধবের সাথে ভাগ করে খেলেন আবাকা খান।

এটাই মোঙ্গল প্রতিশোধ!!

চূড়ান্ত লড়াই

এক

মুইন আল দীন পারওয়ানের মাংস চিবিয়ে খেয়েও আবাকা খানের সাধ মেটেনি। কারণ, পারওয়ানের মাংস খাওয়া তার জীবনের লক্ষ্য ছিল না।

আবাকা খানের জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল মোঙ্গল-ক্রুসেডার যৌথবাহিনী তৈরি করে প্রথমে সিরিয়া, তারপর মিসর জয় করা।

সুলতান বাইবার্সের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই সেই সুযোগও এসে গেল তার হাতে। মামলুকরা তখন নিজেদের মধ্যে রেষারেষিতে ব্যস্ত।

মামলুক সালতানাতে যেকোনো মামলুক ফারিসের জন্যই খোলা ছিল ওপরে উঠার সিঁড়ি, এজন্য তাকে দেখাতে হতো বীরত্ব আর বুদ্ধির চরম পরাকাষ্ঠা। সুলতান হবার যোগ্য লোকের কোনো অভাব ছিল না এই দাসদের ভেতর। কিন্তু সুলতান কেবল একজনই হতে পারে। আর তাই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা কখনোই বন্ধ থাকত না।

বাইবার্সের ইন্তেকালের দুই বছরের মধ্যে দুই দফা বিদ্রোহে একে একে ক্ষমতা হারালেন দুজন সুলতান। ক্ষমতায় বসলেন সুলতান সাইফ উদ্দিন কালাউন আল মানসুর। তিনি ক্ষমতায় বসার পর সিরিয়ার আমির সুঙ্গুর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।[১]

এই বিদ্রোহ আবাকা খানের সামনে নতুন করে সিরিয়া জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে দিল। শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ না থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে অভিযানে বেরোতে না পারলেও ছোট ভাই মেঙ্গু তেমুরকে সেপ্টেম্বর নাগাদ পাঠিয়ে দিলেন সিরিয়া অভিযানে।[২]

---

১. Nicolle, D., 2014. Mamluk ÔAskari 1250–1517. Bloomsbury Publishing.

২. Aigle, D., 2007. The Mongol Invasions of Bilâd al-Shâm by Ghâzân Khân and Ibn Taymîyah's Three" Anti-Mongols" Fatwas. Mamluk Studies Review, 11(2), pp.89-120.

তেমুরের হাতে ছিল ইলখানি সেনাবাহিনীর সেরা অংশ, প্রায় পঞ্চাশ হাজার মোঙ্গল অশ্বারোহী।[৩]

ইরাক হয়ে সিরিয়াতে ঢোকার পথে তার সাথে যোগ দিল আরও প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রুসেডার। এদের বেশিরভাগই এসেছে জর্জিয়া আর সিলিসিয়া থেকে। আছে হাজার খানেক নাইটস টেম্পলার আর নাইটস হসপিটালারও।[৪]

অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ এই বাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করল। কয়েকটি শহর লুটের পর তারা এগোতে লাগল হিমসের দিকে।

মোঙ্গলদের অভিযানের খবর এবং তাদের বাহিনীর আকারের কথা শুনে মামলুকদের টনক নড়ল। সুলতান কালাউন দ্রুত অভিযানে বের হলেন। বিপদ আঁচ করে সিরিয়ার আমির সুঙ্গুর দ্রুত সুলতানের সাথে ঝামেলা মিটিয়ে সুলতানের বাহিনীতে যোগ দিলেন।

পারওয়ানের পরিণতি দেখে সবারই পরিষ্কার ধারণা হয়েছে, মোঙ্গলের তলোয়ার হয় তলোয়ার দিয়ে ভাঙতে হবে, নয়তো তাদের তলোয়ারের নিচে জীবন দিতে হবে।

দুই

২৯ অক্টোবর, ১২৮১ সাল।

টানা তৃতীয়বারের মতো সিরিয়ার ময়দানে মুখোমুখি মামলুক আর মোঙ্গল, মধ্যযুগের দুই ভয়ংকর রণযন্ত্র।

মামলুক রাইট উইংয়ে আছে প্রায় দশ হাজার হেভি ক্যাভালরি মামলুক ফারিস, লেফট উইং তৈরি হয়েছে আরব বেদুইন আর তুর্কমেন উপজাতি যোদ্ধাদের নিয়ে। এরা হালকা চামড়ার বর্মে আবৃত।

সেন্টার ফ্রন্টে প্রায় পাঁচ হাজার হেভি আর্মার্ড ইনফ্যান্ট্রি, তার পেছনে বিশ হাজার ক্যাভালরির মূল বাহিনী। তারও পেছনে আছে পনেরো হাজারের রিজার্ভ ফোর্স।

মোঙ্গল সেনাপতি তেমুরের বাহিনীর রাইট উইংয়ে আছে শক্তিশালী মোঙ্গল বাহাদুররা, সংখ্যায় এরা প্রায় বিশ হাজার। লেফটে ক্রুসেডারদের সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার। সেন্টার ফ্রন্টে আছে নাইটরা। তাদের পেছনে মূল বাহিনীর চল্লিশ হাজার যোদ্ধা। এর মধ্যে আছে মোঙ্গল স্পেশাল ফোর্স খেশিগের প্রায় পাঁচ হাজার যোদ্ধা।

---

৩. Smith. J.M., 1975. Mongol manpower and Persian population. Journal of the Economic and Social History of the Orient/Journal de l'histoire economique et sociale de l'Orient. pp.271-299.

৪. McGregor. A.J., 2006. A military history of modern Egypt: from the Ottoman Conquest to the Ramadan War. Greenwood Publishing Group.

বেলা নয়টার দিকে লড়াই শুরু হয়ে গেল।

মোঙ্গল রাইট উইং প্রথম আঘাতেই মামলুকদের লেফটে থাকা বেদুইনদের ওপর বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়তে শুরু করল।

বেদুইনরা তাদের হালকা বর্ম নিয়ে বেশিক্ষণ এই তীর বৃষ্টির মুখে টিকে থাকতে না পেরে পিছু হটল, একই দশা হলো তুর্কমেনদেরও। কিন্তু তুর্কমেনদের ধনুকের পাল্লা বেদুইনদের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় তারা কিছুটা হলেও তীরবৃষ্টির জবাব দিতে পারছিল।

বেদুইনরা পিছু হটে যাওয়ায় মোঙ্গল বাহাদুররা এবার সর্বাত্মক হামলা চালাল মামলুক লেফটে। তুর্কমেনরা তাদের এই হামলার জবাব দিতে হিমশিম খাচ্ছিল। এমন সময় আবার ফিরে এল বেদুইনরা। আরবি ঘোড়ার খুরের ঘায়ে আগুন ঝরিয়ে নিজেদের লম্বা বর্শা বাগিয়ে তারা মোঙ্গলদের ওপর আক্রমণ শাণালো।

প্রথম দফায় মোঙ্গল রাইট উইং পিছিয়ে গেলেও দ্বিতীয় দফায় তারা ফেইন্ড রিট্রিট ট্যাকটিক্স অবলম্বন করে বেদুইনদের ধোঁকা দিল। বেদুইনরা ভাবল মোঙ্গলরা পালাচ্ছে।

আগুনে ঝাঁপ দেয়ার আগে পতঙ্গ যেমন জানে না সে কোনো বিপদে পড়তে যাচ্ছে; বেদুইনরাও তেমনি জানত না, এটা মোঙ্গলদের ফাঁদ মাত্র।

ফেইন্ড রিট্রিটের ফাঁদে পড়ে পুরো বেদুইন বাহিনী মোঙ্গলদের ধনুকের পাল্লার ভেতরে আসতেই মোঙ্গলরা শুরু করল পার্থিয়ান শট। ঘোড়ার মুখের উল্টোদিকে ঘুরে ঘোড়ার চার পা শূন্যে থাকা অবস্থায় পেছনে তীর ছোড়ার এই ভয়ংকর কৌশল এর আগে তাদের অসংখ্য প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেল বেদুইন ফৌজ, তুর্কমেনরা এবার ঘেরাও হয়ে গেল মোঙ্গল রাইট উইংয়ের সামনে।

সুলতান কালাউন এতক্ষণ মূল বাহিনী নিয়ে লড়াইয়ের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন। এবার তিনি বুঝলেন তিনি যদি সরাসরি হস্তক্ষেপ না করেন তো এই যুদ্ধ হাত থেকে বেরিয়ে যাবে।

কালাউন দ্রুত রিজার্ভ ফোর্স থেকে লেফটে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠালেন।

লড়াইয়ের খেয়াল রাখছিলেন তেমুরও। তিনি দেখলেন মামলুকদের দুর্বল জায়গায় তার বাহিনী ইতোমধ্যেই একটা গভীর ক্ষত করে দিয়েছে। তাই তিনি আরও একটা ইউনিটকে মামলুক লেফটে লেলিয়ে দিলেন, যাতে মামলুকদের লেফট উইং একেবারেই ভেঙে যায়।

কালাউন ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরলেন। উনষাট বছর বয়সেও তার দেহ ছিল মামলুকসুলভ দৃঢ়।

কোনোপ্রকার পূর্বাভাস ছাড়াই তিনি হঠাৎ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে সরাসরি মোঙ্গলদের সেন্টারে আঘাত হেনে বসলেন, তার সমগ্র মূল ফৌজ তাকে অনুসরণ করল।

মামলুক ফারিসরা গড়পড়তা মোঙ্গলদের চেয়ে এবং মামলুকদের আরবি ঘোড়া মোঙ্গলদের ঘোড়ার চেয়ে অনেক ভারী ছিল, তাদের বর্মও ছিল বেশ ভারী। আগুয়ান মামলুকদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর মারতে থাকল মোঙ্গল তীরন্দাজরা, কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই তাদের বর্মে লেগে পিছলে যেতে থাকল।

কালাউন ধুলোর ঝড় তুলে তার ফারিসদের নিয়ে মোঙ্গলদের কাছাকাছি চলে এলেন। মোঙ্গলরা ঢাল বের করে প্রাণপণে বিশালদেহী মামলুকদের এই বাঁধভাঙা স্রোত ঠেকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না।

কালাউনের তীব্র ক্যাভালরি চার্জে মোঙ্গলদের সেন্টার ফ্রন্ট ফালাফালা হয়ে গেল। প্রায় চার হাজার লাশ ফেলে কালাউন সরাসরি মেঙ্গু তেমুরের দিকে এগোতে লাগলেন।

মেঙ্গু তেমুরের গ্রেনেডিয়ার বাহিনী একের পর এক গ্রেনেড হামলা চালিয়ে মামলুকদের সামনের কাতারের যোদ্ধাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছিল। কিন্তু তার মধ্যেই অটল পর্বতের মতো এগিয়ে যাচ্ছিলেন কালাউন। তার বাহিনীর এক কাতার পড়ে যাচ্ছিল তো জায়গা নিচ্ছিল পরের কাতার।

এক পর্যায়ে কালাউন সরাসরি মোঙ্গল বাহিনীর সেন্টারে ঢুকে পড়লেন।

এতক্ষণ তিনি দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়েছেন, এবার শুরু করলেন হত্যাযজ্ঞ। ক্লোজ কোয়ার্টার কমব্যাটে মামলুকদের মতো ভয়ানক যোদ্ধা কমই আছে, তাদের বলা হতো নাইটস টেম্পলার অফ ইসলাম।

তেমুরের সেন্টারে থাকা খেশিগরা নিজেদের সবটুকু সামর্থ্য উজাড় করে লড়তে লাগল, কিন্তু মামলুকরা এদিন রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছিল। সুলতান কালাউনের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের মূল বাহিনীর পুরোটার ওপরে নির্মমভাবে তলোয়ার চালাল মামলুক ফারিসরা। হাজারে হাজারে মোঙ্গলের লাশ পড়তে লাগল ময়দানে।

এর মধ্যেই মোঙ্গল রাইট ফ্ল্যাঙ্ক মামলুকদের লেফট ফ্ল্যাঙ্ককে একেবারেই ভেঙে দিল। কিন্তু যখনই তারা মামলুকদের সেন্টারে ঢোকার চেষ্টা করছিল, তখনই মামলুকদের নতুন আবিষ্কার মিদফার (হাতে ব্যবহার করার উপযোগী আদি কামান) উপর্যুপরি ফায়ারে তাদের ঘোড়াগুলো উল্টোদিকে ঘুরে দৌড় লাগাচ্ছিল। ফলে লেফট ফ্ল্যাঙ্কের এই সাফল্য শেষমেশ স্টেলমেটে রূপ নিল।

ওদিকে কালাউনের ফারিসরা নেশাগ্রস্তের মতো তলোয়ার চালিয়ে যাচ্ছিল মোঙ্গলদের ব্যূহের একেবারে মাঝখানে। মোঙ্গলদের হাতের কাছে পেয়ে তাদের রক্তের নদী বইয়ে দেয়ার সাধ মেটানোর এমন সুযোগ হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছাই তাদের ছিল না। মেঙ্গু তেমুরের দেহরক্ষী মোঙ্গল স্পেশাল ফোর্স খেশিগদের একটা বড় অংশ মামলুক ফারিসদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সুলতান কালাউনের এক বিধ্বংসী আক্রমণে মারাত্মক আহত হলেন মেঙ্গু তেমুর। কালাউনের ঘোড়ার সামনে মানব দেয়াল তৈরি করে খেশিগরা কোনোমতে তার জীবন রক্ষা করল।[৫]

বিকেল নাগাদ মোঙ্গল বাহিনীর মাঝখানটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। মেঙ্গু তেমুর পালাতে বাধ্য হলেন জীবন নিয়ে।

হিমসের এই যুদ্ধে পরাজয় মোঙ্গল আতঙ্কের গোড়াকে একেবারেই টলিয়ে দিল। মোঙ্গলদের আশি হাজার যোদ্ধার ভেতর পঞ্চাশ হাজারই নিহত হয়েছিল, বিপরীতে মামলুকদের মধ্যে শহিদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার।[৬]

টানা তিনবার সিরিয়ায় ও একবার আনাতোলিয়ায় মামলুকদের কাছে পরাজিত হয়ে দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়লেন আবাকা খান।

পরের বছর শীতে অতিরিক্ত মদপান করে তিনি মারা গেলেন।[৭]

তিন

মোঙ্গলদের উত্থানের সাথে সপ্তম শতাব্দীর আরব মুসলিমদের উত্থানের একটা বড় মিল হলো, এই দুটো জাতিই ছিল সভ্য দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে বঞ্চিত, সরল জীবনযাপনকারী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি।

আরবরা জয় করেছিল তৎকালীন দুনিয়ার সেরা দুই সাম্রাজ্য বাইজান্টাইন রোম আর সাসানি ইরানের প্রায় পুরোটাই।

কিন্তু আরব মুসলিমদের সাথে মোঙ্গলদের বড় পার্থক্য, বিজিতদের সাথে আচরণে। আরব মুসলিমরা যেখানে বিজিতদের সাথে চরম মানবিক আচরণ করেছিল। সেখানে মোঙ্গলরা তাদের ঝাড়ে বংশে সাফ করে দিয়েছিল।

মুসলিমদের প্রয়োজন ছিল ইসলামের আদর্শ প্রচার করতে নতুন জনগোষ্ঠী, তাই ভূমির চেয়ে ভূমিতে বসবাস করা মানুষই ছিল তাদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে মোঙ্গলদের মানুষের চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল ভূমি আর সম্পদ। মানুষ মানেই ঝামেলা, তাই তারা নির্দ্বিধায় গণহত্যা চালিয়েছে বিজিতদের ওপরে।

---

৫. Muir, W., 1896. The Mameluke; Or, Slave Dynasty of Egypt, 1260-1517, AD. Smith, Elder.

৬. Amitai-Preiss, R., 2005. Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-1281. Cambridge University Press.

৭. Rossabi, M., 1994. All the Khan's horses. Natural history, 103, pp.48-48.

মোঙ্গলদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল ভয়, মামলুকদের কাছে বারবার হেরে তারা প্রতিপক্ষের ওপর তাদের এই মানসিক আধিপত্য হারিয়ে ফেলতে থাকে। মোঙ্গলরা ইয়াজুজ মাজুজ, এই মিথের অবসান ঘটতে শুরু করে মুসলিম ও খ্রিষ্টান বিশ্বে। কেননা, ইয়াজুজ মাজুজকে হারানো মানুষের পক্ষে সম্ভব হবার কথা না।

আরবরা যে দুটো সভ্যতা জয় করেছিল, সে দুটো থেকে তারা নিয়েছে জ্ঞান, বিজ্ঞান আর শিল্পকলা, সংস্কৃতির কিছু অংশ। কিন্তু তাদের সভ্যতার মূল শক্তি ছিল তাদের ধর্ম ইসলাম, যা প্রভাব বিস্তার করেছিল ইসলামি সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই। তাই আরব মুসলিমরা বিজিত জনগণের মধ্যে মিশে গেলেও নিজেদের মূল পরিচয় হারায়নি। তাদের শক্তির মূলে থাকা ইসলাম অত্যন্ত সুসংহত একটি জীবনাদর্শ, যা খ্রিষ্টবাদ অথবা জরথুষ্ট্রবাদ বা বৌদ্ধধর্মের মাঝে হারিয়ে যায়নি।

ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল মোঙ্গলদের ক্ষেত্রে। তাদের ধর্ম ছিল শামানিজম, তেংরিজম। একেবারেই প্রাচীন এই ধর্মটি বিজিত জনগোষ্ঠীর নতুন দুটি মহাসভ্যতা ইসলামি সভ্যতা আর চীনা সভ্যতার সংস্পর্শে আসা মোঙ্গলদের জীবনের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট ছিল না।

চেঙ্গিজ খান ও ওগেদেই খানের আমলে বিশ্বজয় করতে বেরিয়ে পড়া মোঙ্গলরা তাদের জয় করা বিশাল সাম্রাজ্যের ভেতরে থাকা দুটি মহা সভ্যতার দুই শক্তিশালী মিশনারি ধর্ম বৌদ্ধ ও ইসলামের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে। যে ধর্ম দুটোর উভয়েরই আছে নিজস্ব জীবনাদর্শ। ইসলামের তো রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও আছে।

চেঙ্গিজ খানের বিশ্বজয়ের অভিযানে বেরোনোর এক শ বছরের মধ্যেই তার গড়ে তোলা বিশাল সাম্রাজ্যের চারটি খানাতের তিনটিই আবার মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে পড়ে। অপরটি হয়ে যায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত।

অধিকাংশ মোঙ্গলই ইসলাম অথবা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে স্থানীয় জনগণের ভেতর মিশে যেতে থাকে। কেবল মঙ্গোলিয়ান স্তেপের সভ্যতা থেকে দূরে থাকা অধিবাসীরাই রয়ে যায় তাদের আদিম ধর্মে।

সভ্যতা এভাবেই অসভ্যদের কাছে হেরে গিয়েও শেষমেশ তাদের জয় করে নেয়।

তৃতীয় অধ্যায় : গাজীর ঘোড়া

আরতুরুল, এদেব আলি, উসমান

এক

ঘোড়াটা দুরন্ত বেগে ছুটছে।

দুই পা দিয়ে শক্ত করে ঘোড়াটার পিঠে সেটে আছে এক সুদর্শন তরুণ।

তরুণের হাতে ধরা ছোট একটা বাঁকানো ধনুক।

দু পায়ের গোড়ালি দিয়ে সে নিয়ন্ত্রণ করছে ঘোড়ার গতিপথ। গোড়ালির ভেতরের দিকটা দিয়ে ঘোড়ার পেটের একেক জায়গায় একেকভাবে চাপ দিলে ঘোড়া সেভাবে দিক বদলায়।

ছেলেটির চোখ এই মুহূর্তে সামনের দিকে না, পেছনে। দূরের একটা গাছে দারুণ একটা বেদানা দেখেছে সে, এই বেদানাটা তার খাওয়া চাই, অবশ্যই গাছে না ওঠে। ওঘুজের হাতে তীর থাকতে ওঘুজ গাছে উঠে কী করবে?

তরুণ ঠিক করল ঘোড়াটাকে সোজা গাছের দিকে না ছুটিয়ে উল্টোদিকে ছোটাবে। সোজা ছুটিয়ে তীর তো বাচ্চারাও লাগাতে পারে, তাতে আর বাহাদুরির কী আছে?

ঘোড়ার পেটে চাপ দিয়ে তরুণ ঘোড়ার বেগ আরও বাড়িয়ে দিল।

প্রায় দুই শ কদম এসে ঘোড়াটা যখন শূন্যে লাফিয়ে ওঠল, ঠিক তখন সে ধনুকের ছিলা টেনে দিল।

বেদানাটার বোটা ডাল থেকে আলাদা হয়ে নিচে পড়ল।

গাছের নিচে গিয়ে বেদানাটা তুলে নিল তরুণ। পাগড়ি খুলে ফেলে নিশ্চিন্তে খেতে শুরু করল সে। তার কুচকুচে কালো চুল ঝলমল করে উড়ছিল আনাতোলিয়ার পাহাড় থেকে আসা বাতাসে।

এই ছেলেটার নাম উসমান। উসমান বিন আরতুরুল।

ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে থেকে তীর ছোড়া (কাবাক খেলা) তার প্রিয় খেলা। তার আরেকটা প্রিয় খেলা আছে, মঙ্গোলিয়ান কুস্তি।

দুই

বাগদাদের দেয়াল ভেঙে যেবার হালাকু খানের সৈন্যরা ঢুকে পড়েছিল সেই বছরের শীতেই আনাতোলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে সোগুত নামের ছোট এক শহরে কায়ি গোত্রের বে আরতুরুল গাজির ঘরে এক ফুটফুটে বাচ্চার জন্ম হয়।[১]

বাচ্চাটার নাম রাখা হয় উসমান, উসমান মানে হাড় গুঁড়িয়ে দেয়া পালোয়ান।[২]

উসমানের মা ছিলেন এক সেলজুক শাহজাদি হালিমা সুলতান। তার বাবা অবশ্য সুলতান হতে পারেননি।[৩]

ওঘুজ মেয়েদের কাছে স্বামীই সব।

সেলজুক প্রাসাদের ঐশ্বর্য ছেড়ে স্বামীর আধা যাযাবর কায়ি গোত্রের শিবিরে বউ হয়ে আসা হালিমা নাম থেকে সুলতান শব্দটাই বাদ দিয়েছিলেন। তার বদলে তিনি আর দশজন কায়ি মহিলার মতো হালিমা খাতুন নামেই পরিচিত হতে পছন্দ করতেন।

আরতুরুলের বেইলিকটা ছিল ছোট কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বার এক যোদ্ধা। মোঙ্গল আক্রমণ এড়িয়ে আনাতোলিয়ায় আসার পর সুলতান আলাউদ্দিনকে সহযোগিতা করে জায়গির হিসেবে প্রথমে কারাজা দাঘ পর্বতের কাছে কিছু জমি পান আরতুরুল বে। তারপর সেখান থেকে তাকে সুলতান আলাউদ্দিন পাঠান সেলজুকদের সীমান্তের একেবারে পশ্চিমে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে লাগোয়া সোগুতে।[৪]

ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন উসমান। সেই সাথে বড় হতে লাগল আরতুরুল বে আর হালিমা সুলতানের ছোট বেইলিকটাও।

---

১. Finkel, C., 2005. OsmanÕs dream. The Story of the Ottoman Empire, pp.1300-1923.

২. Goral, M., 2008. The evaluation of archery in Ottoman Empire. Pak. J. Soc. Sci, 5(4), pp.352-359.

৩. Freely, J., 2009. The Grand Turk: Sultan Mehmet II-Conqueror of Constantinople and Master of an Empire. The Overlook Press.

৪. Ali Anooshahr, The Ghazi Sultans and the Frontiers of Islam, pg. 157

তিন

আরতুরুল বে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রিয় বন্ধু দরবেশ এদেব আলির বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। সাথে নিয়ে যাবেন হালিমা খাতুন আর উসমানকে।

এক বৃহস্পতিবার দুপুরে রওনা দিয়ে বিকেল নাগাদ বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন তারা। সাথে অল্প কয়েকজন আল্‌প।

এদেব আলি একজন বিখ্যাত আলেম ও দরবেশ। তার অসংখ্য গুণগ্রাহীর মধ্যে আরতুরুল বে নিজেও একজন।[৫]

রাতে আরতুরুল বের সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করলেন এদেব আলি। খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমানোর জন্য যখন সবাই যার যার কামরায় গেলেন।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে উসমান খেয়াল করলেন, দেয়ালের তাকে পবিত্র কুরআন শরিফ রাখা। কুরআন শরিফ ঘরে থাকা অবস্থায় শুয়ে পড়া তার কাছে বেয়াদবী বলে মনে হলো। আল্লাহর কালামকে সম্মান দেখানোর জন্য তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, ভাবলেন সারা রাত ঘুমাবেন না। ভোরের কাছাকাছি সময়ে তার ঘুম এসে গেল। তিনি স্বপ্ন দেখলেন।

অদ্ভুত এক স্বপ্ন।

শায়খ এদেব আলির বুক থেকে একটা চাঁদ ওঠল। উসমানের বুকে এসে ঠাঁই নিল সেই চাঁদ। তারপর তার নাভি থেকে গজিয়ে ওঠল এক বিশাল গাছ।

গাছটি সুন্দর সবুজ ডালপালায় ভরে ওঠল। সময়ের সাথে সাথে গাছটি বড় হতে হতে পেরিয়ে যেতে লাগল চারটি পর্বতমালা; বলকান, আলবুর্জ, ককেশাস আর অ্যাটলাস। গাছের শেকড় থেকে বইতে লাগল চার চারটি নদী, দানিয়ুব, ইউফ্রেতিস, তাইগ্রিস আর নীল। গাছের পাতাগুলো হঠাৎ রূপ নিলো তরবারির ফলায়। তারপর হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে, বসন্তের বাতাস। সে বাতাসে একেকটা পাতা একেকটা তরবারি হয়ে উড়ে যেতে লাগল কনস্ট্যান্টিনোপলে। দুই মহাদেশ আর দুই সমুদ্রের শহর।

তারপর কনস্ট্যান্টিনোপল পরিণত হলো একটা আংটির কেন্দ্রে। সেই আংটি উসমান যখন হাতে পরতে গেলেন, তখন তার ঘুম ভেঙে গেল।[৬]

ঘুম থেকে উঠে শায়খ এদেব আলিকে এই স্বপ্নের কথা জানালেন উসমান।

শায়খ এদেব আলি স্বপ্নের বর্ণনা শুনে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠলেন। তিনি উসমানকে বললেন, তোমাকে আল্লাহ বাদশাহি দান করবেন। আমার মেয়ে রাবিয়াকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে বলা হয়েছে। আমি আল্লাহর এই ফায়সালা মেনে নিলাম।[৭]

---

৫. Uyar, M. and Erickson, E.J., 2009. A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. ABC-CLIO.

৬. প্রাগুক্ত (১)

ডাইনামিক্স অফ আনাতোলিয়া

এক

গরিবের ঘরে সুন্দরী বউ থাকতে নেই।

কন্সট্যান্টিনোপল ছিল ক্রমশই ভেঙে পড়া বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গরিব ঘরের সুন্দরী বউ। এর ওপর একাধারে নজর ছিল ক্যাথলিক পোপ, ভেনিস, জেনোয়া থেকে শুরু করে সবকটি প্রতিবেশী রাজনৈতিক শক্তির। থাকবেই না কেন?

কন্সট্যান্টিনোপল হলো ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে ঝুলন্ত এক সেতু, যে সেতুতে আছে সিল্ক রোডের প্রবেশদ্বার। চতুর্থ ক্রুসেডে ভেনিসের সাথে হাত মিলিয়ে একবার কন্সট্যান্টিনোপল দখলও করে নেয় ক্যাথলিক গির্জা।[১]

সাতান্ন বছর পর যখন সম্রাট মাইকেল দ্যা এইটথ আবারও এর দখল নেন, তখন থেকে তিনি এর নিরাপত্তা জোরদারের জন্য নিয়োগ করেন নিজের সর্বশক্তি। মাইকেলের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলতে তখন ছিল থ্রেস, মোরিয়া উপদ্বীপ, আনাতোলিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ বিথিনিয়া, উত্তর আনাতোলিয়ার ত্রাবজোন আর এজিয়ান সাগরের কিছু দ্বীপ, এটুকুই।[২]

সেলজুক সালতানাত-ই রুম তখন মোঙ্গল আগ্রাসনের পেটের ভেতর চলে গেছে। তাই সেলজুকদের কাছ থেকে কোনো রকম বিপদের আশঙ্কা মাইকেল করতেন না, তার বরং ভয় ছিল পোপসহ নিজের পশ্চিমা শত্রুদের নিয়ে, তারা সুযোগ পাওয়ামাত্রই আবার কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের চেষ্টা চালাতে পারে।

---

১. Goffman, D., 2002. The Ottoman empire and early modern Europe. Cambridge University Press.

২. Frazee, C.A., 2006. Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453-1923. Cambridge University Press.

৩. Quataert, D., 2005. The Ottoman Empire, 1700-1922. Cambridge University Press.

কনস্ট্যান্টিনোপল শহরটা ছিল বিশাল। এত বড় শহরের প্রতিরক্ষা ব্যয় সামলাতে গিয়ে মাইকেলের বাজেটে টান পড়ল। সব ভেবে চিন্তে তিনি ঠিক করলেন, যেহেতু সেলজুকদের হাত থেকে পূর্ব সীমান্ত এখন নিরাপদ, তাই পূর্বের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আকরিতাইকে ভেঙে দেয়া হবে। এ থেকে বেঁচে যাওয়া খরচ বিনিয়োগ করা হবে কনস্ট্যান্টিনোপলের পেছনে।[৩]

আকরিতাই বাহিনী বিগত প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে বাইজান্টাইন বিথিনিয়াকে রক্ষা করে গেছে সেলজুকদের হাত থেকে।

ওদের সীমান্তের বিভিন্ন চৌকিতে ভাগ করে দিয়ে করমুক্ত জমি আর অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হতো। দেয়া হতো অল্প কিছু বেতন, বিনিময়ে ওরা পাহারা দিত বিথিনিয়ার পূর্ব সীমান্ত। বাহিনী ভেঙে দেয়ায় আকরিতাই সদস্যরা বেকার হয়ে পড়ল। রাতারাতি তাদের জমিজমা চলে গেল কাউন্ট-ব্যারনদের কাছে, তারা হয়ে পড়ল সহায় সম্বলহীন।

সৈনিক যখন চাকরি হারায়, তখন অন্যের গলায় ছুরি ধরে লুটপাট করা ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না। কারণ, কাজ বলতে সে একটা জিনিসই শিখেছিল, মানুষ মারা।

সুন্দরী বউ কনস্ট্যান্টিনোপলকে রক্ষা করতে গিয়ে গরিব বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তার আয়ের প্রধান উৎস কৃষি আর বাণিজ্য সমৃদ্ধ বিথিনিয়াকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল।

দুই

আনাতোলিয়ায় তখন সেলজুকরা ভেঙে পড়েছে। প্রতিদিন কমছিল সেলজুকদের ক্ষমতা।

এক সময়কার সেলজুক রাজধানী কোনইয়া তখন কারামানোলু মেহমেদ বের নিয়ন্ত্রণে।[৪] সেলজুক সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ মধ্য আনাতোলিয়ার সামান্য কিছু ভূখণ্ডের ওপর। আনাতোলিয়ার বাকি অংশ চলে গেছে বিভিন্ন ওঘুজ গোত্রের হাতে। এদের ক্ষমতা খর্ব করার মতো যথেষ্ট শক্তি সেলজুকদের ছিল না। তবু কর আদায়ের জন্য যেটুকু শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা সেলজুকরা করতে জানত। নিজেদের বাহুবলে না কুলালে ডেকে আনা হতো মোঙ্গল নোইয়নকে, তার উপস্থিতিই ছিল একটা সেনাবাহিনীর সমান।

কিন্তু সিরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ায় তখন মোঙ্গলরা দফায় দফায় মামলুকদের হাতে মার খাচ্ছিল। ফলে তাদের সম্পর্কে মানুষের মনে যে আতঙ্ক, তা একটু একটু করে কাটতে লাগল।

---

[৩]. Uyar, M. and Erickson, E.J., 2009. A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. ABC-CLIO.

[৪]. Dale, S.F., 2009. The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals (Vol. 5). Cambridge University Press.
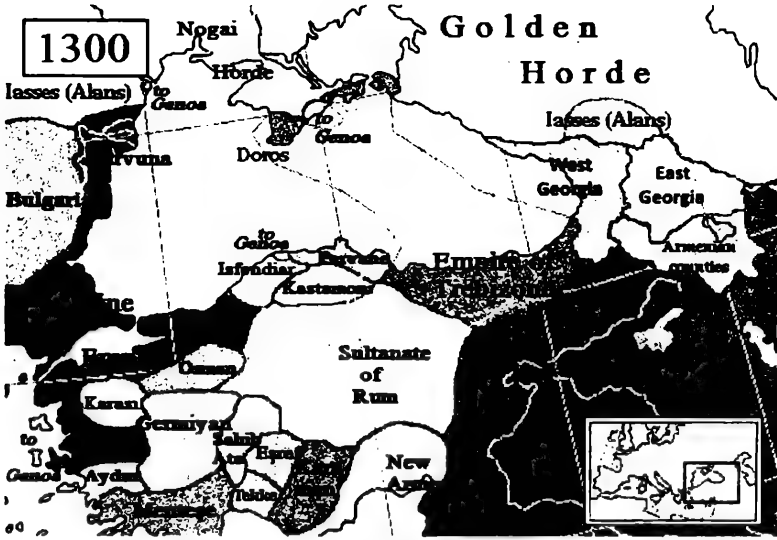
১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে আনাতোলিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র।

১২৭৭, ১২৮২, ১২৮৭, দশ বছর সময়ের ভেতর তিন বার আনাতোলিয়ায় মোঙ্গল বিরোধী বিদ্রোহ হলো।[৫] প্রথম দুবার সহজে তা দমন করা গেলেও তিন বারের বার এই বিদ্রোহ দমন করতে মোঙ্গলদের বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল, ওঘুজদের নিয়ন্ত্রণ করা বড় কঠিন কাজ।

১২৯২ সালে আবার বিদ্রোহ হলো, একই সাথে মোঙ্গল ও তাদের করদ প্রজা সেলজুকদের বিরুদ্ধে। সেলজুকরা এবারও কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করল। কিন্তু এই বিদ্রোহ দমনে তারা নিজেদের শেষ শক্তিটুকুও ব্যয় করে ফেলেছিল। এরপর থেকে আনাতোলিয়ার পশ্চিমে সেলজুকদের কোনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রইল না।

এই জায়গাটা ভৌগোলিকভাবেও ছিল ওঘুজ গোত্রগুলোর জন্য চমৎকার। শীতে তারা এখানকার ঢালু সমভূমি আর উপত্যকাগুলোতে নেমে আসত, গ্রীষ্মে ওঠে যেত উঁচু পার্বত্য জমিতে।

এখানে ছিল তাদের ছাগল-ভেড়া আর ঘোড়া-মহিষ চরানোর জন্য যথেষ্ট তৃণভূমি, সেই সাথে ছিল গম আর ধান ফলানোর মতো উর্বর নিচু জমিও। ফলে ওঘুজ তুর্কমান গোত্রগুলো একের পর এক নতুন বেইলিক (ক্ষুদ্র রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল। দক্ষিণ-পশ্চিমে হামিদি, মেনতিসি, আয়দিন, পশ্চিমে জারমিয়ান, সারুখান, উত্তর-পশ্চিমে কারেসি, বিলেজিক, উত্তরে জান্দারি আর কাস্তামনু বেইলিকগুলো একের পর ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠছিল। এদের বিরুদ্ধে কিছু করা সেলজুকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজে কর্মে স্বাধীন হলেও এরা সবাই সেলজুকদের সামান্য কিছু

---

৫. Amitai. R. and Morgan. D.O. eds., 1999. The Mongol Empire and its legacy (Vol. 24). Brill.

নামকাওয়াস্তে কর দিত এবং এদের মসজিদগুলোতে জুম্মার খুতবায় সুলতানের নামই পড়া হতো। নিজের নামে কেউ মুদ্রাও তৈরি করেনি।[৬]

এদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় ছিল জারমিয়ান বেইলিক, আর সবচেয়ে ছোট ছিল বিলেজিক বেইলিক।[৭] বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের সাথেই ছিল জারমিয়ান, কারেসি, বিলেজিক আর হামিদি বেইলিকের অবস্থান।

এই অঞ্চলের রাজনীতি দিনকে দিন জটিল হয়ে ওঠছিল। ওঘুজরা শুরু থেকেই ছিল যোদ্ধা, গাজি হিসেবে তাদের ছিল সুখ্যাতি। পশ্চিম সীমান্তে বাইজান্টাইনদের ভেঙে পড়া সীমান্ত ব্যবসায়ী, ওঘুজ গাজি ও সুফি দরবেশদের দাওয়াতি কাজের জন্য খুলে দিল নতুন সম্ভাবনার দুয়ার।

ব্যবসায়ীরা খুঁজছিল ব্যবসা। আকরিতাইরা খুঁজছিল লুট করার সুযোগ। ওঘুজ গাজিরা চাইছিল যুদ্ধের সুযোগ।

বেইলিকগুলো চাইছিল নিজেদের সীমানা বিস্তৃত করতে।

সুফিরা খুঁজতেন নতুন জনগোষ্ঠী, যাদের ভেতর ইসলাম প্রচার করা যায়।

বাইজান্টাইন সম্রাটের লোকেরা এসব অঞ্চলে আসতেন শুধুই কর আদায় করতে। এখানকার লোকজনের ভালো মন্দ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। গাজি, সুফি, আর সর্বহারা ডাকাত আকরিতাইদের তৎপরতা তাই পশ্চিম আনাতোলিয়াতে বাড়তেই থাকল।

আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা বলছি।

তিন

নক্ষত্রের ভেঙে পড়া অবশেষ থেকে যেমন গ্রহেরা জন্মায়, তেমনি সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া টুকরোগুলো থেকে জন্ম নেয় নতুন এক বা একাধিক রাজ্য। আর একেকটা সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়া মানেই কিছু মানুষের সব হারানো। কিছু মানুষের জন্য আবার তা খুলে দেয় সৌভাগ্যের নতুন দিগন্ত।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আর সেলজুক সালতানাত, এককালের দুই সুপার পাওয়ার যখন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল। তখন আনাতোলিয়ার বুকে গজিয়ে উঠা তুর্কি আমিরাতগুলো ক্রমেই হয়ে উঠছিল শক্তিশালী।

এখানেও অনেক মানুষের ভাগ্যে নেমে এসেছিল দুর্ভোগ। বাইজান্টাইন ভূমিতে চাকরি আর জমি হারিয়েছিল এককালের শক্তিশালী আকরিতাইরা। আর সেলজুক সেনাবাহিনী

---

৬. Ágoston, G. and Masters, B.A., 2010. Encyclopedia of the ottoman empire. Infobase Publishing.
৭. Pamuk, S., 2000. A monetary history of the Ottoman Empire. Cambridge University Press.

কাঁপিয়ে বেড়ানো অনেক যোদ্ধারাই হয়ে পড়ছিল বেকার। ওদিকে নতুন সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল আনাতোলিয়ার খ্রিষ্টান সামন্ত-জমিদার-অভিজাতদের মধ্যে। কারণ, বাইজান্টাইন সম্রাটের জমিতে তখন সরাসরি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

অন্য অনেক কিছুর মতো প্রজার সংজ্ঞাও পূর্বে-পশ্চিমে এক না। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রজাদের বলা হতো সার্ফ। একজন সার্ফ বংশানুক্রমিকভাবে ছিল জমিদারদের প্রজা, তার নিজের কোনো জমি ছিল না, সে জমিদারদের জমি চাষ করত। চাইলেও সে এক জমিদারের এলাকা থেকে অন্য জমিদারের এলাকায় যেতে পারত না। কারণ, এটা নিষিদ্ধ ছিল। বাইজান্টাইন কৃষকদের নিজেদের উৎপাদিত ফসলের বিরাট এক অংশ জমা দিতে হতো জমিদারের কাছে। নিজেদের ভাগে যা পড়ে থাকত, তা দিয়ে জীবন ধারণ করা ছিল খুবই কঠিন।

যেহেতু সম্রাট পশ্চিম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাই পূর্বে তার নজর ছিল কম। নির্যাতিত জনগণ অত্যাচারী শাসকের বিপদে পাশে দাঁড়াতে চায় না।

আর এই সুযোগটাই ব্যবহার করে পশ্চিম আনাতোলিয়ার আমিরাতগুলো। তারা একের পর এক হামলা চালিয়ে বাইজান্টাইন জমিদারদের এলাকা দখল করতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রেই তাতে সহায়তা দিতে থাকে গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ, কিন্তু শহরের মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল বিপরীত।

আকরিতাই বাহিনী ভেঙে দেয়ার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তুর্কি আমিরাতগুলোর বাহিনীর বিপক্ষে বাইজান্টাইন অভিজাত-জমিদাররা ছিল অসহায়। তাদের প্রতিরক্ষা নির্ভর করত নিজেদের ভাড়াটে সৈন্যদের দক্ষতার ওপর।[৮]

পক্ষান্তরে তুর্কিদের বাহিনীতে থাকত স্তেপের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তুর্কমেন গাজিরা। গাজিদের কাছে এই লড়াইগুলো নিছক পার্থিব লড়াই ছিল না, একই সাথে ছিল নতুন ভূখণ্ড জয় করে দারুল ইসলামের অধীনে নিয়ে আসার লড়াইও। তাই গাজিরা আক্রমণ করত জীবন বাজি রেখে, বিপরীতে একটু বিপদ দেখলেই পা টান দিত ভাড়াটে যোদ্ধার দল।

গাজিদের পাশাপাশি আনাতোলিয়ার সুফিদের জন্যেও এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এনে দিয়েছিল নতুন সম্ভাবনা। যে এলাকা গাজিরা জয় করত, সেখানেই সুফিরা গিয়ে নতুন আস্তানা গাড়তেন, সাথে প্রচার করতেন ইসলামের বাণী।

আরতুরুল বের আমলে বাইজান্টাইন সীমান্তে তুর্কিদের তৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তা আনাতোলিয়াতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দেয়ার মতো শক্তিশালী ছিল না।

১২৮১ সালে আরতুরুল বের মৃত্যু হলে উসমান ক্ষমতায় বসেন।[৯]

---

৮. Uyar, M. and Erickson, E.J., 2009. A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. ABC-CLIO.

বাইজান্টাইন সীমান্তের এই নতুন পরিস্থিতি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল উসমানের মতো কোনো তরুণ আর শক্তিশালী নেতাকেই।

চার

প্রিয় উস্তাদ শায়খ এদেব আলির কাছে উসমান শিখেছিলেন, রাজ্যকে শক্তিশালী করতে হলে রাজ্যের মানুষের উন্নতি ঘটাতে হবে।

তার রাজ্যটি ছিল পুরো আনাতোলিয়ায় সবচেয়ে ছোট রাজ্য, কিন্তু তিনি ছিলেন সম্ভবত তার সময়ে আনাতোলিয়ার সেরা নেতা।

উসমান নিজে ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজ আর ঘোড়সওয়ার। যোদ্ধা হিসেবে সুনামের পাশাপাশি একজন ন্যায়বিচারক হিসেবেও তাকে তার অধীনস্ত লোকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

উসমানের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না। তার আশেপাশে থাকা সব মানুষকে তিনি একটা সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যেখানে থাকবে ইনসাফ আর উন্নত জীবনের আনন্দ।

উসমান যে সময়ে জন্মেছিলেন সে সময়টায় মানুষকে যতটা না যোগ্যতা দিয়ে বিচার করা হতো তার চেয়ে বেশি দেখা হতো তার বংশপরিচয়। তিনি নিজের ছোট রাজ্যটাতে এই বংশপরিচয় দিয়ে মানুষকে বিচার করার প্রথা তুলে দিলেন। তার বেইলিকে সবাই কাজ পেত নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী।

তিনি বিশেষভাবে গরিব ও নওমুসলিমদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

---

৯. Erendil, M., 1980. Emergence of the Ottoman State. An Outline of the Period between 1299-1453. Revue Internationale d'HistoireMilitaire, 46, pp.31-59.

মাওলানা জালাল উদ-দীন রুমির আদর্শে প্রভাবিত উসমান গাজির তাঁবু ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রতিদিন দুপুরে তিনি বেশ বড় রকমের ভোজের আয়োজন করতেন। যেখানে সবাই তার সাথে শরিক হতো, কেউই না খেতে পেয়ে ফেরত যেত না। তার অনুসারীরাও খুব ভালোবাসত তাকে, নিজেদের তারা পরিচয় দিত উসমানোলারি বা উসমানের লোক বলে।[১০]

নিজের সাত ছেলের কয়েকজনের নাম তিনি রেখেছিলেন সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের নামে। উসমানের অধীনে ধীরে ধীরে আরতুরুল বের প্রতিষ্ঠা করা ছোট্ট আমিরাতটি শক্তিশালী হয়ে ওঠতে থাকে।

সামরিক সক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে বাইজান্টাইন সীমান্তের খ্রিষ্টান জমিদারদের বিরুদ্ধে তার অভিযানের পরিমাণও। ওদিকে ১৩০২ সালের এক ভূমিকম্পে সারকায়া নদী তার দিক পরিবর্তন করে।[১১] বিথিনিয়ার বাইজান্টাইন দুর্গগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা, নদীর দিক পরিবর্তনে এই দুর্গগুলো অচল পয়সায় পরিণত হয়।

উসমান সুযোগ হাতছাড়া করার মতো লোক ছিলেন না। একের পর এক জমিদারকে পরাজিত করে তাদের দখলে থাকা ভূখণ্ডকে ইসলামি শাসনের আওতায় নিয়ে আসতে থাকেন তিনি। উসমান কোনো এলাকা জয় করার সাথে সাথে তিনি সেখানকার প্রজাদের বকেয়া কর মওকুফ করে দিতেন। তাই আনাতোলিয়ার গ্রামগুলোর খ্রিষ্টান জনগণের পক্ষ থেকে তাকে কোনো বাধাই দেয়া হচ্ছিল না। একপর্যায়ে তিনি ইয়েনিশেহির নামের একটি শহর বাইজান্টাইনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন, সেই সাথে নিজেকে ঘোষণা করেন সুলতান।[১২]

১২৯৯ সালে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে তার সাফল্যে আনন্দিত হয়ে তাকে একটি ঘোড়ার লেজ চিহ্নিত পতাকা, কাফতান ও ঢাক পাঠিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান সেলজুক সুলতান।[১৩]

একটা ছোট আমিরাত থেকে নতুন এক সালতানাতের জন্ম হলো। এর নাম, উসমানি সালতানাত, দেভলেত-ই আহলিয়ে আল উসমানিয়া।*

---

১০. Finkel. C., 2007. Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire. Hachette UK.

১১. Imber. C., 2009. The Ottoman Empire. 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan.

১২. প্রাগুক্ত(১০)

১৩. প্রাগুক্ত(১০)

* অটোমান নামটা মূলত উসমান নামের গ্রিক উচ্চারণ।

গাজি

এক

'তুমি যদি তীরের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ আনতে চাও, তোমাকে আগে নিজের নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।

ধনুক ধরার সময় নিজের হৃদপিণ্ডের স্পন্দনকে অনুভব করবে। যদি বুকের ভেতর ধকধক আওয়াজ শোনো, বুঝবে আল্লাহর সাহায্যের জন্য তুমি এখনো তৈরি নও। নিজেকে প্রশান্ত কর, প্রশ্বাসের আরও গভীরে চলে যাও। তারপর আবার নিজের হৃদস্পন্দনকে অনুভব করতে চেষ্টা কর।

দেখবে তুমি আর ধকধক আওয়াজ শুনছ না। তোমার রবের নাম তোমার হৃদপিণ্ড যিকর করছে।

প্রশ্বাসের সাথে তখন তোমার পুরো শরীরের প্রতিটা পেশী সজাগ হবে। ধনুকের ছিলা এবার টানটান কর। দুচোখকে নিশানায় স্থির কর, তারপর চোখ বুজে আবার অনুভব কর তোমার সত্তার যিকর। এবার চোখ খুলে দেখো, তোমার নিশানা নিজেই তোমার সামনে হাজির হয়ে গেছে।

তোমার রবের নাম উচ্চারণ কর, ইয়া হক!

নিশ্বাস ছেড়ে দাও। সাথে ছেড়ে দাও তীর।

তীর নিশানায় পৌঁছে দেয়া তোমার রবের কাজ।

তুমি যখন সঠিকভাবে তোমার রবের নামে তীর নিক্ষেপ করতে পারবে, তখন তুমি না, তোমার রবই তীর নিক্ষেপ করবেন। আর আল্লাহর তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।'

সাকারযা নদীর তীরে ব্যাফিউস মালভূমির ওপরের ক্রমেই ঢালু হয়ে যাওয়া চড়াইয়ের ঘন ঝোপে লুকিয়ে থাকা পাঁচ শ গাজির নেতৃত্বে থাকা তুরগুত বে তার শায়খের কথা ভাবছেন।

বাইজান্টাইন সম্রাটের পাঠানো দু হাজার যোদ্ধা ব্যাফিউস মালভূমিতে ঘাঁটি গেড়েছে। তাদের লক্ষ্য, নিকোমিডিয়ার (ইজমিত) আশপাশ থেকে উসমান গাজির যোদ্ধাদের তাড়িয়ে দেয়া।

এর আগে স্বয়ং কাইজার মাইকেল এসেছিলেন আনাতোলিয়া অভিযানে। প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে এসে বহুদূর পর্যন্ত তিনি তাড়া করেছেন উসমান গাজিকে।

উসমান গাজি ভালো করেই জানতেন, অত বড় সুশিক্ষিত পেশাদার বাহিনীকে মোকাবেলার মতো বাহিনী তিনি এখনো গড়ে তুলতে পারেননি। তাই তিনি গাজিদের নিয়ে আনাতোলিয়ার গভীরে পাহাড়ী এলাকায় চলে যান। তাকে প্রায় মাসখানেক ধরে খুঁজেও না পেয়ে শেষমেশ আনাতোলিয়া ছেড়ে কনস্টান্টিনোপলের রাস্তা ধরেন কাইজার। কাইজার যাওয়া মাত্রই জমিদারদের ওপর নিজেদের স্বভাবসুলভ আক্রমণ শুরু করে গাজিরা।

নিরূপায় কাইজার এবার সেনাপতি মুজোলানের নেতৃত্বে দু হাজার যোদ্ধার একটা দল পাঠিয়েছেন। এদের কাজ উসমান গাজিকে আচমকা আক্রমণ করে বন্দি করা। কিন্তু উসমান গাজির লোকজন ছড়িয়ে ছিল সর্বত্র, বাহিনী বসফরাস পেরোনোর পর পরই খবর পেয়ে যান তিনি।

দুই

২৭ জুলাই, ১৩০২ সাল, গভীর রাত।[১]

মুজোলানের বাহিনী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

তুরগুত যেদিকটায় লুকিয়ে আছেন, তার বিপরীত দিক থেকে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বাইজান্টাইন ক্যাম্পের ওপর নেমে এসেছে পাঁচ শ গাজির আরেকটি দল।

---

১. Finkel, C., 2007. Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire. Hachette UK. p. 126

এই দলের কাজ আচমকা হামলা করে ঘুমন্ত বাইজান্টাইনদের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়ে তাদের তুরগুতের বাহিনীর দিকে পালাতে বাধ্য করা। তাদের আলোর সংকেত পেলেই তুরগুত তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করবেন। এদিকে পালাবার জন্য যারাই আসবে, তারাই হবে তার শিকার। এদিক থেকে রাতের আঁধারে তীরবৃষ্টি শুরু হলে নদী তীরের বিপরীত দিকে ছুটবে ভীত বাইজান্টাইন বাহিনী। সেখানে তাদের জন্য প্রায় চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে অপেক্ষা করছেন স্বয়ং উসমান গাজি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাম্পে হই চই শুরু হলো। হামলা শুরু হয়ে গেছে।

গ্রিকদের মতো পোশাক পরা ছায়ামূর্তিগুলো ছুটতে শুরু করেছে ক্যাম্প থেকে।

নিজের ধনুকটা তুলে নিলেন তুরগুত বে, তারপর একটা শিস দিয়ে ওঠলেন। তার বাকি যোদ্ধারাও তৈরি হলো ধনুক বাগিয়ে।

তাদের হাতে যে ধনুক আছে, এটা ওঘুজদের ঐতিহ্যবাহী ধনুক। পৃথিবীতে আর কোনো ধনুকের এর মতো বিশাল পাল্লা নেই। ছয় শ মিটার দূর পর্যন্ত এটা দিয়ে এমনিতেই তীর ছোঁড়া যায়। দক্ষ তীরন্দাজরা এমনকি আট শ মিটার দূরেও তীর ছুড়তে পারে।[২]

নিশানা ভেদ করতেও এই ধনুকের কোনো জুড়িই নেই। তিন শ মিটার দূরে থাকা ব্রোঞ্জের বর্ম ফুঁড়ে বিঁধে যায় এর তীর।

ধনুকে তীর পরিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তুরগুত। চাঁদের আলোয় বোঝা যাচ্ছে, ছায়ামূর্তিগুলো বেশ কাছে এসে পড়েছে।

ওপার থেকে আলোর সংকেত জ্বলে ওঠল।

লম্বা একটা দম নিয়ে নিশানা স্থির করলেন তিনি, তার সারা শরীর টানটান হয়ে উঠল।

তুরগুত উচ্চারণ করলেন, ইয়া হক!!

তিন

বাইজান্টাইন সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে দিগ্‌বিদিক ছুটতে শুরু করেছে। গাজিদের প্রথম আঘাতটা এসেছে উত্তর থেকে, তারা তখন গভীর ঘুমে। ঘুমন্ত শত্রুকে আঘাত হানা কাপুরুষতা, তাই ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবার জন্য আক্রমণের ঠিক আগে একবার বিকট শব্দে তারা হুংকার দিয়ে উঠেছিল, হাইদির আল্লাহ!

---

২. Paterson. W.F.. 1966. The archers of Islam. Journal of the Economic and Social History of the Orient/Journal de l'histoire economique et sociale de l'Orient. pp.69-87.

কিছু বুঝে উঠার আগেই বাইজান্টাইনরা দেখল, তাদের ক্যাম্প শত্রুর দখলে চলে গেছে। প্রাণ নিয়ে তারা পালাল দক্ষিণে। সেখানে শিকারের আশায় অপেক্ষা করছিলেন তুরগুত বে। ধনুকের পাল্লার ভেতরে শত্রুরা আসতেই তীরবৃষ্টি শুরু করলেন তিনি।

উভয় সংকটে পড়া বাইজান্টাইন সেনারা এবার ছুটলো পশ্চিমে, আর সেদিকেই লুকিয়ে আছে উসমান গাজির মূল বাহিনী।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে বাহিনী নিয়ে পশ্চিমে আগাচ্ছিলেন মুজোলান। তাদের পুরোপুরি হতভম্ব করে দিয়ে হঠাৎ উসমান গাজি হাক দিয়ে ওঠলেন, ইয়া আল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার!! শুরু হলো মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ।

মুজোলান দেখলেন তুর্কিরা সংখ্যায় তার বাহিনীর দ্বিগুণ। সেই সাথে তিন দিক থেকে তিনি ঘেরাও হয়ে গেছেন। বাঁচতে হলে কোনোভাবে এই ঘেরাও থেকে বেরিয়ে নদী পার হতে হবে।

দ্রুত ক্ল্যাসিক্যাল বাইজান্টাইন ডিফেন্সিভ ফরমেশনে চলে গেল তার যোদ্ধারা।

কিন্তু গাজিদের ছোঁড়া তীরগুলো একের পর এক তাদের বর্মভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। ঢালের দেয়াল তৈরি করা হলো তীর ঠেকাতে, আর এই সুযোগেই পুরোদমে ক্যাভালরি চার্জ শানালেন উসমান।

এরই মধ্যে মুজোলান দেখলেন, সাথে আনা এক হাজার ভাড়াটে অ্যালান সৈন্যরা বিপদ দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সটকে পড়েছে।[৩]

তীর আর বর্শার মিলিত আক্রমণে দলে দলে মরতে লাগল বাইজান্টাইন সৈন্যরা। কয়েক দফা ক্যাভালরি চার্জে তাদের কাতারগুলো চুরমার হয়ে গেল। উপায়ান্তর না পেয়ে মুজোলান সোজা নদীর দিকে ছুটলেন ।

এবার তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল অ্যালান ভাড়াটে যোদ্ধারা। তাদের তীরবর্ষণের কাভারে শেষমেশ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারল বাইজান্টাইন বাহিনী।

এই যুদ্ধ ব্যাটল অফ ব্যাফিউস নামে পরিচিত। যুদ্ধটা ছোট ছিল, কিন্তু এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

এশিয়া থেকে বাইজান্টাইনদের চিরতরে পাততাড়ি গোটানো এর মাধ্যমেই শুরু হয়।

এই লড়াইয়ে জেতার পর উসমান গাজির নাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

দলে দলে গাজিরা ভিড়তে থাকে তার কাছে। উসমানের পতাকা হয়ে উঠে আনাতোলিয়ার গাজিদের বীরত্বের প্রতীক।

---

[৩]. Nicol. Donald MacGillivray (1993). The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453, Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-43991-6

চার

ব্যাফিউসে হারার দু বছর পর বেশ বড় এক বাহিনী নিয়ে আনাতোলিয়ায় ফিরে আসেন কাইজার। এবারও তাকে সরাসরি মোকাবেলা না করে পাহাড়ী এলাকায় সরে যান উসমান। তার গেরিলা ট্যাকটিক্সের কারণে অনেক বেশি সৈন্য আর রসদ নিয়েও মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে থাকে বাইজান্টাইনরা।

ডিম্বোজ প্রান্তরে আরেক দফা যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয় উভয় বাহিনী, কিন্তু এবারেও বাইজান্টাইনরা জিততে ব্যর্থ হলো।

এর কয়েক বছর পর অটোমানদের ঠেকাতে বাইজান্টাইনরা ডেকে আনল মোঙ্গলদের কিন্তু উসমান গাজি আবারও গেরিলা ট্যাকটিক্স অবলম্বন করে সরে গেলেন পাহাড়ী এলাকায়। মোঙ্গলরা লুটপাট করে চলে গেল।

কাইজার বুঝতে পারছিলেন আনাতোলিয়াতে একটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যা আগামী দিনে তার সাম্রাজ্যের জন্য বড় ধরনের বিপদের জন্ম দিতে যাচ্ছে। শিগগিরই বাইজান্টাইন বিথিনিয়ার বাণিজ্যিক পথগুলো তুর্কিদের হাতে চলে যাবে।

ব্যাটল অফ ব্যাফিউস ছিল নিতান্তই ছোট একটা যুদ্ধ।

কিন্তু এই মুহূর্তে যা প্রজাপতির ডানার সামান্য কম্পন, তা থেকেও ভবিষ্যতে তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়।

গাজিদের গাজি

এক

পরিবারের সাথে সাম্রাজ্যের একটা মৌলিক মিল আছে।

পরিবারের মতো সাম্রাজ্যও একটা সাধারণ পরিচয় দেয়। এই পরিচয় নানা ধর্মের, গোত্রের, বর্ণের মানুষকে গ্রহণ করাতে পারাই হলো সাম্রাজ্যের সাফল্য। যত বেশি মানুষ পরিচয় গ্রহণ করে, সাম্রাজ্য তত বড় হয়। যত সহজে এই পরিচয়কে মানুষ মন থেকে গ্রহণ করে নেয়, সাম্রাজ্যের ভিত হয় তত মজবুত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উসমান গাজি যখন তার ছোট্ট সালতানাতটা স্থাপন করেছিলেন, তখন তার সঙ্গী হওয়া ছিল খুব সহজ। উসমান গাজির কাছে যাও, আনুগত্যের শপথ নিয়ে তার সাথে দুপুরের খাবারে নুন খাও, যুদ্ধের সময় তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করো, তুমি অটোমানদের একজন হয়ে যাবে।

এই সাধারণ পরিচয় শুধু মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাইজান্টাইন তেকফুরদের (জমিদার) শাসনে বিরক্ত বহু খ্রিষ্টান এই পরিচয়ে শামিল হয়েছিল। এর পেছনে মূল কৃতিত্ব উসমান গাজির ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের। তিনি যুদ্ধ বাঁধাতে যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি দক্ষ ছিলেন সন্ধি করতেও। মানুষকে নিমিষে নিজের বন্ধু বানিয়ে দলে ভিড়াতে তার সময় লাগত না। মাওলানা রুমির ভক্ত হওয়ায় খ্রিষ্টানদের সাথে ভাব জমাতেও তার সময় লাগত না।

নিজের উদ্দেশ্যের পাশাপাশি তার মিত্রদের স্বার্থের দিকেও খেয়াল রাখতেন বলে এটা সবার কাছে পরিষ্কার ছিল, উসমানের সাথে থাকলে ঠকতে হয় না।

এভাবেই উসমানের অধীনে অনেক সাধারণ বাইজান্টাইন প্রজা থেকে শুরু করে বহু বাইজান্টাইন কমান্ডারও যোগ দিয়েছিলেন গাজিদের বাহিনীতে। এদেরই একজন ছিলেন কোসে মিহাল। জন্মগতভাবে মিহাল ছিলেন খ্রিষ্টান কিন্তু উসমানের সংস্পর্শ অনেক মানুষকেই একেবারে ভেতর থেকে বদলে দিত। মিহালও কিছুদিনের ভেতর

বদলে গেলেন, কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলিম হয়ে যাবার পর মিহালের নাম হলো আবদুল্লাহ মিহাল গাজি।[১]

বাইজান্টাইন সম্রাট দিনকে দিন তুর্কিদের উত্থানে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। নিজে হামলা করলেন, লাভ হলো না, মোঙ্গলদের পর্যন্ত ডাকলেন, তাতেও লাভ হলো না। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি উসমানের সাথে সন্ধি করতে চাইলেন। বাইজান্টাইন পরিবারের সাথে আত্মীয়তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন না উসমান। তার বড় ছেলে ওরহানের সাথে বাইজান্টাইন প্রিন্সেস অ্যাসপোর্শার বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। বাইজান্টাইন সম্রাট হয়তো তখন ভাবছিলেন, যাক! এবার হয়তো তুর্কিদের উৎপাত থেকে বাঁচা গেল!

কিন্তু আনাতোলিয়ার ভূরাজনীতি তখন এমন অবস্থায় চলে গেছে যে এই লড়াই থামানো আর কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এশিয়ায় টিকে থাকতে গেলে বাইজান্টাইনদের প্রয়োজন ছিল বুরসা থেকে নিকাইয়া আর বুরসা থেকে নিকোমিডিয়ার বাণিজ্য পথকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। আর বাইজান্টাইনদের পতনের ওপর নির্ভর করছিল অটোমানদের টিকে থাকা। তারা জানত, আজ হোক কাল হোক, বাইজান্টাইনরা ফিরে আসবেই।

বিয়ের কয়েক বছর পর, যুদ্ধ থামাতে যাকে বাইজান্টাইনদের জামাই বানানো হয়েছিল সেই ওরহানই বুরসা অবরোধ করে বসলেন।

দুই

ওরহান যেদিন জন্ম নিয়েছিলেন তখনো জীবিত ছিলেন আরতুরুল বে। নিজের প্রথম নাতিকে কোলে নিয়ে তিনি তার নাম রেখেছিলেন ওরহান আল্প। ওরহান মানে মহান নেতা।[২]

ওরহানের গায়ে শুধু কায়িদের রক্ত নয়, সেলজুকদের রক্তও ছিল। দাদি হালিমা সুলতান ছিলেন সেলজুক রাজপরিবারের মেয়ে, ওরহানের নানিও ছিলেন সেলজুক পরিবারের মেয়ে। ওরহানের নানা উমার বে ছিলেন সেলজুক সরকারের মন্ত্রী।[৩]

বড় হবার সাথে সাথে দীর্ঘদেহী, বিশাল কাঁধের অধিকারী ওরহান হয়ে উঠলেন নিজের বাবা ও দাদার মতোই বীরযোদ্ধা।

ওরহানের মধ্যে দেখা যেত তার যাযাবর পূর্বপুরুষদের সব বৈশিষ্ট্য। তিনি এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পছন্দ করতেন না। তাকে একই দুর্গে কখনো এক মাসের বেশি থাকতে দেখা যায়নি।[৪]

---

১. Lowry, H.W., 2003. The nature of the early Ottoman state. SUNY Press.

২. Yavuz, H., 2004. Opportunity spaces, identity, and Islamic meaning in Turkey. Islamic activism: A social movement theory approach, pp.270-88.

৩. Leslie P., Peirce (1993). "Wives and Concubines: Toward Concubinage". The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016-4314: Oxford University Press. p. 55. ISBN 978-0-19-508677-5.

প্রতি জুম্মার নামাজের পর তিনি সঙ্গীদের নিয়ে আয়োজন করতেন বিশাল ভোজের, সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল সব ধরনের মানুষের। যৌবনে ওরহান তার বাবার অভিযানের সঙ্গী হয়ে ওঠলেন। উসমানের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাকে আর্থ্রাইটিস কাবু করে ফেলল। গাজি হিসেবে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে জিহাদের নেতৃত্ব এবার কাঁধে তুলে নিলেন সোনালি দাড়িওয়ালা যুবক ওরহান।

বুরসা আক্রমণ করার পর তিনি দেখলেন, এই ধরনের উঁচু দেয়ালে ঘেরা শহর দখলের জন্য যে ধরনের যন্ত্রপাতি লাগে, তা তার কাছে নেই। ওরহান তাই ভিন্ন এক কৌশলে আগালেন। তিনি প্রথমে নিজের বাহিনীকে শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে আনলেন, যেখান থেকে অটোমানদের তীর শহরের ভেতরে গিয়ে পড়লেও শহরে থাকা বাইজান্টাইনদের তীর তার শিবির পর্যন্ত পৌঁছত না। তারপর চতুর্দিক থেকে শহরে ঢোকার পথগুলো তিনি একে একে বন্ধ করে দিলেন। সাত বছর ধরে অটোমানরা অবরোধ করে রাখল এশিয়ায় বাইজান্টাইনদের সেরা শহর বুরসা।

খাবারের অভাবে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো প্রচুর বুরসাবাসী। ১৩২৬ সালের বসন্তের শুরুতে শহরে থাকা সেনা গ্যারিসনের খাবার মজুদ ফুরিয়ে এলে তারা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।[৫]

বুরসা বিজয় ছিল অটোমানদের জন্য একটা মাইলফলক। এর মধ্য দিয়ে আনাতোলিয়ায় অটোমানরা বাইজান্টাইনদের সমকক্ষ এক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

তিন

বুরসা জয়ের সংবাদ নিয়ে দ্রুত ইয়েনিশেহেরের দিকে ছুটলেন ওরহান। তাকে বলা হয়েছিল তার বাবার অবস্থা ভালো না।

ইয়েনিশেহেরে পৌঁছে ওরহান তার মৃত্যুপথযাত্রী বাবাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

উসমান গাজি তখন নিজের জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছিলেন, মৃত্যুর আগে তার মনে হলো, সন্তানদের কিছু নসিহত করে যাওয়া দরকার। নিজের দুই ছেলে ওরহান আর আলাউদ্দিনকে কাছে ডেকে ওসমান জীবনে শেষবারের মতো নসিহত দিলেন।

'প্রিয় সন্তান, সবার আগে ধর্মের প্রতি যত্নবান হও।

---

৪. Imber, C., 2009. The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan.

৫. Nolan, Cathal J. (2006). The Age of Wars of Religion, 1000-1650: An Encyclopedia of Global Warfare and Civilization. 1. Greenwood Publishing Group. pp. 100–101. ISBN 9780313337338.

ধর্মীয় অনুশাসন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলে যা অন্য কোনোভাবেই অর্জন করা যায় না। কোনোভাবেই ধর্মীয় বিষয়ে কোনো অযোগ্য, দুর্বল, অবিশ্বাসী, অবিবেচক ও উদাসীন লোককে দায়িত্ব দেবে না। একইভাবে এ ধরনের কোনো লোককে কখনোই কোনো প্রশাসনিক কাজেরও দায়িত্ব দেবে না। রাষ্ট্র পরিচালনার সময় শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে। মনে রাখবে, যার ভেতর স্রষ্টার ভয় থাকে, সে কখনো সৃষ্টির ভয়ে ভীত হয় না। তাই কখনোই কোনো পাপীকে রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্ব দেবে না। যারা পাপ কাজে জড়িত থাকে, তাদের কাছ থেকে বিশ্বস্ততা আশা করা যায় না।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তি, পুণ্যবান ব্যক্তি, শিল্পী ও শিক্ষিত জনগণ। এরাই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল শক্তি। তাদের মর্যাদা ও নম্রতার সাথে পরিচালনা করবে। যখনই কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির সন্ধান পাবে, তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে, সম্মান ও সম্পদ দান করবে এবং তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে। ধর্মীয় ও প্রশাসনিক বিষয়গুলো সব সময় নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালন করবে।

আমার উদাহরণ থেকে শিক্ষা নাও। আমি একজন দুর্বল নেতা হিসেবে এখানে এসেছিলাম। আল্লাহ আমাকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন যা অর্জন করার যোগ্যতা আমার ছিল না।

যেকোনো পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ, দ্বীন-ই মুহাম্মাদিকে রক্ষা করবে। সেই সাথে রক্ষা করবে মুমিনদের এবং তোমাদের অনুসারীদের। আল্লাহ ও তার বান্দাদের হক সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকবে। তোমাকে যে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের পুত্রদেরকেও একইভাবে উপদেশ দিতে ভুলবে না।

তোমাদের জনগণকে সাম্য ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাসন করবে। কখনো তাদের প্রতি অন্যায্য আচরণ করবে না। তাদের প্রতি সদয় থাকবে ও শত্রুদের আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতা থেকে তাদের রক্ষা করবে। কখনো কারও সাথে অশোভন আচরণ কর না। জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ থেক, তাদের স্বার্থ রক্ষা কর। তারা ভালো থাকলেই তোমরা ভালো থাকবে।[৬]

উসমান গাজির মৃত্যু হলো।

জীবদ্দশায় তিনি কোনো বিশাল সাম্রাজ্য বা বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে যেতে পারেননি, তার কোনো প্রাসাদ ছিল না। যুদ্ধের মাধ্যমে যা জয় করেছিলেন তার বেশিরভাগই সারা জীবন তিনি ভাগ করে দিয়েছেন নিজের সঙ্গী-সাথিদের ভেতর।

পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের অনেকে উসমান গাজিকে দেখাতে চেষ্টা করেন একজন লুটেরা হিসেবে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাইজান্টাইনদের লুট করা।

অথচ মৃত্যুর সময় তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে ছিল একজোড়া বুট, একটা তীরের বাক্স, একটা বর্শা, কয়েকটা ধনুক, একটা তলোয়ার, কিছু কাঠের চামচ, একটা লবনের বয়াম, কাফতান, জোব্বা, ডজন খানেকের মতো ঘোড়া আর তিনটা ভেড়ার পাল।

---

৬. http://lostislamichistory.com/the-birth-of-the-ottoman-empire

উসমান গাজির শেষ কথাগুলোই ছিল পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে অটোমান সালতানাতের মূলনীতি, যা তাদের তিন মহাদেশে বিস্তৃত এক মহা সাম্রাজ্য হয়ে উঠতে পথ দেখিয়েছিল।

চার

সুলতান হবার পর ওরহানের প্রথম কাজ হলো রাজধানী ইয়েনিশেহের থেকে বুরসায় নিয়ে যাওয়া। সেখানে তিনি উসমানকে পুনরায় কবর দিলেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ওরহান বুরসাকে গড়ে তুললেন নতুন এক সমৃদ্ধশালী শহর হিসেবে।

ইবনে বতুতা তার বর্ণনায় বুরসাকে সুরম্য দালান, চমৎকার বাগিচা আর প্রশস্ত রাস্তার এক চমৎকার শহর হিসেবে তুলে ধরেছেন।[৭]

মাত্র দুই বছরের মাথায় ওরহান আনাতোলিয়ায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর নিকাইয়া (ইজনিক) অবরোধ করে বসলেন। ঠিক বুরসার পদ্ধতিতেই।

এবার চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে এগিয়ে এলেন বাইজান্টাইন সম্রাট এন্ড্রোনিকাস। কিন্তু ওরহান দ্বিগুণ যোদ্ধা নিয়ে তাকে ঘিরে ধরলেন।

পেলিকাননের প্রান্তরে প্রথমবারের মতো কোনো বাইজান্টাইন কাইজারের মুখোমুখি হলেন অটোমান সুলতান।

প্রথম দফা লড়াইয়ে ভারী বর্মে ঢাকা বাইজান্টাইন পদাতিকদের ঢালের দেয়ালে আটকে গেল তুর্কিদের তীর। কয়েকবার সর্বশক্তিতে আঘাত হেনেও গ্রিকদের সুশৃঙ্খল কাতারগুলোতে ভাঙন ধরাতে ব্যর্থ হলেন ওরহান। গ্রিকরা একটা সচল দেয়ালের মতো ফরমেশন নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকল ওরহানের মূল বাহিনীর দিকে। এই ধরনের শেকলের মতো ফরমেশনে থাকা এক শ যোদ্ধা অনেক সময় পাঁচ শর সমান হয়ে দাঁড়ায়।

---

[৭]. Yi. E., 2015. riCh artisans and poor merChants?. Bread from the Lion's Mouth: Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities. 25. p.194.

দ্বিতীয় দফা লড়াই শুরু হলো। 'ইয়া আল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার' রব তুলে ওরহান তীব্র এক ক্যাভালরি চার্জ শানালেন। কিন্তু দু হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী গ্রিক দেয়াল এতেও ভাঙল না। উল্টো গ্রিকদের বর্শার আঘাতে শহিদ হয়ে গেলেন বেশ কয়েকজন গাজি।

এই পরিস্থিতিতে ওরহান দ্রুত নিজের বাহিনী নিয়ে পিছু হটার ভান করলেন। তাদের ভাবসাব দেখে বাইজান্টাইনরা ভাবল গাজিরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। গাজিদের পিছু ধাওয়া করতে করতে তারা এক সরু উপত্যকায় চলে এলো, আর এখানেই ওরহান ঘুরে দাঁড়ালেন।

বিখ্যাত তুঘুলামা (পার্থিয়ান শট) তীরন্দাজীর নির্ভুল প্রয়োগে অসংখ্য গ্রিক যোদ্ধা তুর্কিদের হামলায় হতাহত হলো।

কাইজার নিজের বাহিনীকে একটি পাহাড়ের ওপর সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত হলো, তারা পরদিন ভোর হবার আগেই এখান থেকে পালিয়ে যাবেন।

কিন্তু ওরহান তাদের সেই সুযোগ দিলেন না।

গভীর রাতে 'হাইদির আল্লাহ' রবে প্রকম্পিত হয়ে ওঠল বাইজান্টাইন ক্যাম্প।

প্রচণ্ড আক্রমণে হাজারেরও বেশি বাইজান্টাইন সৈন্য নিহত হলো। কাইজার নিজে আহত হলেন, আহত হলেন তার চাচা কাটাকুজিন। বাধ্য হয়ে প্রচুর সম্পদ ফেলে তারা পালিয়ে গেলেন কনস্ট্যান্টিনোপলে।[৮]

পেলিকাননের এই লড়াই ছিল এশিয়া মাইনরে বাইজান্টাইনদের বিদায় ঘণ্টাস্বরূপ। বাইজান্টাইনরা আর কোনোদিন এশিয়ায় ফিরে আসেনি।

ব্যাফিউসের যুদ্ধ, বুরসা জয় আর পেলিকাননের যুদ্ধ, এই তিনটি ঘটনা এক নতুন আঞ্চলিক পরাশক্তির জন্মের ইঙ্গিত দেয়। এক শ বছর আগে যারা মোঙ্গলদের তাড়া খেয়ে সব হারিয়ে আনাতোলিয়ায় এসেছিল, সময়ের পরিক্রমায় তারা আনাতোলিয়ার শাসক হয়ে ওঠেছে।

৮. Nicol, Donald M. (2002). The Reluctant Emperor: A Biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and Monk, C. 1295–1383. Cambridge University Press. pp. 32–33.

আখি

এক

ইবনে বতুতা বুরসায় প্রবেশ করলেন।

মাত্র কয়েক বছর হয়েছে বুরসা অটোমানদের অধীনে এসেছে। প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরটাকে এই অল্প সময়ের ভেতরেই নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন সুলতান ওরহান গাজি। প্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য অট্টালিকা, সুন্দর সব বাগান, মসজিদ আর হাম্মামখানা দিয়ে সাজানো হয়েছে অটোমানদের নতুন রাজধানীকে।

ইবনে বতুতা এখানে এসেছেন ওরহানের স্ত্রী নিলুফার খাতুনের অতিথি হিসেবে। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে শহরের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন স্বয়ং সুলতানা।[১] শহরে ঢুকে ইবনে বতুতা দেখলেন তার আসার খবর শুনে অসংখ্য তুর্কি তরুণ ভিড় করেছে। এরা দলে দলে চলাফেরা করে, নিজেদের এরা পরিচয় দেয় 'আখি' বলে।

আনাতোলিয়ার একজন অবিবাহিত তরুণের জীবনই ছিল অনেকটা ছকে বাঁধা। কিন্তু এই ছক ছিল এমন, তাতে তারা ক্লান্ত হতো না।

ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, বিকেলে খেলাধুলা, সন্ধ্যার পর কোনো সুফি তেকিতে (আশ্রম) গিয়ে আড্ডা, তারপর ধীরে ধীরে সুফি সংগীতের আসরে ডুবে যাওয়া। তারপর যিকিরে মগ্ন হওয়া, রাত বাড়ার পর যিকরের ঘোরে থেকেই বাড়ি ফেরা।

প্রত্যেক তরুণই কোনো না কোনো ভ্রাতৃসংঘের সদস্য। প্রতিটি ভ্রাতৃসংঘেরই আছে একেকটা নাম। তবে সাধারণভাবে এদের সবাইকে মানুষ আখি বলে। আখি মানে ভাই। প্রত্যেক সংঘের থাকে একজন করে সুফি শায়খ, যার অধীনে তারা জীবনযাপন করে।

ইবনে বতুতা খেয়াল করলেন, এখানকার ব্যবসায়ীরাও কেমন যেন অদ্ভুত!

---

১. Algar, A.E., 1992. The dervish lodge: Architecture, art, and Sufism in Ottoman Turkey (Vol. 10). Univ of California Press.

তিনি বাজারে প্রবেশ করলেন, কিন্তু কোনো ব্যবসায়ী তাকে নিজের মাল কেনার জন্য ডাকাডাকি করলেন না।

দুই

'First improve the mind of the man, the improvement of the workshops, factories and the companies will follow!'

এটা আধুনিক টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের মূল কথা।

আজ থেকে প্রায় সাত শ বছর আগে আনাতোলিয়ার আখিদের মূল কথাও ছিল এটাই। তাসাওউফ আত্মার উন্নতির মাধ্যমে মানুষকে উন্নতির দিকে ধাবিত করে। আর উন্নত মানুষ তার পেশাদার জীবনে উন্নত পণ্য তৈরি করে। উন্নত পণ্য উৎপাদন করে যে রিযিক উপার্জিত হয় তা হয় হালাল রিযিক। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই এতে উপকৃত হয়।

আনাতোলিয়ায় ব্যবসা আর বিভিন্ন কারিগরি শিল্প নিয়ন্ত্রণ করত ব্যবসায়ীদের একেকটি আখি সংঘ।

প্রতিটি শিল্পের জন্য ছিল আলাদা আলাদা আখি সংঘ। কোনো সংঘ হয়তো মাটির জিনিস তৈরি করত, তাদের দোকানগুলোতে কেবল মাটির জিনিসই পাওয়া যেত। কোনো সংঘ আবার তৈরি করত রেশমের জিনিস, তারা শুধু রেশমী জিনিসই বিক্রি করত। যারা ধাতব জিনিস তৈরি করত তাদের দোকানে কোনো অধাতব জিনিস কিনতে পাওয়া যেত না। প্রত্যেকেই নিজের তৈরি জিনিস বিক্রি করত বলে নিজের উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কে তারা ছিল সজাগ।

প্রতিদিন সকালে আখি শায়খ দোকানগুলো পরিদর্শনে বের হতেন। কোনো দোকানে নিম্নমানের পণ্য পাওয়া গেলে শায়খ তা ফেলে দিতেন। দোকানদারের জন্য বিষয়টা ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। যার সাথে এ ঘটনা ঘটত তার পক্ষে অন্যদের কাছে মুখ দেখানোর উপায় থাকত না।

সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা শেষে যেসব তরুণ কারিগরি শিল্প শিখতে আগ্রহী তারা কোনো আখি তেকিতে যোগাযোগ করলে তাদের কারিগরি বিদ্যা শেখার সুযোগ দেয়া হতো। প্রথমে তালিব হিসেবে তারা দু বছর কাজ শেখার পরে দোকানে কাজ করার অনুমতি পেত। তার তিন বছর পর এসব কিশোর/তরুণদের একটি পরীক্ষা নিতেন শায়খ।

পরীক্ষায় যারা পাস করত তাদের এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আখি হিসেবে ঘোষণা করা হতো। তাদের জন্য নতুন দোকানের ব্যবস্থা করে দেয়া হতো। তাদের ব্যবসার জন্য আখিরা মিলে মূলধন যোগাড় করে দিত এবং তার দোকানের কথাও সবাইকে জানিয়ে দেয়া হতো।

কোনো কোনো কঠিন শিল্প শিখতে দশ বছর এমনকি বিশ বছরও লেগে যেত। এসব শিল্পের শিল্পীদের ছিল বিশেষ কদর।

আখিদের সব সময় কিছু নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো।

একজন আখির সাতটি বৈশিষ্ট্য থাকা বাধ্যতামূলক।

১. আখি সৎ হবে।

২. আখি আমানতদার হবে।

৩. আখি বিশ্বস্ত হবে।

৪. আখি দয়ালু হবে।

৫. আখি লোভ পরিহার করে চলবে।

৬. আখি উদার হবে।

৭. আখি ন্যায়পরায়ণ হবে।

কেউ এই বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করে চলতে না পারলে তাকে আখি সংঘ থেকে বের করে দেয়া হতো। কোনো শহরে একটা নির্দিষ্ট আখি সংঘই একটা নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করত। তাই বহিষ্কৃত আখি সদস্যের শহর ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না। তাই অসৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষে আনাতোলিয়ায় টিকে থাকা ছিল খুব কঠিন।

আখি সততা আর নিষ্ঠার কারণে অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে অটোমান সালতানাত দ্রুত আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হয়ে উঠছিল। ১৩৩০ সালের দিকে অটোমান সালতানাত পরিণত হয় আনাতোলিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ এক জনপদে। সুলতানদেরও ছিল আখিদের ওপর গভীর আস্থা। নতুন কোনো এলাকা অটোমানদের শাসনের অধীনে এলেই সুলতান সেখানে আখিদের পাঠিয়ে দিতেন। আখিরা সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করতেন। তাই অটোমান সালতানাতের অর্থনীতি ছিল সততা ও নৈতিক ভারসাম্যের এক চমৎকার উদাহরণ।

তিন

শায়খ ছিলেন আখি সংঘের পরিচালক।

প্রতি মাসে এক অথবা দুইবার আখিদের সম্মেলন বসত। সেখানে তারা শায়খের নেতৃত্বে কীভাবে নিজেদের কাজের মান আরও ভালো করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করত। কারো পণ্যে কোনো খুঁত থাকলে তা নিয়ে হতো গঠনমূলক সমালোচনা। তাদের নিজেদের ছিল শক্তিশালী সমবায় সমিতি। সেখানে তারা প্রতি মাসে কিছু অর্থ জমা রাখত, যা দিয়ে গরিব ও অসহায়দের সাহায্য করা হতো। কোনো আখির পরিবার বিপদে পড়লে তাকেও সহায়তা করা হতো।

নারীদের মধ্যেও ছিল আখি সংঘের প্রভাব। সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম নারী সংগঠনের জন্ম হয় আনাতোলিয়াতেই, নাম ছিল ব্যজিয়ান-ই রুম।[২] আনাতোলিয়ার পশমী পোশাক বোনা মেয়েরা এই সংগঠনটি তৈরি করেছিল। এখানে তারা ব্যবসার পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির চর্চা করত, তাদেরও ছিল সমাজকল্যাণ সমিতি।

কে কত লাভ করছে তা আখিদের কাছে বড় কোনো বিষয় ছিল না। যেহেতু তারা ছিল সুফি, তাই জীবনযাপনের সাধারণ উপায় উপকরণ হলেই তাদের দিন চলে যেত। আখিদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো নিখুঁত পণ্য তৈরি করা এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করে তাদের দোয়া পাওয়া। তাই পণ্যে ভেজাল দেয়া, অতিরিক্ত মুনাফা করতে দাম বাড়িয়ে দেয়া ছিল তাদের জন্য অকল্পনীয় বিষয়।

একজন আখি কখনো তার পণ্য কেনার জন্য অন্যকে ডাকাডাকি করত না। আর তার দোকানে এসে পণ্যের দামাদামিও করা যেত না। সব কিছুই নির্ধারিত দামে বিক্রি করা হতো।

প্রতিটি আখি সদস্যকে তিনটি জিনিস উন্মুক্ত রাখতে হতো।

১. তার দরজা- মেহমানদের জন্য।
২. তার অর্থ- তার আখি ভাইদের জন্য।
৩. তার দস্তরখান- ক্ষুধার্তদের জন্য।

প্রত্যেক আখি সদস্যকে তার দেহের তিনটি অঙ্গকে তিনটি কাজ থেকে বিরত রাখতে হতো-

১. তার চোখকে- অশ্লীলতা থেকে।
২. তার মুখকে- গুনাহের কথা থেকে।
৩. তার হাতকে- নিষ্ঠুরতা থেকে।

সুফি শায়খদের কঠোর তত্ত্বাবধানে বছরের পর বছর কঠোর সাধনা করে একেকজন আখি সদস্যকে এভাবে গড়ে তোলা হতো।

কিন্তু আখিদের একটা বড় সীমাবদ্ধতা ছিল তাদের সীমিত উৎপাদন ক্ষমতা।

যেহেতু পণ্যের মানের দিকে তাদের খুব কড়া নজর ছিল। তাই চাইলেও তারা রাতারাতি অনেক বেশি পণ্যের যোগান দিতে পারত না। এ কারণে কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে গেলে সেখানকার মানুষকে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা আখিদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ত।

আখিদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ছিল, অর্থ কখনো মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। অর্থ কেবল চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছার একটি উপকরণ মাত্র।

---

[২]. Baz. I., 2015. An Organizasion Based On Trade. Art And Moral Values: Akhi Institution. Annals-Economy Series. 6. pp.6-9.

চার

ইবনে বতুতা আনাতোলিয়া থেকে যাবার সময় লক্ষ করেছিলেন, এখানে গড়ে ওঠেছে একটি শক্তিশালী জাতি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এদের মতো অতিথিপরায়ণ ও সৎ মানুষ তিনি আর কোথাও দেখেননি।

একটা জাতির প্রধান শক্তি তার যুব সমাজ। দিনে কাজ শেষে সন্ধ্যায় বিনোদন আর রাতে ইবাদত। সরল এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কষ্টসহিষ্ণু কিন্তু প্রশান্ত মনের অধিকারী এক যুব সমাজ ওরহানের নেতৃত্বে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এমন এক সময়ে, যখন পশ্চিমে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ক্রমেই পতনের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল।

১৩৩৭ সালে সুলতান ওরহান আনাতোলিয়ায় বাইজান্টাইনদের অর্থনৈতিক কেন্দ্র নিকোমিডিয়া জয় করে নেয়ার পর এশিয়াতে বাইজান্টাইনদের আর উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট রইল না।

পশ্চিমে কারেসি আমিরাতের আমিরের মৃত্যুর পর তার দুই ছেলের মধ্যে সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করলে এই সুযোগে ওরহান রক্তপাতহীনভাবে কারেসি আমিরাত জয় করে নেন।

কারেসি আমিরাত ওরহানের অধীনে আসায় বাইজান্টাইনরা দুই দিক দিয়ে অটোমানদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল।

ওদিকে ১৩৪১ সালে এন্ড্রোনিকাস পালাইলাগোস আর কাটাকুজিনের মধ্যে বেঁধে গেল সিংহাসন নিয়ে লড়াই। কাটাকুজিন ওরহানের সাহায্য চেয়ে আবেদন জানালেন, বিনিময়ে প্রিন্সেস থিওডোরাকে ওরহানের কাছে বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি জানালেন। যুদ্ধের খরচ মেটাতে তুর্কিদের থ্রেসের গির্জাগুলো লুট করার অনুমতি দিলেন কাটাকুজিন।

বসফরাসের এপারে এল বাইজান্টাইন প্রিন্সেস, ওপারে গেল বিশ হাজার তুর্কি ঘোড়ার সওয়ার।[৩]

ওরহানের সহযোগিতায় সিংহাসনে বসলেন কাটাকুজিন। কিন্তু অন্যের শক্তিতে সিংহাসনে বসে আর যাই হোক, স্বাধীন থাকা যায় না।

---

৩. J.J.Norwich (1996) Byzantium: the Decline and Fall. Penguin. London Chp.18

কালো মরণ
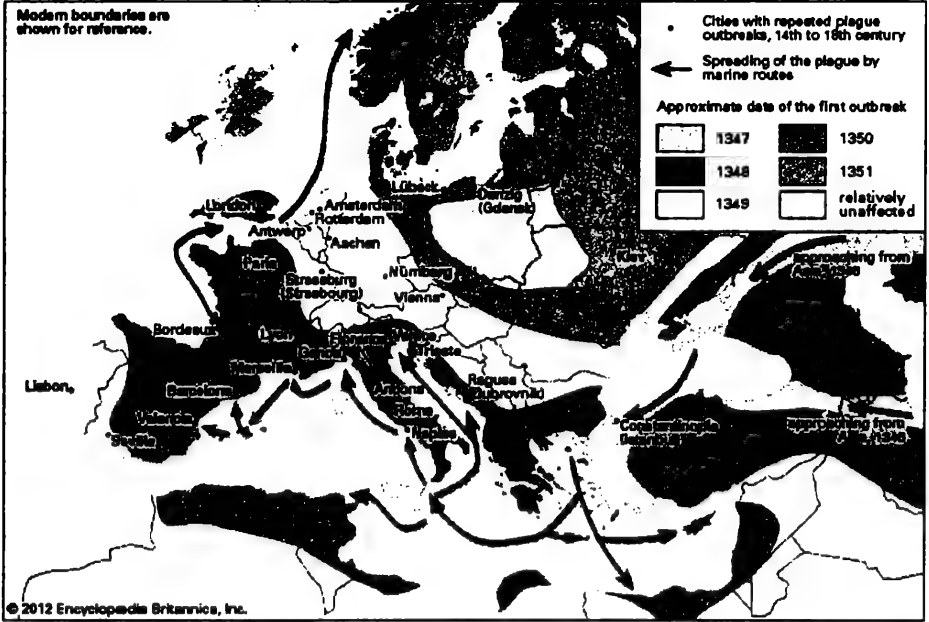
এক

ছপছপ আওয়াজ তুলে সিসিলির মেসিনা বন্দরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বারোটি জাহাজ। এরা এসেছে কাফফা থেকে, ক্রিমিয়ান উপদ্বীপের জেনোইস বন্দর কাফফা মোঙ্গলরা দখল করে নিয়েছে। সেখানকার যেসব জেনোইস নাবিক পালাতে পেরেছে, এই জাহাজে মূলত তারাই আসছে।

বন্দরে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। চিঠি ও অন্যান্য বণিকদের মারফত অনেকেই জেনেছে, তাদের প্রিয়জনেরা আসছে।

অবশেষে জাহাজগুলো বন্দরে ভিড়ল।

অভ্যর্থনা জানাতে যারা এসেছিল, তারা অবাক হয়ে দেখল, জাহাজের ডেক থেকে নামছে কিছু জ্যান্ত লাশ।

এদের বেশিরভাগের গায়ে কালো বড় বড় ফোঁড়া। বগলের ফোঁড়াগুলো আকারে আস্ত একেকটা আপেলের সমান, কারও কুচকিতে ডিমের সমান বড় একেকটা ফোঁড়া। সারা গায়ে এখানে ওখানে দগদগে ঘা থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত আর পুজ।

অনেকেরই গায়ে ভীষণ জ্বর, সেই সাথে একটু পর পর ভীষণভাবে হাঁচি-কাশি হচ্ছে।

চোখ কোটরাগত, সাদা অংশ টকটকে লাল, কারও কারও মুখের মাংস পচে খসে যাচ্ছে, কারও সারা শরীর থেকে আসছে পচা মাংসের বীভৎস গন্ধ।

জ্যান্ত লাশদের কেউ অভ্যর্থনা জানায় না। নাবিকদের দেখতে যারা এসেছিল, বেশিরভাগই ভয়ে পালিয়ে গেল। কেবল অল্প কিছু নাবিকই ফিরে যেতে পারল নিজেদের বাড়িতে, বাকিদের কেউ গ্রহণ করল না।

বন্দর থেকে তাদের শহরে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না। জাহাজেও আর থাকা যাচ্ছিল না। কারণ, জাহাজে ছিল প্রচুর পচাগলা লাশ সেগুলো তাদের মতো জ্যান্ত নয়, মৃত। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে করে কাঁদছিল জাহাজে পড়ে থাকা নাবিকেরা। দয়াপরবশ হয়ে মাঝে মাঝে কেউ কেউ ছুঁড়ে দিচ্ছিল সামান্য কিছু খাবার।

পরদিন বিকেলে নোটিশ এল, কাফফা থেকে আসা বারোটি জাহাজকে অবিলম্বে মেসিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আড়াই হাজার কিলোমিটার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসা হতভাগ্য নাবিকদের আর বাড়িতে ঢোকা হলো না।

গায়ে দগদগে ঘা, জ্বর আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে তারা দাঁড় বাইতে শুরু করল।

দুদিনের মাথায় তারা দলে দলে মরতে লাগল গভীর সাগরে।

সাগরের বুকে লাশেদের নিয়ে ভেসে চলল তাদের ভুতুড়ে জাহাজ।

মেসিনার মানুষ তখনো কল্পনাও করতে পারেনি, এই বারোটি জাহাজ শুধু নাবিকদেরই বয়ে আনেনি, এরা বয়ে নিয়ে এসেছে ইউরোপের মরণ। কালো মরণ।

দুই

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিসিলি আর নেপলসে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে এক অদ্ভুত জ্বর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই জ্বর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার ভেতর গায়ে ফুসকুড়ি ওঠে। সেগুলো সময়ের সাথে সাথে বড় হয়ে দুই থেকে তিন দিনের মাথায় পরিণত হয় দগদগে ঘায়ে। রোগীদের বেশিরভাগেরই

বগলে বা কুচকিতে ডিম বা আপেলের সমান বড় বড় ফোঁড়া দেখা দেয়। হাত ও পায়ের তালুতে কালো ঘা হয়, সেই সাথে হয় প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট।[১]

রোগীরা আক্রান্ত হবার দুই থেকে পাঁচ দিনের ভেতর মারা যেতে লাগল। রোগ ঠেকানোর জন্য শত চেষ্টা করেও কোনো লাভ হলো না। প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকল মৃতের সংখ্যা। শীতের শেষে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ল ফ্লোরেন্স, মিলান, জেনোয়া, ভেনিস আর রোমে।[২]

কোনো বাড়িতে একজনের এই কালব্যাধি হলে কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ির সবাই তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল। এমনও হতো, রোগে আক্রান্ত হবার পর যে জ্বর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিল, তার ঘুম আর কোনোদিন ভাঙেনি।

রোগী দেখতে এসে রোগীর সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল ডাক্তার। কনফেশন নিতে এসে রোগাক্রান্ত হয়ে গির্জায় ফেরার আগেই লাশে পরিণত হচ্ছিল যাজক।

মৃত্যুর এই ঢল দিনকে দিন বাড়তেই লাগল। ইতালিয়ান শহরগুলোর সব কবরস্থানের কবর দেয়ার জায়গা কিছুদিনের ভেতর শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো গণকবর খোঁড়া। একেকটা গণকবরে ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ এমনকি এক শ থেকে দুই শ পর্যন্ত লাশ পুতে ফেলতে লাগল নগরবাসী। এত লাশ ঢাকতে যে পরিমাণ মাটি প্রয়োজন ছিল, তা অনেক সময়েই পাওয়া যাচ্ছিল না।

শহরের কুকুরদের জিভ লকলক করে উঠল মরা মানুষের মাংসের গন্ধে।

সামান্য মাটি দিয়ে চাপা দেয়া লাশ নিয়ে ইতালির রাস্তায় মহাভোজে নামল বেওয়ারিশ কুকুরের দল। মরাখেকোর দল আত্মীয়স্বজনের চোখের সামনেই ছিঁড়েখুঁড়ে লাশ খাচ্ছিল, কিন্তু কালব্যাধির ভয়ে সেই লাশ ছোঁয়ার সাহস কারও হচ্ছিল না।

তিন

মধ্যযুগে ইতালি ছিল বণিকদের দেশ। পুরো পৃথিবীতে সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য চলত তার নেতৃত্ব দিত পূর্বে আরব আর পশ্চিমে ইতালিয়ানরা। ইউরোপের প্রতিটি বড় শহরের ইতালির সাথে যোগাযোগ ছিল। তাই সেখান থেকে দাবানলের মতো ছড়াতে লাগল কালো মরণ। এই রোগের আসল নাম প্লেগ।

ফ্রান্সে প্রথম আক্রান্ত হলো বন্দর নগরী মার্সেই। সেখান থেকে রোগ ছড়িয়ে পড়ল মন্টেপিলার, লিয়ন আর বোর্দক্সে, তারপর তুলুজ আর প্যারিসে।[৩] স্পেনে প্লেগ রোগ পৌছল ১৩৪৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। প্রথমে ভ্যালেন্সিয়া, তারপর সেভিল হয়ে মাদ্রিদ আর কর্দোবায়।

---

[১]. https://www.uwgb.edu/dutchs/WestTech/x14thc.htm

[২]. প্রাগুক্ত(১)

[৩]. প্রাগুক্ত(১)

১৩৪৮ সালের শরতে আল্পস পর্বত পেরিয়ে সুইজারল্যান্ডে হানা দিল প্লেগ। রোন নদী হয়ে উত্তরে ঢুকলো এভিগনোনে, সেখান থেকে স্ট্রাসবার্গ, তারপর রাইনের দেশ জার্মানভূমিতে। হামবুর্গ, কোলন, ব্রেমেন, ডর্টমুন্ডে রাতারাতি ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরতে শুরু করল।

প্লেগ ছাড় দিচ্ছিল না কাউকেই। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ, সাহসী-ভীরু, দুর্বল-শক্তিমান, গরিব প্রজা বা রাজপরিবারের সদস্য, চোর থেকে শুরু করে ধর্মীয় নেতা, কেউই বাদ যাচ্ছিল না প্লেগের করাল গ্রাস থেকে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যে কারও জ্বর হলেই সে নিশ্চিতভাবে ধরে নিচ্ছিল সে মারা যাবে। তাকে পরিবার থেকে আলাদা করে রেখে আসা হতো কোনো ঝুঁপড়িতে। সেখানে সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী মারা যেত। মরার আগে দেখত কীভাবে একটু একটু করে পঁচে খসে যাচ্ছে নিজের দেহটা।

মানুষ ছাড়াও শুয়োর, গরু আর ভেড়াদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এই ব্যাধি। ১৩৪৮ সালের শেষে ইউরোপে ভেড়ার পরিমাণ এত কমে গেল যে শীতের পোশাক বোনার মতো লোমের অভাব দেখা দিল। ক্ষেতে ফসলের চাষ করার মতো চাষী পাওয়া যাচ্ছিল না। শিল্প কারখানায় কাজ করার মতো কোনো শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছিল না।

গির্জার পাদ্রিরা মনে করল, ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে এসেছে পৃথিবীতে। কবি পেত্রার্কের ভাই গেরহার্ডো যে ফ্রান্সিস্কান আশ্রমের সদস্য ছিলেন সেখানকার এক শ চল্লিশজন পাদ্রির মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউই বাঁচলেন না। জন ফ্লিন নামের আরেকজন পাদ্রি মৃত্যুর আগে এক টুকরো পার্চমেন্টে লিখে গেলেন, পৃথিবীতে আদম সন্তানদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। এই ভয়াবহ কালো মরণের হাত থেকে যদি কোনো আদম সন্তান শেষ পর্যন্ত বেঁচেই যায়, আমার এই পার্চমেন্ট সে যেন যত্ন করে রাখে। ঈশ্বরের শাস্তির চরম দৃষ্টান্তকে তারা যেন মনে রাখে!

চার

১৩৪৯ সাল, মার্চের শেষ নাগাদ নরওয়ের বার্গেন বন্দরে একটা ফ্রেঞ্চ পতাকাবাহী জাহাজ দেখা গেল। জাহাজের ডেকে স্তূপ করে রাখা প্রচুর ভেড়ার লোম। পুরো ইউরোপে তখন লোমের আকাল। অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, জাহাজের ডেকে কোনো খালাসি, নাবিক বা সারেংকে দেখা যাচ্ছিল না।

জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই দলে দলে লোকেরা জাহাজে উঠল লোমের লোভে। লোম নিয়ে টানা হেচড়া করতে গিয়ে তারা এমন কিছু দেখল, যা তারা আগে কখনো দেখেনি।

জাহাজ ভরা ছিল দু পাটি দাঁত বের করে থাকা মানুষের কঙ্কাল আর বীভৎস পচাগলা লাশ।

কিছু কঙ্কাল চেয়ারে বসে ছিল, ওই অবস্থাতেই মারা গেছে। কিছু কঙ্কাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল জাহাজের মাস্তুল টানা দড়ির সাথে।

ভয়ে চিৎকার করতে করতে মানুষ জাহাজ ফেলে পালিয়ে গেল।

এর তিন দিনের মাথায় নরওয়েতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। এই ভুতুড়ে জাহাজে করে বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে প্লেগ তার কালো ডানা মেলে দিল নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড আর পোল্যান্ডে।

ফ্রেঞ্চ আর জার্মানদের কাছ থেকে ১৩৪৯ সালের বসন্তে প্লেগ সংক্রমিত হলো বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া আর ইংল্যান্ডে।[৪] সেখানে এত দ্রুত এই মরণব্যাধি ছড়িয়ে পড়ল যে, অনেকেই প্লেগের ভয়ে নিজের শহর থেকে পরিবার নিয়ে পালিয়ে অন্য শহরে গিয়ে দেখল সেখানে তার আগেই প্লেগের মহামারী পৌঁছে গেছে।

এমন কিছু পরিবারের কথা জানা যায় যারা নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে দেখে সেখানে শুধু পচাগলা লাশ পড়ে আছে।

১৩৫০ সাল নাগাদ এই বিপর্যয় তার চরমতম রূপ ধারণ করে। প্যারিসে প্রতিদিন গড়ে আট শ মানুষ মরছিল। পিসায় মরছিল গড়ে পাঁচ শ করে, ভিয়েনায় দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ছয় শ।[৫]

বোর্দক্সে রোজ চার শ করে মানুষ মারা যাচ্ছিল, এত মানুষকে সৎকার করার জন্য পাদ্রি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না, কারণ পাদ্রিরাও সমানে মরছিল। বাধ্য হয়ে পোপ পাপাল বুল জারি করে বললেন, মৃত্যুর পূর্বে কোনো পাদ্রির কাছে কনফেশন না করে যেকোনো সাধারণ পুরুষের কাছে বা কোনো নারীর কাছে করলেও চলবে।[৬]

কিন্তু গোটা পৃথিবী যেখানে জীবন বাঁচাতে দিশেহারা, সেখানে কে কার কনফেশন নেয়?

ভিয়েনার প্রতি দুই জনে একজন, ফ্লোরেন্স আর জেনোয়ার প্রতি পাঁচজনে চারজন, ভেনিস, হামবুর্গ আর ব্রেমেনের প্রতি তিনজনে দুইজন, এভিগনোনের প্রতি ছয়জনে পাঁচজন মানুষ প্লেগে মারা গেল।[৭]

গোটা ইউরোপের জনসংখ্যার প্রায় ষাট শতাংশ এই ভয়ংকর মহামারীতে জীবন হারায়। ১৩৪৭ সাল থেকে ১৩৫০ সাল, মাত্র এই তিন বছরে।[৮]

---

৪. প্রাগুক্ত(১)

৫. Bullough, V.L., 1976. Heresy, witchcraft, and sexuality. Journal of Homosexuality, 1(2), pp.183-199.

৬. প্রাগুক্ত(১)

৭. Ole J. Benedictow, "The Black Death: The Greatest Catastrophe Ever", History Today Volume 55 Issue 3 March 2005(http://www.historytoday.com/ole-j-benedictow/black-death-greatest-catastrophe-ever). Cf. Benedictow, The Black Death 1346–1353: The Complete History, Boydell Press (7 Dec. 2012), pp. 380ff.

মনার্ক-কিং-লর্ড-ব্যারন আর নাইটদের সম্পদ অথবা বিশপ-কার্ডিনাল-পোপের উদাত্ত আহাজারি, কোনো কিছুই প্লেগকে থামাতে পারছিল না।

পৃথিবীর শেষ যেন ঘনিয়ে এল।

পাঁচ

১৩৩১ সাল থেকে প্লেগ চীন থেকে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে। সেখান থেকে ভারতে, ইরান-ইরাক হয়ে প্লেগ আঘাত হানে আনাতোলিয়া ও মিসরেও।

প্লেগের এই বিস্তারের পেছনে মূল বাহক ছিল কালো ইঁদুর আর এক প্রকার মাছি, এরাই সুদূর চীন থেকে পুরো প্রাচ্যে এই মরণব্যাধির বিস্তার ঘটায়। ভয়াবহ এই ব্যাধিতে চীনের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ প্রাণ হারায়। উত্তর ভারতের জনসংখ্যা রাতারাতি কমে যায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে মধ্যপ্রাচ্য কিছুটা হলেও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃতের সংখ্যা ছিল কোটির বেশি।[৯]

প্লেগ এক দেশ থেকে আরেক দেশে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বড় কৃতিত্ব ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাহাজগুলোর। প্রতিটা দেশেই কোনো-না-কোনো সমুদ্র বন্দর হয়েই প্লেগ প্রবেশ করেছে।

১৩৩১ সালে শুরু হওয়া এই মহামারীতে উজাড় হয়ে যায় মোঙ্গল ইলখানাত, যা এশিয়ার রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতির জন্ম দেয়।[১০]

এই রোগ চীন থেকে ইউরোপে পৌঁছতে সময় লাগে পনেরো বছর। কিন্তু তারপর মাত্র তিন বছরেই ইউরোপকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে কালো মরণ খ্যাত এই ভয়াল ব্যাধি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণে এশিয়ায় আনুমানিক সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। এই আক্রমণ ইউরোপের গভীরে পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু এক শতাব্দী পরে প্লেগের আক্রমণে ইউরোপে মারা যায় সাড়ে তিন কোটি থেকে ছয় কোটি মানুষ।

---

৮. Ole J. Benedictow. "The Black Death: The Greatest Catastrophe Ever", History TodayVolume 55 Issue 3 March 2005(http://www.historytoday.com/ole-j-benedictow/black-death-greatest-catastrophe-ever). Cf. Benedictow, The Black Death 1346–1353: The Complete History. Boydell Press (7 Dec. 2012), pp. 380ff.

৯. Di Cosmo. N.. 2009. Black Sea emporia and the Mongol empire: A reassessment of the pax mongolica. Journal of the Economic and Social History of the Orient. 53(1). p.83.

১০. Olea Ricardo A.; Christakos G. (2005). "Duration assessment of urban mortality for the 14th century Black Death epidemic". Human Biology. 77 (3): 291–303. doi:10.1353/hub.2005.0051. PMID 16392633.

প্লেগকে ঈশ্বরের অভিশাপরূপে আখ্যা দিয়ে পোপ মানুষকে ধর্মের পথে আসার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল পোপের আহবানে ঈশ্বর কোনো প্রকার সাড়াই দিচ্ছেন না। ফলে পোপের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস ব্যাপকভাবে হ্রাস পেল।

খ্যাপা মানুষের সব রাগ গিয়ে পড়ল ইহুদি, জিপসি আর ডাইনিদের ওপর।

১৩৫০ সালের পর থেকে ইউরোপে শুরু হলো ব্যাপকভাবে ইহুদি নির্যাতন।[১১]

ব্ল্যাক ডেথ বা কালো মরণখ্যাত প্লেগ ইউরোপকে এক মহাদেশীয় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীর প্লেগের জীবানুর বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। টিকে যায় মানব সভ্যতা।

প্লেগ ঠেকাতে গির্জার ভয়াবহ ব্যর্থতা চতুর্দশ শতকের ইতালিতে এক নতুন মতবাদের উত্থানে সহায়তা করে। পরবর্তী সময়ে যা রেঁনেসা ও আধুনিক ইউরোপিয়ান সভ্যতার এক স্তম্ভরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, এর নাম হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ।

[১১]. প্রাগুক্ত(১)

ইউরোপের দুয়ারে

এক

বড় রাজনৈতিক শক্তিগুলো ছোট ছোট রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ভেতর লড়াই বাধিয়ে রাখতে পছন্দ করে। অধিকাংশ রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভেতর গৃহযুদ্ধ লাগলে ভেতরে ভেতরে খুশি হয়। কারণ, এর অনেকগুলো সুবিধা আছে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ১৩৫২ সালের দিকে ঠিক এটাই চলছিল।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের আনাতোলিয় অংশ তখন অটোমানদের দখলে চলে গেছে। উত্তরে মেসিডোনিয়া, সার্বিয়া-বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, দক্ষিণ হাঙ্গেরি ও গ্রিসের একটা বড় অংশ নিয়ে স্টিফেন দ্যা মাইটি তখন প্রতিষ্ঠা করে বসেছিলেন সার্বিয়ান সাম্রাজ্য।

বাইজান্টাইন সিংহাসনের দুই দাবিদার জন পালাইলাগোস আর জন কাটাকুজিনের মধ্যে যখন আবার লড়াই বেধে গেল তখন এই দুই আঞ্চলিক শক্তি তাতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। এখানে অটোমান সুলতান ওরহানের উদ্দেশ্য ছিল বাইজান্টাইনদের নিজের করদ প্রজায় পরিণত করা। পক্ষান্তরে স্টিফেন দুশানের উদ্দেশ্য ছিল একে একে বেলগ্রেড, থেসালোনিকি এবং কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে বিশাল এক ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তুর্কিদের ইউরোপের দুয়ার খ্যাত আনাতোলিয়া থেকে বিদায় করা।

যেহেতু কাটাকুজিন ছিলেন ওরহানের শ্বশুর, ওরহান তাই এই লড়াইয়ে কাটাকুজিনের সাথে জোট গড়লেন। আর জন পালাইলাগোস জোট গড়লেন স্টিফেন দুশানের সাথে।

দুশান জনকে সহযোগিতা করার জন্য দ্রুত চার হাজার সার্বিয়ান হেভি ক্যাভালরি পাঠালেন। এই খবর পেয়ে ওরহান কাটাকুজিনকে সাহায্য করতে পাঠালেন দশ হাজার গাজিকে। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব নিলেন ওরহানের বড় ছেলে, দুর্ধর্ষ শাহজাদা সুলেইমান পাশা।

দুই

দুই গ্রিক যুবক ঘুরে ঘুরে ডেমোটিকার চারপাশ দেখে নিচ্ছে। এরা এসেছে মাংস বিক্রেতার বেশে।

এরা আনমনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরার সময় দাগ কেটে যাচ্ছে এখানে ওখানে। মাঝে মাঝে এরা মাটিতে বসছে, মাটিতে খড়ি দিয়ে দাগ কাটছে। তারপর আবার নিজেদের ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে করেই তারা দুজন পুরো ডেমোটিকা ঘুরে এল, তারপর সেখান থেকে চলে গেল কনস্ট্যান্টিনোপল। কনস্ট্যান্টিনোপলে থাকা এক নাপিতের সাথে দেখা করে ওরা ফিরে গেল নিজেদের এলাকায়।

নাপিত সেদিন সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে বসফরাস প্রণালি পেরিয়ে চলে গেল আনাতোলিয়ার এক ক্যারাভানসারাইয়ে। ক্যারাভানসারাইয়ের ঘোড়ার সহিসের কাছে সে একটা ছোট থলে দিয়ে চলে গেল হাম্মামে।

একটু পরেই এক মুসাফির ঘোড়া নিয়ে বের হওয়ার জন্য সহিসকে ডাকল। সহিস ঘোড়া নিয়ে আসতেই সে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল।

ঘোড়ার জিনের ভেতরে আঠা দিয়ে থলেটা লাগিয়ে রাখা ছিল। এই থলেতে ছিল ডেমোটিকার পুরো বিবরণ আর দুশানের পাঠানো ক্যাভালরির সাথে লড়াইয়ের জন্য সঠিক পথের খবর। সেই সাথে আছে দুশানের বাহিনীর শক্তির বিবরণও।

দুই গ্রিক মাংস বিক্রেতা, নাপিত, ঘোড়ার সহিস আর মুসাফির।

এরা সবাই সুলেইমান পাশার গোয়েন্দা। অটোমান তুর্কিরা ওদের বলে 'চাভুশ'।

তিন

সুলেইমান পাশা ডেমোটিকার বাইরে এক খোলা সমতলে দুশানের পাঠানো বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

এই ময়দান সমতল। তাই এখানে চাইলেই তিনি তার লাইট ক্যাভালরি ও গাজি বাহিনী নিয়ে হেভি সার্বিয়ান ক্যাভালরির সাথে লড়তে পারবেন। ভারী বর্ম পরা নাইটদের টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া ঘোড়াদের প্রচুর খাটিয়ে নিয়ে নাইটদের ধনুকের পাল্লার বাইরে গিয়ে তীর ছুঁড়তে পারবেন, আর চূড়ান্ত হামলার সময় নিজের ঘোড়াগুলোকে ছোটাতে পারবেন পুরোদমে।

তিনদিক থেকে শত্রুদের ঘেরাও করে ফেলল তার বাহিনী। চার হাজার সার্বের বিপরীতে তার বাহিনীর যোদ্ধার সংখ্যা দশ হাজার, ঘেরাও করতে তাই তেমন সমস্যাও হয়নি।

দুদিক দিয়ে সার্ব ক্যাভালরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তুর্কি গাজিরা, শুরু হয়ে গেল লড়াই।

সার্বদের প্রথম আঘাতেই বেশ কয়েকজন তুর্কি যোদ্ধা শহিদ হয়ে গেল। তারপর বাকিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পিঠটান দিল। মুহূর্তে ঢিলে হয়ে গেল ঘেরাও।

সাথে সাথেই সার্বরা ঘেরাওয়ের সবচেয়ে দুর্বল জায়গার দিকে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো এগিয়ে গেল। ততক্ষণে তুর্কিরা আরও দূরে সরে গিয়ে ঘেরাওটাকে বড় আর হালকা বানিয়ে ফেলল।

এটা ছিল একটা ফাঁদ।

বিশাল পাল্লার অটোমান ধনুক থেকে তীর বৃষ্টি শুরু করল তুর্কি গাজিরা। সার্বরা হতভম্ব হয়ে ভাবছিল, ধনুক দিয়ে ছোঁড়া তীর এত দূর কী করে আসে!

কিন্তু ভাবনায় ডুবে যাবার সময় যুদ্ধের ময়দানে অতি ক্ষণস্থায়ী। তুমুল তীর বর্ষণের মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে সার্বরা মরতে লাগল। তীর বৃষ্টির তীব্রতায় সার্বদের যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা তখন সুলেইমান পাশা হুংকার দিয়ে ওঠেন, ইয়া আল্লাহ! বিসমিল্লাহ!! আল্লাহু আকবার!!!

ধুলোর ঝড় তুলে গাজিরা এগিয়ে গেল তীরের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া সার্বদের দিকে। সার্বদের লাশে ভরে গেল যুদ্ধের ময়দান।

এই লড়াই ইউরোপের মাটিতে অটোমানদের প্রথম বিজয়।[১] ডেমোটিকার এই লড়াই চতুর্দশ শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়, কোনো বাইজান্টাইন যোদ্ধার অংশগ্রহণ ছাড়াই।

জন কাটাকুজিন ফের ক্ষমতায় বসলেন। তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে ফের আনাতোলিয়াতে ফিরে গেলেন সুলেইমান পাশা। কিন্তু তার চোখে আটকে রইল ইউরোপের স্মৃতি। তাকে এখানে আবার আসতে হবে।

স্টিফেন দুশান বুঝতে পারলেন, মুসলিমরা স্থায়ীভাবে ইউরোপে প্রবেশ করবে, সেদিন আর দূরে নয়। ইউরোপে মুসলিমদের প্রবেশ বন্ধ করতে হলে তাকে বাইজান্টাইনদের উচ্ছেদ করে সরাসরি অটোমানদের মুখোমুখি হতে হবে।

তাই তিনি এবার কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের পরিকল্পনা করতে শুরু করলেন।

চার

বসন্তের গভীর রাত।

মর্মর সাগর তীরের এক পাহাড়ের খাজে চল্লিশজন ঘোড় সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। সবাই কালো পোশাক পরা, তাদের ঘোড়াগুলোও মিশকালো। শুধু একজনের ঘোড়ার কপালে সাদা দাগ আছে।

---

১. Deringil, S., 2007. The Turks and ÒEuropeÓ: the argument from history. Middle Eastern Studies, 43(5), pp 709-723.

সাগরের তীরে এসে তারা উঠল একটা বড় জাহাজে। জাহাজটাতেও কালো রঙ করা, এমনকি পালের সাদা কাপড়ের জায়গাতেও কালো কাপড়।

নিশ্চুপ রাতের গভীরে গাল্লিপলি উপদ্বীপে নামল জাহাজটা। তারপর চল্লিশজন ঘোড়সওয়ারের এই দল ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত উপদ্বীপের জিম্পি দুর্গের পাহারাতে থাকা শ খানেক বাইজান্টাইন সৈনিকের ওপর।

'হাইদির আল্লাহ!' ধ্বনি শুনে বাইজান্টাইনরা বুঝতে পারল, তুর্কিরা এসেছে। ভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। এই চল্লিশজন সুলেইমান পাশার গেরিলা বাহিনীর সদস্য। কপালে সাদা দাগ ওয়ালা ঘোড়ার সওয়ার শাহজাদা সুলেইমান পাশা।

প্রায় বিনা বাধায় দখল হলো গাল্লিপলি। জিম্পি দুর্গের ওপরে তুর্কি পতাকা উড়িয়ে দিলেন সুলেইমান পাশা।

ইউরোপে প্রথমবার তুর্কিরা ঢুকেছিল কাইজারের আত্মীয় হিসেবে, দ্বিতীয়বার মিত্র হিসেবে।[২]

তৃতীয়বার ইউরোপে তুর্কিরা বিজয়ী হিসেবে প্রবেশ করল।

গাল্লিপলি হলো ইউরোপের দরজা।

ইউরোপের প্রবেশদ্বারের এই বিজয় ইউরোপের ভাগ্য চিরদিনের জন্য বদলে দিল।

পাঁচ

গাল্লিপলি তুর্কিরা দখল করে নেয়ার পর ক্ষুব্ধ কাটাকুজিন গাল্লিপলি ফিরিয়ে দিতে ওরহানের কাছে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু চতুর ওরহান বললেন, এই জমি আল্লাহ আমাকে দান করেছেন, এ জমি এখন আর তোমাকে কীভাবে ফেরত দিই?

কাটাকুজিন এবার বুঝলেন, শত্রুকে ঘরের দরজায় এনে হাতে ঘরের চাবি ধরিয়ে দিলেই সে বন্ধু হয়ে যায় না।

ওদিকে ডেমোটিকার হারের জ্বালা মেটাতে কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করতে লক্ষাধিক যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন স্টিফেন দুশান। কিন্তু মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে পথিমধ্যে প্রবল জ্বরে তিনি মারা গেলেন। ভেঙে গেল সার্বিয়ান সাম্রাজ্য।

এরই মধ্যে গাল্লিপলি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে কনস্ট্যান্টিনোপলের বাসিন্দারা সম্রাট কাটাকুজিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল। তারা ক্ষমতায় বসাল জন পালাইলোগোসকে।

---

২. Finkel, C., 2007. Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire. Hachette UK.

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য যখন টালমাটাল সময় পার করছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে, তখন আনাতোলিয়াতে শিকার করে বেড়াচ্ছিলেন সুলেইমান পাশা। এক দিন শিকারের সময় তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা গেলেন।

প্রচণ্ড ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ সুলতান ওরহান।

শেষ বয়সে এই সুলেইমানকেই তিনি ভাবছিলেন সালতানাতের ভবিষ্যৎ।

এরপর থেকে ক্রমেই তার স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকল। ১৩৬০ সালে তিনি মারা গেলেন। ক্ষমতায় বসলেন তার ছেলে মুরাদ গাজি।

চৌত্রিশ বছর আগে ওরহান শুরু করেছিলেন আনাতোলিয়ার সবচেয়ে ছোট, কিন্তু একমাত্র স্বাধীন রাজ্য নিয়ে। মৃত্যুর সময় তিনি যে সালতানাত রেখে যান, তা ছিল আনাতোলিয়ার সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ধনী সালতানাত।

ইউরোপের রাজনীতিতে অটোমানদের জড়িয়ে পড়া শুরু হয় তার সময়েই, আর মৃত্যুর আগে নিজের সন্তান মুরাদকে তিনি দিয়ে যান এই উদীয়মান আঞ্চলিক শক্তির পরিচালনার দায়িত্ব।

মুরাদ

এক

তুর্কিদের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় সুলতান মুরাদের আমলে। ১৩৫৯ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি প্রথমেই থ্রেসে ঢুকে পড়েন। মুরাদের যুদ্ধনীতি ছিল তার পিতা ওরহান, দাদা উসমান ও পরদাদা আরতুরুল বের মতোই। মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে তিনি নিরাপদ রাখতে চেয়ে নিজের পূর্ব সীমান্ত ওর বিপরীতে বাইজান্টাইন, বুলগার ও সার্বদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখে তিনি নিজের সালতানাতকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন পশ্চিমে।

অটোমান সুলতানদের ঐতিহ্য ছিল ক্ষমতায় আসার পরপরই কোনো বিজয় অভিযান পরিচালনা করে তা থেকে পাওয়া অর্থের মাধ্যমে একটা মসজিদ নির্মাণ করা। মুরাদ ক্ষমতায় এসেই ডোমেটিকায় এক অভিযান চালান। শহরের দেয়ালের চারপাশে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে অবস্থান করে তিনি ডোমেটিকার গভর্নরকে চিঠি পাঠান। ইসলাম গ্রহণ কর অথবা জিযিয়া দাও অথবা লড়াইয়ে নামো। যদি জিযিয়া দিয়ে শান্তির প্রস্তাবে রাজি থাক তবে তোমার ও তোমার জনগণের জানমাল ও ধর্ম পালনের দায়দায়িত্ব আমার। কিন্তু যদি লড়াই করতে আস, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তোমাদের একেবারে ধ্বংস করে দেবো।

ডোমেটিকার চোরলু দুর্গে থাকা কয়েক হাজার রোমান সেনা কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে লড়াই শুরু করে। কিন্তু কয়েক দিনের মাথাতেই তাদের প্রতিরোধ চুরমার করে অটোমানরা দুর্গ জয় করে নেয়।

দুর্গ জয়ের পর অটোমান কমান্ডার লালা শাহিন পাশা এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেন।

বন্দি তিন হাজার রোমান সেনার সবাইকে একে একে হত্যা করা হয়। এর ঠিক পর পরই আরেক অভিযানে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আদ্রিয়ানোপল জয় করে নেন শাহিন পাশা। আদ্রিয়ানোপলের রোমান গভর্নর তুর্কিরা এসেছে শুনে ভয়ে নদীপথে পালিয়ে যান। এতে ইউরোপে ব্যাপকভাবে তুর্কিভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপের জমিন এ সময় যেন তুর্কিদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু নতুন সুলতান অনুভব করলেন, তার সালতানাত এখনো ইউরোপে খুঁটি গেড়ে বসার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

অটোমান সালতানাত তখনো ছিল মূলত একটা ঢিলেঢালা কাঠামোর রাষ্ট্র। কাগজে কলমে সবাই সুলতানের অধীন হলেও কার্যত সুলতানকে বড় বড় গোত্রের বে, বিভিন্ন গাজি দলনেতা এবং সাবেক সেলজুক সালতানাতের প্রভাবশালী পরিবারগুলোর ওপর নির্ভর করতে হতো। অটোমান বাহিনীর প্রায় পুরোটাই গঠিত ছিল গাজি লাইট ক্যাভালরিদের নিয়ে। তারা যতটা না সুলতানের প্রতি অনুগত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুগত ছিল নিজ নিজ বে'র প্রতি।

একেকজন বে নিজের গোষ্ঠীতে ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু রাজনীতিতে তারা অননুমেয়। অটোমান সালতানাত ছাড়াও তখন আনাতোলিয়াতে প্রায় ডজনখানেক আমিরাত ছিল। এই গাজি বেরা বেশিরভাগ সময়ে অটোমান সুলতানের অনুগত থাকলেও সুবিধামতো যেকোনো আমিরাতের বাহিনীতে যোগ দিয়ে দলবদল করতে তাদের অনেকেই পারদর্শী ছিলেন। রাষ্ট্র নিয়ে এই যাযাবরদের অনেকেরই কোনো মাথাব্যথা ছিল না, তারা বরং নিজেদের স্বার্থ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। মুরাদের পূর্বপুরুষ উসমান, ওরহানকেও এই সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষ আর মুরাদের প্রতিপক্ষ এক ছিল না। উসমান আর ওরহান লড়াই করেছেন ক্ষয়িষ্ণু বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিজেদের পরিচিত ভূমি আনাতোলিয়ায়। বিপরীতে মুরাদকে লড়তে হচ্ছিল ইউরোপের মাটিতে। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সার্ব ও বুলগাররা, যাদের ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী।

মুরাদকে তাই একটা নতুন, কেন্দ্রীয় সরকারব্যবস্থা গঠনের কাজে হাত লাগাতে হলো। এক শ বছর আগের আরতুরুল বে আর হালিমা সুলতানের হাতে গড়া ছোট্ট বেইলিকটাকে মুরাদ সাম্রাজ্যে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দুই

রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য যেটাই হোক, তার এক নম্বর উপাদান হলো ভূমি। একটা সাম্রাজ্য বিপুল পরিমাণ ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে এসব ভূমির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ওই সাম্রাজ্যের প্রজাতে পরিণত হয়।

মুরাদ তাই প্রথমেই সালতানাতের ভূমি বণ্টনের দিকে নজর দিলেন। অটোমান সালতানাতের বিভিন্ন আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা জমির জরিপ করে ফেলল মুরাদের জরিপকারীরা।

যেহেতু আইনগতভাবে সালতানাতের যুদ্ধ করে জয় করা সমস্ত জমির মালিক ছিলেন সুলতান তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এসব জমি শুধু তাদেরই দেওয়া হবে যারা সালতানাতের প্রতি নিঃশর্তভাবে অনুগত।

জরিপের কাজ শেষ হবার পর মুরাদের প্রধান উজির খায়রুদ্দিন খালিল পাশা সালতানাতের সমস্ত জমিকে তিন ভাগে ভাগ করলেন।

এক : যে সব জমি যুদ্ধ করে জয় করা হয়েছে।

দুই : যেসব জমি আগে থেকেই ব্যক্তি মালিকানায় ছিল এবং এখনো আছে।

তিন : যেসব জমি বিভিন্ন ধর্মীয় বা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে ওয়াকফ করা হয়েছে।[১]

প্রথম দুই রকমের জমির আলাদাভাবে জরিপ করা হলো। ব্যক্তি মালিকানার জমির ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ/উশর বসানো হলো। যুদ্ধলব্ধ জমি বণ্টন করা হলো এমন সব লোকদের কাছে, যারা সাহসী এবং যুদ্ধের ময়দানে সুলতানের সাথে লড়াই করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এরা ছিল শক্তিশালী ও দক্ষ ঘোড়সওয়ার।

যুদ্ধলব্ধ জমিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হলো। যেসব জমির বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার আকচে (রৌপ্যমুদ্রা) থেকে বিশ হাজার আকচে, তাদের বলা হতো তিমার। যেসব জমির বার্ষিক আয় বিশ হাজার আকচে থেকে এক লাখ আকচের মধ্যে তাদের বলা হতো জিয়ামাত। আর যেসব জমির বার্ষিক আয় এক লাখ আকচেরও বেশি তাদের বলা হতো খাস।[২]

প্রতিটি তিমারে মুরাদ একজন করে সিপাহী নিয়োগ দিলেন। সিপাহীর কাজ ছিল যুদ্ধের সময় নিজের ঘোড়া ও অস্ত্রের খরচ বহন করা এবং নিজের সাথে তিমারের আকার অনুযায়ী লোকবল নিয়ে আসা, যারা যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত। সিপাহী সুলতানের পক্ষ থেকে তিমারের শান্তিশৃঙ্খলার কাজ দেখাশোনা করবে এবং তিমার থেকে সুলতানের পক্ষে কর আদায় করবে। যুদ্ধের ময়দানে সময়মতো হাজির না হলে অথবা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলে তিমারের মালিকানা সিপাহীর হাত থেকে কেড়ে নেয়ার আইন করা হলো। এতে করে কাপুরুষ ও ধান্দাবাজ শ্রেণির লোকজন জমির মালিক হওয়ার ঝুঁকি নেয়া থেকে দূরে রইল।

এই ভূমি বণ্টনের ফলে সুলতান মুরাদ পেলেন এমন একদল যোদ্ধা, যারা ছিল সালতানাতের প্রতি গভীরভাবে অনুগত। কিন্তু এদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। এ ছাড়া এরা সবাই ছিল ঘোড়সওয়ার, তাই মুরাদকে পদাতিক বাহিনী তৈরির দিকেও নজর দিতে হলো।

---

১. İnalcık, H. and Quataert, D. eds., 1994. An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge University Press.

২. প্রাগুক্ত(১)

এজন্য মুরাদ আইন করলেন, প্রতিটি গ্রামে, নগরে ও শহরে প্রতি চল্লিশ ঘর মুসলিমের মধ্যে থেকে অন্তত একজন যুবককে লড়াইয়ে পাঠানো বাধ্যতামূলক। এদের নিয়ে তিনি তৈরি করলেন শক্তিশালী পদাতিক তীরন্দাজ বাহিনী আজব। আনাতোলিয়ায় জিহাদে যেতে আগ্রহী তরুণের সংখ্যা কখনোই কম ছিল না। তাই এবার মুরাদ প্রচুর পরিমাণ নিয়মিত সৈনিক পেয়ে গেলেন। আজবরা ছিল সাহসী ও দক্ষ তীরন্দাজ, তাদের নিয়োগ করা হতো ময়দানেরর সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ যেদিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেখানে। তাই তাদের প্রাণহানির সম্ভাবনাও ছিল খুবই বেশি। যেখানে ঝুঁকি বেশি, সেখানে পুরস্কারও বেশি, এই নীতিতে মুরাদ আজবদের জন্য উঁচু বেতন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করলেন। সেই সাথে তাদের জমির করও মওকুফ করে দিলেন।

উসমান গাজির চার হাজার আকিনজিকে বিশ হাজারে পরিণত করেছিলেন তার ছেলে ওরহান। সেই সাথে গোড়াপত্তন করেছিলেন দুটি অনিয়মিত বাহিনী ইয়াইয়া ও মুসাল্লেমের। মুরাদের আমলে এসে অটোমান সালতানাত প্রথম এমন একটি কাঠামো পায় যার মাধ্যমে একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী দাঁড় করানো যায়।

মুরাদ যখন নতুন সেনাবাহিনী তৈরি করছিলেন তখন অটোমানদের শত্রুরাও বসে ছিল না। মুসলিমদের ইউরোপ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ইউরোপের রাজ-রাজড়াদের ভেতর রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাচ্ছিল পর্দার আড়ালে। সার্বিয়া-বসনিয়ার লাজার (রাজা), হাঙ্গেরির সম্রাট লুইস দ্যা গ্রেট আর বাইজান্টাইন কাইজারের মধ্যে চলছিল জোর কূটনীতি। শেষমেশ এই কূটনীতিতে যোগ দিলেন স্বয়ং পোপ।

উত্তর দিক থেকে ঝড় আসছে। ষাট বছর পর আবার ফিরে আসছে ক্রুসেড!!

মারিৎজায় রক্তগঙ্গা

এক

ইউরোপ থেকে তুর্কি তাড়ানোর এই লড়াইয়ে প্রথম যিনি ময়দানে নামলেন, তিনি হলেন সার্বিয়ার লাজার ভুকাসিন। প্রায় ত্রিশ হাজার যোদ্ধার শক্তিশালী এক বাহিনী নিয়ে তিনি রওনা দিলেন অ্যাড্রিয়ানোপলের দিকে। দুই সপ্তাহ মার্চ করে বিনা বাধায় তিনি পৌঁছে গেলেন অ্যাড্রিয়ানোপলের মাত্র পনেরো কিলোমিটারের ভেতর।[১]

অ্যাড্রিয়ানোপল জয় করে বলকান থেকে এশিয়ায় ঢোকার দুটো পথের একটাকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন মুরাদ। ভুকাসিন যখন অ্যাড্রিয়ানোপলের দোরগোড়ায় এসে হাজির হলেন, মুরাদ তখন বাইজান্টাইনদের সাথে লড়াই করতে ব্যস্ত থ্রেসের দক্ষিণে।

অটোমানদের সেরা কমান্ডার লালা শাহিন পাশা সেনাবাহিনীর আরেকটা বড় অংশ নিয়ে তখন এশিয়া মাইনরে ছিলেন। সার্বদের গতিবিধির খবরাখবর জানতে পেরে তিনি মাত্র দশ হাজার যোদ্ধা দিয়ে হাজি ইলবে'কে অ্যাড্রিয়ানোপলের দিকে রওনা করিয়ে দিলেন।[২]

হাজি ইলবে যখন ক্রুসেডার ক্যাম্পের কাছে পৌঁছলেন, তখন রাত নেমে এসেছে।

তার স্কাউটরা খবর নিয়ে এল, অ্যাড্রিয়ানোপল দখল উপলক্ষে ক্রুসেডার ক্যাম্পে চলছে আগাম উৎসব। প্রচুর ভেড়া আর মুরগি জবাই করে, গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে সারা রাত উৎসবের পর কাল সকালে শহর দখলের জন্য রওনা হবে ক্রুসেডাররা।

---

১. Freely, J., 2009. The Grand Turk: Sultan Mehmet II-Conqueror of Constantinople and Master of an Empire. The Overlook Press.

২. Nicolae Jorga: Geschichte des Osmanichen, (trans.: Nilüfer Epçeli) Vol 1,Yeditepe yayınları İstanbul, 2009, ISBN 975-6480- 18-1 p 201

দুই

রাত বেশি গভীর হবার আগেই একটা একটা করে ক্যাম্পের সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। ক্যাম্পের গার্ডরা এবার ফুর্তিতে মেতে ওঠল নিঃশব্দে। এতক্ষণ এরা সুযোগ পায়নি।[৩]

ওদিকে নিঃশব্দে নদী পেরিয়ে এসেছে স্বয়ং মৃত্যু। মারিৎজা নদীর স্রোতও তার কাছে ক্ষীণ।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাত হাজার আকিনজি অশ্বারোহী হাজি ইলবের নেতৃত্বে মারিৎজা নদী পেরিয়ে ক্যাম্পের দুদিকে পজিশন নিলো। শুধু নদীর পাড়টা খোলা রেখে উত্তর আর দক্ষিণ দিক আটকে দিল তার বাহিনী। পেছনে আরও তিন হাজার আজব যোদ্ধা, দুর্দান্ত তীরন্দাজ এরা।

শিকারী বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ক্যাম্পের মাত্র একশ মিটারের ভেতর চলে এল তুর্কি বাহিনী। এবার হাজি আদেশ দিলেন প্রত্যেকের ঘোড়ার দুপাশে দুটো করে মশাল জ্বালিয়ে দিতে।

মশাল জ্বালানো শেষ হবার সাথে সাথে ইলবে হুংকার দিয়ে ওঠলেন, হাইদির আল্লাহ!!

ক্ষুধার্ত সিংহের মতো অটোমান গাজিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুসেডারদের ওপর। তাদের মাত্র একবার সংকেত দেয়া হয়েছিল জেগে ওঠার জন্য। কারণ, ঘুমন্ত শত্রুকে হত্যা করা কাপুরুষতা।

হকচকিয়ে যাওয়া ক্রুসেডাররা ঘুম ভাঙার পর একটা মাত্র শব্দই শুনতে পেল, 'পালাও!'

দুদিক থেকে সাত হাজার গাজি তাড়া করল তাদের।

এক দিকে তীরবৃষ্টি, অন্যদিকে ঘোড়সওয়ারদের বিদ্যুৎগতি হামলা, সাথে মাতলামি, দশ হাজার ঘোড়ার সাথে বাঁধা বিশ হাজার মশালকে মাতালেরা দেখছিল চল্লিশ হাজার। তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি, একের পর এক তীরের আঘাতে লাশের স্তূপ পড়তে লাগল মারিৎজা নদীতে।

ক্রুসেডারদের কয়েক হাজার সাফ হয়ে গেল এক ধাক্কায়। বাকিরা ভাবল সুলতান মুরাদ সম্ভবত বিশাল কোনো বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর হামলা করেছেন।

যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচল।

বেঁচে গেল অ্যাড্রিয়ানোপল।

এই যুদ্ধকে ইতিহাসে ফার্স্ট ব্যাটল অফ মারিৎজা বলা হয়। তুর্কি ঐতিহাসিকরা একে বলেন সার্ব সিন্দিব, মানে সার্বদের ধ্বংস।

---

[৩]. https://www.warhistoryonline.com/medieval/not-battle-slaughter-secured-ottomanexpansion-balkan-peninsula.html

এই যুদ্ধের ফলে বলকানে ক্রমেই একটা কুসংস্কার জন্ম নিতে শুরু করল।

তুর্কিদের খালি চোখে দেখা যায় না, ওরা ভয়ংকর। ওদের গায়ে তীর মারলে লাগে না, ওদের তীর লোহার বর্মকেও ভেদ করে ঢুকে যায় বুকের ভেতর।

একান থেকে ওকান হয়ে লোকের মুখে শোনা নানা বাড়াবাড়ি রকম গুজবের মাধ্যমে জন্ম নিতে থাকল ইতিহাস কুখ্যাত স্টেরিওটাইপ দ্যা টেরিবল তুর্ক।

তিন

পোপ আর বাইজান্টাইন কাইজারের কূটনীতি বৃথা গেল না। কাইজারের চাচাতো ভাই ছিলেন স্যাভয়ের কাউন্ট এমেদিয়াস। এমেদিয়সের নেতৃত্বে স্যাভয়, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, হাঙ্গেরি আর বুলগেরিয়া মিলে শক্তিশালী অটোমান বিরোধী ক্রুসেডার জোট গঠন করল। কিছুদিনের মধ্যেই এতে যোগ দিল সাইপ্রাস এবং রোডস দ্বীপের নাইটস হসপিটালাররা।[৪] পোপ পঞ্চম আরবান দীর্ঘদিন পর আশায় বুক বাঁধলেন, আবার শুরু হতে যাচ্ছে ক্রুসেড। এই ক্রুসেডের লক্ষ্য ছিল দুটি। প্রথম লক্ষ্য ছিল তুর্কিদের ইউরোপ থেকে বের করে দেয়া। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে আঘাত হেনে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটিকে ধ্বংস করে দেয়া। ক্রুসেডে সাহায্যের বিনিময়ে পোপ বাইজান্টাইন কাইজার জন পালাইলোগাসের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, ক্রুসেড শেষে তিনি নিজের অর্থডক্স চার্চ ছেড়ে রোমান ক্যাথলিক চার্চে যোগ দেবেন।

গুড ফ্রাইডের দিন পোপ নিজের হাতে 'পবিত্র ক্রুশ' স্যাভয়ের কাউন্ট এমেদিয়াস এবং সাইপ্রাসের পিটার দ্যা গ্রেটের পোশাকে সেলাই করে দিলেন। বিপুল উৎসাহে শুরু হলো ক্রুসেডের প্রস্তুতি। পোপ পাপাল বুল জারি করে ঘোষণা করলেন, চার্চ তার মোট বাৎসরিক আয়ের দশ শতাংশ ক্রুসেডের খরচ হিসেবে এমেদিয়াসকে দান করবে।[৫]

দ্বিমুখী অভিযান শুরু হলো।

মুরাদের পক্ষে এই বিশাল সেনাবাহিনীকে থামানো সম্ভব ছিল না। জেনোয়া আর ভেনিস দার্দানেলস প্রণালি দিয়ে অটোমানদের আটকাতে নিজেদের নৌবহর নামিয়ে দিবে জানতে পেরে নিরূপায় মুরাদ ইউরোপে থাকা তুর্কিদের দ্রুত আনাতোলিয়ায় পিছু হটার নির্দেশ দিলেন।

---

৪. Manion. L.. 2014. Narrating the Crusades: Loss and Recovery in Medieval and Early Modern English Literature (Vol. 90). Cambridge University Press.

৫. Hsia. R.P.C.. 2005. The world of Catholic renewal. 1540-1770. Cambridge University Press.

ক্রুসেডার বাহিনী ১৩৬৬ সালে এসে পড়ল গাল্লিপলিতে। ছোটখাটো কিছু সংঘর্ষ শেষে শহর থেকে বেরিয়ে গেল তুর্কি বাহিনী। অটোমানরা এই প্রথমবারের মতো ইউরোপের মাটি থেকে পিছু হটল।[৬]

এক মাঘে শীত যায় না। বলকান অঞ্চলের রাজনীতি সব সময়েই ছিল অস্থির।

স্যাভয়ের কাউন্ট এমেদিয়াস যখন গাল্লিপলি জয়ে ব্যস্ত, তখন বাইজান্টাইন কাইজার বুলগেরিয়ার জারের সাথে সমঝোতা করতে গিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ক্রুসেডার জোটকে আরও শক্তিশালী করা। কিন্তু বুলগেরিয়ার জার তার প্রস্তাবে তো গুরুত্ব দিলেনই না বরঞ্চ তাকে বন্দি করলেন।

চাচাতো ভাই কাইজারের বন্দি হবার খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে এমেদিয়াস বুলগেরিয়া আক্রমণ করে বসলেন। বুলগেরিয়ার বিপুল পরিমাণ অঞ্চল মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তিনি বুলগেরিয়ার জারকে হুমকি দিলেন। বললেন জনকে ফেরত না দিলে তার রাজধানী আক্রমণ করা হবে। বাধ্য হয়ে জার জন পালাইলোগাসকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

ক্রুসেডের মূল ঝড়টা গেল অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের ওপর দিয়ে। শীত এসে পড়ায় এমেদিয়াস নিজের বাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেন স্যাভয়ে।

কাইজার বুঝতে পারলেন, নিজের সিংহাসন রক্ষা করতে হলে তাকে অবশ্যই পোপের সাথে সমঝোতায় বসতে হবে।

চার

'অটোমানরা শত্রু। কিন্তু গির্জা নিয়ে বিবাদকারী ল্যাটিনরা শত্রুর চেয়েও খারাপ।'

পোপ যেমন রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরু, ঠিক তেমনি অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরু হলেন প্যাট্রিয়ার্ক। তখনো ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের জন্ম হয়নি।

গ্রিক অর্থডক্স চার্চ আর ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে চলছিল তীব্র বিরোধ। ক্রুসেডে নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্যাথলিকরা। আর অর্থডক্সরা ছিল অপেক্ষাকৃত নমনীয়।

অর্থডক্স চার্চের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন বাইজান্টাইন সম্রাট কিন্তু অটোমানদের উত্থানের যুগে দুর্বল হয়ে পড়েছিল রোমান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। যে সাম্রাজ্য এক দিন পশ্চিমে ক্রোয়েশিয়া থেকে পূর্বে আর্মেনিয়া, উত্তরে রাশিয়া থেকে দক্ষিণে ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তার সীমানা সংকুচিত হতে হতে চলে এসেছিল কনস্ট্যান্টিনোপল, থ্রেস, মোরিয়া উপদ্বীপ, আর ক্রিট দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত।

---

[৬]. Cox, Eugene L. (1967). The Green Count of Savoy: Amadeus VI and Transalpine Savoy in the Fourteenth Century. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.p 219–21.

অস্তিত্ব সংকটে ভোগা সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে হাঙ্গেরির লুইস দ্যা গ্রেটের কাছে গেলেন কাইজার, লুইস তার সাহায্যের জন্য পাঠালেন দুজন ঘোড়সওয়ার।

কাইজার বুঝলেন তার দুর্বলতা নিয়ে নির্মম রসিকতা করছেন ক্যাথলিক সম্রাটরা।

এরপর তিনি ইতালি সফরে গিয়ে ভেনিস, জেনোয়া, মিলান, ফ্লোরেন্সের প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন। কেউ সাহায্য করল না। শেষতক জন ঠিক করলেন, তিনি অর্থডক্স খ্রিষ্টান থেকে ক্যাথলিক হয়ে যাবেন। অন্তত তখনই পোপ তাকে বাঁচাতে ক্রুসেডের ডাক দিতে সম্মত হবেন।

কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের জনগণের কাছে। বিদ্রোহের ভয়ে ক্যাথলিক হবার ঘোষণা দেয়ার সাহস পেলেন না কাইজার।
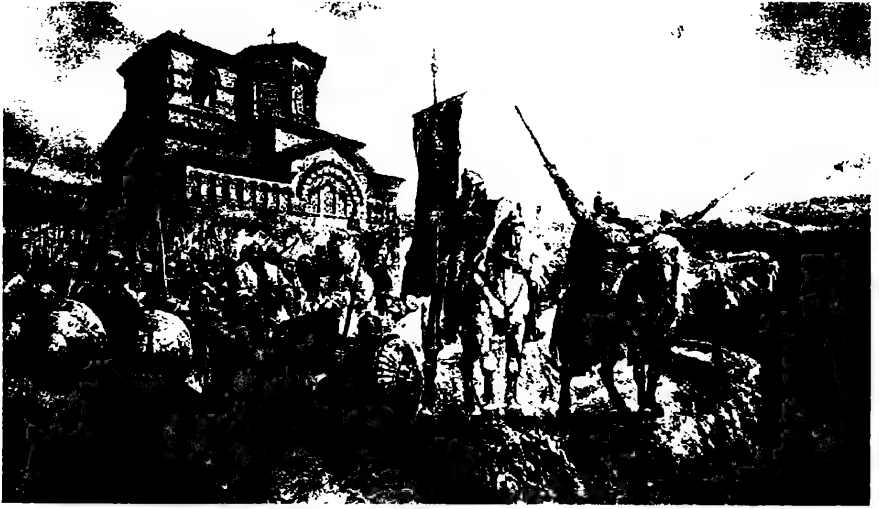
কিং ভুকাসিন আর লর্ড উগলেজার বিশাল সার্বিয়ান বাহিনী।

এরই মধ্যে ১৩৭১ সালে আবার মাথা তুলে দাঁড়াল সার্বিয়া কিং ভুসকাসিন আর তার ভাই বসনিয়ান লর্ড উগলেজা আবারও বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বলকান উপদ্বীপের বুক চিরে এগিয়ে চললেন। লক্ষ্য ইউরোপ থেকে অটোমানদের নাম নিশানা মুছে দেয়া।

পাঁচ

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৩৭১।[৭]

গভীর রাত। অ্যাড্রিয়ানোপলের কাছের বন শরতের রাতে কুয়াশায় ভিজে আছে।

কাছের পাহাড় থেকে আসছে মৃদু শীতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় ভেড়ার লোমের কম্বল গায়ে চড়িয়ে ঘুমোতে বেশ লাগে।

---

৭. L. S Stavrianos, The Balkan since 1453, p.44

মারিৎজা নদীর তীর ঘেঁষেই রাজা ভুকাসিনের শিবির। ভুকাসিন, প্রিন্স মার্কো আর ডেস্পট উগলেসা মিলে গোটা বলকানের শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন এখানে। পথে তারা কোনো বাধা পাননি। অটোমানরা কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। ভুকাসিন ধারণা করেছিলেন, সুলতান মুরাদ তার রাজধানী রক্ষায় এগিয়ে আসতে বাধ্য হবেন। কিন্তু মুরাদ তখন ব্যস্ত এশিয়া মাইনরে।

ঠিক সাত বছর আগের মতোই অবস্থা। কিন্তু এবার ভুকাসিনের মোট সৈন্যসংখ্যা সেবারের প্রায় দ্বিগুণ, ষাট থেকে সত্তর হাজারের মধ্যে।

এবার ভুকাসিন আরও সতর্ক। নিজের গোয়েন্দাদের তিনি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিলেন, পাছে অটোমানরা আবারও গতবারের মতো কোনো অ্যামবুশ করে।

গোয়েন্দাদের দেয়া খবর অনুযায়ী সব ঠিকঠাকই ছিল। আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত নেই কোনো অটোমান বের অস্তিত্ব। সুলতান মুরাদ খুব শিগগিরই ফিরে আসবেন এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। নির্বিবাদে অ্যাড্রিয়ানোপল দখল এবার সুনিশ্চিত।

সাত বছর আগের মতোই, আবারও ভোজ উৎসবের আদেশ দিলেন ভুকাসিন। পেট পুরে খেয়ে আর গলা পর্যন্ত মদপান করে তার বাহিনীর ক্রুসেডাররা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাহিনীর সাথে নিয়ে আসা বেশ্যাদের ওপর। উদ্দাম কামলীলা চলার পর ক্লান্ত হয়ে এল পুরো ক্যাম্প।

রাত বাড়ার পর তারা ঢুকে গেল কম্বলের নিচে। মৃদু ঠান্ডা রাতে ক্লান্ত, মাতাল ক্রুসেডারদের চোখে যখন রাজ্যের ঘুম, তখন ঘোড়ায় চাবুক কষে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে নীরব মৃত্যুদূত।

লালা শাহিন পাশা আর গাজি এব্রেনোস, দুই ঠান্ডা মাথার শিকারী সাথে মাত্র আট শ অভিজ্ঞ গাজিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন ভুকাসিনের ক্যাম্পের দিকে।

ছয়

শাহিন পাশা অথবা এব্রেনোস কেউই এখানে যুদ্ধ জয়ের আশা নিয়ে আসেননি। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিতে সত্তর হাজারের সাথে আট শ যোদ্ধা নিয়ে লড়াই করার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু তারা আসলে লড়াই জিততে আসেননি। তারা এসেছেন খুন করতে এবং খুন হতে।

পোড় খাওয়া এই দুই অভিজ্ঞ গাজি ভালো করেই জানেন, এই লড়াইয়ে জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। অ্যাড্রিয়ানোপল রক্ষা করার কোনো উপায়ও যেহেতু নেই, তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, যত বেশি সংখ্যক শত্রুর প্রাণহানি ঘটিয়ে নিজেরা শহিদ হবেন। এতে করে তাদের শাহাদাতের পর সুলতান মুরাদ যখন আনাতোলিয়া থেকে ফিরবেন তখন তার পক্ষে লড়াই করা সহজ হবে।

জীবন বাজি ধরে রওনা হয়ে গেলেন, সাথে তারা দুজন নিলেন বাছা বাছা আট শ গাজিকে।[৮]

২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এব্রেনোস আর শাহিন পাশাসহ বাহিনীর সবাই মাথায় যার যার কাফন বেঁধে নিলেন। তারপর রাতের চাদরে গা ঢাকা দিয়ে রওনা হয়ে গেলেন শত্রু শিবিরের দিকে।

ভুকাসিনের শিবির থেকে বেশ কিছুটা দূরের এক বনে তারা মিলিত হলেন ভুকাসিনের ক্যাম্পের ভেতর লুকিয়ে থাকা নিজেদের গোয়েন্দাদের সাথে। এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হলো, মাঝরাতে দুই ভাগে ভাগ হয়ে আট শ গাজি দুই দিক থেকে চারজনের ছোট ছোট মোট দুই শ দলে ভাগ হয়ে শিবিরে ঢুকে পড়বে। তাঁবুতে ঢোকার আগ পর্যন্ত কোনোরকম আওয়াজ করা যাবে না। তাঁবুতে ঢোকার পর একবার মাত্র আওয়াজ করে শত্রুকে জাগিয়ে সাথে সাথে হত্যা করতে হবে। তাঁবুর সবাইকে হত্যা না করা পর্যন্ত কোনো তাঁবু থেকে বের হওয়া যাবে না।

তারপর নিঃশব্দে বনের ভেতর গুঁড়ি মেরে চলতে শুরু করলেন তারা। ঘোড়াগুলোকেও যথাসম্ভব নিঃশব্দে হাটিয়ে নিয়ে রাতের দ্বিতীয় প্রহরে তারা হাজির হলেন ক্রুসেডার শিবিরের কাছেই। সেখান থেকে চারজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন পুরো শিবিরে। ক্রুসেডাররা তখন ঘুমে বিভোর।

শুরু হলো এক নির্মম হত্যাযজ্ঞ।

যে তাঁবুতেই অটোমানরা ঢুকছিল সে তাঁবুই পরিণত হচ্ছিল কবরস্থানে। মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে অটোমানরা হত্যা করেছিল অন্তত বিশ হাজার ক্রুসেডারকে। এরপর তারা যা পেয়ে গেল তা তারা কল্পনাতেও আনেনি।

ভুকাসিন আর উগলেজার তাঁবু।

শাহিন পাশা ডেস্পট উগলেসার তাঁবুতে ঢুকতে গেলে উগলেসার দেহরক্ষীরা কঠোরভাবে বাধা দিল। পাশা ও তার সঙ্গীরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে দুর্দান্ত বেগে তলোয়ার চালিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন তাদের সবাইকে। তারপর তাঁবুতে ঢুকে হত্যা করলেন উগলেসাকে।

ওদিকে এব্রেনোস গাজি ঢুকলেন ভুকাসিনের তাঁবুতে, কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে ভেসে এল 'হাইদির আল্লাহ' ধ্বনি।

শাহিন পাশা বুঝলেন, কিং ভুকাসিন শেষ।

ভুকাসিন আর উগলেসাকে মারতে গিয়ে যে শোরগোল হয়েছিল তাতে শিবিরের যারা তখনো জীবিত ছিল, তারা জেগে ওঠল।

---

৮. Boskovic, Vladislav (2009). King Vukasin and the disastrous Battle of Marica. GRIN Verlag. p. 11. ISBN 978-3-640-49264-0.

শিবিরের অর্ধেক যোদ্ধা নিহত, নিহত রাজা ভুকাসিন। এই অবস্থায় তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

শাহাদাতের নেশায় পাগল এভ্রেনোস আর শাহিন পাশা 'ইয়া আল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার!' রব হেকে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর।

এক অদ্ভুত আতঙ্ক ছেকে ধরল ক্রুসেডারদের। যে যেদিক পারল ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু গাজিদের তলোয়ারের ধারে রক্তে ভেসে গেল গোটা শিবির। শাহিন পাশা আর এভ্রেনোস আট শ যোদ্ধা নিয়ে এসেছিলেন শহিদ হতে কিন্তু তার বদলে তারা ধ্বসিয়ে দিলেন সত্তর হাজারের এক সেনাবাহিনীকে।

ব্যাটল অফ মারিৎজা পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা গেরিলা আক্রমণগুলোর একটা।

এই লড়াইয়ের ফলে সার্বিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে। অটোমানদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে গোটা বলকান।

লড়াইয়ের পরদিন, ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে দেখা গিয়েছিল, মারিৎজা নদীর পানি রক্তের মতো লাল হয়ে আছে।

জানিসারি

আসন গেড়ে বসে আছেন লম্বা নাক, সাদা দাড়ি আর গভীর দৃষ্টির এক আত্মসমাহিত পুরুষ। মাথায় দরবেশী পাগড়ি। তার পাশে বসে আছেন সুলতান মুরাদ।

লাল জোব্বা পরা প্রথম যুবক দরবেশের সামনে এসে দাঁড়াল।

যুবকের বয়স চব্বিশ বছর। আঠারো বছর আগে তাকে ধরে আনা হয়েছিল মেসিডোনিয়া থেকে।

যুবকের চেহারা প্রশান্ত, দৃষ্টি স্থির। দরবেশের সামনে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে এসে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর নিজের হৃদপিণ্ডের অপর মুঠো করে ডান হাত রেখে দরাজ কণ্ঠে উচ্চারণ করল:

'একমাত্র বাদশাহ আল্লাহর নামে, হু...
আমাদের পথ এক, আমাদের উদ্দেশ্য এক, আমাদের দ্বীন এক।
আমার গর্দান আপনার জন্য কুরবান হোক।
আমার জবান আল্লাহর অলিদের জবানের প্রতিধ্বনি হোক।
রুটি, পানি বা লবণ যদি না পাই, তবুও যেন এ পথ আমি না ছাড়ি।

আর যদি আমি এ পথ থেকে সরে যাই, তলোয়ারের এক আঘাতে আমার এ গর্দান ছিন্ন করে দেবেন।

হকের এই পথে উস্তাদের দোয়া আমার সঙ্গী হোক।

ইয়া আলি! হু...

হে মুয়াবিয়ার অনুসারীরা! হে মুহাম্মাদের (সা.) শত্রুরা!

তোমরা মিথ্যাবাদী, আমরা সত্যবাদী। তোমরা একপক্ষে, আমরা অন্যপক্ষে।

সুলতান যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই শপথ যদি তুমি ভঙ্গ করো, তখন কী হবে?'

যুবক জবাব দিল, আমাকে যেন আমারই তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়। আমি যেন মাটিতে মিশে যাই, আমি যেন ধুলা হয়ে যাই।

বেকতাশি দরবেশ তার জোব্বার চওড়া আস্তিন রাখলেন প্রথম যুবকের মাথার ওপরে।

ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল।

বাতাস গমগম করে উঠল প্রবীণ দরবেশের ভরাট আওয়াজে।

'মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই যুবকের চেহারা উজ্জ্বল হোক। এর বাহু হয়ে উঠুক শক্তিশালী, তলোয়ার হোক তীক্ষ্ণধার, নিক্ষিপ্ত তীর হোক পিপাসার্ত। তুমি সব যুদ্ধেই জিতবে, আর বিজয় ছাড়া কখনোই ফিরে আসবে না ইনশাআল্লাহ!!'[*]

হাত সরালেন দরবেশ।

তারপর তুর্কমেন প্রতীক সাদা পালক লাগানো লম্বা সাদা টুপি পরিয়ে দিলেন যুবকের মাথায়। তারপর তার হাতে তুলে দেয়া হলো ইয়াতাগান তলোয়ার।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও এক হাজার যুবক।

এদের ধরে আনা হয়েছে গ্রিস, মেসিডোনিয়া, ওয়ালেসিয়া, আলবেনিয়া আর বুলগেরিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে মায়ের বুক খালি করে।

এদের আনা হয়েছে তখন, যখন এদের বয়স ছিল সাত থেকে এগারো বছরের ভেতর।[১]

প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছর নাগাদ একবার সুলতানের প্রতিনিধিরা বলকানের খ্রিষ্টান গ্রামগুলোতে যেত শিশু বাছাইয়ে।[২] প্রতি চল্লিশ ঘর থেকে সাত থেকে এগারো বছরের শিশুদের ডেকে এনে জড়ো করা হতো গ্রামের খোলা ময়দানে। যেসব ছেলে বাবার

---

[*]. The Ottoman Centuries: Lord Kinross

[১]. Ágoston, G., 2014. Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450–1800. Journal of World History, 25(1), pp.85-124.

[২]. Clarence-Smith, W.G., 2006. Islam and the Abolition of Slavery. Oxford University Press, USA

একমাত্র সন্তান, তাদের ফিরিয়ে দেয়া হতো। তারপর ফিরিয়ে দেয়া হতো তাদের, যাদের বাবা নেই, মা আছে। কিন্তু যাদের মা-বাবা কেউ নেই তাদের নিয়ে নেয়া হতো। খাটো কোনো বাচ্চাকে নেয়া হতো না। কারণ, সাধারণত খাটোরা উচ্ছৃঙ্খল হয়। বেশি লম্বা কাউকে নেয়া হতো না। কারণ, তারা সাধারণত বোকা হয়, বেশি মোটা বা বেশি চিকন কাউকে নেয়া হতো না। এজন্য যে, তারা সাধারণত কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না। ট্যারাদের বাদ দেয়া হতো, কারণ ট্যারাদের নাকি একগুঁয়েমি থাকে।[৩]

এরপর যারা বাকি থাকত তাদের ভেতর থেকে সবচেয়ে সুঠামদেহী ছেলেদের আলাদা করা হতো, গড়ে চল্লিশ ঘর থেকে পাঁচ বছরে একজন করে ছেলে।[৪]

তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হতো আনাতোলিয়ায়। সেখানে তাদের থাকতে দেয়া হতো আগে থেকে বাছাই করা কোনো ধার্মিক মুসলিম কৃষক পরিবারের সাথে। সেখানে তাদের ইসলামে দাখিল করা হতো। ইসলামের নিয়মকানুন শেখার সাথে সাথে তারা সেখানে শিখত চাষবাসের কঠোর পরিশ্রমের কাজ। এতে তাদের শরীর অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠত। কৃষক পরিবারে এরা ছিল সুলতানের আমানত, এদের যত্ন ঠিকমতো নেয়া হচ্ছে কিনা তার খোঁজ খবর সুলতানের নিযুক্ত লোকেরা রাখত।[৫]

চার বছর কৃষক পরিবারে বড় হবার পর ওদের নিয়ে আসা হতো বুরসায়। সেখানে ওদের ভেতর যারা সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে শক্তিশালী, তাদের পাঠানো হতো প্রাসাদে। প্রাসাদে তারা পড়াশোনা করত শাহজাদা, পাশা ও বে'দের সন্তানদের সাথে।

যারা পড়াশোনায় ভালো তাদের দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগকে পাঠানো হতো ইসলামি শারিয়াহ, কুরআন, হাদিস ও তাফসির পড়ানো হয় এমন মাদরাসায়। আরেক ভাগ, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় আগ্রহী ছিল, তাদের পড়ানো হতো নিজেদের পছন্দনীয় বিষয়ে।

বাকিরা তাদের জীবন কাটাত সুলতানের সৈনিক হয়ে। এদের নিয়েই তৈরি হয়েছিল জানিসারি বাহিনী।

একটানা চার বছর প্রশিক্ষণ নিয়ে ওরা বড় হতো সুদক্ষ একেকটা যন্ত্র হয়ে।

ওদের প্রত্যেকে দু হাতেই তলোয়ার চালাতে পারত কিলিজ তলোয়ার। দুহাতেই ধনুক থেকে তীর ছোঁড়া, কুঠার, খঞ্জর, বর্শা, বল্লমসহ প্রতিটি অস্ত্র চালনা ওদের কাছে হয়ে যেত খেলার মতো।

---

৩. Imber, C., 2009. The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan.

৪. Imber, C., 2009. The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan.

৫. İnalcık, H. and Quataert, D. eds., 1994. An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge University Press.

ওদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তীরন্দাজী। তুর্কি ধনুকের শক্তিশালী ছিলা টেনে ওরা লক্ষ্যভেদ করে পারত, এমনকি ছয় শ মিটার দূর থেকেও।

ওরা অন্যান্য ইউনিটের থেকে অনন্য ছিল। ওদের জন্য নির্ধারিত ছিল আলাদা লাল পোশাক। ওদের জন্য দাড়ি রাখা ছিল নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও ছিল বিশেষভাবে তৈরি অস্ত্রাগার, আলাদা রান্নাঘর, প্রত্যেক রেজিমেন্টের জন্য সেখানে রান্না হতো একই হাড়িতে।

সবার কাছ থেকে আলাদাভাবে তারা থাকত উন্নতমানের ব্যারাকে। সেই সাথে তাদের জন্য ছিল বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা। জানিসারিদের বেতন দেয়া হতো অন্য সবার চেয়ে বেশি। আর যুদ্ধের ময়দানে তারা লড়াইও করত বেপরোয়াভাবে।

জানিসারিরা ছিল অটোমান সুলতানের এলিট ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট। তাদের বিপরীতে আরেকটি এলিট ক্যাভালরি ইউনিট ছিল, যাদের বলা হতো কাপিকুলু সাওয়ারি। এদের বেছে নেয়া হতো তুর্কি ছেলেদের মধ্যে থেকে। এই ক্যাভালরি ইউনিটের ছিল ছয়টি ডিভিশন, সিপাহী, সিলাহদার, ডান ও বাম উলুফেচি, ডান ও বাম গরিব। এর মধ্যে সিপাহী আর সিলাহদার ইউনিট দুটো ছিল বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের নিয়ে তৈরি। এরা যেকোনো মুহূর্তে সুলতানের আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকত।

যুদ্ধের ময়দানে জানিসারিরা থাকত সুলতানের ঠিক সামনে। আর কাপিকুলুরা থাকত ঠিক পেছনে, সুলতান নিজে থাকতেন সিপাহী আর সিলাহদারদের মাঝখানে।

জানিসারিদের কাজ ছিল আক্রমণের চূড়ান্ত মুহূর্তে শত্রুকে নিখুঁত মারণাঘাত হেনে চুরমার করে দেয়া। পক্ষান্তরে কাপিকুলুদের কাজ ছিল অন্যান্য ইউনিট শত্রুর আক্রমণে ভেঙে পড়লে জীবন বাজি রেখে শত্রুদের ঠেকানো। এই দুটো এলিট ইউনিট তৈরি করে সুলতান মুরাদ অটোমান সেনাবাহিনীকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যান। যুদ্ধের ময়দানে এরা শত্রুর জন্য ছিল রীতিমতো যমদূতের মতো। জানিসারি ও কাপিকুলুরা না ছিল দাস, না ছিল স্বাধীন মানুষ। সুলতানের প্রতি আনুগত্যই ছিল তাদের জীবনের মূলকথা।

এই চরমভাবে অনুগত দুটি বাহিনীর মাধ্যমে সুলতান গাজি বে'দের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনেন। অটোমান সেনাবাহিনী সাংগঠনিক ও সামরিক দক্ষতায় ছাড়িয়ে যায় তৎকালীন পৃথিবীর যেকোনো বাহিনীকে।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পরবর্তী চার শ বছর জানিসারি আর কাপিকুলুরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে বলকান, মধ্যপ্রাচ্য আর মাগরেবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় সেনাবাহিনীগুলোর কাছে এরা ছিল রীতিমতো আতঙ্ক।

কূটনীতির গ্র্যান্ডমাস্টার

এক

যে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এক দিন পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে সিরিয়া, উত্তরে হাঙ্গেরি থেকে দক্ষিণে ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার সীমা সংকুচিত হতে হতে চলে এসেছিল কনস্ট্যান্টিনোপল, থ্রেসের সামান্য কিছু অংশ, মোরিয়া উপদ্বীপ আর ত্রেবিজন্ড পর্যন্ত।

এই অবস্থায় হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি রোমান সম্রাট। বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, হাঙ্গেরি আর ইতালিতে ঘুরে কারও কাছে সাহায্য না পেয়ে তিনি পোপের কাছে গিয়ে সাহায্যের বিনিময়ে অর্থডক্স চার্চকে পরিত্যাগ করার ঘোষণা দিয়ে ক্যাথলিক হয়ে যান।

এসব করে শেষ পর্যন্ত তার কোনো লাভ হলো না। নিজের ঘরেই বিদ্রোহ করে বসল ছেলে অ্যান্ড্রোনিকাস। তাকে সমর্থন জানাল একাধিক ইতালিয়ান নগর রাষ্ট্র। সিংহাসন রক্ষা করতে আবারও শেষমেশ মুরাদের কাছেই ধরনা দিলেন জন পালাইলোগাস।

এক শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করে অ্যান্ড্রোনিকাসকে অন্ধ করে দেয়ার জন্য চাপ দিলেন মুরাদ।

মুরাদের ভয়ে এই কাজ করতে বাধ্য হলেন জন। কিন্তু চালাকি করে তিনি নকল সিরকা ব্যবহার করলেন, যার ফলে কিছুদিন পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন অ্যান্ড্রোনিকাস।

সাথে সাথেই তিনি পিতাকে বন্দি করেন এক টাওয়ারে।

এবার দুর্বল মিত্রকে রক্ষা করতে মুরাদ নিজেই এগিয়ে এলেন। জনকে অ্যান্ড্রোনিকাসের হাত থেকে মুক্ত করে অ্যান্ড্রোনিকাসকে স্যালেনিকা দ্বীপের গভর্নর করে পুনরায় জনকে সিংহাসনে বসান তিনি। বিনিময়ে জন তাকে বার্ষিক বিরাট অঙ্কের কর দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[১]

---

১. Kastritsis, D.J., 2007. The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-1413(Vol. 38). Brill.

এরপর থেকে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে ব্যবহার করতে থাকেন মুরাদ।

তারপর কাটা দিয়ে কাটা তোলার রাজনীতির আরেক উদাহরণ দেখালেন সুলতান। এশিয়াতে বাইজান্টাইনদের শেষ যে শহরটা বাকি ছিল, সেই ফিলিপোপলিস দখল করার জন্য বাইজান্টাইন সম্রাটকে তিনি পাঠালেন অটোমানদের প্রতিনিধি হিসাবে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, যা এক দিন বিশ্বকে শাসন করত, মুরাদের আমলে তা হয়ে পড়ল অটোমানদের করদ এক নগণ্য রাজ্য, যার সিংহাসনে কে বসবে সে সিদ্ধান্ত নিতেন অটোমান সুলতান।

দুই

রাজনীতিতে বিয়ে সব সময়েই কার্যকর এক অস্ত্র। বিয়ের মাধ্যমে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করা বা মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করা, দুইই সম্ভব।

সুলতান মুরাদ প্রথমটা করতে চেয়েছিলেন।

সেলজুক সালতানাত-ই রুম এককালে ছিল সারা আনাতোলিয়ার অবিসংবাদিত শাসক। মোঙ্গলদের আক্রমণে সেলজুক সালতানাত ধ্বংস হবার পর থেকে আনাতোলিয়া তার ঐক্য হারায়। ছোট ছোট আমিরাতে বিভক্ত আনাতোলিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।

কিন্তু এ সময়ে আনাতোলিয়ায় ছিল দুটি শক্তিশালী রাজপরিবার। অটোমানদের উসমানি পরিবার আর কারামানিদের কারামানি পরিবার।

এরা প্রত্যেকেই নিজেদের মনে করতেন সেলজুকদের উত্তরাধিকারী। পশ্চিম আনাতোলিয়ায় যেমন উসমান পরিবার ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি মধ্য ও পূর্ব আনাতোলিয়াতে শক্তিশালী ছিল কারামানি পরিবার। দুই পরিবারের ভেতর সেই ওরহানের আমল থেকেই চলে আসছিল ঠান্ডা লড়াই।

বাইজান্টাইনদের নিজের প্রজায় পরিণত করার পরে মুরাদকে পূর্বে তাকাতে হলো। নিজেকে সেলজুকদের যোগ্য উত্তরসূরি প্রমাণ করতে তিনি সতর্ক দাবাড়ুর মতো কিছু চাল দিলেন।

প্রথম চাল ছিল কারামানের আলাউদ্দিন আলি বের সাথে আদরের মেয়ে নাফিসা খাতুনের বিয়ে দেয়া। ১৩৭৮ সালে এই বিয়ে হওয়ার পর কারামানের সাথে অটোমানদের ঝামেলা কিছুদিনের জন্য কমে যায়।[২]

---

২. Halil İnalcık. Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları.İSAM. İstanbul. ISBN 978-605-5586-06-5 p.99

এর পরপরই বড় ছেলে বায়েজিদকে মুরাদ বিয়ে দেন জার্মিয়ানোলু বংশের রাজকুমারী সুলতান খাতুনের সাথে। এই বিয়ের ফলে জার্মিয়ানদের আমিরাতের একটা বড় অংশ উপহার হিসেবে পেয়ে যান বায়েজিদ।[৩]

এরপর মুরাদ দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে আয়দিন, মেনতেসে, সারুখান ও টেক্কি আমিরাতের আমিরদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এতে পুরো পশ্চিম আনাতোলিয়াতে অটোমানদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে।

বিশেষকরে দক্ষিণের আন্তালিয়া বন্দরের নিয়ন্ত্রণ অটোমানদের হাতে চলে যাওয়ায় আনাতোলিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর তাদের প্রাধান্য নিশ্চিত হয়ে যায়। আর এতে ক্রমেই বিরক্ত হতে থাকেন আলাউদ্দিন বে। তিনি মুরাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, আনকারা আক্রমণ করে অটোমানদের একটা সেনাছাউনিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন। এর ফলে মুরাদ ইউরোপ অভিযান স্থগিত রেখে কুতাহইয়াতে আলাউদ্দিনের মুখোমুখি হন।

এই যুদ্ধে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, যা পরবর্তী সময়ে আনাতোলিয়া ও বিশ্বরাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

যেহেতু কারামানের বে ছিলেন একজন মুসলিম শাসক, তাই মুরাদের এই যুদ্ধে শায়খুল ইসলাম মুরাদের পক্ষে কোনো ফাতওয়া দেননি। ফলে গাজিদের অধিকাংশ অটোমানদের পক্ষে লড়াইয়ে নামতে অস্বীকার করে। শাইখুল ইসলামের ফাতওয়া ছাড়া সুলতানের পক্ষেও সম্ভব ছিল না তাদের লড়াইয়ে বাধ্য করা। ফলে বাধ্য হয়েই মুরাদকে ইউরোপ থেকে সৈন্য আমদানি করতে হলো।

এই লড়াই কুতাহইয়ার যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। এই যুদ্ধেই উত্থান ঘটে অটোমান সালতানাতের পরবর্তী সুলতান ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বায়েজিদের।

যুদ্ধে কারামানিদের শক্তিশালী তুর্কি ঘোড়সওয়ার বাহিনী যখন অটোমানদের ডিফেন্সকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল ঠিক তখন রাইট উইং দিয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়ে তাদের একপাশকে অচল করে দেন বায়েজিদ। বিদ্যুৎগতির এই আক্রমণ এতই তীব্র ছিল যে, এরপর থেকে বায়েজিদের নামই হয়ে যায় ইয়িলদিরিম-বজ্রপাত।

কুতাহইয়াতে অটোমানদের কাছে হেরে গিয়ে রাজধানী কোনইয়ার দিকে পালিয়ে যান আলাউদ্দিন বে। মুরাদ বিন্দুমাত্র দেরি না করেই কোনইয়া অবরোধ করে বসেন। বারো দিনের অবরোধের পর কোনইয়ার পতন ঘনিয়ে আসে।

এমন সময় মুরাদের দিকে বুমেরাং হয়ে ফিরে এল তারই অস্ত্র নাফিসা খাতুন।

শাহজাদি নাফিসাকে মুরাদের কাছে পাঠিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চান আলাউদ্দিন বে।

---

৩. Imber, C., 2009. The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan

কোনইয়ার দেয়ালের বাইরে দেখা যায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। পিতা মুরাদের বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন নাফিসা খাতুন, তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তার ছেলে-মেয়েরা।

মেয়ের চোখের পানি সহ্য না করতে পেরে মুরাদ আলাউদ্দিন বেকে ক্ষমা করে দিলেন। তাকে কোনইয়ার অধিকারও ছেড়ে দিলেন এই শর্তে যে, সে ভবিষ্যতে আর কোনো বিদ্রোহ করবে না।

তিন

আনাতোলিয়ায় যখন অটোমানদের উত্থান ঘটে, তারা তখন ছিল আনাতোলিয়ার সবচেয়ে ছোট আমিরাত। এই ছোট আমিরাতের ধীরে ধীরে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল উসমান পরিবারের বিচক্ষণতার। সালতানাতের শক্তির জায়গাগুলোকে তারা যেমন কাজে লাগিয়েছেন, তেমনি নিয়ন্ত্রণও করেছেন। সেই সাথে যখন যে বিপদের সৃষ্টি হয়েছে তখন সেটাকে সতর্কভাবে মোকাবেলা করেছেন।

মুরাদের আগে অটোমান সালতানাত ছিল মূলত কিছু তুর্কি গোত্রের ঐক্যমতের ভিত্তিতে চালিত একটা সালতানাত, যার কোনো সুগঠিত কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। মুরাদের আমলে সালতানাত উত্তরে সার্ব এবং পূর্বে কারামানিদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। আনাতোলিয়ার অন্য আমিরাতগুলো অটোমানদের মতো বড় সালতানাত হয়ে না ওঠার একটা বড় কারণ গাজিরা। যখনই গাজিরা কোনো নতুন এলাকা জয় করেছে, সেখানে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। তারপর ধীরে ধীরে আগের আমিরাত থেকে আলাদা হয়ে নিজেরাই তৈরি করেছে আরেকটি আমিরাত। জার্মিয়ানি আমিরাত থেকে একে একে আয়দিন, সারুখান আর মেনতেসে আমিরাতের জন্ম এভাবেই।

মুরাদ বুঝতে পেরেছিলেন, এভাবে তিনি বড় সালতানাত তৈরি করতে পারবেন না। বড় সালতানাত টিকিয়ে রাখতে চাই শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

জানিসারি ও কাপিকুলু বাহিনী, তিমারি সিপাহী বাহিনী গঠন ছিল মুরাদের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রচেষ্টারই অংশ। এতে করে গাজিদের ওপর সুলতানের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী হয়। কিন্তু চির যাযাবর গাজিদের ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। মুসলিম হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও তারা ভালোভাবে নিলেন না।

এক দিকে সেলজুক সালতানাতের উত্তরাধিকার নিয়ে কারামানিদের সাথে লড়াই, অন্যদিকে অন্য আমিরাতগুলোর অবস্থা দেখে মুরাদ ক্রমেই গাজিদের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণকে বাড়িয়ে চললেন। যা ধীরে ধীরে অটোমান সালতানাতের ভেতর শুরু হলো এক শীতল যুদ্ধ।

এই ঠান্ডা লড়াইয়ের ভেতরেই উত্তর সীমান্তে আবার নতুন করে যুদ্ধের ঝনঝনানি বেজে ওঠে। সার্বরা আবার লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে বলকানের বুকের ওপর।

চার

কুতাহইয়ার যুদ্ধের শেষে আনাতোলিয়ার সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করেছিল মুরাদের সার্বিয়ান সেনারা। মুরাদ তাদের নিষেধ করলেও তারা শোনেনি। তারা ভুলে গিয়েছিল এটা ইউরোপ না।

সাত শ সৈনিকের শিরোচ্ছেদ করা হলো দুঘণ্টায়। এরা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করেছিল।

এরপর সার্বিয়াতে ফিরে গেল মুরাদের সার্বিয়ান ডিভিশন। এরা ছিল ক্ষুব্ধ। সার্বিয়ান লাজার হেব্রেজানোভিচ বসনিয়ান প্রিন্সের সাথে শলাপরামর্শ করে ফন্দি আটতে লাগলেন এই রাগকে কাজে লাগিয়ে কী করে মুরাদকে শায়েস্তা করা যায়।

লাজারের অগ্রগতির খবর পেয়ে মুরাদ তার বিশ্বস্ত সেনাপতি লালা শাহিন পাশাকে পাঠালেন অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে।

শাহিন পাশা নিজে থেসালিতে বাইজান্টাইনদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার অধীনস্ত আরেক কর্নেল শাহিন বে'কে অগ্রসর হতে বললেন।

দশ দিন ধরে পথ চলে শাহিন বে পৌঁছলেন মেসিডোনিয়ার ভার্ডার নদীর তীরে। তার বাহিনীর পুরোটাই ঘোড়সওয়ার, লাইট ক্যাভালরি ইউনিট আকিনজিদের নিয়ে গড়া। সংখ্যায় তারা ছিল বিশ হাজার।[৪]

ভার্ডার অববাহিকাতে সার্বিয়ান বাহিনীকে এক সপ্তাহ ধরে খুঁজেও কিছুই পেলেন না শাহিন বে। তারা তখন ভার্ডারের উত্তর তীরের গহীন বনে লুকিয়ে আছে, তাদের স্কাউটরা অটোমানদের খবর রাখছে।

দীর্ঘ খোঁজা খুঁজির পরেও শত্রুর দেখা না পেয়ে আকিনজিরা গণিমতের মালের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠল। তারা আশেপাশের জনপদ লুট করতে শুরু করল। বিশ হাজারের মধ্যে মাত্র দু হাজার শাহিন বের কথা শুনল। বাকিরা বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ইচ্ছেমতো লুটে মেতে ওঠল।[৫]

খবর পাওয়ামাত্রই হেব্রেজানোভিচের বাহিনী সোজা এগিয়ে গেল মাত্র দু হাজার যোদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কর্নেল শাহিন বের দিকে।

সার্বিয়ান ফোর্সের একদম সামনেই ছিল হেভি ক্যাভালরি নাইট বাহিনী। তাদের বর্শা ও বর্মের সামনে আকিনজিরা এমনিতেই দুর্বল, তার ওপর এবারে তারা সংখ্যায়ও কম।

---

৪. Namık. Kemal (1982). Osmanlı tarihi: Anadolu Selçukluları ve Anadolu beylikleri hakkında bir mukaddime ile Osmanlı devleti'nin kuruluşundan İstanbul'un fethine kadarı. 2. İstanbul'un fethinden Kanunî Sultan Süleyman'nın ölümüne kadar. Türk Tarih Kurumu. pp. 200

৫. প্রাগুক্ত(৪)

দুই দিকে ছড়িয়ে পড়ে সার্বিয়ান ফোর্সের দুই উইংকে আক্রমণ করলেন শাহিন বে।

তারা ভালোমতোই প্রস্তুত ছিল, ঘোড়ার পিঠে তীরের ঝাঁক নিয়ে শুয়ে থাকা তীরন্দাজরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়তে লাগল। তিনদিক থেকে ত্রিশ হাজার যোদ্ধার মধ্যে ঘেরাও হয়ে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালালেন শাহিন বে।

এরপর বসনিয়ান প্রিন্স ভর্তোকের বাহিনী চলে এল যুদ্ধের ময়দানে, সাথে সার্বিয়ান নাইট ওবিচ মিলার। এরা ঘিরে ধরল বিশৃঙ্খল আঠারো হাজার আকিনজিকে। এদের মাত্র পাঁচ হাজার প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারল।[৬] অটোমান সেনাবাহিনীর এক বড় অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি মাত্র আঘাতে।

মেসিডোনিয়ার বুক চিরে এখনো বইছে ভার্ডার, অটোমানদের লাল রক্তের গন্ধ নিয়ে।

৬. প্রাগুক্ত(৪)

কসোভোর যুদ্ধ

এক

লালা শাহিন পাশা আর নেই।

ভার্ডারের তীরে হওয়া প্লচনিকের যুদ্ধের পর আরেকবার সার্বদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এই অটোমান কমান্ডার, লাভ হয়নি। সেখানেও পরাজিত অ্যাড্রিয়ানোপল, মারিৎজা, আর স্যাভোয়ার্দ ক্রুসেড লড়া এই মহাবীর। বিলেজায় হারার পর আর বেশি দিন বাঁচেননি তিনি।

সার্বরা আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়াতে ঢোকার পথগুলো বন্ধ করে দিয়েছে এক এক করে। ওদিকে বসনিয়ার রাজা ভর্টকও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

বসনিয়া থেকে আসা দশ হাজার, সাথে ব্রাঙ্কোভিচের সাথে আসা পাঁচ হাজার যোদ্ধা, প্রিন্স লাজার হেব্রেজানোভিচের নিজের পনেরো হাজারের সাথে মিলে সংখ্যাটা দাঁড়াল ত্রিশ হাজারে।[১] এর সাথে যোগ হলো ক্রুসেড ফেরত নাইটদের এক দল, প্রায় পাঁচ হাজার সংখ্যায়।

একে একে অটোমানদের ইউরোপে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে তারা এগোতে থাকল মেসিডোনিয়ার ভেতর দিয়ে।

জবাবে দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন মুরাদ। দুই সন্তানসহ তিনি তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত রওনা হলেন ফিলিপোপলিস থেকে বুলগেরিয়া হয়ে মেসিডোনিয়ার দিকে।

মেসিডোনিয়াতে এসে তিনি বুঝলেন তিনি আসলে একটা ফাঁদে পড়ে গেছেন। পূর্বে পাথুরে পর্বতমালা, খাবার-পানির অভাব সেদিকে।

---

১. Vojna Akademija (1972). 'Kosovska bitka'. Vojna Enciklopedija (in Serbo-Croatian). Belgrade: Vojnoizdavački zavod JNA. p. 659)

পশ্চিমে-উত্তরে যেদিকেই যাবেন শত্রুর স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোলে প্রতিটি এলাকা। খুব বেশি সৈন্যও যে আনতে পেরেছেন তাও নয়। যদিও সংখ্যাটা তখনো সার্বদের চেয়ে বেশি কিন্তু ইউরোপ সেরা যোদ্ধা নাইটদের সাথে লড়তে এরা যথেষ্ট না।

সুলতান মুরাদ চিন্তিত।

তার সেরা সেনাপতিকে তিনি হারিয়েছেন। এলিট ইউনিটগুলো একেবারেই নতুন, জানিসারি বা কাপিকুলুরা তখন পর্যন্ত বড় কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তিমারি সিপাহীরাও মোটের ওপর অনভিজ্ঞই। সেই সাথে কসোভোর প্রান্তরে গ্রীষ্মের তীব্র বাতাস বইছে অটোমানদের বিপরীত দিক থেকে। ধুলার কারণে মুরাদের তীরন্দাজরা সামনের দিকে তাকাতেই পারছে না।

ওদিকে প্রিন্স লাজার হেব্রেজানোভিচের পুরোপুরি পোয়াবারো। তার আঁটা ছকে আটকে গেছেন অটোমান সুলতান।

১৩ জুন, ১৩৮৯ সালে ফরমেশন সেট করে ফেললেন লাজার।

মুরাদ তার বাহিনী নিয়ে লাজারকে আক্রমণ করতে বাধ্য হবেন। লাজার অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন, এখান থেকে তাকে সরানো মুশকিল। লাজারের সাথে আছে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত নাইটদের এক বিশাল ব্রিগেড। মুরাদকে প্রথমে তিনি আক্রমণ করতে বাধ্য করে লড়াইয়ের ময়দানের ওপরের দিকে তুলে আনবেন। তারপর তার নাইটদের দিয়ে সরাসরি ভেঙে ফেলবেন অটোমান ব্যূহ। তার লেফট ফ্ল্যাঙ্ক আটকে রাখবে অটোমান হেভি ক্যাভালরি ইউনিটগুলোকে। আর নাইটদের ঠিক পেছন পেছন তিনি তার মূলবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সোজা মুরাদের ঘাড়ে কোপ বসাবেন।

দুই

১৪ জুন, ১৩৮৯, গভীর রাত।

কসোভোর ময়দানের দক্ষিণে গাঁড়া তাঁবুতে বসে সুলতান মুনাজাত করছেন–

> 'হে আল্লাহ, আমি সারা জীবন তোমার ইসলামের পতাকাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে উঁচু রেখেছি। বারবার জীবন বাজি রেখেছি তোমার বান্দাদের জন্য। আজ এই শেষ বয়সে এসে আমি তোমার কাছে বিজয় ভিক্ষা চাই। আমার কোনো ক্ষমতা নেই এই শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার, যদি তুমি সাহায্য না কর। হে প্রভু, যে বাতাস শুধু তোমার ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়, তাকে তুমি আমাদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দাও। হে আল্লাহ, এই ময়দানে তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে ইসলামকে জয়ী করে দাও। এই জয়ের জন্য যদি আমাকে জীবনও দিতে হয়, মালিক আমাকে তাহলে তুমি শহিদ হিসেবে কবুল করে নাও।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা জায়নামাজে বসে কাঁদলেন সুলতান মুরাদ খোদাওয়ান্দিগার।

ফজরের আজান শুনে উঠে গেলেন তিনি। নামাজ শেষে তার মুখে এক প্রফুল্ল ভাব ফুটে ওঠল।

এই যুদ্ধে তিনি জিততে চলেছেন, এই বিশ্বাস তার মনে গেঁথে গেল।

তিন

কসোভোর ময়দানে উত্তরে সার্ব বাহিনী পজিশন নিয়েছে।

মাঝে প্রিন্স লাজার, ডানে ব্রাঙ্কোভিচের অশ্বারোহী বাহিনী, বামে বসনিয়ান ভুকোভিচের ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন।

একদম সামনে নাইটদের ইউরোপ কাঁপানো হেভি ক্যাভালরি ব্রিগেড।

অটোমানদের ব্যূহের একেবারে শুরুতেই আছে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ইসফেন্দিয়ারোলু ও হামিদি আমিরাত থেকে আনা পাঁচ হাজার তীরন্দাজ। এদের কাজ ঝাঁকে ঝাঁকে তীর মেরে শত্রুর আক্রমণের প্রথম ও তীব্রতম ধাক্কাটা হজম করে নিয়ে শত্রুর শক্তি কমিয়ে আনা, যাতে সেন্টারে থাকা ইউনিটগুলোর আক্রমণ সহজ হয়।

এরপরেই আছে মুরাদের প্রায় দুই হাজার তিমারি সিপাহী, মিডিয়াম ক্যাভালরি রেজিমেন্ট। তিমারিদের পেছনে তৈরি আছে ছয় হাজার আজব তীরন্দাজ আর চার হাজার লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ইয়াইয়া। ইয়াইয়ারা অনিয়মিত যোদ্ধা, এদেরও কাজ মূলত শত্রুর আক্রমণের কঠিনতম ধাক্কাটা শুষে নেয়া।

বাহিনীর রাইট ফ্ল্যাঙ্কে আছেন বড় শাহজাদা বায়েজিদ, সাথে এক হাজার হেভি ক্যাভালরি কাপিকুলু সিপাহী। পাঁচ হাজার আকিনজি গাজিকে নিয়ে তার ডান পাশেই আছেন গাজি বে এভ্রেনোস।

ছোট শাহজাদা ইয়াকুব চেলেবি আছেন লেফট ফ্ল্যাঙ্কে, তার সাথে আছে এক হাজার তিমারি সিপাহী আর এক হাজার আজব। ইয়াকুবের অধীনে লেফট ফ্ল্যাঙ্কে আছেন আরও পাঁচ হাজার গাজি। এদের নেতৃত্বে আছেন মিহাল ও মালকোচ পরিবারের গাজি বে রা।

ঠিক সেন্টারে নিজের দুই হাজার জানিসারি আর দেড় হাজার কাপিকুলু সিপাহী নিয়ে অবস্থান নিলেন সুলতান মুরাদ। বাহিনীর রিয়ারগার্ড হিসেবে রইল তিন হাজার তিমারি সিপাহী আর তাদেরও পেছনে ছিল করদ রাজ্য থেকে আসা সৈন্যদের আরেকটা বেষ্টনী।

কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই একটা ভুল করে বসলেন মুরাদ। শত্রুর শক্তিশালী হেভি ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটের বিরুদ্ধে তিনি লেফট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে ইয়াকুব চেলেবিকে আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন।

ইয়াকুবের আজব তীরন্দাজরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর চার্জ করল শত্রুর ফ্রন্টলাইনে। প্রবল বাতাস আর ধুলায় নিশানাই ঠিক করতে পারছিল না অটোমান তীরন্দাজেরা।

ফলে তীরগুলোর বেশিরভাগই ঠেকে গেল নাইটদের ভারী বর্মে। শুরু হলো সার্বদের ক্যাভালরি অ্যাটাক।

ভারী অস্ত্রে সজ্জিত নাইটদের চার্জ সামলাতে না পেরে কাতারে কাতারে মারা গেল হামিদি আর ইসফেন্দিয়ারি আমিরাতের যোদ্ধারা। অটোমান বাহিনীর সেন্টার ফ্রন্টে থাকা সিপাহী ইউনিট সরে এল পেছনে। ইয়াকুবের লেফট উইং মূলবাহিনী থেকে একটু দূরে সরতেই ব্রাঙ্কোভিচ প্রাণপণে হামলা করে বসল অটোমান লেফট উইংয়ে।

লাশের স্তূপ পড়ে যেতে লাগল অটোমানদের লেফট ও লেফট সেন্টারে।

ওয়েজ ফরমেশন তৈরি করে ভুকোভিচকে বামে একটু পেছনে রেখে ব্রাঙ্কোভিচ আর প্রিন্স লাজার মিলে প্রাণপণে আঘাত হানছিলেন অটোমানদের ওপর।

দুঘণ্টার মধ্যে দশ হাজার অটোমান শহিদ হয়ে গেল।

মুসলিম সেনাদের রক্তে ভিজে যাওয়া কসোভোর প্রান্তরে লাজারের কাছে ছুটে গেল ব্রাঙ্কোভিচের দূত। সে জানাল, যুদ্ধে ক্রুশের বিজয় হতে যাচ্ছে।

চার

এই সময়ে হঠাৎ যে বাতাস অটোমানদের উল্টোদিকে বইছিল, তা পুরোপুরি ঘুরে সার্বদের চোখে বালি ছিটাতে লাগল। যুদ্ধক্ষেত্রে নাইট বাহিনী মুরাদের কাছাকাছি এসে পড়েছে দেখে কাপিকুলুদের বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলেন বায়েজিদ। এরা সাম্রাজ্যের সেরা যোদ্ধা। একের পর এক নাইটদের লাশ ফেলতে লাগল তারা, কিন্তু নিজেরাও মরছিল সমানভাবেই।

লাজার আর ব্রাঙ্কোভিচের তোপের মুখে পড়ে লেফট ফ্ল্যাঙ্ক খালি করে দিয়ে পিছু হটে গেলেন ইয়াকুব। মুরাদ উন্মুক্ত হয়ে পড়লেন লাজারের পনেরো হাজারের মূল বাহিনীর সামনে। অটোমানদের পরাজয় যেন তখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

পুরো ময়দানে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন শাহজাদা বায়েজিদ আর একশ বছরেরও বেশি বয়সি আকিনজি বে গাজিবাবা এভ্রেনোস। তাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সার্ব লেফট ফ্ল্যাঙ্ক তখনো কোনো সুবিধা করতে পারেনি।

মুরাদ বিপদে পড়ছেন দেখে রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে বেপরোয়া হামলা চালালেন বায়েজিদ ইয়িলদিরিম, বজ্রপাত।
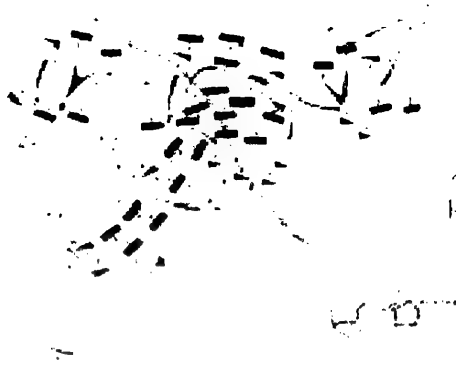
কসোভোর যুদ্ধের ট্যাকটিক্যাল ম্যাপ।

বজ্রপাতের মতোই তার তলোয়ারের ঘায়ে লাশের পর লাশ পড়তে লাগল। শত্রুদের বাহিনীর ভেতর শাহজাদাকে একাই ঢুকে পড়তে দেখে উন্মাদ হয়ে গেল তার বাহিনী। পুরো বসনিয়ান ফোর্স কয়েক ঘণ্টার মাথায় মাংসের কিমায় পরিণত হলো। চুরমার হয়ে যাওয়া লেফট ফ্ল্যাঙ্কের অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সেন্টারের দিকে সরে গেলেন ভুকোভিচ।

ওদিকে অটোমান সেন্টারে তখন ভয়াবহ চাপ তৈরি করেছে ব্রাঙ্কোভিচ আর লাজারের বাহিনী, সেই সাথে ফ্রন্টলাইনে থাকা নাইটস হসপিটালাররা।

এবার এগিয়ে এল জানিসারি বাহিনী।

জানিসারিদের ঝাঁক ঝাঁক তীর অনুকূল বাতাসে ছেঁকে ধরল লাজারের হেভি ইনফ্যান্ট্রিদের। ইয়া আল্লাহ! বিসমিল্লাহ!! আল্লাহু আকবার!!! গর্জন তুলে হাজি ইয়িত বে আর রজব পাশার কাপিকুলু সিপাহীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নাইটদের ওপর। এর মধ্যে রাইট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে এসে যোগ দিলেন শাহজাদা বায়েজিদ।

নাইটদের হেভি ক্যাভালরি আর লাজারের হেভি ইনফ্যান্ট্রি অটোমানদের জানিসারি এলিট ইনফ্যান্ট্রি, কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি এবং বায়েজিদ গাজিদের মধ্যে পড়ে তিনদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেল।

বায়েজিদ তখন জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে গেছেন। একের পর এক সার্বকে মারতে মারতে তিনি সার্বদের ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

ততক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছেন ইয়াকুবও। তিনি লেফট উইংয়ে ধাওয়া করলেন ব্রাঙ্কোভিচকে।

বায়েজিদের দুর্ধর্ষ আক্রমণে লাজারের পুরো বাহিনী তছনছ হয়ে গেল।

ওদিকে নাইটদের শেষ করে ফেলল কাপিকুলু আর জানিসারিরা। কিন্তু তাদের মেটাতে হলো কড়া মূল্য। প্রচুর জানিসারি আর কাপিকুলু সিপাহী শহিদ হলো।

প্রিন্স লাজার ধরা পড়লেন হাজি ইয়িত বের হাতে। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে পালাল লাজারের জামাতা ওবিচ মিলার।

অটোমানরা জিতে গেল কসোভোর যুদ্ধে।

কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হলো ভয়াবহ।

বিশ হাজার সার্ব নিহত। অটোমানদের মধ্যে নিহতের সংখ্যা আরও বেশি।

পাঁচ

সুলতান মুরাদের মুনাজাতের শেষটুকুও আল্লাহ কবুল করলেন।

সার্বিয়ান নাইট ওবিচ মিলার, যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সে ছদ্মবেশে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে সুলতানের কাছে এসে তার হাতে চুমু খাওয়ার জন্য কাছে গেল।

সুলতান হাত বাড়িয়ে দিতেই চোখের পলকে ওবিচের ছোরা ঢুকে গেল সুলতানের পেটের একদম ভেতরে।

জানিসারিদের পাল্টা হামলায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওবিচ মিলার।[২]

আসরের নামাজের একটু পরেই শাহাদাত বরণ করলেন মুরাদ।

[২]. Emmert, Thomas A. (1996). "Milos Obilic and the Hero Myth" (PDF). Journal of the North American Society for Serbian Studies. 10

চতুর্থ অধ্যায় : চারিদিকে শত্রু

থান্ডারবোল্ট

এক

এক শাসকের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই শুরু হয় আরেকজনের শাসন। কসোভোর ময়দানে শহিদ মুরাদের ইন্তেকালের পর দ্রুত সালতানাতের কর্ণধার নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়ল।

সম্ভাব্য সুলতান ছিলেন দুজন। বায়েজিদ আর ইয়াকুব। অটোমানদের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক শাহজাদার সিংহাসনের প্রতি অধিকার সমান। অতএব, যে কেউই সুলতান হতে পারতেন।

যেহেতু যুদ্ধ জয়ের মূল নায়ক ছিলেন বায়েজিদ, তাই তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। দ্রুত সিংহাসনে বসে নিজেকে সুলতান ঘোষণা দিলেন। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াকুবকেও কোনো সুযোগ দিলেন না। সরাসরি তাঁবুতে ডেকে এনে গলায় ধনুকের ছিলা পেঁচিয়ে প্রাচীন তুর্কি পদ্ধতিতে ইয়াকুবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

বায়েজিদ নিজের সুলতান হবার রাস্তা পরিষ্কার করতে গিয়ে এক নিষ্ঠুর, অনৈতিক পন্থার জন্ম দিলেন। যা তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত ছিল প্রায় দুই শ বছর।[১]

সিংহাসনে বসার পর বায়েজিদের প্রথম কাজ ছিল সার্বদের সাথে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় আসা। কসোভোর যুদ্ধে দুই বাহিনীই চূড়ান্ত আকারে বিধ্বস্ত হয়েছে। যদিও শেষমেশ অটোমানরাই জিতেছে কিন্তু তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ভয়াবহ।

বাধ্য হয়ে বায়েজিদ আনাতোলিয়া থেকে রিজার্ভ বাহিনী ডেকে পাঠালেন। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন সার্বিয়ার দিকে।

মারিৎজা আর কসোভোতে হেরে সার্বদের সামরিক শক্তি ইতোমধ্যেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। উপায়ান্তর না পেয়ে সার্ব অভিজাতরা দলে দলে বায়েজিদের কাছে এসে বশ্যতা স্বীকার করতে লাগল। এমনকি প্রিন্স লাজারের বড় ছেলে স্টিফেন বালকোভিৎজ নিজেই হাজির হলেন বায়েজিদের কাছে। সাথে নিয়ে এলেন সুন্দরী বোন অলিভিয়েরা ডেস্পিনাকে। অলিভিয়েরাকে বিয়ে দেয়া হলো বায়েজিদের সাথে। এই বিয়ের সাথে সাথে স্টিফেনের সাথে সন্ধি করলেন বায়েজিদ।

সন্ধি অনুযায়ী স্টিফেন বায়েজিদকে নিয়মিত কর দেয়ার ওয়াদা করলেন। সেই সাথে নিজের বাহিনীসহ বায়েজিদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতিজ্ঞাও করলেন। বিনিময়ে বায়েজিদ তাকে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সার্বিয়া সীমান্তের সমস্যা দূর হবার পর বায়েজিদ তার গাজিদের স্বাধীনতা দিলেন বলকানের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ার।

এভ্রেনোস, মিহাল ও মালকোচ পরিবারের নেতৃত্বে তুর্কি গাজিরা ইউরোপের একের পর এক নতুন অঞ্চল অটোমান শাসনের অধীনে নিয়ে আসতে লাগল। সেই সাথে বাড়তে শুরু করল এই পরিবারগুলোর প্রতিপত্তি। গাজিদের নিয়ন্ত্রণ করতে মুরাদ যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেই একই সমস্যার মুখে এবার পড়লেন বায়েজিদ।

দুই

বায়েজিদের পূর্বপুরুষদের আনাতোলিয়া নীতি ছিল, আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ নয়। কিন্তু বায়েজিদ এই নীতির ধার ধারেননি। স্বভাবের দিক থেকে চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত বায়েজিদ দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ক্ষমতায় আসার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি একে একে আয়দিন, মেনতেসে, সারুখান, হামিদোলু, ইসফেন্দিয়ারোলু ও কাস্তামানু আমিরাতগুলো সরাসরি নিজের সালতানাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

---

১. Goffman, D., 2002. The Ottoman empire and early modern Europe. Cambridge University Press.

এই বিষয়টা গাজিদের ক্রমেই ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা কোনো প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম আমিরাতের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নিতে রাজি ছিল না বিধায় বায়েজিদের সাথে তাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

বায়েজিদও গাজিদের প্রভাব হ্রাস করতে নিয়মিত সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার দিকে নজর দেন।

১৩৯৪ সাল নাগাদ তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সেনাবাহিনীর একটায় পরিণত হয় অটোমান বাহিনী। শক্তিশালী জানিসারি রেজিমেন্ট আর কাপিকুলু ডিভিশনের উপস্থিতির পাশাপাশি সিপাহীদের সংখ্যাও বেড়ে যাওয়ায় আগের যেকোনো সুলতানের চেয়ে বায়েজিদ নিজেকে বেশি শক্তিশালী অনুভব করতে শুরু করলেন।

তিন

বায়েজিদের নাম ইয়িলদিরিম বা বজ্র এমনি এমনি হয়নি।

তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে বজ্রপাতের মতো গতিতেই ইউরোপ থেকে এশিয়া আবার এশিয়া থেকে ইউরোপে ঘুরে বেড়াতেন। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন শত্রুদের ওপর। তিনি ছিলেন এমন এক জেনারেল যার সেনাবাহিনী থামতে জানত না।

বায়েজিদের হাতে একের পর এক বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও বসনিয়ার বেশকিছু অঞ্চলের পতন ঘটে। এরপর তিনি নজর দেন হাঙ্গেরির অন্তর্গত (আধুনিক রোমানিয়া) ওয়ালেসিয়া ও ট্রান্সিলভানিয়ার দিকে। ওয়ালেসিয়াতে তিন তিনটি কষ্টকর অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ওয়ালেসিয়ান কাউন্ট মির্সিয়া দ্যা গ্রেটকে জিযিয়া দিতে বাধ্য করেন।

ওয়ালাসিয়া থেকে ফিরেই বায়েজিদ নজর দেন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের নিভু নিভু প্রদীপের দিকে। তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলতে বাকি ছিল মূলত এথেন্স, মোরিয়া উপদ্বীপ আর কনস্ট্যান্টিনোপল। কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করা ছিল যেকোনো বিজেতার জন্য এক স্বপ্ন। বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ১৩৯৪ সালে সুলতান বায়েজিদ কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করে বসলেন।[২]

ফেরারি হলেন বাইজান্টাইন কাইজার। সারা ইউরোপ ঘুরে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল রক্ষার জন্য ইউরোপিয়ান সম্রাটদের কাছে আকুতি জানাতে লাগলেন। কাইজারের সাথে এই আকুতিতে যোগ দিলেন আরেক সম্রাট, হাঙ্গেরির জন সিগিসমুন্ড।

১৩৯৪ সালের শুরুতে হাঙ্গেরির সম্রাট সিগিসমুন্ড বুঝতে পারেন বায়েজিদ খুব বেশি দিন চুপ করে বসে থাকবেন না। সার্বিয়া পেরিয়ে তার সাম্রাজ্যে আক্রমণ করা অটোমানদের জন্য শুধু সময়ের ব্যাপার।

---

২. Finkel, C., 2007. Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire. Hachette UK.

সিগিসমুন্ড হেলাফেলা করার মতো কোনো লোক ছিলেন না। লুইস দ্যা গ্রেটের মতো তিনিও ছিলেন একজন শক্তিশালী সম্রাট। ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়ানো বিপদের মুখে তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে সার্বিয়া পেরিয়ে বুলগেরিয়াতে প্রবেশ করে দানিয়ুবের তীরে নিকোপলিস দুর্গ জয় করে নেন। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, এ জায়গাটা ধরে রাখা তার একার ক্ষমতায় কুলাবে না।

বায়েজিদ তার বাহিনী নিয়ে আগে বাড়লে পিছু হটে গেলেন সিগিসমুন্ড। সিগিসমুন্ড পিছু হটে যাওয়ায় নিশ্চিন্তে ১৩৯৫ সালে আবার বাইজান্টাইনদের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করলেন বায়েজিদ।

কিন্তু তত দিনে সিগিসমুন্ডের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে সারা ইউরোপে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তুর্কিদের থামাতে হলে চাই খ্রিষ্টানদের ঐক্যবদ্ধ এক সেনাবাহিনী।

মধ্যযুগের ইউরোপে হাঙ্গেরি ছিল ক্যাথলিক চার্চের এক শক্তিশালী সমর্থক। হাঙ্গেরির সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। সিগিসমুন্ডের পূর্বসূরি লুইস দ্যা গ্রেট ছিলেন পোপের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। বায়েজিদের হাতে হাঙ্গেরির পতন ঘটলে, তা যে ইউরোপের জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে, তা বুঝতে কারও কষ্ট হচ্ছিল না।

সিগিসমুন্ডের আহ্বান ভরা চিঠি পোপের সীলমোহর নিয়ে পৌঁছে গেল ফ্রান্সে সম্রাট চার্লসের চাচা ডিউক অব বার্গান্ডির কাছে। চিঠি গেল জন আর হোলি রোমান এম্পেররের কাছেও। পোল্যান্ড, জার্মানি, বোহেমিয়া, অস্ট্রিয়া, ইটালির সেনাবাহিনী প্রস্তুত হতে থাকল অটোমানদের নাম নিশানা ইউরোপের মাটি থেকে মুছে ফেলতে।

সমুদ্রপথে নৌবহর নিয়ে প্রস্তুত হতে থাকল ভেনিস, জেনোয়া আর রোডসের নাইট হসপিটালাররা। নাইটদের আরও এক বাহিনী চলে গেল সিগিসমুন্ডের কাছে, মুরাদের মতো তার ছেলের লাশও চায় তারা।

১৩৯৬ সালের গ্রীষ্মে এই আন্তর্জাতিক বাহিনীর আকার দাঁড়াল ১ লাখ ৩০ হাজারে। গোটা ইউরোপের শক্তি নিয়ে ধেঁয়ে আসছে এক ঘূর্ণিঝড়।

ক্রুসেড।

ভয় শব্দটা কী, তা জানতেন না সুলতান বায়েজিদ। শত্রুর শক্তি সম্পর্কে জানার পরেও তার তাঁবুতে যখন হাঙ্গেরির দূত এল, তিনি দূতকে তাকাতে বললেন তাঁবুর ডান দিকে।

সেখানে একটা ঝকঝকে তলোয়ার ঝুলছিল।

মরণপণ

বোল্ড রেখাটি দানিয়ুব নদী ধরে এগিয়ে যাওয়া ক্রুসেডার বাহিনীর গতিপথকে নির্দেশ করছে।

এক

বুদাতে বসে পার্টি করার দিন শেষ। ক্রুসেডার বাহিনী এখন ভিদিনে।

জন অফ নেভার্স, লর্ড অফ কাউসি, জাঁ কোতে দি ইউ, জন দ্যা ফিয়ারলেস, জাঁদে ভিয়েনে, জাঁদে ক্যারাগোস, ম্যানুয়েল বুসিকল্ট, মির্সিয়া দ্যা এল্ডার, স্টিফেন ল্যাকোভিচ অফ বুলগেরিয়া আর সম্রাট সিগিসমুন্ড একত্রে বসেছেন ওয়ার কাউন্সিলের মিটিংয়ে।

ফ্রান্সের কাউন্টরা মোটেই অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন না। সিগিসমুন্ড চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে পারছেন না যে, তাদের এখন সামনে না এগিয়ে ভিদিনেই অপেক্ষা করা উচিত।

গত বছরই বায়েজিদ বলেছিলেন, এবার জুলাইতে তিনি হাঙ্গেরি আক্রমণ করবেন।

অগাস্ট চলে। তবু বায়েজিদের কোনো খবর নেই। তিন মাস বসে থেকে ক্লান্ত ক্রুসেডার বাহিনী।

নেভার্সের জন ফ্রান্সের কাউন্টদের পক্ষ থেকে জোরালো বক্তব্য বললেন, তাদের কোনোমতেই এখানে বসে সময় নষ্ট করা উচিত না। এত বড় বাহিনী নিয়ে বসে না থেকে তাদের উচিত মার্চ করে কনস্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বসফরাস পেরিয়ে আনাতোলিয়া হয়ে সিরিয়া পেরিয়ে জেরুসালেম জয় করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা।

তরুণ জনের আবেগময় ভাষণ শুনলেন সিগিসমুন্ড আর মির্সিয়া। কিন্তু বাস্তব তাদের কল্পনার চেয়ে অনেক ভিন্ন। যত সামনে আগাবেন, তত নিজেদের অচেনা পরিবেশে অস্ত্র-রসদের অভাবে পড়ার সম্ভাবনা।

সিগিসমুন্ডের কথা কেউ শুনল না।

ফরাসিরা-নাইটরা হাত গুটিয়ে থাকতে আসেনি।

পরদিন বাহিনী বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্য নিকোপলিস। অটোমানদের এলাকাতে ঢুকতে হলে আগে নিকোপলিস দুর্গ জয় করতে হবে।

দুই

ধুলোয় গোসল করে হাঁপাতে হাঁপাতে নিকোপলিসে এসেছে হাসান চাভুশ। তার লাল দাড়িগুলো ধূসর হয়ে আছে ধুলোতে, মুখ হা করে বড়বড় শ্বাস নিচ্ছে সে।

কয়েক মুহূর্ত জিরিয়ে কয়েক ঢোক পানি খেল। টানা এগারো দিন ঘোড়া ছুটিয়ে সে নিকোপলিস দুর্গে পৌঁছে গেছে। দুর্গে পৌঁছেই দ্রুত আমির দোয়ান বের কাছে গেল। সে তাকে খুলে বলল ক্রুসেডারদের অগ্রগতির খবর। দোয়ান বের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে ওঠল।

হাসানকে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে তিনি দুর্গে জরুরি সভা ডাকলেন।

ক্রুসেডাররা আসছে।

তাড়াতাড়ি অন্তত ছয় মাস টিকে থাকার মতো রসদ জমা করে ফেললেন দোয়ান বে। দুর্গে যতক্ষণ খাবার পানি আছে, ততক্ষণ সৈন্যরা লড়ে যেতে পারবে।

সুলতানের কাছে দূত পাঠানো হয়ে গেছে এরমধ্যেই। অ্যাড্রিয়ানোপল থেকে আসতে সুলতানের চার সপ্তাহ লাগার কথা। দোয়ান বে'কে এই সময়টা যেভাবেই হোক দুর্গটা ধরে রাখতে হবে।

হাঙ্গেরি হয়ে সার্বিয়া দিয়ে ঢুকে বুলগেরিয়ার ভিদিনে পৌঁছল ক্রুসেডার বাহিনী। ভিদিনে অন্তত দশ হাজার মানুষকে হত্যা করল তারা। তারপর এগিয়ে গেল নিকোপলিসের দিকে।

পথিমধ্যে ক্রুসেডোররা রাহোভা শহরটাকে অবরোধ করল। সাহায্য করার জন্য কাউকে পেল না রাহোভাবাসী। আত্মসমর্পণ করলে প্রাণের নিরাপত্তা দেয়া হবে- সিগিসমুন্ডের

এই কথার পর শহরের দরজা খুলে দিল শহরবাসী। কিন্তু শহরে ঢুকে নির্মমভাবে চুক্তি ভেঙে দলে দলে পুরুষদের জবাই করল ক্রুসেডাররা। এক রাতের ভেতর খুন হলো কয়েক হাজার মানুষ, ধর্ষণের সংখ্যাও ছিল হাজারের কাছাকাছি।[১] আরও কয়েক হাজার মানুষকে বন্দি করা হলো। দাস হিসেবে এদের রাখা হবে। পুরুষদের ব্যবহার করা হবে ভারী কাজে, শিশুদের হালকা কাজে, আর মেয়েদের ব্যবহার করা হবে বেশ্যা হিসেবে।

রাহোভার খবর শুনে তাড়াতাড়ি রওনা করলেন বায়েজিদ। রাজধানীতে শায়খুল ইসলাম জিহাদের ডাক দিলেন।

প্রথমে বায়েজিদের সৈন্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারের মতো। জিহাদের ডাক দেয়াতে আনাতোলিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে গাজিরা এসে জমায়েত হলো বায়েজিদের পতাকার নিচে। সংখ্যাটা দাঁড়াল ষাট হাজারে।[২]

আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বায়েজিদ ইয়িলদিরিম।

তিন

নিকোপলিস দুর্গ অবরোধ করা হয়েছে।

দুর্গের উত্তরে দানিয়ুব নদী। দুপাশে পাথুরে সমভূমি, দক্ষিণে বুলগেরিয়া যাবার রাস্তা।

দোয়ান বে'র মজুদ প্রচুর। শক্তিশালী স্টোরেজ নিয়ে তিনি লম্বা অবরোধের জন্য তৈরি। কিন্তু যারা অবরোধ করতে এসেছে তারা তৈরি না।

তারা তিন মাস বুদার প্রাসাদে ফুর্তি করে বেড়িয়েছে ঠিকই কিন্তু দুর্গের দেয়াল ভাঙতে হলে যে সিজ মেশিন আনতে হয়, সে কথা মনে করতে পারেনি।[৩] অবশ্য সংখ্যায় তারা এত বেশি ছিল যে, সিজ মেশিন ছাড়াই তারা দুর্গ দখলের চিন্তা করতে থাকল।

প্রথম দুদফা চেষ্টা করে নাইটরা ব্যর্থ হলো। দুর্গের দেয়ালে উঠতে গেলেই ভেতর থেকে তীর, গরম পানি মারা হচ্ছে।

সেপ্টেম্বরের সাত তারিখ লর্ড কাউসির এক স্কাউট তাকে খবর দিল যে, বায়েজিদ আসছেন। আবার সভা বসল। সভায় সবদিক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সৈনিকদের মানসিকভাবে শক্তিশালী রাখার জন্য এই খবর ফাঁস হতে দেয়া যাবে না।

---

১. Madden, Thomas F. (2005). Crusades: the Illustrated History (1 ed.). Ann Arbor: University of Michigan Press

২. "Askeri Yapi Ve Savaşlar: Savaşlar (2/11)" (in Turkish). www.theottomans.org. Retrieved 2009-02-18.

৩. DeVries, K., 1999. The Lack of a Western European Military Response to the Ottoman Invasions of Eastern Europe from Nicopolis (1396) to Mohacs (1526). The Journal of Military History, 63(3), p.539.

পরদিন ভোরে যে যে সৈন্যকে বায়েজিদের আসার খবর আলাপ করতে দেখা গেল, তাদের কান কেটে দিলেন বুসিকল্ট।

কিন্তু দুদিন পরেই সিগিসমুন্ড পাকা খবর নিয়ে আসলেন, বায়েজিদ কাছাকাছিই কোথাও আছেন। তুর্কি সৈনিকদের ব্যবহার করা তীরের ফলক পেয়েছে তার স্কাউটরা।

বায়েজিদ দ্রুতগতির কিন্তু এতটা দ্রুতগতির তা তারা চিন্তা করতে পারেনি।

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকল ক্রুসেডার বাহিনী। টানা দুসপ্তাহ অপেক্ষা করল তারা। কিন্তু বায়েজিদের দেখা নেই।

২৪ তারিখ সকালে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তারা দেখল দক্ষিণের পর্বতের ওপর লাল সাদা পতাকা ওড়ছে। পতাকার বুকে চাঁদ তারা আঁকা।

বায়েজিদ সাধারণত তখনই হাজির হন, যখন কেউ তাকে আশা করে না।

চার

বায়েজিদ ইয়িলদিরিম নামটা এমনি এমনি অর্জন করেননি। চার সপ্তাহের পথ তিনি বারো দিনে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছেন নিকোপলিসের দক্ষিণে থাকা পার্বত্য অঞ্চলে। এসেই দুটো কাজ করলেন। প্রথমেই পাঁচ শ আকিনজিকে গিরিপথ দিয়ে নিকোপলিসের দিকে পাঠালেন। এরা জানে এদের বেঁচে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু এরা যাবে। সুলতানের নির্দেশ।

দ্বিতীয় কাজটা ছিল অসাধারণ একটা ট্যাকটিক্যাল ম্যানিউভারিং।

গিরিপথ দিয়ে পর্বতে উঠার পুরোটা রাস্তায় তিনি ঘোড়া মারা ফাঁদ পেতে রাখলেন। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলেন লম্বা শূল। ঘোড়া নিচ থেকে ওপরে উঠতে গেলেই সোজা পেটে ঢুকে যাবে এসব শূল। কিন্তু ওপর থেকে নিচে নামতে গেলে ঘোড়ার কোনো সমস্যা হবে না।

বায়েজিদের বাহিনী পাহাড়ের ওপরে। বাহিনীর সামনের দিকের পুরোটাই আকিনজি আর লাইট ইনফ্যান্ট্রি আজব ডিভিশন দিয়ে সাজানো। তার শত্রুর বাহিনীর অগ্রভাগ সম্ভবত পুরোটাই অশ্বারোহী, বায়েজিদের গোয়েন্দারা নিশ্চিত খবর এনেছে।

রাতে ফ্রেঞ্চ আর হাঙ্গেরিয়ানদের মধ্যে ওয়ার কাউন্সিলের সভায় তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল।

হাঙ্গেরির সম্রাট সিগিসমুন্ড এবং ওয়ালেসিয়ার মির্সিয়া দুজনেই জোর দিয়ে বলেছেন, বাহিনীর সামনের দিকে হাঙ্গেরিয়ান আর্মি, পোল্যান্ড-ব্যাভারিয়া ও প্রুশিয়ার বাহিনী থাকা উচিত। এরা বর্ম পরে না, ওজনে হালকা, তাই বায়েজিদের দ্রুতগতির বাহিনীর প্রথম আক্রমণ এদেরই সামলানো উচিত।

কিন্তু এবারেও তার কোনো কথাই মানলেন না ফ্রান্স থেকে আসা বীর বাহাদুররা। তাদের একটাই কথা, যুদ্ধের ময়দানে অভিজাত নাইট বাহিনী কোনোভাবেই হাঙ্গেরির সাধারণ যোদ্ধাদের পেছনে থাকতে পারে না। রোডসের নাইট হসপিটালারদের নেতা সেন্ট জন এবং এনগেরার্ড সেভেন্থও একই গো ধরলেন।[৪]

বাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশ ফ্রেঞ্চ। তাদের কথা এড়ানো সম্ভব না।

বিরক্তিতে ফুঁসতে ফুঁসতে সিগিসমুন্ড রাজি হলেন। তার আর উপায়ও ছিল না।

যুদ্ধের আগের রাতে ব্যাপক উল্লাসে মেতে উঠলেন ফ্রান্স থেকে আসা নাইট-কাউন্টদের দল। বন্দি প্রতিটি পুরুষকে হত্যা করা হলো। লাশের গা থেকে মাংস খুলে নদীতে ফেলে দেয়া হলো। নারীদের মধ্যে সাত বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেককে রাতভর গণধর্ষণ করা হলো।

দুর্গের ভেতরে দোয়ান বে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন মেয়েদের আর্তনাদে। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না।

জায়নামাজে বসে অশ্রু ঝরাচ্ছিলেন এই অটোমান কমান্ডার। তার বিশ্বাস, এই অত্যাচারের জবাব দিতে বায়েজিদ অবশ্যই আসবেন। তিনি তখনো জানেন না, সুলতান ইতোমধ্যেই এসে হাজির হয়েছেন নিকোপলিসের কাছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাঙ্গেরিয়ান আর্মি চলে গেল ক্রুসেডার ফোর্সের একেবারে পেছনে। লেফট উইংয়ে মির্সিয়া, রাইট উইংয়ে স্টিফেন ল্যাকোভিচ, ওয়ালেসিয়া আর বুলগেরিয়ার লাইট ক্যাভালরি কন্টিনজেন্ট নিয়ে।

বাহিনীর মধ্যভাগ ও সামনের পুরোটা জুড়ে ফ্রান্স-ইতালি-প্রুশিয়া থেকে আসা হাজার হাজার মিডিয়াম ইনফ্যান্ট্রি-ক্যাভালরি। একদম সামনে ইউরোপের সেরা যোদ্ধা, নাইট বাহিনী 'হেভি ক্যাভালরি ডিভিশন'।

পুরো বাহিনী এগোচ্ছে দানিয়ুবকে পেছনে রেখে। দানিয়ুব নদীতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদসহ জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করছে ভেনেশিয়ান আর জেনোইসরা। এই বাহিনীর মোট সংখ্যা এক লাখ ত্রিশ হাজার প্রায়।

ড্রাম বাজার তালে তালে ঢাল বেয়ে পর্বতের দিকে উঠতে লাগল বিশাল ক্রুসেডার আর্মি। বায়েজিদ পর্বতের ওপর থেকে একবার এই বাহিনীর দিকে তাকাচ্ছেন। আরেকবার তাকাচ্ছেন আসমানের দিকে।

তার প্রভু কি তাকে রক্ষা করবেন?

---

৪. Tuchman, Barbara W. (1978). A Distant Mirror: the Calamitous 14th Century. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 0-345-28394-5.p. 558

পাঁচ

সকালবেলা অটোমান বাহিনীর যে পাঁচ শ সওয়ারকে বায়েজিদ সামনে পাঠিয়েছিলেন, তারা ছিলেন অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ যোদ্ধা।

অনভিজ্ঞ এই যোদ্ধাদের নিমেষে পর্বতের ঢালে কচুকাটা করে ফেলল কাউন্ট কোতে দিউর নাইটরা। তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

কিন্তু পর্বতের ওপরে উঠতে উঠতে এই উৎসাহে পানি ঢেলে দিতে থাকল বায়েজিদের পাতা ঘোড়ামারা ফাঁদ। দুঘণ্টার মধ্যে নিজেদের অর্ধেক ঘোড়া হারাল নাইটরা। হেভি ক্যাভালরির অর্ধেকটা পরিণত হলো হেভি ইনফ্যান্ট্রিতে।

নিকোপলিসের প্রান্তরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উসমানি সেনাবাহিনী (ডানে) ও ক্রুসেডার বাহিনী (বামে)।

মাথার ওপরে সূর্য উঠে এল এই সময়েই। গরমে হাঁপাতে হাঁপাতে আশি পাউন্ড ওজনের বর্ম আর ত্রিশ পাউন্ড ওজনের স্পিয়ার-সোর্ড নিয়ে পর্বতের ওপরে ওঠল নাইটরা।

এখানে আসামাত্রই বৃষ্টির মতো তাদের দিকে ধেয়ে এল তুর্কিদের তীর। ক্লান্ত নাইটদের প্রথম লাইনটা লাশের স্তূপে পরিণত হতে দশ মিনিটও লাগেনি। এদের পেছনেই চলে এল নাইটদের মূল বাহিনী। আকিনজিরা এদের চার্জে টিকতে না পেরে ঘোড়ামারা ফাঁদগুলোর ভেতর দিয়ে হিট অ্যান্ড রান ট্যাকটিক্স-এ একবার আগাতে আরেকবার পেছাতে লাগল। ভারী গড়নের ইউরোপিয়ান ঘোড়া নিয়ে তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে একের পর এক ঘোড়া হারাচ্ছিল নাইটরা।

নাইটদের ঘোড়াগুলো শেষ হতে না হতেই বাহিনীর লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ঝড় তুলে দিল আনাতোলিয়ার মিডিয়াম ক্যাভালরি ডিভিশন। জানিসারিরা দুপাশে সরে পথ করে দিল

রুমেলিয়ার হেভি ক্যাভালরি কাপিকুলু ডিভিশনকে। এদের সামনে নাইটদের বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকল। এরই মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন সিগিসমুন্ড।

সিগিসমুন্ডের যোদ্ধাদের হামলায় আনাতোলিয়ার সিপাহীদের রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ময়দান। আনাতোলিয়া আর রুমেলিয়া ডিভিশনের যোদ্ধারা হাঙ্গেরিয়ান-ব্যাভারিয়ানদের সাথে নিজেদের জীবন বাজি রেখে পায়ে পা মিলিয়ে লড়তে লাগল কিন্তু শত্রুর সংখ্যাধিক্য তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। নাইটদের সাথে পোলিশ-হাঙ্গেরিয়ানদের জোরদার হামলার মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আকিনজি ও আজবরা। সিপাহীদের একটা বড় অংশ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য হলো।

অটোমান ব্যূহের সেন্টার উন্মুক্ত হয়ে পড়ল ক্রুসেডারদের সামনে। কিন্তু প্রচণ্ড লড়াইয়ে নাইটদের শক্তি তখন ফুরিয়ে এসেছে।
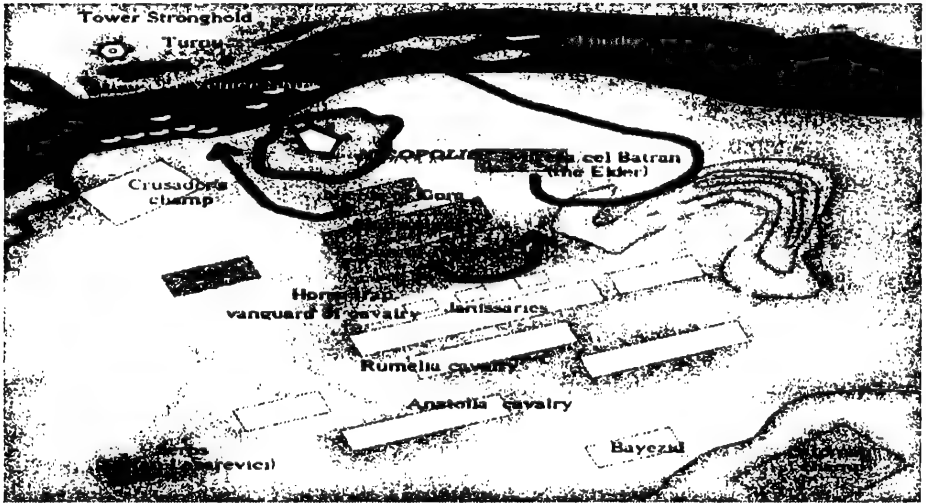
নিকোপলিসের যুদ্ধের ট্যাকটিক্যাল ম্যাপ।

বায়েজিদ লাল পতাকা তুলে হুংকার ছাড়লেন, 'ইয়া আল্লাহ! বিসমিল্লাহ! আল্লাহু আকবার!'

এটা ছিল আম হামলার সংকেত। তাকবির শুনে ফিরে দাঁড়াল গাজিদের দল। ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেল কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি ডিভিশনের সিপাহীরা। জানিসারিরা ফায়ারিং পজিশনে গিয়ে শুরু করল তীর বৃষ্টি।

উইং দিয়ে গাজিরা, সেন্টার দিয়ে জানিসারি আর কাপিকুলুরা ছেঁকে ধরল সিগিসমুন্ডের বাহিনীকে। মির্সিয়ার লাইট ক্যাভালরি এই প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেল।

ভয়ডর ছুঁড়ে ফেলে উন্মুক্ত বামপাশ দিয়ে বাতাসের বেগে ক্রুসেডার বাহিনীর পেছনে পৌঁছে গিয়ে তাদের ঘাড়ে কোপ বসাতে লাগল রুমেলিয়ার কাপিকুলু ডিভিশন। জান্দারলি আলি পাশার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভেঙে গেল সিগিসমুন্ডের ব্যূহ।

আরেক দফা শেষ চেষ্টা চালালেন নাইটরা। জানিসারিদের সাথে মরণপণ সংগ্রামে জেতার লড়াইয়ে নাইটরাই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের দুই ফ্ল্যাঙ্ক উন্মুক্ত হওয়াতে ঘটে গেল বিপর্যয়। রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে বায়েজিদের স্ত্রী ডেস্পিনার বড় ভাই স্টিফেন লাজার তার সার্বিয়ান হেভি ক্যাভালরি ইউনিট নিয়ে যুদ্ধের ভাগ্য সিল করে দিলেন। তিন দিক থেকে তিনটা হেভি আর্মার্ড ইউনিটের মাঝখানে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল নাইট বাহিনী।

নিকোলাই আর স্টিফেন ল্যাকোভিচের সাথে স্টিফেন লাজার বালকোভিটজের সমঝোতায় কোনোমতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালালেন সিগিসমুন্ড। নদী সাঁতরে পার হতে গিয়ে চল্লিশ পাউন্ড ওজনের ভারী বর্ম নিয়ে ডুবে গেল হাজার হাজার নাইট।

সমগ্র ইউরোপের মিলিত শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল মুসলিম গাজিরা।

এই পরাজয়ের খবর শুনে পোপ হার্ট অ্যাটাক করলেন।[৫]

বায়েজিদের হাতে ইউরোপের বুকের ওপর রচিত হলো ক্রুসেডের কবর।

ছয়

নিকোপলিসে ক্রুসেডারদের চুরমার হয়ে যাবার খবর ফ্রান্সে পৌঁছতে সময় লেগেছিল চার মাস। ফ্রান্সের সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস যখন বড়দিনের আনন্দে ব্যস্ত, তখন তার কানে এসে পৌঁছল তুর্কিদের হাতে তছনছ হয়ে যাওয়া বাহিনী আর বন্দি কাউন্টদের খবর।

মাথা খারাপ হয়ে গেল তার।

পরের সপ্তাহে সম্রাটের হাতে পৌঁছল বায়েজিদের চিঠি। দুই লাখ ডুকাট (স্বর্ণমুদ্রা) দাবি করেছেন বায়েজিদ, অন্যথায় বন্দি অভিজাত কাউন্টদের মাথার খুলি সময়মতো পৌঁছে দেয়া হবে বলে সোজা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।[৬] একই রকম চিঠি ইউরোপের অন্যান্য সম্রাটদের কাছেও পৌঁছল।

রাহোভার গণহত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তিন হাজার বন্দিকে কাউন্টদের সামনেই হত্যা করা হলো। বাকিদের দলে দলে দাস বানানো হলো।

মুক্তিপণের পাঁচ লাখ ডুকাটের একটা বড় অংশ বায়েজিদ খরচ করলেন মসজিদ নির্মাণে। নিকোপলিসের যুদ্ধের আগের রাতে তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেছিলেন, যুদ্ধে জিতলে বুর্সাতে বিশাল এক মসজিদ নির্মাণ করবেন।

---

৫. O'Brien, P., 2009. The Discovery of Islamic Superiority (1095–1453). In European Perceptions of Islam and America from Saladin to George W. Bush (pp. 47-70). Palgrave Macmillan US.

৬. Tuchman, Barbara W. (1978). A Distant Mirror: the Calamitous 14th Century. New York:.Alfred A. Knopf. ISBN 0-345-28394-5.p. 568

তিনি তার মানত পুরো করলেন। মসজিদটা এখনো আছে। নাম উলু জামি বুরসা।

তারপর বায়েজিদ তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী বেরিয়ে পড়লেন অভিযানে।

নিকোপলিসে গোটা ইউরোপ এমনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর তারা আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অন্তত পৌনে তিন শ বছর তারা কোনো সম্মিলিত ক্রুসেড ঘোষণা করতে পারেনি।[৭]

এর মাঝে ব্যতিক্রম ছিল স্পেন-পর্তুগালের সেনাবাহিনী এবং জেনোয়া, ভেনিস আর মিলানের নৌশক্তি। প্রথম দুই দেশ এই ক্রুসেডে অংশ নেয়নি। আর যুদ্ধটা স্থলে হওয়াতে ইতালিয়ানদের জাহাজগুলো রয়ে গিয়েছিল অক্ষত। এই জাহাজে করেই পালিয়েছিলেন ফ্রেঞ্চ মার্শাল ম্যানুয়েল বুসিকল্ট আর হাঙ্গেরির সম্রাট সিগিসমুন্ড।

নিকোপলিসে হেরে গিয়ে অপমানে ফেরারি হলেন সিগিসমুন্ড। পরের প্রায় পাঁচ বছর তিনি দেশে ফেরেননি।

বায়েজিদ এবার আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ দেখে নেয়ার অভিযানে নামলেন। মোরিয়ার পতন ঘটল বায়েজিদের সামনে। শুধু গ্রিকদের শেষ শহর এথেন্স টিকে রইল তার শক্তিশালী দুর্গগুলোর জোরে।

মোরিয়া জয় করে পোপের দূতকে বায়েজিদ জানালেন, পরের বছর হাঙ্গেরি জয় করে ইতালির দিকে আগাবেন তিনি। তারপর ভ্যাটিকানে ঢুকে সেন্ট পিটার্সের পবিত্র বেদীতে নিজের ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াবেন।

অপমানে কালো হয়ে গিয়েছিল পোপের দূতের মুখ।

---

৭. "Battle of Nicopolis". Encyclopædia Britannica. 2009. Retrieved 2009-02-18.

অশান্ত আনাতোলিয়া

এক

বড় বিজয় কাউকে বিনয়ী করে, কাউকে করে তোলে অহংকারী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বায়েজিদের সাথে দ্বিতীয়টিই ঘটেছিল।

নিকোপলিসের যুদ্ধের আগেই অধিকাংশ আনাতোলিয়ান রাজ্যগুলো জয় করে নিয়েছিলেন বায়েজিদ। এবার তিনি নজর দিলেন অটোমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী এশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী কারামানের দিকে। যে কারামানে এসে থেমে গিয়েছিল তার পিতা মুরাদের রাজনৈতিক কূটচালের অগ্রগতি।

বায়েজিদ যতটা না রাজনীতিবিদ ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন যোদ্ধা। তিনি কথা বলতেন তলোয়ারের ভাষাতে।

কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘুরে হুট করে এক দিন এক হাজার দু শ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কারামানে হামলা করে বসলেন বায়েজিদ। কিছু করার আগেই কারামানের ইবরাহিম বে দেখলেন তার রাজ্য দখল হয়ে গেছে। কারামান জয় করে গোটা আনাতোলিয়া ও বলকান অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠলেন বায়েজিদ। গর্বে ভরে উঠল তার বুক।

বিপুল উদ্যম নিয়ে তিনি এবার কনস্ট্যান্টিনোপল তৃতীয়বারের মতো অবরোধ করে বসলেন।

বায়েজিদের হয়তো অনেক বড় সেনাবাহিনী ছিল কিন্তু তার নৌবাহিনী ছিল একেবারেই সাধারণ মানের।

ফলে বসফরাসে জেনোয়ার নৌবাহিনীর হাতে তাড়া খেয়ে তার বাহিনীকে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ ছেড়ে দিতে হলো। এবার নতুন করে ছক আঁকতে লাগলেন থান্ডারবোল্ট।

বসফরাসের আনাতোলিয়ান পাড়ে বায়েজিদ আনাদোলু হিসারি নামে এক শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করলেন। উদ্দেশ্য পরবর্তী অবরোধের সময় এখান থেকে নিজের বাহিনীকে লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া।

১৪০০ সালে আবার কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করে বসলেন তিনি।

এবার জেনোইসরা এসে সুবিধা করতে পারল না।

চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়লেন বাইজানটাইন সম্রাট ম্যানুয়েল পালাইলাগোস। তার প্রজারা একে একে না খেয়ে মরতে লাগল তুর্কিদের অবরোধে। ১৪০১ সালের শেষ দিকে গ্রিক প্রজারা কনস্ট্যান্টিনোপলের দেয়ালে দড়ি বেঁধে নিচে নেমে এসে অটোমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল ক্ষুধার জ্বালায়।

বায়েজিদ আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন বিজয়ের ব্যাপারে। সেই সাথে অহংকারীও। তিনি এবার কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ী বীর হতে যাচ্ছেন।

দুই

যুদ্ধের ময়দানে বিদ্যুৎগতি ভালো হলেও রাষ্ট্র নির্মাণে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই।

ক্ষিপ্র স্বভাব যুদ্ধে বায়েজিদকে বারবার জিতিয়েছে এটা সত্যি কিন্তু যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তৈরি করেছে অনেক শত্রুও।

কারামান বলপূর্বক দখল করায় গাজিরা তার ওপর আগে থেকেই ক্ষেপে ছিলেন। তার ওপর তিনি যখন শক্তিশালী গাজি বে'দের ভূ-সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাদের ক্ষমতাকে আরও সীমিত করতে চাইলেন, তখন গাজিরা ক্ষেপে গেল। সুলতান মুরাদ তার ত্রিশ বছরের রাজত্বে একটু একটু করে গাজিদের নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। বায়েজিদ সামরিকভাবে মুরাদের চেয়ে অনেক বেশি স্বনির্ভর আর শক্তিশালী হওয়ায় মাত্র দশ বছরেই তিনি গাজিদের ক্ষমতাকে একেবারে কমিয়ে আনতে চাইলেন।

ব্যাপারটা আসলে মোটেই এমন সহজ ছিল না। গাজিরা ছিল অটোমান সেনাবাহিনীর একেবারে মৌলিক একটা উপাদান। সেনাবাহিনীর বাইরেও তুর্কিদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে গাজিদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। একসময় এই গাজিরাই গড়েছিল অটোমান সালতানাতের ভিত। এখন ক্ষমতাকে হ্রাস করে ফেলাটা তাদের মধ্য এশীয় অহংবোধে আঘাত হানল। অটোমানরা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক অভ্যন্তরীণ সমস্যায় পড়ল, যা তাদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

কারামানিয়ার প্রিন্স, আয়েদিন ও সারুখানের প্রিন্সরা বায়েজিদের ভয়ে কারমানের টরাস পর্বতমালার ওপারে আর্মেনিয়ার দিকে। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এক দিগ্‌বিজয়ীর দরবারে।

বৃদ্ধ দিদিগ্‌বিজয়ী নিজেও যে বায়েজিদের ওপর খুশি ছিলেন, তা নয়। বায়েজিদের দরবারে দুবছর আগে আশ্রয় নিয়েছে তার দুই দুশমন সুলতান জালাইয়ের আর কারা ইউসুফ।

একদিকে তুর্কি বীর, আরেকদিকে তাতার দিগ্‌বিজয়ী পরস্পরকে চিঠি দিতে লাগলেন।

তাতার দিগ্‌বিজয়ী ফেরত চাইলেন তার দুশমনদের, বায়েজিদ জবাব দিলেন অত্যন্ত অপমানজনক ভাষায়।

ক্রমেই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে এল।

বায়েজিদ তার সর্বশেষ চিঠিতে লিখেছিলেন–

> 'তোমাকে যদি আমি যুদ্ধে হারাই, তাহলে তোমার স্ত্রীদের নগ্ন করে আমি নাচের আসর বসাব। তাদের হাতে আমি শরাব পান করব।'[১]

পুরুষ সবচেয়ে হিংস্রভাবে লড়াই করে তখন, যখন তার স্ত্রীর সম্মানে আঘাত হানা হয়।

আর এই পুরুষটি যেনতেন কেউ ছিলেন না। গোল্ডেন হোর্ডকে পিষে ফেলা, ককেশাসের পর্বতকে অবনত করা, হিন্দুস্তান থেকে সিরিয়া, খোরাসান থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত ভূমির একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনি। জীবদ্দশায় প্রায় পৌনে দুকোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ, মস্কো থেকে বাগদাদ, দিল্লি থেকে দামেস্ক পর্যন্ত প্রতিটি শহরের ত্রাস এই বীরের নাম ছিল তাইমুর লং। মধ্য এশিয়া থেকে বের হওয়া শেষ দিগ্‌বিজয়ী আমির তাইমুর গুরিগান।

---

[১] Robinson, F. ed., 1996. The Cambridge illustrated history of the Islamic world. Cambridge University Press.

আলজাই

সতেরো মিলিয়ন মানুষ জবাই করা দুনিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পুরুষটাও কোনো এক দিন প্রেমিক ছিল। আমির কাজগানের দরবার থেকে তাঁবুতে ফিরে শীতলপাটির ওপর শুয়ে সেও তার স্ত্রীকে চুমু খেত। বিকেলবেলা সে প্রেমিকাকে নিয়ে বের হতো তুর্কি ঘোড়ায় চড়ে। প্রেয়সীর চুল খুলে দিত বনের ভেতর থেকে ছুটে আসা ঠান্ডা বাতাস, সেই কালো চুলের দিকে মানুষটা হা করে চেয়ে থাকতে গিয়ে ঘোড়দৌড়ে হেরে যেত। স্ত্রী, প্রেমিকা, সেবিকা- সবই যখন একজন হয়, দুনিয়ার কারও কাছে না হারা পুরুষটাও তখন হারতে থাকে। ভালোবাসার জ্যোৎস্না রঙে যার চোখ ধুয়ে যায়, তার কাছে মাটিকে জান্নাতের মেশক লাগে, রমনীকে লাগে হুর।

মা ওয়ারা উন্নাহারের পাইনের বনের ফাঁকে যখন চুপিচুপি বাতাসেরা গল্প করত, তারা তখন দেখত চওড়া কাঁধের বড় মাথাওয়ালা এক তরুণ গান গাইছে। তার বুকে মুখ গুঁজে আছে এক তরুণী। তার সুরে বাতাসও হয়তো তখন সুর মেলাতে চাইত। সন্ধ্যার পর আকাশের শামিয়ানার নিচে ঘাসের গালিচা পেতে ওরা বসত। ওদের নাকে গোলাপের ঘ্রাণ আসত কিন্তু গোলাপের ঘ্রাণ প্রেমিকের কাছে প্রিয়ার ঘ্রাণের চেয়ে সুন্দর নয়।

আলজাই চোখ বুজত। তার বোজা চোখের পাতা দুটো তাঁবুর মতো হয়ে থাকত স্বামীর সামনে। একজোড়া ঠোঁট সেই চোখের পাতায় যেন উষ্ণ মরুর বাতাস বইয়ে দিয়ে নিজে শান্ত হয়ে যেত। তাকিয়ায় রাখা খোলা বইয়ের পাতায় লেখা অক্ষরের সঙ্গে ও দূরের তারাদের সাথে ওরা কথা বলত। বসন্তে বুলবুলের গান আলজাইকে অস্থির করে তুলত, তার প্রিয়তম তাকে সময় দিত খুব কম। ঘোড়ায় চড়া মানুষটার জন্য দিগন্তে তার টানাটানা চোখের নজর ছড়িয়ে দিত আলজাই। অনেক অনেক অপেক্ষার পর মানুষটা তার কাছে আসত। চওড়া কাঁধ, বড় একটা মুখের মানুষটাকে আলজাই খুব ভালোবাসত।

ওদের একটা ছেলে ছিল, নাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরকে কোলে নিয়ে চাঁদের আলোয় নিজের দরিদ্র প্রেমিকের কাছে যুদ্ধের গল্প শুনত আলজাই। মানুষটা তাকে কখনো বেশি কিছু দিতে পারেনি।

এই মানুষটাকে সে কথা দিয়েছিল সব সময় তার সাথে থাকবে। এই কথার দাম দিতে গিয়ে আমিরের নাতনি হয়েও তাকে থাকতে হয়েছিল তাঁবুতে। স্বামীর সাথে সে মরুভূমিতে খালি পায়ে হেঁটেছে। বদ্ধ গুদামের দুর্গন্ধে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেও স্বামীর সাথে সত্তর দিন পর্যন্ত থাকতে হয়েছে তাকে। তাতে তার শরীর খারাপ করেছে ঠিকই কিন্তু ভালোবাসা খারাপ করেনি। বিনিময়ে তার যাযাবর স্বামী নিজের জন্য পানি না রেখে তার জন্য পানি রাখত। গরমে দম বন্ধ হয়ে এলে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সব ভুলে যেত সেই শক্ত-সমর্থ মানুষটা।

জীবনে একবারই স্বামীকে ভালোমতো কাছে পেয়েছিল আলজাই। ভালোবেসেছিল প্রাণ ভরে। চার চারটা মাস পায়ে তীর বিঁধে আলজাইয়ের তাঁবুতে পড়ে ছিল তার ভালোবাসার মানুষটা। সারা দিন যে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামত না, সে চার চারটা মাস ঘোড়ায় চড়েনি। একদিকে আলজাই স্বামীকে কাছে পেয়ে খুশি ছিল, অন্যদিকে রাতে তার ঘুম হতো না, মানুষটা অনেক দিন ঘোড়ায় চড়ে না বলে। প্রিয়তম স্বামী যেদিন আবার ঘোড়ায় চড়ল, আলজাই সেদিন বোঝেনি আর সে কোনোদিন তাকে এভাবে পাবে না। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে চুল নেড়ে নেড়ে সে আর তাকে গান শোনাতে পারবে না। পরের মাসে যে আলজাই মারা যাবে।

আলজাইকে কিছু দিতে না পারার দুঃখ থেকে তার স্বামী হয়তো বদলে গিয়েছিল। প্রিয়তমাকে কিছু দিতে না পারার ক্ষত বড় গভীর ক্ষত।

এই ঘা আটাশ বছরের এক প্রেমিককে বদলে দিয়েছিল নির্মম এক হত্যাকারীতে। সে আর কখনো গান গায়নি। সে আর কখনো ঠাট্টা করেনি। আর কোনোদিন তাকে কেউ হাসতে দেখেনি। সে আরও ছয়টা বিয়ে করেছিল একে একে, তার দুহাতে জমা পড়েছিল সারা এশিয়ার ঐশ্বর্য কিন্তু কোনোদিন সে আলজাইকে ভুলতে পারেনি।
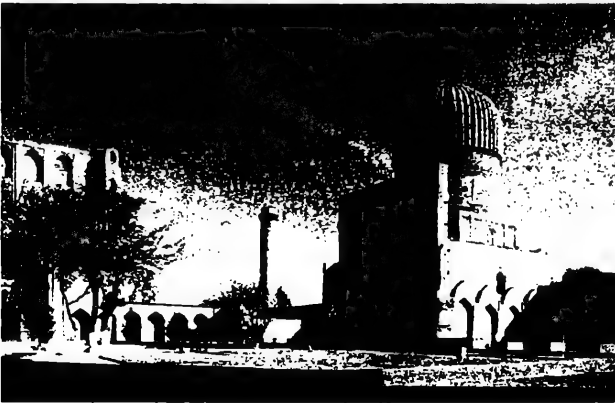
বিবি খানুম নামের এক মসজিদ এখনো দাঁড়িয়ে আছে উজবেকিস্তানে। আলজাইয়ের প্রেমিকের ভালোবাসার নিশানা হয়ে।

সবচেয়ে নিষ্ঠুর মানুষটাও কোনো এক দিন প্রেমিক ছিল। এমনকি যদি তার নাম আমির তাইমুর হয়ে থাকে, তাও।

এক

আলজাইয়ের মৃত্যুর পর তাইমুরকে ক্ষমতা আর রাজ্য বিস্তারের নেশা পেয়ে বসে। এর আগে তিনি চাঘাতাই খানাতের আমির হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলজাইয়ের মৃত্যুর পর তার জীবনের লক্ষ্য হয় একটাই- নতুন রাজ্য জয়; তা যত মানুষের জীবনের বিনিময়েই হোক না কেন। ১৩৬৭ সাল থেকে শুরু হওয়া তাইমুরের এই রাজ্য বিস্তারের মহা অভিযানে পরবর্তী ত্রিশ বছরে তিনি জয় করে নেন পুরো মধ্য এশিয়া, ইরান, খোরাসান, উত্তর ভারত, উত্তরের মহাসাম্রাজ্য গোল্ডেন হোর্ড (কিপচাক খানাত) এবং ইরাক ও সিরিয়া।
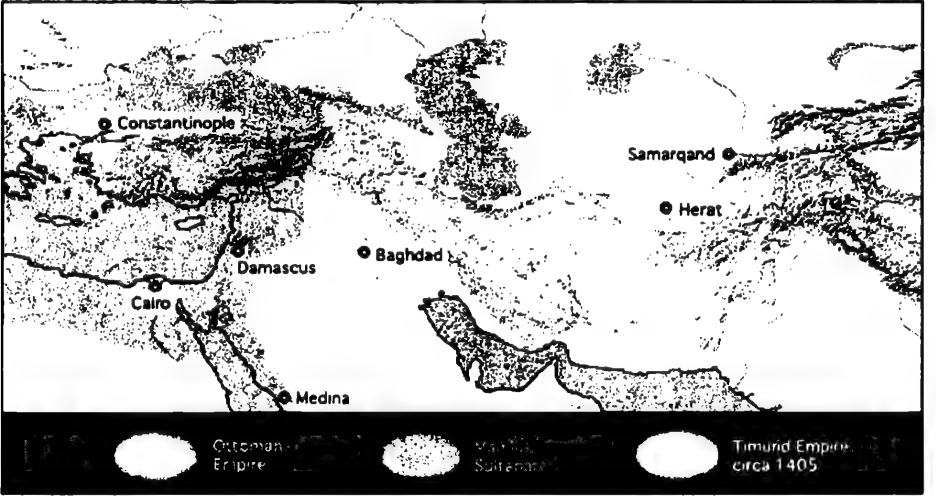
১৪০০ সালে তাইমুরি সাম্রাজ্য, উসমানি সালতানাত ও মামলুক সালতানাতের মানচিত্র।

তাইমুর নিজেকে বিবেচনা করতেন চেঙ্গিজ খানের উত্তরসূরি হিসেবে। সত্যি বলতে তিনি চেঙ্গিজ খানের জয় করা ভূখণ্ডের দুই তৃতীয়াংশই নিজের পতাকাতলে নিয়ে এসেছিলেন। কিপচাক খানাত, চাঘাতাই খানাত এবং ইলখানাত।

সিরিয়ায় মামলুকদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তার সাথে সুলতান বায়েজিদের যে দ্বৈরথ সৃষ্টি হয়, তা তিনি এড়াতে চেয়েছিলেন। তুর্কিদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে তার ভালোই ধারণা ছিল। কিন্তু তাইমুরের বিশ্বজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়েও বায়েজিদের কটূক্তি তাইমুরকে আনাতোলিয়ায় ডেকে আনে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অনিবার্য হয়ে উঠল দুই মহাবীরের সংঘাত।

দুই

অটোমান সালতানাতে তখন দানা বেধে ওঠেছে অস্থিরতা।

অতি তাড়াহুড়োর ফলাফল কখনোই ভালো হয় না।

কথাটা সুলতান বায়েজিদ বোঝেননি। যে গাজিদের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে অটোমান সালতানাত ছোট্ট একটা গোত্র থেকে ধীরে ধীরে একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিল, নিকোপলিসের বিজয়ের পর তা ভুলে গিয়েছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বায়েজিদ।

একদিকে কারামানের প্রিন্স, ওদিক থেকে ফ্রান্সের চার্লস, স্পেনের কাস্তিলার রাজা ফিলিপ আর বাইজান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল তাইমুরকে চিঠি লিখলেন, তিনি যেন বায়েজিদকে আক্রমণ করেন।

এসব ঘটনাই ঘটেছিল ১৩৯৯ সালের গোড়ার দিকে, যখন তাইমুর আর্মেনিয়া, আজারবাইজান আর সিরিয়া জয় করে ভাবছেন আর কী করা যায়। কারণ, এশিয়াতে তার সাথে লড়াই করার মতো আর কেউ বাকি ছিল না।

এই সময়েই বায়েজিদের অপমানজনক চিঠি তার মাথায় খুন চড়িয়ে দিল। তিনি অটোমান সাম্রাজ্য আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তাইমুর জানতেন এই যুদ্ধে যেকোনো ফলাফলই হতে পারে। তাই তিনি ঝুঁকি নিলেন না। তার চারজন স্ত্রীর বাইরেও ছিল কয়েকজন উপপত্নী, অসংখ্য দাসী। এদের কাউকেই এবার তিনি সাথে নিলেন না।

আলজাইয়ের পর তাইমুরের জীবনে ভালোবাসার মানুষ বলতে যা বোঝায়, সেটা ছিলেন বিবি সারাই মুলক খানুম।

তাইমুর মনের ভেতর প্রচণ্ড রোষ নিয়ে আগাতে লাগলেন। তার বেগমের শ্লীলতাহানির হুমকি দিয়েছে যে, তাকে তিনি ছাড়বেন না।

এই ক্রোধ মঙ্গোলিয়ান ক্রোধ। সাথে মিশেছে তাতারিদের একরোখা মানসিকতা। সৈন্যদের নিয়ে তাইমুর বেরিয়ে পড়লেন। তার মনে কোনো সংশয়ই ছিল না যে তিনি এবার জীবনের সেরা যুদ্ধটা লড়তে যাচ্ছেন।

আনাতোলিয়াতে অপেক্ষা করছে মাটির বুকে হাঁটা তার একমাত্র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

তিন

অগ্রবাহিনী হিসেবে তাইমুর আগেই পাঠিয়ে দিলেন নিজের প্রিয় নাতি মুহাম্মাদ সুলতানকে। মুহাম্মাদ সুলতান তুর্কি শহর শিভাসের গভর্নরকে পরাজিত করে শিভাস দখল করে নিলেন।

ওদিক দিয়ে তার দূত ছুটল সোজা ভারতের দিকে। ভারত তখন তাইমুরের আরেক নাতি পীর মুহাম্মাদের দখলে। পীর মুহাম্মাদকে তিনি লিখে পাঠালেন, তিনি যেন দ্রুত তার বাহিনী এবং অন্তত পঞ্চাশটি হাতি নিয়ে আনাতোলিয়ার দিকে রওনা দেন।

এরপর নাতি খলিল সুলতানকে সমরকন্দ থেকে ডেকে পাঠালেন তাইমুর। সাথে মিরন শাহকেও আনা হলো। তাইমুরের উন্মাদ এই ছেলে জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিকই ছিল। যুদ্ধের ময়দানে সে ছিল বিপজ্জনক।

সবশেষে আমির তাইমুর তার আদরের দুলাল শাহরুখ মির্জাকে খবর দিলেন, তিনি যেন দশ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে দ্রুত শিভাসের দিকে আসেন।

তাইমুর যত দিন জীবিত ছিলেন, তার আদেশ ছিল নিয়তির মতোই অমোঘ।

একসাথে ঘোড়া ছোটালেন তার ছেলে আর নাতিরা। ভারত থেকে পীর মুহাম্মাদ সত্তর হাজার যোদ্ধা নিয়ে ছুটলেন, সাথে একশোর কাছাকাছি হাতি।

খোরাসান থেকে শাহরুখ বেরুলেন দশ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে। সাথে নিলেন প্রচুর ন্যাপথালিন আর গান পাউডার। তাবরিজ থেকে রওনা হলেন মিরন, সাথে ষাট হাজার সেনা আর প্রচুর রসদ।

তাইমুরের নিজের সাথে ছিল প্রায় দুই লাখ যোদ্ধার দানবীয় বাহিনী। এর সাথে সমরকন্দ থেকে এসে যোগ দিলেন খলিল সুলতান। এরা যখন শিভাসে মুহাম্মাদ সুলতানের সাথে মিলিত হলেন, তখন এই বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল আনুমানিক চার লাখ থেকে আট লাখের মধ্যে। আজ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি, এই যুদ্ধে তাইমুরের বাহিনীর মোট সংখ্যা ঠিক কত ছিল।

এই রকম দক্ষযজ্ঞ প্রস্তুতি নিয়ে যখন তাইমুর আসছেন, তখন রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা হয়ে আছেন বায়েজিদ। গাজিরা তখন তার বিরুদ্ধে চরমভাবে ক্ষুব্ধ।

চার

গাজিদের না পেয়ে তাইমুরের অগ্রগতির খবর শুনে বায়েজিদ ওয়ালাসিয়ানদের ডেকে পাঠালেন। ওয়ালাসিয়া থেকে দশ হাজার লাইট ক্যাভালরি এল। সার্বিয়া থেকে স্টিফেন লাজার এলেন বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে। এদের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার নাইট ছিলেন।[১]

---

১. Robinson, F ed., 1996 The Cambridge illustrated history of the Islamic world Cambridge University Press

এরপর নিজের অনুগত বাহিনীকে একত্র করলেন বায়েজিদ। এই বাহিনীর একটা বড় অংশই ছিল পদাতিক। যেখানে অটোমানদের মূল শক্তি ছিল অশ্বারোহী বাহিনী, সেখানে গাজিদের অধিকাংশ না আসাতে তাদের পদাতিক বাহিনী নিয়েই এগোতে হলো।

তবুও এই বাহিনী ছিল ভয়ংকর। তৎকালীন দুনিয়ার সেরা ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট জানিসারি ছিল অটোমানদেরই। সেই সাথে ছিল শক্তিশালী কাপিকুলু ডিভিশন, যারা কসোভো আর নিকোপলিসে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

শেষ মুহূর্তে বায়েজিদ আরও কিছু ঘোড়সওয়ার পেয়ে গেলেন। এরা তাতার। ক্রিমিয়া থেকে এসেছে।

সব মিলিয়ে বায়েজিদের বাহিনীর আকার দাঁড়াল এক লাখ বিশ হাজার থেকে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজারের ভেতর। এই বাহিনীর চার ভাগের এক ভাগই ছিল তাতাররা।

জগতের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা একে অপরের গর্দান নেয়ার জন্য এগোচ্ছেন।

একজনের অধীনে দুনিয়ার সেরা ক্যাভালরি, আরেকজনের অধীনে সেরা ইনফ্যান্ট্রি। একজন ডিফেন্সিভ ওয়ারফেয়ারে চ্যাম্পিয়ন, আরেকজন অ্যাটাকিং ওয়ারফেয়ারের কিংবদন্তী।

দুনিয়ার সবচেয়ে একরোখা জাতিগুলোর মধ্যে দুটি, তুর্কি আর তাতাররা মুখোমুখি সংঘর্ষে এগোচ্ছে, প্রাচীন তাতার প্রবাদের মতোই।

সে প্রবাদে লেখা-'মানবজাতির পথ একটাই, যুদ্ধ'।

পাঁচ

মধ্য এশিয়া থেকে আসা বৃদ্ধ নিজের ছেলের সাথে দাবা খেলছেন। তিনি চিন্তিত। ছেলে মনে হচ্ছে জিতে যাবে।

তার দুটো ঘোড়া আর কয়েকটি সিপাহী ছাড়া সব শেষ। ছেলের ছয়টা সিপাহী, দুইটা নৌকা। জেতার সম্ভাবনা ছেলেরই বেশি।

দাবার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন প্রবীণ দাবাড়ু। খেলা বন্ধ করে তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে সবাইকে জড়ো হবার আদেশ দিলেন।

এই দাবা খেলোয়াড়ের নাম আমির তাইমুর গুরিগান। নিন্দুকেরা অবশ্য ডাকতো তাইমুর লং। তবে তার সামনে এই নাম উচ্চারণের সাহস কখনো কারও হয়নি।

তাইমুর মানে লোহা। বাস্তবে তিনি ছিলেন লোহার মতোই কঠিন।

তাইমুরের ডাকে তাঁবুর সামনে একে একে হাজির হলেন তার বাহিনীর আমিররা।

তাইমুর ঘোষণা দিলেন, 'আমাদের বাহিনীর পুরোটাই সওয়ার দিয়ে গড়া, আমরা তাই শত্রুর চেয়ে দ্রুত চলতে পারব। আমার কাছে খবর এসেছে, বায়েজিদ তার বাহিনী নিয়ে এদিকেই আসছে। আমরা দ্রুত মার্চ করে সামনে এগিয়ে যাব এবং তাকে এমন জায়গাতে হামলা করব, যা হবে আমাদের ঘোড় সওয়ার বাহিনীর জন্য উপযুক্ত। সেখানে থাকতে হবে পানি, মাটি হতে হবে সমতল। বায়েজিদের পদাতিকরা আমাদের পেছন ধাওয়া করে করে ক্লান্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কেবল তখনই তাকে আমরা আক্রমণ করব। আমাদের ফৌজ একটু পরেই রওনা হবে, সবাই যার যার ঘোড়ায় সওয়ার হও।'

সাতষট্টি বছর বয়সী তাইমুর দ্রুত প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

দাবা খেলার সময় শাহরুখের সিপাহীদের চেয়ে তার ঘোড়ার বেগ বেশি ছিল। কারণ, দাবার বোর্ড সমতল। পাহাড়ী অঞ্চলে ঘোড়া সিপাহীদের সাথে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা যেত না।

শাহরুখের নৌকা দেখে তার মনে হয়েছে পানি না থাকলে নৌকা অচল হয়ে যাবে। তাই এমন জায়গাতে যুদ্ধ করতে হবে, যেখানে তুর্কিরা তাদের নৌযানে করে রসদ না আনতে পারে।

সিভাসের পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণের দুর্গম গিরিপথ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাইমুর। তাকে পথ দেখাচ্ছিলেন একজন গাজি আমির। নাম হুসাইন গাজি।

বায়েজিদের ছেলে সুলেইমান পরদিন এসে দেখলেন তাইমুরের ক্যাম্প পরিত্যক্ত। তারা কোথায় গেছেন, তা বোঝার কোনো উপায় নেই। পাহাড়ের পাথুরে গায়ে কারও পায়ের ছাপ পড়ে না।

ছয়

বায়েজিদের দরবার।

সুলতান বায়েজিদ, তার সেনাপতি ও উজিররা যুদ্ধের স্ট্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করে একমত হলেন, তাইমুর অবশ্যই খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে চাইবেন, যেখানে মাটি সমতল, প্রচুর পানি আছে। কারণ, তার পুরো বাহিনীই ঘোড়সওয়ার। সমতল ভূমি আর পানি ছাড়া এই বাহিনী অচল।

তারা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন, তাইমুর আনকারা বা তার আশেপাশে কোথাও যুদ্ধ করতে চাইবেন।

সিদ্ধান্ত হলো, বায়েজিদের বাহিনী আনকারার কাছেই যে জুবুক খাল আছে, তা দখল করে নিয়ে ক্যাম্প সাজাবেন।

বায়েজিদ ইয়িলদিরিম-দ্যা থান্ডারবোল্ট এবার তার বাহিনীকে মার্চিং অর্ডার দিলেন। অ্যাড্রিয়ানোপল থেকে আনকারা পৌছতে তাদের ছয় দিন লাগল। সাধারণত যেটা পনেরো দিনের পথ।

আনকারাতে পৌছে খুব সতর্কভাবে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে চাঁদ তারার ক্লাসিক্যাল ইসলামিক ফরমেশনে তাঁবু সাজালেন বায়েজিদ। তাঁবুগুলোর একপাশে বয়ে গেছে মিষ্টি পানির খাল জুবুক।[২]

তার কাছে খবর এল, সুলেইমান পাশা তাইমুরের বাহিনীকে খুঁজে পাচ্ছেন না। সিভাস খালি। তার মানে ওরা পশ্চিমে বেরিয়েছে, এখানে ওদের আসতেই হবে, ভাবলেন তিনি।

হঠাৎ তার মাথায় একটা জিনিস খেলে গেল।

আনকারা থেকে সিভাস পর্যন্ত আছে বিস্তীর্ণ ফসলের খেত আর গ্রাম। এগুলো তাইমুরের হাতে পড়া মানে তার প্রজাদের রক্তে আনাতোলিয়া লাল হয়ে যাওয়া।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সামনে এগিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলেই তাইমুরকে থামাবেন।

আবার পরামর্শ সভা বসল।

কেউই বায়েজিদের সাথে একমত হলেন না। জুলাই মাসের গরমে আনাতোলিয়ার তপ্ত সমভূমি দিয়ে দশ দিন সফর করে তাইমুরকে আক্রমণ করতে যাওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ না। বায়েজিদ পাল্টা যুক্তি দেখালেন, 'যদি আমরা পার্বত্য অঞ্চলে ওদের হামলা করতে পারি, ওরা যুদ্ধই করতে পারবে না। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলে তাতাররা আমার বাহিনীর সামনে মাছিও না।'

পার্বত্য অঞ্চলের দিকে আগানোর সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত নেয়া হলো, বায়েজিদের জোরাজুরিতে।

সাত

পাকা ঘুঘুর মতো তাইমুর দ্রুতগতিতে কিন্তু নিঃশব্দে এগোচ্ছেন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে কিজিলার্মাক নদী ঘেঁষে।

ছয় দিন তার বাহিনী একটানা দক্ষিণ-পশ্চিমে মার্চ করে বায়েজিদকে এড়িয়ে কায়সারিয়া পৌছে হুট করে কায়সারিয়া দখল করে নিল। তারপর কায়সারিয়ার আশেপাশের সব জমির ফসল কেটে নিল চার দিন ধরে। খাবার নিয়ে তাদের আর কোনো চিন্তা নেই।

---

২. Dincer. T., 2002. Did the diverson of a small water course change the course of the history?. Eos. Transactions American Geophysical Union. 83(31). pp.333-338.

চার দিনের মাথায় উত্তর-পশ্চিমে ঘোড়া চালালেন তাইমুর। তার স্কাউটরা খবর এনেছে, আনকারার ক্যাম্প খালি করে দিয়ে আরারাত পর্বতের দিকে গেছেন বায়েজিদ।
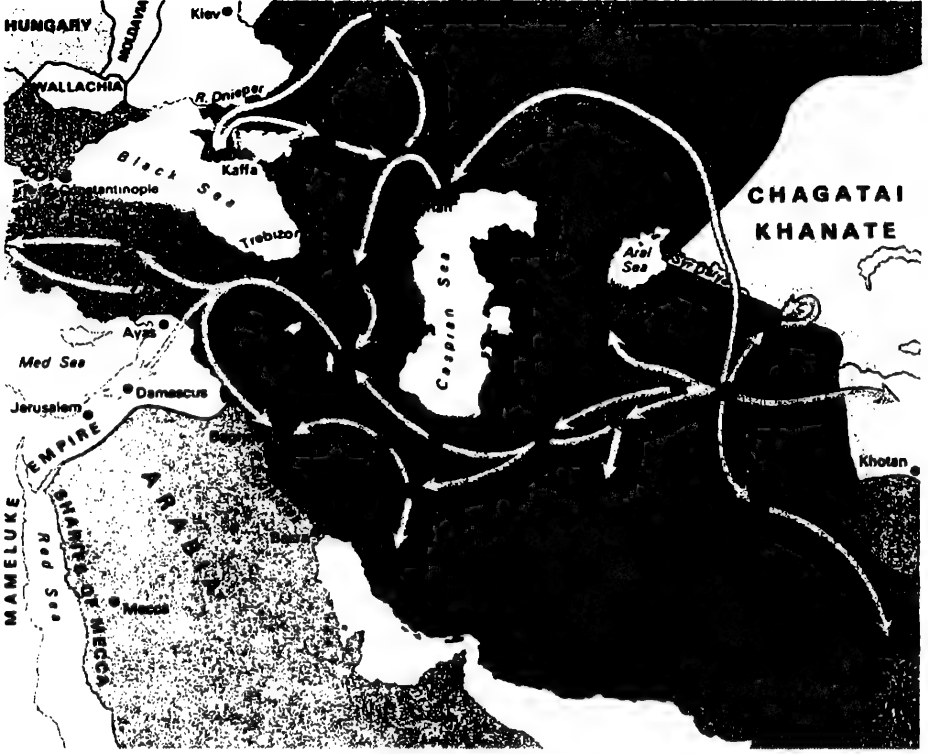
মধ্য এশিয়া থেকে ইরান হয়ে আনাতোলিয়ায় প্রবেশ করেন তাইমুর, সোজা পথে আনাতোলিয়ায় না ঢুকে তিনি দুর্গম টরাস পর্বতমালা টপকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বায়েজিদকে বিভ্রান্ত করে আনকারায় অবস্থান নেন।

তিন দিনের মাথায় আনকারা পৌঁছাল তাতার বাহিনী। পেয়ে গেল বায়েজিদের বিল্ট ইন ক্যাম্প, সাথে পানির মজুদ।

তাইমুরের একটা মুভে এবার যুদ্ধের চাল বদলে গেল।

জুবুক খালে বাঁধ দিয়ে একরাতের মধ্যে তিনি খালের পানির স্রোত উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। পূর্বদিক থেকে আসা তুর্কি বাহিনী এবার এক ফোঁটা পানিও পাবে না।

দাবা খেলোয়াড়ের সহজাত প্রবৃত্তি তাইমুরকে আরেকবার সতর্ক করে দিল।

তিনি একটা নকল খাল কাটলেন। যাতে ফেরার পথে বায়েজিদ আগেই টের পেয়ে না যান যে, তাইমুর তার ক্যাম্প দখল করে বসে আছেন।

সেই খালের পানিতে আগের খাল থেকে মাছ ধরে ছেড়ে দেয়া হলো।

তখনো বায়েজিদ সিভাসের কাছে ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত। তাইমুরকে হারানো উপলক্ষ্যে আগাম ভোজের ইন্তেজাম হচ্ছে তুর্কি শিবিরে। যখন তিনি তাইমুরের আনকারার দিকে আগানোর খবর পেলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দ্রুত অটোমান বাহিনীকে প্রস্তুত করে আনকারার দিকে আগালেন বায়েজিদ। ততক্ষণে আনকারা অবরোধ করে বসে আছেন তাইমুর।

আট দিন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মার্চ করে আনকারাতে পৌঁছলেন বায়েজিদ। পৌঁছে দেখলেন পানি নেই। নকল খালটাও বাঁধ দিয়ে বুজিয়ে ফেলেছেন তাইমুর।

তুর্কি বাহিনীর রেখে যাওয়া স্ট্র্যাটেজিক্যালি অসাধারণ ক্যাম্পটাও পড়েছে তাইমুরের হাতে। তারই ফেলে যাওয়া তাঁবুতে এখন আরাম করছেন তাইমুর।

অগত্যা যুদ্ধের ময়দানের উত্তরে থাকা ছোট একটা ঝরনাতে পানির জন্য গেলেন বায়েজিদের ভলান্টিয়াররা। রাতে সেই পানি খেয়ে অনেক সিপাহীর পেট খারাপ হলো।

ঝরনার পানিতে বিষ দিয়ে রেখেছিলেন তাইমুর।[৩]

রোদে পোড়া, পিপাসার্ত, আধমরা এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাইমুর গুরিগানের সামনে দাঁড়িয়েছেন বায়েজিদ। তাকে এখন এখানেই যুদ্ধ করতে হবে। কালকের ভেতর পানির ব্যবস্থা করতে না পারলে তার সৈন্যরা বাঁচবে না।

---

৩. প্রাগুক্ত(২)

এক

২৮ জুলাই, ১৪০২। বেলা দশটা।

প্রচণ্ড গরমে পুড়ে যাচ্ছে চারপাশ।

বায়েজিদ চেয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের উঁচু-নিচু ভূমিতে তাইমুরের ক্যাভালরিকে অচল করে দিয়ে যুদ্ধ করতে। কিন্তু চালে ভুল করে ফেলেছিলেন তিনি। ঘোরাপথে তাইমুর ইউটার্ন নিয়ে দখল করে নিয়েছিলেন বায়েজিদের ক্যাম্পসহ যাবতীয় লজিস্টিক বেস।

পানির পিপাসাতে মুমূর্ষু বাহিনী নিয়ে নিরূপায় বায়েজিদ তাইমুরের ছকে যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। আর কোনো উপায়ই ছিল না তার।

যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই বাহিনী।
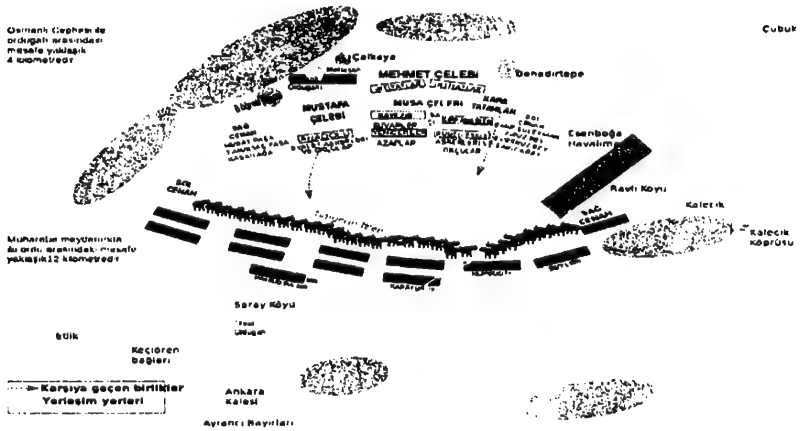
ম্যাপের দক্ষিণে মুহাম্মাদ সুলতানের নেতৃত্বে তাতার বাহিনী, তাইমুর আছেন মূল বাহিনী থেকে অনেক পেছনে। উত্তরে সুলতান বায়েজিদের নেতৃত্বে উসমানি সেনাবাহিনী।

তাইমুরের বাহিনীর ডান বাহুতে আছে শাহজাদা মিরন শাহ। তার অধীনে হেভি ক্যাভালরি কোর। মিরন শাহের ঠিক ভেতরের দিকে আনাতেলিয়ার লাইট ক্যাভালরি।

আনাতোলিয়ার বাহিনীর আরও বামে, সেনাবাহিনীর রাইট সেন্টারে তাইমুরের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি নুরুদ্দিন।

নুরুদ্দিনের পাশে আছেন দুই দুর্ধর্ষ লাইট ক্যাভালরি আর্চার কোরের জেনারেল আবু বকর আর উসমান। বাহিনীর ঠিক কেন্দ্রে আছেন তাইমুরের নাতি পীর মুহাম্মাদ। তার সামনে দাঁড় করা আছে ভারত থেকে আনা হাতির সারি।

পীর মুহাম্মাদের একটু পেছনে হেভি ক্যাভালরি কোর নিয়ে বাহিনীর মূল অংশের অধিনায়ক হয়ে আছেন তাইমুরের সবচেয়ে প্রিয় নাতি মুহাম্মাদ সুলতান।

মুহাম্মাদের পেছনে রিজার্ভ ফোর্সের দায়িত্বে আছেন ইস্কান্দার শাহ। তার আরও বামে লেফট উইংয়ে রিজার্ভ ফোর্সের দায়িত্বে সুলেইমান শাহ। লেফট উইংয়ের দায়িত্বে আছেন খলিল সুলতান আর শাহরুখ মির্জা।

এই বাহিনীর মোট সংখ্যা ছয় লাখ।

বাহিনীর অনেক পেছনে একটা গিরিপথে চল্লিশজন দেহরক্ষী নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাইমুর।

ওদিকে অর্ধচন্দ্রের মতো ফরমেশন সাজিয়ে আগাচ্ছেন বায়েজিদ।

বাহিনীর একদম সামনে লাইট ইনফ্যান্ট্রি আর্চার আজব ডিভিশন। এদের অধিনায়ক শাহজাদা ঈসা। তাদের ঠিক পেছনে বাহিনীর কেন্দ্রে জানিসারি বাহিনী, এলিট ইনফ্যান্ট্রি কোর, জানিসারিদের অধিনায়ক হাসান আগা।

জানিসারিদের ঠিক পেছনে কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি ডিভিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং বায়েজিদ। বাহিনীর ডানে সার্বিয়ান প্রিন্স স্টিফেন বালকোভিচেজে হেভি ক্যাভালরি কোর। সাথে আছে ফিরোজ পাশা, এনভারেজ পাশা আর জাবিক পাশার আনাতোলিয় বাহিনী। পুরোটাই মিডিয়াম ইনফ্যান্ট্রি।

লেফট সেন্টারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুস্তাফা জালেবি, তার পেছনেই বাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন মুসা জালেবি, দুই শাহজাদা। লেফট উইংয়ের দায়িত্বে আছেন শাহজাদা সুলেইমান পাশার লাইট ক্যাভ্লরি কোর, তিমুরিতাস পাশা, মুরাদ পাশার রুমেলিয়ার ক্যাভালরিরা।

বাহিনীর একদম পেছনে সুলতানের ছোট ছেলে শাহজাদা মুহাম্মাদ নিজের ভ্যানগার্ড ক্যাভালরি রিজার্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

দুই

যুদ্ধ শুরু হলো।

প্রথমেই অটোমানদের রাইট উইং দিয়ে স্টিফেনের সার্বিয়ান হেভি ক্যাভালরি জোরদার হামলা চালাল তাতারদের লেফট উইংয়ে থাকা খলিল সুলতানের ওপর। খলিল কয়েক

মিনিটের মধ্যে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিছু হটলেন। সামনে এগোলেন তাইমুরের শাহজাদা শাহরুখ মির্জা। স্টিফেন শাহরুখের বাহিনীকেও কেয়ার করলেন না। তার নাইটরা শাহরুখের লাইট ক্যাভালরি লাইন ভেদ করে তাইমুরের ফরমেশনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করলেন তাইমুরের আরেক নাতি শাহজাদা মুহাম্মাদ সুলতান। তিনি মূল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এসে কোনোমতে স্টিফেনকে ঠেকালেন। রিট্রিট করলেন স্টিফেন, আগে বাড়ল অটোমানদের আজব ইনফ্যান্ট্রি কোর।

লেফট উইংয়ে বায়েজিদের নির্দেশে হামলা চালালেন শাহজাদা সুলেইমান। তাইমুরের ছেলে মিরন শাহ সুলেইমানের সাথে প্রায় তিনগুণ সৈন্য নিয়েও তাল মেলাতে না পেরে পিছু হটে গেলেন। ঠিক এই সময়ে ঘটল এক অঘটন। সুলেইমানের বাহিনীতে থাকা তাতাররা যুদ্ধের মধ্যেই দল বদল করে যোগ দিল তাইমুরের সেনা প্রধান নুরুদ্দিনের সাথে। এক ঝটকায় চারভাগের এক ভাগ সৈন্য হারালেন বায়েজিদ।[১]

এই সুযোগ কোনোমতেই নষ্ট করলেন না নুরুদ্দিন। তার হেভি ক্যাভালরি কন্টিনজেন্ট সুলেইমানের বাহিনীকে একদম পিষে ফেলল। ১২টা থেকে ১টা, এই এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার অটোমান জবাই হয়ে গেল নুরুদ্দিনের বাহিনীর হাতে। তাকে ঠেকাতে বায়েজিদের ছোট ছেলে মুহাম্মাদ নিজের লাইট ইনফ্যান্ট্রি নিয়ে ছুটে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। মুহাম্মাদের একমাত্র চেষ্টা ছিল তখন, কোনোভাবেই যেন নুরুদ্দিন অটোমান ফোর্সের পেছন দিকে পৌঁছে তার বাবাকে আক্রমণ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

ডান দিকে আবারও বীর বিক্রমে এগোলেন স্টিফেন। তাতারি তীরন্দাজদের তীর তার সৈন্যদের বর্মে লেগে আটকে যাচ্ছিল। খলিল সুলতানের বাহিনীর বারোটা বাজিয়ে তিনি শাহরুখকে ঘেরাও দিয়ে ফেলছেন। এমন সময় তাইমুরের আদেশে পুরো তাতার সেন্টার নিয়ে স্টিফেনের ওপর চড়াও হলেন বীর যোদ্ধা মুহাম্মাদ সুলতান। ওদিকে পীর মুহাম্মাদের হাতিগুলের পিঠ থেকে একের পর এক গান পাউডার মাখানো গোলা মারা হচ্ছিল স্টিফেনের যোদ্ধাদের দিকে। বেশিক্ষণ টিকতে পারল না সার্বিয়ানরা। রাইট উইং কমান্ডার মুরাদ পাশা এবং তিমুরিতাস পাশার লাশ রেখে তারা পিছু হটে গেল। এবার ডান দিকে মুহাম্মাদ সুলতান আর বাম দিকে নুরুদ্দিন ফ্রি স্পেস নিয়ে একসাথে হামলা চালালেন বায়েজিদের সেন্টারের ওপর।

জানিসারি প্রধান হাসান আগা, শাহজাদা মুস্তাফা, শাহজাদা ঈসা আর মুসা মিলে কাতারের পর কাতার তাতারদের লাশ ফেলছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারা বুঝতে পারলেন, তাদের শক্তি শেষ হয়ে এসেছে।

---

[১]. Tucker, Spencer (2010). "Battle of Ankara". Battles that Changed History: An Encyclopedia of World Conflict. ABC-CLIO. pp. 139–141. ISBN 978-1-59884-429-0.

বায়েজিদের মধ্যে এবার এক হিংস্র পিতার চেহারা ফুটে ওঠল। স্টিফেন বুঝে গিয়েছিলেন যে, তাতারদের এই তাজাদম বিশাল বাহিনীর সাথে আধমরা ফৌজ, তাও সংখ্যায় ছয় ভাগের এক ভাগ নিয়ে কোনোভাবেই অটোমানরা জিততে পারবে না। তিনি সুলতানকে পিছু হটতে বললেন।

কিন্তু বায়েজিদ ভাবছিলেন তার ছেলেদের কথা। তিনি পিছু হটে গেলে তার ছেলেদের একজনও বাঁচবে না তাতারদের হাত থেকে।

বেপরোয়া বায়েজিদ তার কাপিকুলু কোর নিয়ে প্রচণ্ড হামলা চালালেন। পীর মুহাম্মাদ ও নুরুদ্দিন তখন বায়েজিদের বড় ছেলে সুলাইমানকে সামলাতে ব্যস্ত। ওদিকে বায়েজিদ শাহজাদাদের পালাতে বলে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাইমুরের সেন্ট্রাল ফোর্সের দুই কমান্ডার আবু বকর, উসমান আর মুহাম্মাদ সুলতানের ওপর।

ডান দিকে শেষ আঘাত হানলেন স্টিফেন। এবারেও তিনি খলিল সুলতানের বাহিনীকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন অনেক দূর। কিন্তু আবারও সেই আগুনে গোলা তার অশ্বারোহীদের থামিয়ে দিল। এবার মুহাম্মাদ সুলতানের পাল্টা প্রতিক্রিয়াতে পালাতে বাধ্য হলেন স্টিফেন। কিন্তু সাথে নিয়ে গেলেন তাইমুরের জেনারেল আমির জালালের প্রাণ।

বায়েজিদ, হাসান আগা, হামজা পাশা, গাজি বে এভ্রেনোস আর মুস্তাফা অমানুষিক বীরত্ব দেখিয়ে লাশের দেয়াল বানিয়ে ফেললেন তাইমুরের বাহিনীর অগ্রভাগে। তাদের বীরত্বের মুখে তাইমুরের সেন্টার সব ধরনের সামরিক সুবিধা পাওয়ার পরেও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

কিন্তু খেলা তখনো বাকি। মূল বাহিনীর অবস্থা খারাপ দেখে রিজার্ভ থেকে এক লাখ তাজাদম ফৌজ ময়দানে নামালেন তাইমুর।

এবার পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেল।

ক্লান্ত, পিপাসার্ত বায়েজিদের সৈন্যরা আর পারছিল না।

তলোয়ারের ঘায়ে, আগুনের গোলায় যারা মরেনি, তারা একে একে পানির পিপাসায় মরতে লাগল। এবার পীর মুহাম্মাদ (তাইমুরের নাতি যিনি বাহিনীর সামনের দিকের নেতৃত্বে ছিলেন) তার হাতিগুলোকে চালিয়ে দিলেন জানিসারিদের বুকের ওপর দিয়ে।

জানিসারিরা হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হতে লাগল তাদের সুলতানকে বাঁচাতে গিয়ে। আজব ডিভিশনগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। দলে দলে পালাতে লাগল সিপাহিরা।

জানিসারিদের কয়েকটা দুঃসাহসী ইউনিট বর্শা মাটিতে গেড়ে লাফিয়ে হাতির পিঠে উঠে হাতি মারতে লাগল।

বায়েজিদের কুঠারের আঘাতে এক এক করে উড়ে গেল তাইমুরের সেনাপতি আবু বকর, মালিক শাহ আর সুলেইমান শাহের মাথা।

নুরুদ্দিন আর মিরন শাহ এবার পীর মুহাম্মাদকে নিয়ে পুরো বাহিনী চালিয়ে দিলেন বায়েজিদের মূল বাহিনীর ওপর। বন্দি হলেন মুস্তাফা। হাতির শুঁড়ে পেঁচিয়ে জীবন দিলেন হাসান আগা।

শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছিলেন এই জানিসারি কমান্ডার।

শেষ পর্যন্ত মাত্র তিন শ সিপাহী নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেলেন বায়েজিদ, কিন্তু তিনি ঘেরাও হয়ে গেলেন এক লাখের বেশি তাতারের মাঝে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কুঠারের আঘাতে এক শত এর বেশি তাতার সৈন্য নিহত হলো, কিন্তু বায়েজিদকে থামানো গেল না।

তিন

সন্ধ্যার ঠিক পর পর।

বায়েজিদের ঘোড়া তাতারদের তীরে আহত হয়ে মারা গেল। বন্দি হলেন বায়েজিদ।

বায়েজিদ পাশার সাহায্যে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে পেরেছিলেন মুসা ও মুস্তাফা ছাড়া বাকি সব শাহজাদা।

পিছু হটে গিয়েছিলেন স্টিফেন বালকোভিৎজও। কিন্তু তার আগে তিনি নিভিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন আরেকটি অতি মূল্যবান জীবন প্রদীপ। ভয়ংকরভাবে আহত হন তাইমুরের সবচেয়ে প্রিয় নাতি মুহাম্মাদ সুলতান। এই আঘাতেই পরে তার মৃত্যু হয়।

বন্দি বায়েজিদকে তাইমুরের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। তার সারা দেহে ছিল তাতারদের রক্ত।

নিজের জীবনের বিনিময়ে বায়েজিদ তার ছেলেদের রক্ষা করেছিলেন। আর তাইমুর যুদ্ধে জিতলেন ঠিকই কিন্তু হারালেন নিজের একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ সুলতানকে।

যুদ্ধ কাউকে ছাড়েনি।

নব্বই হাজার অটোমানের সাথে আনকারার ময়দানে পড়েছিল এক লাখ তাতারের লাশ।

চার

বায়েজিদকে বেঁধে নিয়ে আসা হলো তাইমুরের তাঁবুতে।

সেখানে শাহরুখের সাথে দাবা খেলছিলেন বৃদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী।

টানা এক দিন ধরে মুখে এক ফোঁটা পানি না দেয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত অবসন্ন বায়েজিদের দিকে তাকিয়ে উপহাসের হাসি দিলেন তাইমুর। জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধাকে যুদ্ধে হারিয়ে দারুণ আনন্দ হচ্ছিল তার।

এই হাসি সইতে পারছিলেন না বায়েজিদ। পরাজিত হয়েও তার রাজকীয় স্বভাব ছিল অক্ষুণ্ন।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি তাইমুরকে বললেন, 'আল্লাহ যাকে মেরেছেন, তাকে নিয়ে উপহাস করা আপনার সাজে না।'

তাইমুর জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কী অদ্ভুত খেলা, তিনি আমার মতো খোঁড়া আর তোমার মতো অন্ধকে দুনিয়ার বাদশাহী দান করেছেন।'

তাইমুরের এই কথার জবাব বায়েজিদ দিলেন না। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উসমানের সন্তানেরা আল্লাহ ছাড়া কারও সামনে মাথা নোয়াতে অভ্যস্ত না।

তাইমুর বললেন, 'শোন বায়েজিদ, তোমাকে এখানে কোনো প্রকার অসম্মান করা হবে না। আমার লোকেরা তোমাকে যথাযথ সম্মানের সাথে আপ্যায়ন করবে। এখন গিয়ে বিশ্রাম নাও। যদিও আমি জানি, তুমি এই যুদ্ধে জিতলে আমার এবং আমার লোকদের কী হাল করতে। তবুও তোমার কোনো রকম অমর্যাদা আমি করব না। মানি লোকের সমাদর আমির তাইমুর করতে জানে।'

বায়েজিদকে একটি সুন্দর তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো।

ওদিকে তাইমুরের বাহিনী ঝড়ো হাওয়ার বেগে পৌঁছে গেল বুর্সাতে।

সেখানে তারা বন্দি করল বায়েজিদের আরেক ছেলে মুসাকে। আগেই বন্দি হয়েছিলেন আরেক শাহজাদা মুস্তাফা। সুলেইমান, মুহাম্মাদ আর ঈসা পালিয়ে গেছিলেন বসফরাসের ওপারে, ইউরোপে।[২]

তাইমুরের সেনাপতি নুরুদ্দিন ব্ল্যাক সির তীরের নগরী, নাইটদের শক্ত ঘাঁটি স্মার্না অবরোধ করলেন। এখানে হাজারো ক্রুসেডার বসবাস করত। বায়েজিদ একবার ছয় মাস ধরে অবরোধ করেও স্মার্না দখল করতে পারেননি।

তাইমুরও পারলেন না।

কিন্তু তার বন্য সেনারা যখন কোনো শহর দখল করতে না পারত, পথে যা কিছু পড়ত সব তারা জ্বালিয়ে ছাই করে দিত। স্মার্নার ভাগ্যেও তাই ঘটল। স্মার্নার চারপাশ জ্বালিয়ে দেয়া হলো। অবরুদ্ধ শহরবাসীর জন্য জেনোয়া থেকে যে জাহাজ এল, তাতে পাথর মারার যন্ত্র মিনজানিক দিয়ে ছুঁড়ে মারা হলো ডজন খানেক মানুষের মাথা।

এই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে জাহাজ ফিরে গেল।

ফিরে গেলেন তাইমুরও। যাবার আগে রেখে গেলেন পনেরো হাজার মানুষের মাথা দিয়ে বানানো দুটো পিরামিড, শহরের সদর দরজার দুপাশে।

ওদিকে বুর্সার পতনের সাথে সাথে বায়েজিদের সম্পদের এক বিশাল অংশ গিয়ে পড়ল তাইমুরের হাতে। সেই সাথে তাইমুর বন্দি করলেন বায়েজিদের হারেমে থাকা ক্রীতদাসীদের এবং তার স্ত্রীদেরও।

---

২. Zachariadou, E.A., 1983. Süleyman çelebi in Rumili and the Ottoman chronicles. Der Islam, 60(2), pp.268-296.

পাঁচ

দশ দিন পর তাইমুর এক রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করলেন।

সেই ভোজের অনুষ্ঠানে বায়েজিদকে ফিরিয়ে দেয়া হলো তার রাজকীয় পাগড়ি, রাজকীয় পোশাক এবং সিংহাসন। অবাক হলেন বায়েজিদ।

মধ্য এশিয়ার দাবা খেলোয়াড়ের চাল তিনি ধরতে পারেননি।

একটু পর উৎসব শুরু হলো।

বায়েজিদের হারেমের ক্রীতদাসীরা একে একে নাচতে ও গাইতে শুরু করল। এদের মধ্যে ছিল কালোচুলের আর্মেনিয়ান তরুণী, সোনালি চুলের সার্কাশিয়ান সুন্দরী, টলটলে চোখের অধিকারিনী গ্রিক ষোড়শী, উপচে পড়া ভরাট যৌবনের রুশ যুবতী। বিভিন্ন রাজ-রাজড়ারা উপহার হিসেবে এদের পাঠাতেন হাউজ অফ উসমানের মালিকদের কাছে।

এরা যখন নাচছিল, তাইমুর তখন বারবার বায়েজিদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে বিদ্রুপের মুচকি হাসি টানছিলেন। নাচের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না বায়েজিদের।

এরপর শতাব্দীর নির্মমতম রসিকতাটি করলেন দিগ্‌বিজয়ী তাইমুর।

বায়েজিদের সামনে প্রথমে হাজির করা হলো তার গ্রিক স্ত্রী মারিয়াকে। তারপর আনা হলো তুর্কি সুন্দরী, বায়েজিদের তৃতীয় স্ত্রী দৌলতকে।

সবশেষে আনা হলো তার শেষ স্ত্রী ডেস্পিনাকে, বায়েজিদ জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন তাকে। নিকোপলিসের যুদ্ধের মতো কঠিন সময়েও কখনো নিজের কাছ ছাড়া করেননি এই সার্বিয়ান প্রিন্সেসকে।

বায়েজিদের এই তিন স্ত্রীকে আনা হয়েছিল সম্পূর্ণ নগ্ন করে। তারা খাবার টেবিলে নগ্ন অবস্থাতেই তাইমুরকে খাবার পরিবেশন করলেন। এই দৃশ্য বায়েজিদের সহ্য হলো না। তার দীর্ঘদেহ কয়েকবার কেঁপে ওঠল।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। বের হয়ে গেলেন তাঁবু থেকে।

একটু পরে জানা গেল তিনি স্ট্রোক করেছেন।

অটোমান সালতানাতের সেরা যোদ্ধা সুলতানদের একজনের জীবনের এভাবেই শেষ হলো মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। ইন্তেকালের আগে তাইমুর বায়েজিদের স্ত্রীদের তার কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।[৩]

---

৩. Kastritsis. D.J.. 2007. The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-1413(Vol. 38). Brill.

ছয়

তাইমুরের প্রিয় নাতি শাহজাদা মুহাম্মাদ সুলতান মুমূর্ষু।

আনকারার যুদ্ধে স্টিফেনের হাতে আহত হয়েছিলেন তাতারদের শাহজাদা মুহাম্মাদ। তাইমুরের প্রথম সন্তান জাহাঙ্গীর ও পুত্রবধু খানজাদের ছেলে এই মুহাম্মাদ ছিলেন তাইমুরের কলিজার টুকরা।

দেরি না করে ঘোড়া ছোটালেন তাইমুর। সাথে নিয়ে গেলেন তৎকালীন দুনিয়ার সেরা চিকিৎসককে।

কিন্তু মুহাম্মাদ ততক্ষণে চিকিৎসার অতীত। দাদার কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন ২৪ বছরের তরুণ।

তাইমুর যুদ্ধে জিতেও যেন সব হারালেন। পাহাড়ের মতো অটল মন নিয়ে তিনি অবিচল রইলেন। জীবনে অসংখ্য মৃত্যু দেখেছেন তিনি।

মুহাম্মাদের মা, আদরের পুত্রবধু খানজাদে আর তাইমুরের সম্রাজ্ঞী বিবি সারাই মুলক খানমের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে এল তার দুনিয়া। তবুও সবকিছু সহ্য করে নিয়েছিলেন এই দিগ্বিজয়ী। কিন্তু যখন জানাযার পর মুহাম্মাদের লাশের সাথে তার চার ও পাঁচ বছরের দুই ছোট ছোট শিশু কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল, সতেরো মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা পাষাণ তাইমুরের পক্ষেও তা আর সহ্য করা সম্ভব হলো না।

তিনি একেবারেই খামোশ হয়ে গেলেন।

এরপর থেকে একাকী সময় কাটাতে লাগলেন বৃদ্ধ দিগ্বিজয়ী। কারও সাথে কথা বলতেন না খুব একটা।

তার প্রথম ভালোবাসা আলজাই, বড় ছেলে জাহাঙ্গীর, সেজ ছেলে ওমর, প্রিয় বন্ধু সাইয়েদ মাইনুদ্দিন এবং শাহজাদা মুহাম্মাদ- এদের কাউকে তিনি আর কখনো দেখতে পাবেন না।

তিনি স্পষ্ট অনুভব করছিলেন, তার ইচ্ছাশক্তির চেয়েও বড় কোনো শক্তি একে একে তার প্রিয়জনদের তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই মহাশক্তির কাছে তিনি বড় অসহায়।

মুহাম্মাদের ইন্তেকালের পর তাইমুর বেশি দিন বাঁচেননি।

১৪০৫ সালে তারও মৃত্যু হলো।

গৃহযুদ্ধ

এক

বলা হয়ে থাকে দুনিয়ার প্রথম খুনটা হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই। হাবিল খুন হয়েছিল কাবিলের হাতে।

কেবল শক্তিমানই দিনশেষে টিকে থাকে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। অটোমান সালতানাতের শুরুতে এই নিয়মটা উপেক্ষা করা হলেও বেশি দিন প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা যায়নি।

১৩৮৯ সালে সুলতান মুরাদ খোদাওয়ান্দিগারের ইন্তেকালের পর সুলতান ইয়িলদিরিম বায়েজিদ ছোট ভাই ইয়াকুবকে হত্যা করে ভাই হত্যার ধারাটা শুরু করে দেন অটোমানদের মাঝে, যা পরবর্তীকালে চলেছিল শত শত বছর ধরে।

বায়েজিদের ইন্তেকালের পর তাইমুর বায়েজিদের ছোট ছেলে মুহাম্মাদকে তার পক্ষ থেকে আনাতোলিয়ার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাজনীতি জিনিসটা এতটা স্বচ্ছ কোনোদিনই ছিল না।

তাইমুরের প্ল্যান ছিল অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন বায়েজিদের সন্তানরা নিজেদের ভেতর সারা জীবন যুদ্ধ করে তার অধীনে থাকুক। শাহজাদা মুসা জালেবিকে তুর্কি আমির ইয়াকুব বে'র কাছে পাঠিয়ে দিলেন তাইমুর। তাকে বলে দিলেন সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে। সাথে দিলেন স্বর্ণের বর্ম, স্বর্ণের কোমরবন্ধ, শিরস্ত্রাণ আর ত্রিশটি আরবি ঘোড়া।

ওদিকে আনকারার যুদ্ধের পরপরই বায়েজিদের আরেক ছেলে সুলেইমান বসফরাস পেরিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি খুব দ্রুত থ্রেসের দখল নিলেন। থ্রেস মানে আজকের পূর্ব গ্রিস, দক্ষিণ বুলগেরিয়া ও উত্তর-পশ্চিম তুরস্ক।

আরেক শাহজাদা ঈসা তত দিনে বুর্সার দখল নিয়েছেন। যেহেতু রাজধানী তার দখলে, তাই তিনি নিজেকে সুলতান ভাবতে শুরু করলেন।

এসবের কোনো কিছুই শাহজাদা মুহাম্মাদকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

তার বাবা তাকে আমাসিয়া শহরের গভর্নর করেছিলেন। আনাতোলিয়ার উত্তরের দুর্গে ঘেরা এই শহরকে তিনি চিনতেন নিজের হাতের তালুর মতোই।

শান্ত, সুদর্শন, মধ্যম উচ্চতার শাহজাদা মুহাম্মাদ ছিলেন প্রশস্ত বুকের অধিকারী এক সাহসী যোদ্ধা। তার মা ছিলেন জার্মিনি রাজ্যের রাজকন্যা দৌলত খাতুন।

নানাবাড়ির লোকজন নাতিকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করল। মুহাম্মাদ নিজের বাহিনী নিয়ে বুর্সার দিকে এগিয়ে গেলেন ১৪০৫ সালে। ছোট এক যুদ্ধের পর তিনি বুর্সা জয় করে নিলেন। ঈসা পালালেন বসফরাসের ওপারে।

পরের বছর সেনাবাহিনী নিয়ে আবার হামলা চালালেন ঈসা। এবার মুহাম্মাদের বাহিনীর হাত থেকে তিনি পালাতে পারলেন না। ঈসাকে হত্যা করা হলো। সিংহাসনের লড়াই থেকে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী বিদায় নিলেন।

দুই

একটা সালতানাতের শাহজাদাদের ভেতর যখন যুদ্ধ চলে, তখন শত্রুরা যথাসম্ভব চেষ্টা করে নিজেদের সুবিধা আদায় করতে।

এখানেও তাই হলো।

যে বাইজান্টাইন সম্রাট পাঁচ বছর আগে ছিলেন বায়েজিদের করুণা ভিখারী, সেই সম্রাট এখন ইউরোপে বায়েজিদের সন্তান সুলেইমানের অভিভাবক সেজে বসলেন। তার আশ্বাস পেয়ে সুলেইমান বসফরাস পেরিয়ে বুর্সায় হামলা চালিয়ে বুর্সা জয় করে নিলেন। মুহাম্মাদের শক্তি ছিল না সুলেইমানের এই অভিযান ঠেকানোর।

মুহাম্মাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্ভবত তার বাবার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। মুরাদের এই নাতি ঠান্ডা মাথায় ভাই মুসার সাথে হিসেব-নিকেশে বসলেন। মুহাম্মাদের রাজ্যের দিকে যখন সুলেইমান অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন সুলেইমানের রাজ্য পাহারা দিচ্ছিলেন বাইজান্টাইন সম্রাট। নিয়তির কী খেলা!

এবার মুসাকে মুহাম্মাদ ছোট একটা বাহিনী দিয়ে সুলেইমানের উত্তর দিকে ব্ল্যাক সি দিয়ে পাঠালেন থ্রেসে হামলা চালাতে।

বোকা বনে গেলেন সুলেইমান। তিনি ভেবেছিলেন যেহেতু তার সাথে বাইজান্টাইনরা আছে, বসফরাস পেরিয়ে কেউ তার রাজ্য আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু ব্ল্যাক সির দিকটা তার মাথায় ছিল না। বাধ্য হয়ে সুলেইমান ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে।

সুলেইমান মুসাকে প্রথম প্রথম হটিয়ে দিলেও পরবর্তী সময়ে নিজেকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে প্রমান করলেন মুসা। মুসা চেলেবির সাথে ছিল দুটি শক্তি : গাজি মিহাল পরিবার, শায়খ বদরুদ্দিন নামের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ওলামা।

তার বাহিনীর হাতে নিহত হলেন সুলেইমান।

এবার মুসা বেইমানি করলেন মুহাম্মাদের সাথে। তিনি নিজেকে সুলতান ঘোষণা করলেন। নিজের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে মুসা কন্সট্যান্টিনোপল অবরোধ করে রোমান সম্রাটকে শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হলেন।

সার্বিয়ান লাজার স্টিফেন বালকোভিটজ, যিনি ছিলেন বায়েজিদের ডান হাত, তিনি ঠান্ডা মাথায় এবার বায়েজিদের ছেলেদের বিরুদ্ধে রোমানদের সাহায্য করলেন। অটোমানদের পতনে তার লাভ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। বলকান থেকে অটোমানরা সরে যাওয়া মানে গোটা বলকানের প্রভুতে পরিণত হবেন স্টিফেন। তাই ভাইদের মধ্যে এই বিরোধে আপাতদৃষ্টিতে কম বিপজ্জনক এবং শান্তিপ্রিয় গোছের মুহাম্মাদকেই সমর্থন জানানোটা ছিল তার জন্যে নিরাপদ।

বাইজান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল আর সার্বিয়ান লাজার স্টিফেন মিলে বৈঠক করে সিদ্ধান্তে আসলেন, মুসাকে সরিয়ে দিতে হবে। তারা মুহাম্মাদের কাছে দূত পাঠালেন।

১৪১৩ সালে মুহাম্মাদ চামুরলুর ময়দানে মুসার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তার বাহিনীর সাথে যোগ দিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা স্টিফেন বালকোভিটজ।

মুহাম্মাদের জানিসারি কমান্ডার হাসসান আগাকে দেখে মুসার জানিসারিরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। হাসসান ছিলেন বায়েজিদের বাহিনীর সেরা জানিসারি কমান্ডারদের একজন। তার নির্দেশে মুসার সৈন্যরা দল বদল করতে লাগল। ফলে মুসা এগিয়ে এসে হাসসানকে হত্যা করে ফেললেন। পাল্টা হামলা করলেন আরেক জানিসারি কমান্ডার, নিহত হলেন মুসা।

অ্যাড্রিয়ানোপল দখল করে নিয়ে পঞ্চম অটোমান সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসলেন মুহাম্মাদ।

তাকে বলা হয় অটোমান সালতানাতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা।[৩]

মাত্র চার বছরের মধ্যেই তিনি থ্রেস ও বুলগেরিয়াতে অটোমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু সার্বিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনার মতো শক্তি তার তখনও হয়নি। কারামানসহ পূর্ব আনাতোলিয়া তখন ফের চলে গেছে অটোমানদের শত্রুদের হাতে। বাইজান্টাইনরা কার্যত স্বাধীন সার্বরা আগের মতো করদ প্রজা নয়, মিত্র।

আনাতোলিয়ায় দগদগে ঘা রেখে গেছেন তাইমুর। তাইমুরের তাতার বাহিনীর লুটপাট আর হত্যাকাণ্ডে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া গ্রামগুলোতে নতুন করে চাষাবাস আর প্রশাসনিক কাজ শুরু করতে মুহাম্মাদ দিনরাত কাজ করতেন। এর মাঝেই দানা বাঁধল নতুন এক বিপ্লব, যার জন্য তিনি তৈরি ছিলেন না।

তিন

আনকারার যুদ্ধের পর থেকে পরের বারো বছর আনাতোলিয়ায় বায়েজিদের চার ছেলের ভেতর যে গৃহযুদ্ধ চলে তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আনাতোলিয়ার কৃষি আর বাণিজ্য। বারবার একেকটি প্রদেশের মালিকানা বদল হতে থাকে, ফলে মুহূর্তের মধ্যে বদলাতে থাকে চাষীর জমির মালিকানা, সেই সাথে ঘনঘন যুদ্ধের কারণে বেড়ে যায় করের বোঝা। শুরু হয় খাদ্যাভাব, যা পরে দুর্ভিক্ষে রূপ নেয়।

গৃহযুদ্ধের দুই ফাইনালিস্ট মুসা ও মুহাম্মাদ দুজনের শক্তির উৎস ছিল দুই রকম।

মুসা চেলেবি পেয়েছিলেন গাজি এবং আলেভি সুফিদের সমর্থন। পক্ষান্তরে, মুহাম্মাদ চেলেবির শক্তির উৎস ছিল সিপাহী ও সুন্নি মুসলিমরা।

মুসা চেলেবির কাজাস্কার শায়খ বদরুদ্দিন মুসার দখলকৃত তিমারগুলো সিপাহীদের ভেতর ভাগ না করে সরাসরি গাজিদের হাতে দিয়ে দেন। এতে করে গাজিদের ভেতর মুসার জনপ্রিয়তা দারুণ বেড়ে যায়।

কিন্তু মুহাম্মাদ ক্ষমতায় আসার পর ব্যাপারটা বদলে যায়, জমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সিপাহীরা খুশি হলেও ফের বিগড়ে যেতে থাকে গাজিরা। গাজিদের এই ক্ষোভকে পুঁজি করেই ১৪১৬ সালের বসন্তে নতুন এক বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তোলেন শায়খ বদরুদ্দিন।

---

৩. Gábor Ágoston; Bruce Alan Masters (2009). Encyclopedia of the Ottoman Empire. Infobase Publishing. ISBN 978-1-4381-1025-7

তিনি প্রচার করতে শুরু করেন, মহাবিশ্বের কোনো সৃষ্টি নেই, আবার কোনো ধ্বংসও নেই, এটি চিরন্তন। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই বিভ্রম। বিভ্রম কেটে গেলে এদের অস্তিত্বও কেটে যাবে।

সৃষ্টি আর ধ্বংস সদা চলমান এক প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেন শায়খ বদরুদ্দিন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, জান্নাত জাহান্নাম বলে কিছু নেই। ওলামারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এগুলোকে মানুষের কাছে প্রচার করেন।[৪]

বদরুদ্দিনের যে মতবাদ সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তা হলো, তার সম্পদের বণ্টনসংক্রান্ত মতবাদ। তার মতে, জমিনে সব মানুষের সমান ভাগ আছে। সম্পদ আল্লাহ কারও একার ভোগের জন্য না; বরং সবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই কারও কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ থাকা উচিত না। সম্পত্তির মালিক হবে পুরো সমাজ। সেখান থেকে প্রত্যেকে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে।

সেই সাথে বদরুদ্দিন আরও বলেন, মুসলমান আর খ্রিষ্টানের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। খ্রিষ্টানকে যে কাফির বলে সে নিজেই আসলে কাফির।

এই মতবাদগুলো প্রচারের ফলে আনাতোলিয়ার বিভিন্ন নও মুসলিম তুর্কমান গোত্র যেগুলো তখনো ইসলামি শরীয়ত ও আকিদা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করেনি, তারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়।

গাজিদের একটা বড় অংশ ছিল অশিক্ষিত। এরা শহর থেকে দূরে বসবাস করতে পছন্দ করত বলে ইসলামি শিক্ষার অধীনেও খুব একটা আসেনি। ফলে তারা বদরুদ্দিনের দার্শনিক চিন্তাধারা ও যুক্তিতর্কের কাছে সহজেই হার মেনে তাকে মহান শায়খ বলে গ্রহণ করে নেয়। এর সাথে সাথে জমি ও সম্পদের বণ্টন নিয়ে তার দেয়া মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে খ্রিষ্টানদের ভেতরেও।

সালতানাতের ভেতরে ক্রমেই দানা বেধে ওঠে বিদ্রোহ।

বদরুদ্দিন প্রথমে নিজেকে গাজি বংশোদ্ভূত দাবি করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের বংশ পরিচয় সংযুক্ত করেন সেলজুক পরিবারের সাথে। এরপর তিনি আনাতোলিয়ার সুলতান হবার দাবি করে বসেন।[৫]

প্রথমে সিনোপ, পরে দোব্রুজা এবং তারপর সারুখানে বদরুদ্দিন, তার শিষ্য মুস্তাফা ও কামালের নেতৃত্বে শক্তিশালী বিদ্রোহী বাহিনী গড়ে ওঠে। এরা একের পর এক শহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শহরের কাজি এবং ওয়ালিকে হত্যা করে খাজাঞ্চির সমস্ত অর্থ

---

[৪]. Inalcik, Halil (1973). The Ottoman Empire: The Classical Era 1300-1600. New York: Praeger Publishers. p. 189.

[৫]. Inalcik, Halil (1973). The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. New York: Praeger Publishers. p. 190.

নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে থাকে। সেই সাথে জমিজমার দখল সিপাহীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়।

নতুন জমি পাবার লোভে দলে দলে খ্রিষ্টানরাও তাদের সাথে যোগ দিয়ে আন্দোলনকে দ্রুত শক্তিশালী করে তোলে। বদরুদ্দিন আগে মুসা চেলেবির সেনাবাহিনীর কাজাস্কার (সামরিক আদালতের বিচারক) ছিলেন, তাই মুসার বাহিনীর চাকরি হারানো সাবেক সৈনিকরা দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। এদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে বাহিনী পাঠাতে হয় সুলতান মুহাম্মাদকে কিন্তু টানা কয়েকবার এরা সুলতানের পাঠানো বাহিনীকে পরাজিত করে। মানিসা, সারুখান, দোরবুরুন দোব্রুজা, ইজনিক ক্রমেই সুলতানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

শেষ পর্যন্ত দোব্রুজা থেকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেয়া হয় শায়খ বদরুদ্দিনকে। কিন্তু তার দুই শিষ্য মুস্তাফা আর কামাল তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে ইজনিক আর মানিসা প্রদেশে। এই অবস্থাতে সুলতান তার প্রধান উজির বায়েজিদ পাশার অধীনে মুস্তাফার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পাঠান। এই বাহিনী মুস্তাফাকে পরাজিত করে তার কয়েক হাজার সমর্থককে মৃত্যুদণ্ড দেয়।[৬]

সারুখানে কামালের বাহিনীর ওপরও চালানো হয় ক্ষমাহীন এক দমন অভিযান। প্রায় দুই হাজার কামাল সমর্থককে হত্যা করে অবশেষে আনাতোলিয়ায় পঞ্চদশ শতাব্দীর এই সমাজতান্ত্রিক বিদ্রোহের অবসান ঘটানো হয়।[৭]

এই বিদ্রোহ সুলতান মুহাম্মাদের রাষ্ট্রচিন্তায় একটা গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসে।

তিনি বুঝতে পারেন, একটা মুসলিম সালতানাতের অস্তিত্ব অনেকটাই নির্ভর করে সালতানাতের নাগরিকদের ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞানের ওপর। সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারে এমন জনগণ নিয়ে শক্তিশালী সালতানাত গড়া সম্ভব নয়।

চার

শায়খ বদরুদ্দিনের বিদ্রোহ দমন করা হতে না হতেই নতুন খেলা শুরু করলেন ধড়িবাজ বাইজান্টাইন সম্রাট।

মুহাম্মাদের আরেক ভাই মুস্তাফা তাইমুরের ছেলে শাহরুখের কাছ থেকে পালিয়ে এসে বাইজান্টাইনদের সাহায্য চাইলেন। অটোমানদের চিরশত্রু কারামানিদের সাথে হাত মিলিয়ে মুস্তাফা ভাইকে উৎখাত করার ছক আঁটতে লাগলেন। এই ছক

---

৬. Europe and the Islamic World: A History. Tolan, John. Princeton university Press. (2013) ISBN 978-0-691-14705-5. p. 128.

৭. Kohen, E. (2007). History of the Turkish Jews and Sephardim: memories of a past golden age. University Press of America.

সফল হলে অটোমান সালতানাতের কবর রচিত হতো কিন্তু মুহাম্মাদ এক বীরোচিত অভিযান চালিয়ে মুস্তাফাকে ভড়কে দেন। বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন মুস্তফা।

এত কিছু করেও মুহাম্মাদকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ব্ল্যাক সির ওপারের ওয়ালেসিয়াকে নিজের করদ প্রজায় পরিণত করলেন।

এরপর তার বাহিনী মেসিডোনিয়া ও আলবেনিয়ার কিছু অংশ জয় করে নিল।

দাদার মতো নিজের মেয়েদের বিয়ে দিলেন এমন সব রাজ্যে, যারা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করত। আর ছেলেদের বিয়ে দিলেন এমন রাজ্যে, যারা প্রয়োজনে তাকে সহায়তা করতে পারে।

নিজে বিয়ে করেছিলেন যুলকাদিরের রাজকন্যা আমিনা খাতুনকে।[৮]

এভাবে মাত্র আট বছরের ভেতরেই কখনো তলোয়ারের খোঁচায়, কখনো কাজির খুতবায় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অটোমান সালতানাতের অংশগুলোকে জোড়া লাগালেন মুহাম্মাদ।

অতিমাত্রায় পরিশ্রম করে তার শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

মাত্র পয়ত্রিশ বছর বয়সে ১৪২১ সালে হঠাৎ এক দিন তিনি ইন্তেকাল করলেন অ্যাড্রিয়ানোপল প্রাসাদে।

৩৫ বছরের জীবনে ২৪টা যুদ্ধ করা শরীরটাতে যখন কাফন পরানো হয়, তখন সেখানে দেখা যাচ্ছিল ৪০টা আঘাতের দাগ।[৯]

৮. Dimitris J. Kastritsis (2007). The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-1413. BRILL. ISBN 978-9-004-15836-8.

৯. İnalcık, Halil (1991). "Meḥemmed I". The Encyclopedia of Islam, New Edition, Volume VI: Mahk–Mid. Leiden and New York: BRILL. pp. 973–978. ISBN 90-04-08112-7.

ঘরের শত্রু

এক

'সঠিক সিদ্ধান্ত' কথাটা আসলে খুবই আপেক্ষিক। সঠিক আর ভুলে সংজ্ঞা আসলে সময়ের সাথে বদলায়।

১৪০২ সালে ব্যাটল অফ আনকারাতে তাইমুর নিজে বাহিনীর পেছনে থেকে লড়াইয়ের ময়দানে সামনে ঠেলে দিয়েছেন নিজের পুত্র-পৌত্রদের। হ্যাঁ, অসাধারণ সমরকুশলতায় তাইমুর যুদ্ধটা জিতেছিলেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ জিততে গিয়ে নিজের উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ সুলতানকে হারিয়েছিলেন।

যুদ্ধে হেরে যাওয়া একগুঁয়ে বায়েজিদ ইয়িলদিরিম করলেন তার উল্টোটা। কারও কথা না শুনে নিজে যুদ্ধের ময়দানে থেকে তাইমুরকে ঠেকিয়ে রাখলেন একদম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু একজন বাদে তার সব সন্তানকে তিনি পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন। নিজে ধরা পড়লেন তাইমুরের বাহিনীর কাছে, মারা গেলেন কিছুদিন পর। কিন্তু তার সন্তানরা বেঁচে ছিলেন।

ঠান্ডা মাথায় একজন সম্রাটের মন নিয়ে ভেবে দেখলে, কোনো সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল? অথবা এতকিছু হয়তো বায়েজিদ ভাবেননি। হয়তো পিতার মন সুলতানের মনকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল, ঘটনাটা এর বেশি কিছুই না।

সন্তানের প্রতি পিতার এই অবুঝ ভালোবাসাই শেষ পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে দিয়েছিল। নিজে মরে গিয়েছিলেন বায়েজিদ কিন্তু তার সন্তানরা, তাদের সন্তানরা তার সাম্রাজ্যকে একটু একটু করে আবার গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি তারা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বায়েজিদকেও। ওদিকে তাইমুরের মৃত্যুর পরে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে ক্রমশেই টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাইমুরি সাম্রাজ্য।

তাহলে আনকারার ময়দানে সঠিক কে ছিলেন? তাইমুর নাকি বায়েজিদ? ইতিহাস এর উত্তর জানে না।

প্রথম দিকের অটোমান সুলতানদের মধ্যে একটা কাকতালীয় ব্যাপার ছিল।

যে বছর কোনো সুলতান মারা যেতেন, ঠিক ওই হিজরি বছরেই তার একজন নাতি জন্মগ্রহণ করতেন যিনি সুলতান হতেন।

উদাহরণ দেই।

সুলতান উসমান গাজি মারা যান ১৩২৬ সালে, তার নাতি মুরাদ খোদাওয়ান্দিগারের জন্ম সেই বছরেই। দ্বিতীয় সুলতান ওরহান গাজি মারা যান ১৩৬০ সালে, ঠিক ওই বছরেই জন্ম হয় ৪র্থ সুলতান বায়েজিদের।

১৩৮৯ সালে শহিদ হন সুলতান মুরাদ, একই বছর জন্ম হয় ৫ম সুলতান মুহাম্মাদের। ১৪০৩ সালে মারা যান বায়েজিদ, ওই হিজরি বছরেই জন্ম হয় ৬ষ্ঠ সুলতান মুরাদের। কিন্তু ১৪২১ সালে যখন মুহাম্মাদের মৃত্যু হলো, সে বছর কোনো শাহজাদার জন্ম হলো না।

মুহাম্মাদ ছিলেন প্রথম অটোমান সুলতান যার ইন্তেকালের সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল। কারণ, বাইজান্টাইন আর সার্বরা হাত নিশপিশ করে অপেক্ষা করছিল কখন অটোমানদের মধ্যে আবার নতুন করে ঝামেলা পাকিয়ে দেয়া যায়, তাদের সাথে দহরম মহরম ছিল কারামান, আয়েদিন, মানতেশি আর টেক্কির আমিরদের। এদের মাঝ থেকে নতুন করে সালতানাতকে তার আগের চেহারায় নেয়াটাই হয়ে দাঁড়াল মুরাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

দুই

রূপবতী নারী আর শক্তিমান পুরুষের সাধারণত শত্রুর অভাব থাকে না।

পিতার মৃত্যুর পর উসমানের তলোয়ার হাতে নিয়ে ব্যাপারটা ভালোমতোই টের পেলেন মুরাদ।

বাইজান্টাইন কাইজার মুরাদের বাবা মুহাম্মাদকে জ্বালিয়ে মেরেছেন সারাটা জীবন ধরে, কোনো রকম যুদ্ধ করা ছাড়াই, শুধু চালবাজি করে। বাইজান্টাইনদের চালবাজি মুরাদের আমলেও থামলো না। তারা রোডস দ্বীপে পালিয়ে থাকা মুহাম্মাদের ভাই মুস্তাফাকে উসমানের তলোয়ারের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করল।

তখনো মুরাদের বাহিনীতে যোদ্ধার সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছাড়ায়নি। সুলতান মুহাম্মাদ তার সেনাবাহিনী গড়ার জন্য সময় পেয়েছিলেন কেবল চার বছর। তার হাতে খুব বেশি টাকা কড়িও ছিল না। এই সৈন্য দিয়ে পশ্চিমে রোমানদের শায়েস্তা করতে গেলে উত্তর দিকে সার্বরা মাথাচাড়া দেয়, পূর্বে কারামানিরা ঘোট পাকাতে শুরু করে। আবার কারামানিদের শায়েস্তা করতে গেলে রোমানদের চালবাজি আরও বেড়ে যায়।

চুপচাপ থেকে নিজের সেনাবাহিনী বড় করার দিকে মনোযোগ দিলেন মুরাদ। তার ঈগলের মতো নাক আর চোখ দিয়ে তিনি হয়তো অনুভব করতে পেরেছিলেন, শান্তি নয়, সম্মানজনকভাবে টিকে থাকতে হলে যুদ্ধই অটোমানদের জন্য একমাত্র পথ।

কিন্তু তিনি পর্যাপ্ত সময় পেলেন না। বাইজান্টাইনরা মুস্তাফাকে শক্তিশালী সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করল। প্রায় বিনা বাধায় অ্যাড্রিয়ানোপল জয় করল মুস্তাফার বাহিনী।

চাচার এই বিদ্রোহ দমন করতে উজিরে আযম বায়েজিদ পাশাকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন মুরাদ। কোনো যুদ্ধ হলো না। রোমান গোয়েন্দার বিষমাখানো ছুরিতে রাস্তায়ই নিহত হলেন বায়েজিদ পাশা।[১]

এবার মুরাদ নিজেই ময়দানে নেমে গেলেন। তিনি ছিলেন তার দাদা বায়েজিদের মতোই বীর যোদ্ধা।

কোন পূর্বাভাস ছাড়াই মুস্তাফার বাহিনীকে ভড়কে দিয়ে অসময়ে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লেন মুরাদ। পালানো ছাড়া হতভম্ব মুস্তাফার আর কোনো উপায় ছিল না। পুরো রাস্তাই তাকে অনুসরণ করে চলল কয়েকজন অটোমান গোয়েন্দা। সুযোগ বুঝে তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। ব্যর্থ হলো রোমান সম্রাটের আরেকটা চাল।

চালবাজি করা যার স্বভাবে একবার ঢুকে যায়, সে আর কখনো সুস্থ হয়ে বসতে পারে না। রোমান সম্রাট ম্যানুয়েলও পারলেন না। এবারে তিনি খুঁজে বের করলেন মুরাদের ভাই কুচুক মুস্তাফাকে। তিনি দাবি করলেন মুস্তাফাই অটোমান সালতানাতের সত্যিকারের দাবিদার। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি হওয়া যে ভালো না, তা আবার প্রমাণিত হলো যখন কারামানের প্রিন্সও মুস্তাফাকে সমর্থন করে ফৌজ নামালেন।

কিন্তু মুরাদের আক্রমণের সামনে কিশোর মুস্তাফার বাহিনী বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। যে কমান্ডার নিজে দুর্বল, তার বাহিনীর মনোবল সব সময় দুর্বলই থাকে।

মুরাদ বন্দি করলেন কুচুক মুস্তাফাকে। তাকে ফাঁসি দেয়া হলো।[২]

তিন

ঘরের শত্রুদের দমন করে মুরাদ আগালেন বাইজান্টাইনদের দিকে।

বায়েজিদের পতনের পর থেকে টানা তেইশটা বছর ঘি-মাখন খেয়ে ভালোই কাটছিল রোমান সম্রাটের দিনগুলি। এবারে আর তিনি পার পেলেন না। মুরাদ কঠোর অবরোধ করলেন বাইজান্টাইন শহরগুলোকে।

---

১. Stavrides, T. (2001). The Sultan of Vezirs: The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelović (1453-1474). Brill. p. 55. ISBN 9789004121065. Retrieved 2014-12-26.

২. Halil İbrahim İnal: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi.İstanbul. 2008. ISBN 9789944174374. p 125

তিন মাস অবরোধের পর মুরাদ বুঝলেন তার অর্থকড়ি বেশি নেই, বড়জোর আর তিন মাস অবরোধ টেকাতে পারবেন।

বাইজান্টাইনদের ভয় দেখাতে তিনি কয়েকটি জনবসতিতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। কিছু ব্যবসায়ীর জাহাজ লুট করা হলো। ফলে ব্যবসায়ীরা ম্যানুয়েলকে কর দেয়া বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিল।

ম্যানুয়েল বাধ্য হলেন মুরাদকে কর দিতে।

মুরাদের পরদাদা প্রথম মুরাদ প্রথমবারের মতো বাইজান্টাইনদের প্রজায় পরিণত করেছিলেন ১৩৭৪ সালে। বায়েজিদের ইন্তেকালের তেইশ বছর পর, ১৪২৫ সালে আবারও বাইজান্টাইন সম্রাটকে প্রজায় পরিণত করলেন দ্বিতীয় মুরাদ।

১৪২৮-১৪৩০ সালের মধ্যে তিনি দ্রুত কিছু অভিযান চালিয়ে বুলগেরিয়ায় নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করলেন, ওদিকে মোরিয়ার ভেনেশিয়ান শহর স্যালোনিকা অবরোধ করে দখল করলেন ভেনিসের কাছ থেকে।[৩]

এরপর তিনি অভিযান চালাতে বের হলেন মেসিডোনিয়া ও সার্বিয়াতে। বলকানের এক বড় ভূখণ্ড চলে এল মুরাদের নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু এবার হাঙ্গেরি থেকে আবার বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর সেরা জেনারেলদের একজন ইউরোপ থেকে অটোমানদের তাড়াতে মরণপণ প্রস্তুতি শুরু করলেন।

৩. Inalcik, Halil (1989). "The Ottoman Turks and the Crusades, 1451–1522". In Zacour, N.P.; Hazard, Harry W. A History of the Crusades, Volume VI: The Impact of the Crusades on Europe. Madison, Wisconsin. University of Wisconsin Press. pp. 222–275.

কমান্ডার জন

এক

১৪০৬ সালে রোমানিয়ান এক গভর্নর ভোকের স্ত্রী শুকনো গড়নের এক বাচ্চার জন্ম দেন হুনডোরিয়া দুর্গের চার দেয়ালের মাঝে।[১]

বাচ্চার জন্মের সময় বাচ্চার মা আর্সেবেত মর্সিনা যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। কারণ, এই বাচ্চা জন্ম নেয়ার আগে প্রায় এক বছর বাচ্চার বাবা দুর্গে তো দূরের কথা, গোটা ট্রান্সিলভানিয়াতেই ছিলেন না। হাঙ্গেরি-অস্ট্রিয়া-পোল্যান্ডের সম্রাট জন সিগিসমুন্ড তাকে পাঠিয়েছিলেন ক্রোয়েশিয়া অভিযানে।

তাহলে এই সন্তানের জন্ম কীভাবে হলো?

উত্তরটা খুব বেশি কঠিন না।

সিগিসমুন্ড নিজে প্রায়ই ট্রান্সিলভানিয়া সফরের নাম করে হুনডোরিয়া দুর্গে আসতেন। তিনি একজন কুখ্যাত প্লে বয় ছিলেন, যিনি নিজের জীবদ্দশায় দুই শর বেশি নারীর সাথে রাত কাটানোর ব্যাপারে অভিযুক্ত ছিলেন।[২]

ধরে নেয়া হয়, এই বাচ্চার বায়োলজিক্যাল ফাদার তিনিই ছিলেন। মর্সিনার সাথে সিগিসমুন্ডের প্রেমের গুজবটা আরও তীব্র হয় যখন বাচ্চার নাম রাখা হয় জানোস। ইংরেজিতে জন।

এই বাচ্চাকে নিয়ে এতকিছু বলার অনেক কারণ আছে।

---

[১]. Teke, Zsuzsa (1980). Hunyadi János és kora [John Hunyadi and his Times] (in Hungarian). Gondolat. ISBN 963-280-951-3.

[২]. Bak, János (1998). "Hungary: Crown and Estates". In Christopher Almand. New Cambridge Medieval History vol. VII. c. 1415–c. 1500. Cambridge: CUP. pp. 707–27.

জানোস বা জনকে রোমানিয়ানরা চেনে আইওন অফ হুনডোরিয়া নামে, সার্বরা চেনে সাইবিনিয়ান জাঙ্কো নামে, স্লাভরা চেনে উঙ্গারি জাঙ্কো নামে। বাইজান্টাইনরা তাকে চেনে জাঙ্কো অফ বাইজান্টিয়াম হিসেবে, মেসিডোনিয়া আর বুলগেরিয়ার খ্রিষ্টানদের কাছে তিনি জানসেকুলা নামে পরিচিত।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাকে আজও স্মরণ করে ক্রিশ্চিয়ানিটির রক্ষক হিসেবে। পুরোনাম জানোস হুনয়াদি, পুরো পঞ্চদশ শতাব্দীর সেরা মিলিটারি ট্যাকটিশিয়ানদের একজন হিসেবে তিনি ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন।[৩]

হুনয়াদি শৈশব থেকেই খুব যত্নের সাথে ইতালিতে যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। নিজের যৌবনের শুরুতে চলে যান চেক-পোল্যান্ড হয়ে সুইডেনে। সেখানে তিনি শেখেন হুসাইট ওয়ারফেয়ার।

যৌবনে তার স্বপ্ন ছিল ইউরোপের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা, তুর্কিদের ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বলকানে খ্রিষ্টান ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা।

১৩৯৬ সালে সুলতান বায়েজিদ ইয়িলদিরিমের হাতে নিকোপলিসের ক্রুসেডে সম্রাট সিগিসমুন্ড ও নাইটদের অল ইউরোপিয়ান বাহিনীর যে শোচনীয় পরাজয় ঘটে, তার ফলাফল হিসেবে চল্লিশ বছরের জন্য ইউরোপের ক্রুসেড করার ক্ষমতা প্রায় লোপ পায়।

এই সময়ের মধ্যেই তাইমুরের হাতে ১৪০২ সালে আনকারার যুদ্ধে অটোমান বাহিনী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেলে অটোমানরা অর্ধশতাব্দীর জন্য পিছিয়ে যায়। সুলতান মুহাম্মাদ চেলেবি ও সুলতান মুরাদ সানির অক্লান্ত পরিশ্রমে অটোমানরা যখন ধীরে ধীরে নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি হয়েছে, ঠিক তখনই জন সিগিসমুন্ড হলেন হোলি রোমান এম্পায়ারের পবিত্র সম্রাট।[৪]

হোলি রোমান এম্পেররের একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল ইউরোপে ক্রিশ্চিয়ানিটির ঝাণ্ডা বহন করা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন সিগিসমুন্ড। সিংহাসনে বসেই তিনি হাঙ্গেরির দক্ষিণ দিকের নিরাপত্তার ভার দিলেন নিজের অবৈধ সন্তান, ট্রানসিলভানিয়ার রিজেন্ট জন হুনয়াদিকে।

প্রথমবারের মতো যোগ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেলেন জন। হুসাইট যুদ্ধে শেখা ওয়াগেনবার্গেন ট্যাকটিক্স, ইউরোপিয়ান হেভি ক্যাভালরির নতুন ধরনের ব্যবহার আর তার সাথে নিজের ক্ষুরধার মগজকে এক করে তিনি অটোমানদের বিরুদ্ধে বলকানে আবার ক্রুসেডের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

---

৩. Mureșanu, Camil. John Hunyadi: Defender of Christendom. Center for Romanian studies, 2001.

৪. https://www.britannica.com/biography/Sigismund-Holy-Roman-emperor

দুই

জনের একটা বড় ক্ষমতা ছিল শত্রু যুদ্ধের ময়দানে কী করতে পারে তা আগে থেকেই আঁচ করতে পারা।

১৪৩৭ সালে মুরাদের জেনারেল ইসহাক বেগ সার্বিয়া অভিযানের সময় জনের মুখোমুখি হন। ইসহাক ভেবেছিলেন টিপিক্যাল নাইটদের মতো জন তার বাহিনীর সেন্টারে আঘাত হানবেন। তাই তিনি তার হেভি ক্যাভালরিকে সেন্টারে নিয়ে এসে দুই ফ্ল্যাঙ্কে লাইট ইনফ্যান্ট্রিদের বসান।

নিজের অসামান্য বুদ্ধিবলে জন বুঝে ফেলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে ইসহাক কী করবেন।

যুদ্ধের আগের রাতে ট্যাকটিক্স বদলে তিনি তার ক্যাভালরিকে উইংয়ে নিয়ে এসে ইসহাক বেগের বাহিনীকে দুপাশ থেকে কচুকাটা করে ফেললেন।

পরের বছর, ১৪৩৮ সালে মাজিদ পাশাকে পাঠানো হয় জনকে থামাতে। তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে করেই হোক, জনকে হত্যা করে তার মাথা সুলতানের কাছে নিয়ে যাবেন।

বুদ্ধির খেলাতে এবারেও জিতে যান জন হুনয়াদি। তার এক স্পাই সাইমন কোমেনি এই খবর জানতে পেরে তার কাছে পৌঁছে দেন।

যুদ্ধের ময়দানে হুনয়াদি একটা দাঁড়কাকের ছবি আঁকা বর্ম পরতেন, তার মাথায় থাকত রুপালি হেলমেট, চড়তেন সাদা ঘোড়ায়। এই জিনিসগুলো খেয়াল করে মাজিদ পাশা জনকে হত্যার জন্য তার স্পেশাল ইউনিটকে নির্দেশ দেন।

যুদ্ধের দিন চরম আত্মত্যাগ করলেন সাইমন কোমেনি। তিনি হুনয়াদিকে বোঝালেন যে, তার প্রাণ গেলে ক্রিশ্চিয়ানিটির কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু হুনয়াদি মারা গেলে অটোমানদের ঠেকানো খ্রিষ্টান ইউরোপের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

হুনয়াদি তাই নিজের মূল বাহিনী থেকে সরে পেছনে থাকা রিজার্ভ ট্রুপসের সাথে যুদ্ধে নামলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তার বর্ম-হেলমেট পরে তারই ঘোড়ায় উঠলেন সাইমন এবং তুর্কিদের আক্রমণে নিহত হলেন। হুনয়াদিকে মারা মানেই যুদ্ধ শেষ ভেবে লুট শুরু করলে তুর্কিরা। এমতাবস্থায় নিজের রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে এসে বিশৃঙ্খল তুর্কিদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন জন।

পরের পাঁচ বছরে গোটা বলকানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সার্বিয়া, ওয়ালাসিয়া, বুলগেরিয়ার একটা বড় অংশ নিজের দখলে নিয়ে নিলে অটোমানরা ইউরোপে অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ে গেল।

১৪৪৩ সালে অটোমান জেনারেল শাহাবুদ্দিন পাশাকে ত্রিশ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী দিয়ে জন হুনয়াদিকে দমন করতে পাঠানো হয়।

এবার রীতিমতো জাদু দেখালেন জন।

ষাঁড় দিয়ে টানা প্রায় দুই শ ওয়াগন একটাকে আরেকটার সাথে লোহার শেকল দিয়ে জুড়ে দিয়ে জন একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করলেন। প্রতিটি ওয়াগনের ভেতর লুকিয়ে থাকত ছয় থেকে আটজন তীরন্দাজ, যাদের কাছে থাকত ইউরোপিয়ান ক্রসবো, সাথে থাকত দুজন মাস্কেটিয়ার। তাদের সাথে থাকত আরও আটজন তলোয়ারবাজ-বর্শাধারী, সেই সাথে বিশাল দুটো ঢাল বহন করার জন্য থাকত আরও দুই সৈনিক। এভাবে জোড়া দেয়া ওয়াগনগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় থাকত আরও অনেক ষাঁড়, তাদের ঠিক পেছনে থাকত ঘোড়ামারা শূল।[৫]

আয়তক্ষেত্রের ভেতরের দিকে থাকত হেভি ক্যাভালরি ইউনিট, সেই সাথে তখনকার দিনের আর্টিলারি ইউনিট।
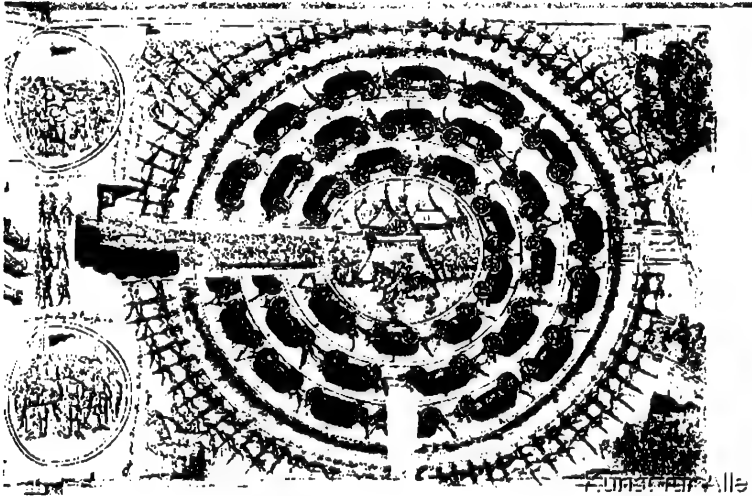
ওয়াগেনবার্গ ফরমেশনঃ চারিদিকে সাজিয়ে রাখা ওয়াগনের ভেতর থাকত তীরন্দাজ ও মাস্কেটিয়ার, আর গাড়িগুলোর বেষ্টনীর মাঝখানে থাকা ফাঁকা জায়গায় থাকত ক্যাভালরি।

ওয়াগনের গা ছিল পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়ানো, তাই ওয়াগনের ভেতর তীর ঢুকত না। যেহেতু সব ওয়াগন একটা আরেকটার সাথে জোড়া লাগানো থাকত, তাই ধাক্কা মেরে কোনোটাকে উলটে দেয়াও ছিল অত্যন্ত কঠিন।

কোনো ক্যাভালরি রেজিমেন্টের পক্ষে ওয়াগনগুলোর মাঝখানের খালি জায়গা দিয়ে এই ফরমেশনের ভেতরে ঢোকা সম্ভব ছিল না। কারণ, শেকলে বাধা ষাঁড়ের দলের পেছনেই থাকত ঘোড়ামারা শূল।

[৫]. Cartledge, Bryan (2011). The Will to Survive: A History of Hungary. C. Hurst & Co. ISBN 978-1-84904-112-6

এই ওয়াগনগুলো একেকটা সচল দুর্গের মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে যেত শত্রুর ফরমেশনের ঠিক সেন্টার দিয়ে। আর তার ভেতর থেকে ক্রমাগত তীর আর কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকত ভেতরে থাকা সৈন্যরা। অত্যন্ত শক্তিশালী এই ডিফেন্সিভ ফরমেশন অটোমানদের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল।

জন হুনয়াদি মাত্র পনেরো হাজার যোদ্ধা নিয়েই এই ওয়াগন ফোর্ট্রেস ট্যাকটিক্স খাটিয়ে তুর্কিদের লাশের স্রোত বানিয়ে ফেলেন বলকানে। শাহাবুদ্দিন পাশা পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসেন এদির্নে।

তিন

জন হুনয়াদির দৃঢ়তায় ১৪৪০-১৪৪২ সালের মধ্যে অটোমানদের অভিযানগুলো সার্বিয়াতে প্রবল বাধার মুখে পড়ে।

১৪৪৩ সালে জনের বাহিনী সার্বিয়ার অটোমান সানজাক বে কাসিম পাশার ওপর হামলা চালায়। কাসিম পাশা অবস্থা বেগতিক দেখে দ্রুত সার্বিয়া ছেড়ে পিছু হটে যান। এসময় তিনি পথে যত গ্রাম পেয়েছিলেন সব পুড়িয়ে দেন। ফলে রসদের অভাবে কিছুদূর এসে থেমে যায় জনের বাহিনী।

এবার কাসিম পাশা বুলগেরিয়ার অটোমান কমান্ডার তুরখান বের সহযোগিতা চান। ধারণা করা হয় তুরখান বে সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। তিনি কাসিম পাশাকে সাহায্য না করে উল্টো নিজেই পালিয়ে যান।

এসময় সুলতানের জামাতা মাহমুদ বে এবং প্রধান উজির চেন্দারলি হালিল পাশা দুজনেই অবস্থান করছিলেন বুলগেরিয়াতে। জন হুনয়াদি আচমকা এগিয়ে এলে তারা দুজনে বন্দি হন হাঙ্গেরির হাতে।

মুরাদের ঘরে হাহাকার শুরু হলো। মেয়ে আর মেয়ের মা মিলে মুরাদের মাথা খারাপ করে দিলেন। ছয় মাস চেষ্টার পর মুরাদ পোল্যান্ডের রাজা ভ্লাদিস্লাভ ও হাঙ্গেরির রাজা জন হুনয়াদির সাথে দশ বছর মেয়াদী শান্তি চুক্তি করলেন।[১]

ইউরোপে শান্তি পেলেও এশিয়াতে অটোমানদের চিরশত্রু কারামান লেগে রইল তার পেছনে। ১৪৪৪ সাল নাগাদ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তাদেরকেও ঠান্ডা করলেন মুরাদ। তার আর এই সাম্রাজ্য, জঞ্জাল ভালো লাগছিল না।

---

[১]. Imber, Colin (July 2006). "Introduction" . The Crusade of Varna, 1443–45 . Ashgate Publishing. pp. 9–31. ISBN 0-7546-0144-7. Retrieved 2007-04-19. Archived June 28, 2007, at the Wayback Machine.

তিনি সিংহাসন ছেড়ে দিলেন ছেলে মুহাম্মাদের কাছে।[৭] তারপর চলে গেলেন আনাতোলিয়ার দক্ষিণের এক নির্জন জায়গাতে, আল্লাহর ইবাদাতে দিন কাটাতে লাগলেন একাকী। কিন্তু বেশি দিন তার আর শান্তিতে থাকা হলো না।

অক্টোবর নাগাদ মুরাদ খবর পেলেন পোল্যান্ডের রাজা ভ্লাদিস্লাভ, হাঙ্গেরির জন হুনয়াদি, ওয়ালাসিয়ার মির্সিয়া, ক্রাউন অফ বোহেমিয়া, কিং অফ বসনিয়া, কিং অফ ক্রোয়েশিয়া, টিউটনিক নাইট, লিথুয়ানিয়া, মলদোভা, ট্রান্সিলভানিয়া ও ইউক্রেনের কিছু সৈনিক মিলে ২৪,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে বুলগেরিয়ার বুক চিরে এগিয়ে আসছে তার রাজধানীর দিকে।[৮] ভিদিন, রাহোভা ও বায়েজিদের বিখ্যাত দুর্গ নিকোপলিস বিধ্বস্ত করে দিয়ে তারা দ্রুত এগিয়ে আসছে দক্ষিণে।

প্রথম প্রথম নিজের নির্জনবাস ছেড়ে প্রাসাদে ফিরতে অস্বীকার করলেন সুলতান।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে তার কাছে একটা চিঠি এল। চিঠি লিখেছে তার ছেলে মুহাম্মাদ।

চিঠিতে লেখা ছিল-'যদি আপনি সুলতান হন, দ্রুত নিজের বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে জনগণকে রক্ষা করুন। আর যদি আমি সুলতান হয়ে থাকি, তবে আমি আপনাকে আদেশ দিচ্ছি, রাজধানীতে ফিরে আসুন এবং জনগণকে রক্ষা করতে শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন।'[৯]

পুত্রের কাছ থেকে এই তীব্র শ্লেষপূর্ণ চিঠি পেয়ে মুরাদ আর থাকতে পারলেন না। দ্রুত রাজধানীতে ফিরে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে বসফরাস পেরিয়ে বুলগেরিয়ার দিকে আগাতে লাগলেন।

---

৭. "Murad II| Ottoman sultan". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2017-01-20

৮. "Murad II| Ottoman sultan". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2017-01-20

৯. Finkel, Caroline (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923. Basic Books. ISBN 978-0-465-02396-7.

ভার্না হ্রদের তীরে

এক

ক্রুসেডার ক্যাম্পে ওয়ার কাউন্সিলের সভা চলছে।

পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল জুলিয়াস সিজারিনি কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন।

'অটোমানদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাদের ঘোড়সওয়াররা। তাদের গতির সাথে তাল মেলানো খুবই কঠিন। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত আমাদের যে অবস্থান, তাতে আমাদের উচিত হবে দেভনিয়া নদীর জলাভূমির ঠিক পেছনে সৈন্য সাজানো। তারা লেক ভার্না আর ভার্না উপসাগরের পানির ওপর দিয়ে আমাদের উইংয়ে হামলা করতে পারবে না, তাদের সিপাহীরা নদীর পাড়ের জলাভূমিতে অচল হয়ে যাবে আর আমাদের হুসাইট ও নাইট যোদ্ধারা তাদের খোলা ময়দান থেকে ছুটে এসে একদম পিষে ফেলবে।'

তার এই কথার সমর্থনে উঠে দাঁড়ালেন বিশপ এর্জেস।

'মহামহিম ঠিকই বলেছেন। এতে করে অটোমানদের বাহিনীকে আমরা কোণঠাসা করে রাখতে পারব, এমনকি তারা সংখ্যায় বেশি হলেও খুব একটা সুবিধা তারা এখানে পাবে না।'

প্রায় সবাই এই কথাতেই একমত হলেন।

তখনো বাকি প্রধান তিন ব্যক্তি।

পোল্যান্ডের রাজা ভ্লাদিস্লাভ, হাঙ্গেরির জন হুনয়াদি আর ওয়ালাসিয়ার মির্চিয়া।

হুনয়াদি প্রশ্ন তুললেন,'তাহলে আপনারা আবারও অটোমানদের আক্রমণ করার সুযোগ দিতে চাইছেন? অথচ আমরা ঈশ্বরের পবিত্র ধর্মের যোদ্ধা। আমাদের বরং উচিত এই জলাভূমি পেরিয়ে ফ্রাঙ্গা প্লাটার উঁচু জায়গাতে পজিশন নেয়া। সেখান থেকে আমাদের সওয়াররা অটোমানদের দিকে আগানোর সময় ওপর থেকে নিচে নামবে, আর অটোমানদের জন্য বিষয়টা হবে স্রেফ উল্টো। দু পাশের খাড়া মালভূমির পাথুরে জমিতে ওদের ঘোড়ার বেগ কমে আসবে, আমাদের বর্শা দিয়ে ওদের আমরা স্রেফ গেঁথে ফেলব।'

ভ্লাদিস্লাভ খুব সংক্ষেপে বললেন, 'আক্রমণ ছাড়া আর কিছু ভাবা অসম্ভব, পিছিয়ে যাওয়া অকল্পনীয়।'

মির্সিয়াও সুর মেলালেন তাদের সাথে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তারা এমন এক অবস্থানে আছেন, যেখান থেকে আক্রমণই সেরা সিদ্ধান্ত। রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে লড়াই করলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেক্ষেত্রে তারা একদিক থেকে উঁচু পাহাড়ী এলাকা, অন্যদিক থেকে সাগর এবং আরেক দিক থেকে লেক ভার্নার মাঝে আটকা পড়বেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হলো চব্বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে আট হাজার থাকবে ভ্লাদিস্লাভের সাথে বাহিনীর সম্মুখে। কেন্দ্রে থাকবে হাঙ্গেরির ম্যাগনেটরা, সাথে বুলগার বিদ্রোহী বাহিনী চেক ও ক্রোয়াটরা।

সেন্টারের ওয়াগন ফোর্ট্রেসের কমান্ডে থাকবেন জন হুনয়াদি। তার পেছনে থাকবে ট্রানসিলভানিয়ার চার হাজার ক্যাভালরি।

রাইট ফ্ল্যাঙ্কে থাকবেন টিউটনিক নাইট, বোহেমিয়ান হেভি ক্যাভালরি ও ওয়ালাসিয়ান ক্যাভালরির মোট ছয় হাজার যোদ্ধা নিয়ে সিজারেনি। তারা থাকবে ভার্না উপসাগর ও ফ্রাঞ্জা প্লেটের মাঝখানে।

লেফট ফ্ল্যাঙ্কে থাকবেন মাইকেল সিলিয়াগি, তার অধীনে যোদ্ধার সংখ্যা পাঁচ হাজার।

লেফট ফ্ল্যাঙ্ক পজিশন নিল ভার্না হ্রদের কাছ ঘেঁষে একটু ঢালু জায়গাতে। পেছনে দেভনিয়া নদী। সামনে ঢালু ময়দান। অপেক্ষা শুধু সুলতানের।

ক্রুসেডাররা শিকারী বাঘের মতো ওঁৎ পেতে আছে।

দুই

সুলতানের অবস্থা হলো জলে কুমির ডাঙায় বাঘের মতো। জলে কুমিরের বদলে তার জন্য অপেক্ষা করছিল ভেনিস আর জেনোয়ার নৌবাহিনী, ডাঙায় ক্রুসেডার বাহিনী।

ভেনেশিয়রা দার্দানেলিস প্রণালি ব্লক করে দিল ক্রুসেডের সমর্থনে।[১]

মুরাদ এই খবর পেয়ে নিজের চল্লিশ হাজার সৈন্যের ষোল হাজারকে পেছনে রেখে আসলেন রাজধানী রক্ষার জন্য।

জোমোইসদের ঘুষ দিয়ে দার্দানেলস পেরিয়ে তিনি বাকি চব্বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অবস্থান নিলেন লেক ভার্নার দক্ষিণ পশ্চিমে থাকা সমভূমিতে।

---

১. Imber. C.. 2009. The Ottoman Empire. 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan.

সেন্টারের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন সুলতান। এখানে তার সাথে আছে পাঁচ হাজার জানিসারি এবং প্রায় দুই হাজার কাপিকুলু সিপাহী।

রাইট ফ্ল্যাঙ্কে তিন হাজার রুমেলিয়ান ক্যাভালরি, নেতৃত্বে কাসিম পাশা। লেফটে আরও তিন হাজার আকিনজি লাইট ক্যাভালরি, তাদের কমান্ডার শাহিন বে। লেফট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে বেশ কিছুটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন দাউদ পাশা, চার হাজার আনাতোলিয়ান সিপাহী নিয়ে।

বাহিনীর একদম সামনে রইল লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড আজব, রিয়ার গার্ড হিসেবে থাকল কাপিকুলু ক্যাভালরি।

নভেম্বর মাসের দশ তারিখ, ১৪৪৪ সালের তীব্র শীতে বুলগেরিয়ার তীব্র ঠান্ডায় দুই বাহিনী আবারও মুখোমুখি হলো।

তিন

অটোমান বাহিনীর লেফট ফ্ল্যাঙ্ক প্রথম সুযোগেই 'হাইদির আল্লাহ' ধ্বনিতে হামলা করে বসল ক্রুসেডার রাইট ফ্ল্যাঙ্ককে। তাদের ঝাঁক ঝাঁক তীর থেকে বাঁচতে কয়েক দফা পিছু হটতে বাধ্য হলেন সিজারেনি। যখন কোনোমতেই তাদের সামলানো গেল না, তখন তিনি পিছিয়ে ওয়াগন ফোর্ট্রেসের ভেতর চলে গেলেন।

হাঙ্গেরি থেকে আসা কামানগুলো বেরিয়ে এল খোলা ময়দানে।

শত শত তুর্কি যোদ্ধারা কামানের গোলার সামনে পড়ে মরতে লাগল। কয়েকবার ক্যাভালরি চার্জের চেষ্টা করতে গিয়ে শহিদ হলেন অসংখ্য সিপাহী আর আকিনজি। বাধ্য হয়ে শাহিন বে তাদের পিছিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। এবার ওয়াগন ফোর্ট্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তাদের পিছু ধাওয়া করলেন সিজারেনি।

ওদিক দিয়ে জন হুনয়াদির বাহিনী সেন্টারের আজব ব্রিগেডের ওপর তুফান বইয়ে দিচ্ছিল। জন যেদিকেই যাচ্ছিলেন সেদিকেই লাশের স্তূপ পড়ে যাচ্ছিল। দুপুর নাগাদ অটোমানদের সেন্টার ফ্রন্ট ফাঁকা হয়ে গেল, সচল দুর্গের মতো ওয়াগন ফোর্ট্রেস একটু একটু করে মুরাদের ব্যূহ ভেদ করার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

রক্তাক্ত ময়দানের চেহারা পাল্টে দিলেন দাউদ পাশা।

তার কাপিকুলু সিপাহীরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে কামানের গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে জানবাজি রেখে হামলা চালাল সিজারেনির বাহিনীর ওপরে। তীর বৃষ্টিতে হাঙ্গেরিয়ান আর্টিলারি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে দেভনিয়া নদীর দিকে ছুটলেন সিজারেনি কিন্তু দাউদ পাশার বাহিনী তাকে ও তার বাহিনীকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল।
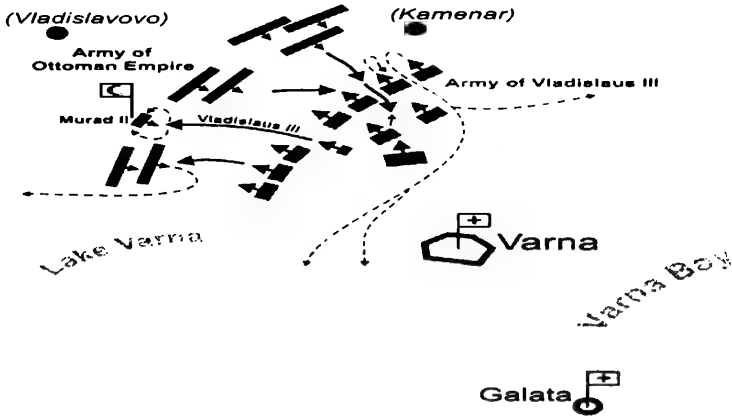
ব্যাটল অফ ভার্নাঃ ট্যাকটিক্যাল ম্যাপ।

রুমেলিয়ান ক্যাভালরি জন হুনয়াদির আক্রমণে প্রথমে পিছু হটলেও আবার ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তাদের চাপে ক্রিশ্চিয়ান লেফট ফ্ল্যাঙ্ক পুরোপুরি গুঁড়িয়ে গেল। মাইকেল জিলিয়াগি পালালেন, তিনি পালানো মাত্রই ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছনে পিছনে ছুটল ওয়ালাসিয়ার যোদ্ধারা। কিন্তু নাইটরা আবারও যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল প্রচণ্ড এক কাউন্টার অ্যাটাকে।

একই সাথে এবার অটোমানদের সেন্টার উন্মুক্ত হয়ে গেল পোলিশদের সামনে, আবার পোলিশ লেফট ফ্ল্যাঙ্ক উন্মুক্ত হয়ে গেল অটোমানদের সামনে।

জন হুনয়াদি বুঝলেন এই যুদ্ধ বাঁচাতে হলে তাকে নিজেদের লেফট ফ্ল্যাঙ্ক টিকিয়ে রাখতেই হবে, তাই নিজে দ্রুত সেদিকে আগালেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত অ্যাডভান্স করতে ভ্লাদিস্লাভকে মানা করে দিয়েছিলেন হুনয়াদি কিন্তু সুযোগ দেখে ভ্লাদিস্লাভ নিজেকে আর থামাতে পারলেন না।

নিজের হেভি ক্যাভালরি নিয়ে চার্জ করে তিনি জানিসারিদের প্রতিরোধ চুরমার করে দিলেন। শত্রুর হাতের নাগালে চলে এলেন সুলতান মুরাদ, ঠিক এমনি মুহূর্তে ঘটে গেল মহাবিপর্যয়।

কাপিকুলু ও জানিসারি বাহিনীর কয়েকটি জামাত দ্রুত ভ্লাদিস্লাভকে ঘিরে ফেলল। একই সাথে ভ্লাদিস্লাভের ঘোড়া একটা ঘোড়ামারা শূলে বিধে মাটিতে পড়ে গেল। আজব বাহিনীর এক যোদ্ধা খোজা হাজারের এক আঘাতে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ভ্লাদিস্লাভের মাথা।[২]

---

২. Jaczynowski, Lech (January 2017). Supposed Gravesites of Władysław III of Varna (PDF). p. 193. ISBN 9788374555265. Retrieved 21 December 2017.
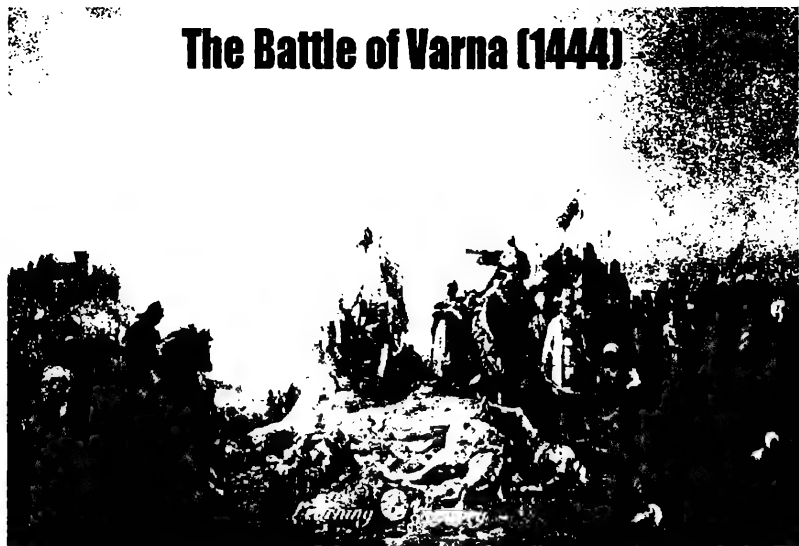
সুলতান মুরাদের খুব কাছাকাছি চলে এসে নিহত হন ভ্লাদিস্লাভ।

মুরাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে জানিসারিরা জানবাজি রেখে এগোতে লাগল। এবার তাদের ঠেকানো কারও পক্ষেই সম্ভব হলো না।

জানিসারি-কাপিকুলু যৌথ আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গোটা পোলিশ আর্মি।

জন কয়েকবার চেষ্টা করলেন ভ্লাদিস্লাভের লাশ উদ্ধার করতে। কিন্তু তুর্কি হেভি ক্যাভালরিদের চার্জে টিকতে না পেরে তাকে ফিরতে হলো খালি হাতে।

লেক ভার্না থেকে ভার্না উপসাগর পর্যন্ত পড়ে রইল চল্লিশ হাজার লাশ।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মতো বেশি ছিল, মুরাদ তিন দিন পর্যন্ত বুঝতে পারেননি যে তিনি আসলে যুদ্ধে জিতেছেন। যুদ্ধে জিতেও শহিদের বিপুল সংখ্যা দেখে তিনি আক্ষেপ করে বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ, তুমি এমন বিজয় কাউকে দিও না।

সুফি সুলতান

এক

ভার্নার যুদ্ধের পর গোটা বলকান অঞ্চল, দানিয়ুব বেসিন, পোল্যান্ড আর ইতালিতে হাহাকার পড়ে গেল।

পোল্যান্ডের রাজা ভ্লাদিস্লাভ জবাই হয়ে গেছেন যুদ্ধের ময়দানে। এই ধাক্কা সামলাতে পোল্যান্ডের তিন বছর লেগেছিল। এই তিন বছর পোল্যান্ডের সিংহাসন ছিল শূন্য। শাসক বা শাসন বলতে কিছু সেখানে ছিল না।[১]

বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল হাঙ্গেরির বাহিনী।

পোপ আবার হতাশ হলেন। এবারও মুসলিমদের ইউরোপ থেকে বের করে দেয়া গেল না। সবচেয়ে বড় কথা, একজোট হয়ে ফের ক্রুসেড করার মতো শক্তি চার্চের হাতে আর বাকী থাকল না। ফলে বাইজান্টাইন সম্রাটের নিয়মিত অটোমানদেরকে কর দেয়া ছাড়া উপায় রইল না।

ওয়ালাসিয়ার ভ্লাদ হয়ে পড়লেন মুরাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে নিজের দুই ছেলেকে অটোমানদের কাছে পাঠালেন তিনি। সুলতানের ছেলেদের সাথে তারা বড় হতে লাগল একসাথে।[২]

রাজধানীতে ফিরে মুরাদ আবার তার ছেলে মুহাম্মাদের কাছে সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে উধাও হলেন, যদিও তিনি কখনোই ভাবেননি মুহাম্মাদের মতো বেয়াড়া ছেলেকে তার সিংহাসন দিতে হবে।

মুহাম্মাদের বড় দুই ভাই ছিল মুরাদের খুব প্রিয়। কিন্তু শিশুকালেই তাদের দুজনের মৃত্যু হয়। এরপর সুলতানের আশা ছিল তার ছেলে আলি।

---

১. . Nandris, G., 1966. The historical Dracula: The theme of his legend in the Western and in the Eastern literatures of Europe. Comparative Literature Studies, 3(4), pp.367-396.

২. Inalcik, H., 1960. Mehmed the Conqueror (1432-1481) and his Time. Speculum, 35(3), pp.408-427.

এক দিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে সুলতান জানতে পারলেন আলি ঘুমের মধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। মুহাম্মাদের বয়স তখন সাত বছর।

আলির মৃত্যুর আগে মুরাদ কোনোদিন মুহাম্মাদকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবেননি। মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না জানলে মুরাদ হয়তো বুঝতে পারতেন কী ছেলে তিনি জন্ম দিয়েছেন।

দুই

অটোমান সুলতানরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে ছিলেন বাড়াবাড়ি রকমের সচেতন।

মাত্র সাত বছর বয়স হলেই শাহজাদাদের পাঠানো হতো রাজধানীর বাইরে কোনো এক প্রদেশের গভর্নর হিসেবে, তাদের মায়ের সাথে। সাহায্যকারী হিসেবে যেতেন সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কোনো পাশা।

মুরাদের সময়ে সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছিল বিপদের ঘনঘটা। বিদ্রোহের আগুন যেন শাহজাদাদের ছুঁতে না পারে সেজন্য জন্মের পর যত দ্রুত সম্ভব তাদের রাজধানীর বাইরে পাঠাতেন তিনি। মুহাম্মাদকে দুই বছর বয়সেই আমাসিয়াতে পাঠানো হলো তার মায়ের সাথে। তার মা ছিলেন একজন গ্রিক দাসী, হুমা খাতুন।[৩]

পাঁচ বছর পর যখন সুলতানের কাছে মুহাম্মাদকে নিয়ে আসা হয়। তখন মুরাদ দেখলেন তার শাহজাদা ভীষণ রকমের একরোখা। শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ। শাহজাদার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো ছেলের এই অবস্থা কেন। তিনি জানালেন এই ছেলে ভীষণ অবাধ্য। কারও কোনো কথাই শোনে না।

মুরাদ ছেলেকে শায়েস্তা করলেন নিজের হাতে। তারপর দুজন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিকে শাহজাদার উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

প্রথমজন উলামা আহমাদ কুরআনি। দ্বিতীয়জন শায়খ আক শামসউদ্দিন।

শাহজাদা কথা না শুনলে তাকে শায়েস্তা করার জন্য উস্তাদদের একটা মোটা বেত দেয়া হলো।

বেতের বাড়িতে কাজ হয়েছিল। বেয়াড়া শাহজাদা মুহাম্মাদ মাত্র পাঁচ বছরের ভেতরে সুন্নি মতবাদ, শিয়া মতবাদ, সুফি মতবাদ, ক্যাথলিসিজম, অর্থডক্স মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞানী হয়ে ওঠলেন।

কুরআন-হাদিসের ওপর তার গভীর জ্ঞান ফুটে উঠতে লাগল। একই সাথে আরবি, ফার্সি আর তুর্কি বলতে শিখে গেলেন মুহাম্মাদ, তখন তার বয়স মাত্র বারো। তিনি শিখেছিলেন কীভাবে জাহাজ বানাতে হয়, তিনি জানতেন কীভাবে কামান বানাতে হয়, শিখেছিলেন কীভাবে দুর্গের ডিজাইন করতে হয়, সেই সাথে তিনি ছিলেন এক জাত যোদ্ধা।

---

৩. Peirce, L.P., 1993. The imperial harem: Women and sovereignty in the Ottoman empire. Studies in Middle Eastern Hist

১৪৪৪ সালে তাই তার ওপর শাসনভার দিয়ে আনাতোলিয়াতে উধাও হয়েছিলেন মুরাদ। তসবি-জায়নামাজ আর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কাটতে লাগল সুলতানের নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

ওদিকে মুহাম্মাদের পড়াশোনার প্রতি এলার্জি গেলেও তার একরোখা স্বভাব বদলায়নি। যথারীতি তিনি গণ্ডগোল লাগিয়ে ফেললেন প্রধান উজির জান্দারলি খলিল পাশার সাথে। মতবিরোধের মূল কারণ ছিল সৈন্যদের বেতন দেয়া।

খলিল ঠিক করলেন ছোকরা সুলতানকে তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবেন তিনি কী জিনিস।

রাজধানীতে জানিসারি বিদ্রোহ শুরু হলো খলিল পাশার মদদে। জানিসারিরা বাজার লুট করে, বন্দরে আগুন লাগিয়ে অ্যাড্রিয়ানোপলে আতঙ্ক সৃষ্টি করল বাড়তি বেতনের দাবিতে। মুহাম্মাদ খলিল পাশাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনোমতে বিদ্রোহ দমন করলেন, কিন্তু এই ঘটনা তিনি কখনো ভোলেননি।

খলিল পাশার সাথে তার বিরোধ ক্রমেই বাড়তে থাকল। শিহাবউদ্দিন পাশা আর ইয়াকুব পাশা নামের দুজন উজির হয়ে ওঠলেন মুহাম্মাদের কাছের লোক।

বছর দুইয়ের মধ্যেই রাজকাজের ওপর একেবারে বিরক্ত হয়ে গেলেন মুহাম্মাদ। তেরো চৌদ্দ বছরের এক কিশোর যখন সুলতান হয় তখন এটাই স্বাভাবিক।

খলিল পাশার সাথে বিরোধ আরও বাড়ল।

ওদিকে বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে পড়াশোনা করে খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মকে প্রায় মিশিয়ে ফেলতে লাগলেন মুহাম্মাদ।

শাহজাদা মুহাম্মাদের জীবনের এই দিশেহারা দিনগুলোতে তার পথপ্রদর্শক ছিলেন শায়খুল ইসলাম উস্তাদ আক শামসউদ্দিন। তিনি প্রচুর সময় নিয়ে কিশোর সুলতানের জ্ঞান পিপাসা মিটিয়ে তার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করলেন। মুহাম্মাদ তার এই উস্তাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

শাহজাদার ওপর আক শামসুদ্দিনের প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে, সিংহাসনে শাহজাদা বসা অবস্থায় তিনি দরবারে প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ শাহজাদা ঠায় দাঁড়িয়ে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। উস্তাদ না বলা পর্যন্ত শাহজাদা মুখ তুলতেন না।

কিন্তু দরবারে একজন উলামার এত প্রভাব খলিল পাশা মেনে নিতে পারলেন না। আকা শামসুদ্দিনের সাথে খলিল পাশার আবার মতবিরোধ শুরু হলে মুহাম্মাদ তার উস্তাদের পক্ষ নিলেন।

ফলাফল, ১৪৪৬ সালে মুরাদের কাছে নালিশ গেল, শাহজাদা সালতানাত পরিচালনায় অক্ষম। জানিসারিরা আবার বিদ্রোহ করতে পারে।

নিরূপায় মুরাদ তার দরবেশী জীবন ছেড়ে আবার সিংহাসনে বসলেন।

ইউরোপে এত দিন ধরে ঘাপটি মেরেছিলেন জন হুনয়াদি। আবার সৈন্য যোগাড় করে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন তিনি। ১৪৪৮ সালে আবারও সার্বিয়ার ডেস্পট ব্রাঙ্কোভিচকে তিনি অটোমান সালতানাত আক্রমণের জন্য ফুসলাতে লাগলেন।

সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মানি থেকে একদল সৈন্য আসার খবরে হুনয়াদির সাহস অনেক বেড়ে গেল। বসনিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি মিলে আবার অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে লাগল।

মুরাদ আর মুহাম্মাদ, দুই বাপ-ব্যাটা মিলে বেরিয়ে পড়লেন অভিযানে।

কসোভোর ময়দানে হবে ফয়সালা, ইউরোপে অটোমানরা থাকবে কিনা।

তিন

১৫ শ শতকের মাঝামাঝি, ইউরোপের মানচিত্র ছিল এখনকার চেয়ে অনেক আলাদা।

স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানিসহ গোটা মধ্য ইউরোপ, হাঙ্গেরি-সার্বিয়াসহ বলকান পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যেই মূলত সীমিত ছিল মানুষের বসবাস। পোল্যান্ড-স্ক্যান্ডিনেভিয়ার জনসংখ্যা ছিল সীমিত।

প্রচণ্ড ঠান্ডায় পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া জমি চাষের উপযোগী হতে হতে এপ্রিল চলে আসত। এপ্রিলে ফসল লাগিয়ে সেই ফসল ঘরে তুলতে চলে আসত জুলাই মাস।

১৪৪৮ সালের দিকে তাই জন হুনয়াদি বলকান অঞ্চলে অটোমান বিরোধী খ্রিষ্টান বিপ্লবের পরিকল্পনা আঁটছিলেন, তা জুলাইয়ের আগে মাঠের লড়াইয়ে রূপ দেয়া সম্ভব হলো না। পেটে খাবার না থাকলে অনেক সময় ধর্মের কথাও বিস্বাদ লাগে।

বলকানের খ্রিষ্টানরা মাঠের ফসল কেটে তারপর ধীরে ধীরে ১৪৪৮ সালের অগাস্ট নাগাদ জন হুনয়াদির বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। হুনয়াদি ছিলেন এক দুর্দান্ত গেরিলা ফাইটার। তার দেয়া প্রশিক্ষণে গেরিলা ওয়ারফেয়ারে দক্ষ হয়ে উঠল হাঙ্গেরির ক্রুসেডার বাহিনী।

এরসাথে যুক্ত হলেন ইসকান্দার বেগ নামের এক সাবেক জানিসারি কমান্ডার। বহু বছর অটোমানদের জানিসারি বাহিনীতে কাজ করে তিনি অটোমান মিলিটারি ট্যাকটিক্স শিখেছিলেন। তারপর জন্মভূমি আলবেনিয়াতে গিয়ে গড়ে তুলেছেন গেরিলা বাহিনী। এই দুই বাহিনী একসাথে যুক্ত হয়ে গড়ে উঠল জন-ইস্কান্দারের শক্তিশালী সেনাদল। সাথে যোগ দিল বসনিয়াক বাহিনীর হেভি ক্যাভালরি নাইটরা, ওয়ালাসিয়ান লাইট ক্যাভালরি, বুলগেরিয়ান নাইটদের অল্প কিছু অংশ।

কিন্তু তারা দেরি করে ফেলেছিল জার্মান ক্রুসেডারদের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে। সব মিলিয়ে তারা মেসিডোনিয়াতে পৌঁছায় অক্টোবর মাসে এসে, শীত তখন আসি আসি করছে।

কসোভোর ময়দানে ৫৯ বছর আগে এমনই এক যুদ্ধে অটোমানরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সার্বদের প্রতিরোধ। কাকতালীয়ভাবে তখনো সিংহাসনে ছিলেন মুরাদ নামের একজন। প্রথম মুরাদ।

এবার পরিস্থিতি অনেক ভিন্ন।

বারো শ মাইল মার্চ করে আসা হাঙ্গেরিয়ানদের বিপরীতে তারা পাড়ি দিয়েছে মোটে চার শ মাইল। হাঙ্গেরিয়ান আর্মির মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি।[৪] ওদিকে অটোমানদের যোদ্ধার পরিমাণ চল্লিশ হাজার।[৫] ১৬ অক্টোবর গভীর রাতে এল নতুন সাহায্য, সার্বিয়ান ডেস্পট জর্জ ব্রাঙ্কভিচ অটোমান ক্যাম্পে এসে হাজির হলেন। জন হুনয়াদিকে বহু আগে থেকেই পছন্দ করতেন না জর্জ। তাই তার অধীনে নিজের বাহিনী থেকে কাউকেই পাঠাননি তিনি। এতে ক্ষেপে গিয়ে তার রাজ্য লুট করলেন ইসকান্দার বেগ।

সময়মতো তাই এর শোধ তুলতে এলেন ব্রাঙ্কোভিচ।

চার

১৬ই অক্টোবর রাতে কসোভোর ময়দানের দক্ষিণে মুরাদ ঘাঁটি গাড়লেন। এবার তিনি পুরোপুরি ভিন্ন এক কৌশল নিয়ে এসেছেন।

জন হুনয়াদি এতকাল বারবার অটোমানদের চমকে দিয়েছেন, এবার মুরাদ তাকে চমকে দিতে চান।

অটোমান সেনাবাহিনীর বিশেষ ব্যারাকে গত কয়েক মাসে এক নতুন ইউনিট ট্রেনিং নিয়েছে, এদের নাম আরাবাচিলারি। গতবার জন অটোমানদের সাথে যা করেছেন, এবার মুরাদ জনের সাথে তাই করতে যাচ্ছেন। ওয়াগন ফোর্ট্রেসের তুর্কি নাম আরাবা। ক্রুসেডাররা ভাবতেই পারবে না বোহেমিয়ান এই ট্যাকটিক্স তুর্কিরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।

সেই সাথে মুরাদ তৈরি করেছেন একটা আর্টিলারি ইউনিট।

এই দুই চমকের পাশাপাশি তিনি শত্রুর জন্য নতুন আরও চমক তৈরি করছেন।

সারারাত ধরে জানিসারিরা কসোভোর ময়দানের একটা উঁচু জায়গার চারপাশে ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে তোলা মাটি দিয়ে দুপাশে দুটো ঢালু দেয়ালও তৈরি করা হচ্ছে,

---

[৪]. Bennett, The Hutchinson Dictionary of Ancient & Medieval Warfare, p. 182 "Hunyadi led 24,000 - 30,000 men including 10,000 Wallachians, but should have waited to join Scanderbeg's troops before confronting Murad's force of 40,000."

[৫]. Ágoston, G., 2014. Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450–1800. Journal of World History, 25(1), pp.85-124.

এর পেছনে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে প্রচুর শূল। অটোমানদের সেন্টারে আঘাত হানতে গেলে এগুলো পেরিয়ে তার পর আসতে হবে।

সকালে যুদ্ধ শুরু হবে, রাইট উইংয়ের দায়িত্ব দেয়া হবে ১৬ বছরের কিশোর শাহজাদা মুহাম্মাদকে, তার সাথে অবশ্য জাগান পাশা থাকবেন। রাইট উইংয়ে মূলত আনাতোলিয়ার সিপাহীরা থাকবে, সাথে পেছনে থাকবে মালকোচুলু পরিবারের আকিনজিরা।

লেফট উইংয়ে থাকবেন ইসহাক পাশা ও কারাদজা পাশা, তাদের সাথে রুমেলি সিপাহীরা। তাদের একটু সামনে থাকবে আকিনজি বাহিনীর আরেকটা দল। তুরখান, মিহাল আর এভ্রেনোস পরিবারগুলোর গাজিরা এদিকটাতেই থাকবে।

একদম সামনে আজবদের অবস্থান, বরাবরের মতো শত্রুর সামনে উন্মুক্ত তাদের জীবন।

সেন্টারে ট্রেঞ্চ আর মাটির দেয়ালের ভেতরের দিকে সুলতান তৈরি করেছেন মূল ব্যূহ। প্রায় দুই শ ওয়াগন একটা আরেকটার সাথে শেকল দিয়ে জোড়া দেয়া হয়েছে। মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে ষাঁড়, সেগুলোও শেকল দিয়ে জোড়া দেয়া।

ওয়াগনের ভেতর তৈরি মুরাদের জানিসারিরা। ওয়াগন ফোর্ট্রেসের ঘেরাওয়ের ভেতরে জানিসারি-কাপিকুলু আর আজবদের মিশ্রণ।

প্রতি তিনজন আজবের বিপরীতে একজন করে জানিসারি, একজন করে কাপিকুলু নিয়ে আরাবার ভেতরের দিকটা সাজানো হলো, যার একদম মাঝখানে সুলতান স্বয়ং।

সুলতানের ঠিক সামনেই আছে আর্টিলারি ইউনিট।

আরাবার বাইরে, মূল বাহিনী থেকে পেছনে আছে কাপিকুলুদের আরেকটা ব্রিগেড। এদের কাজ অন্যান্য ইউনিট শত্রুর আক্রমণ সামলাতে ব্যর্থ হলে শেষ মুহূর্তে বেপরোয়া আঘাত হেনে পরাজয় ঠেকানো।

কসোভোর ময়দানের অন্য প্রান্তে তখন চলছে আরেক হিসাব নিকাশ।

পাঁচ

জন হুনয়াদি জানেন এবার তার বাহিনী অটোমানদের তুলনায় দুর্বল। গতবার অল্প সময়ে তাড়াহুড়ো করে অটোমানরা মাত্র চব্বিশ হাজার সৈন্য আনতে পেরেছিল। এবার ব্যাপারটা পুরোপুরি আলাদা।

কিন্তু তার ধারণা, তিনি ট্যাকটিক্যালি অটোমানদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। তার ওয়াগন ফোর্ট্রেস ভেদ করে অটোমানরা ঢুকতে পারবে না। গতবার ভ্লাদিস্লাভ ভুল না করলে ভার্নার যুদ্ধে ক্রুসেডাররাই জিতত।

এ ছাড়াও তার কাছে আছে আর্টিলারি। তার কামানগুলো গতবারের মতো এবারেও তাকে অটোমানদের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে রক্ষা করবে।

প্লেমেন্টিনা টিলার ওপর নিজের ক্যাম্প গাড়লেন জন। তারপর পাহাড়ের ঢালে নিজের বাহিনীকে অবস্থান নিতে বললেন।

গতবারের মোকাবেলা থেকে জন বুঝতে পেরেছেন, অটোমানদের ক্যাভালরিকে কামানের গোলাবর্ষণ দিয়ে ঠেকিয়ে দেয়া যায়। তিনি তাই নিজের কামানের মুখগুলো বাহিনীর দুই উইংয়ে তাক করলেন।

১৭ অক্টোবর সকালে যুদ্ধ শুরু হলো।

প্রথমে ক্রুসেডার লেফট উইং আক্রমণ শুরু করল অটোমানদের রাইটে। লম্বা সময় ধরে তারা কামানের গোলার ছত্রছায়ায় হামলা চালিয়ে গেল। শাহজাদা মুহাম্মাদ এই হামলার সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে পারতেন না, যদি না জাগান পাশা তাকে সহযোগিতা করতেন। সারাদিন ধরে হামলা করে গেল ক্রুসেডাররা কিন্তু অটোমান রাইট ফ্ল্যাঙ্ক তারা ভাঙতে পারল না।

দুপুর থেকে অটোমানদের লেফট উইং দিয়ে আঘাত হানল জনের হেভি ক্যাভালরি, দাঁতে দাঁত চেপে হামলা ঠেকিয়ে গেলেন কারাদজা পাশা আর ইসহাক পাশা। লেফট উইংয়ে ইউরোপিয়ান হেভি ক্যাভালরির শক্তিশালী একেকটা চার্জ হজম করতে প্রতিবারই শহিদ হচ্ছিলেন প্রচুর সিপাহী। অটোমানদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো কিন্তু তারা হাল ছাড়ল না।

কয়েক দফা পিছু হটার পর আচমকা উদয় হলো এভ্রেনোস গাজি, মিহাল গাজি আর তুরখান গাজি পরিবারগুলোর অধীনে থাকা বিদ্যুৎগতির আকিনজি বাহিনী। শুরু হলো মধ্য এশিয় সওয়ারি তীরন্দাজীর ভেলকি। পুরোদমে ছুটতে থাকা ঘোড়ার পিঠ থেকে একের পর এক তীর ছুঁড়ে গাজিরা ক্রুসেডারদের সামনে তীরের দেয়াল তৈরি করলেন। ঝাঁক ঝাঁক তীর ক্রুসেডারদের ছেঁকে ধরল।

প্রথম দিকে তারা ঢাল দিয়ে তীর ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঢাল ভেদ করেই ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল শক্তিশালী অটোমান ধনুক থেকে ছোঁড়া অনেক তীর। গাজিরা এতদূর থেকে তাদের দিকে তীর ছুঁড়ছিলেন যে, ক্রুসেডারদের ক্রসবো থেকে ছোঁড়া তীর কোনোভাবেই তাদের ধারে কাছে পৌঁছতে পারছিল না।[৬]

গাজিদের তীরবৃষ্টির কাভার নিয়ে সিপাহীরা আবার এগিয়ে গেল ক্রুসেডারদের দিকে। এরপর তীর নিক্ষেপ থামিয়ে গাজিরাও যোগ দিলেন হামলায়। মুখোমুখি যুদ্ধে দুই পক্ষেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো।

আগের দিন দুই উইংয়ে আঘাত হানার পরেও কোনো কাজ হলো না দেখে পরদিন জন নিজে অটোমানদের সেন্টারে আঘাত হানলেন। অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করলেন অটোমানরা তার প্রযুক্তি নকল করে তার চেয়েও ভালো ওয়াগন ফোর্ট্রেস বানিয়ে বসে আছে।[৭]

---

[৬]. Foley, V., Palmer, G. and Soedel, W., 1985. The crossbow. Scientific American, 252(1), pp.104-111.

[৭]. Uyar, M. and Erickson, E.J., 2009. A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. ABC-CLIO.

কামানের গোলার আওয়াতায় জন হুনয়াদির বাহিনী আসার সাথে সাথে বোম্বিং শুরু করল মুরাদের কামানচির দল। এরমধ্যে দিয়েই কয়েকবার দুর্দান্ত আক্রমণ চালালেন হুনয়াদি। মুরাদের জানিসারিরা বীরত্বের সাথে এই হামলা রুখে দিল। জন এবার জেনারেল অ্যাসল্ট ঘোষণা দিয়ে তার পুরো বাহিনীকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। কিন্তু আবারও ভেলকি দেখালেন গাজিরা।

'হাইদির আল্লাহ!' হুংকার দিয়ে নিজেদের অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে তারা ঘূর্ণিবায়ুর মতো ছুটে এসে আঘাত হানলেন ক্রুসেডারদের দুই উইংয়ে। তাদের দূরপাল্লার তীরগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুর ওপর পড়ছিল। ইস্পাতের প্লেট আর্মার ভেদ করেও অনেক তীর শত্রুদের আহত করছিল। সেই সাথে গাজিদের দুর্বার ক্যাভালরি চার্জ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। প্রচুর লাশ ফেলে পালিয়ে গেল তারা।

ক্লান্ত হুনয়াদি ঠিক করলেন রাতে তিনি এক গেরিলা হামলা চালিয়ে অটোমানদের সাবাড় করে দেবেন।[৮]

পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঝরাতে হামলা করতে গিয়ে হুনয়াদি দেখলেন অটোমানদের দুই উইংয়ের সৈন্যরা নেই, মাঝে শুধু সুলতান মুরাদের সেন্টার।

এই অবস্থা দেখে তিনি বেপরোয়া এক হামলা চালালেন তার পুরো বাহিনী নিয়ে। আর তখনই ভূতের মতো এসে হাজির হলো কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি ডিভিশন। রাতের আঁধারেও তাদের তীব্র বেগের তলোয়ার চালনায় দিশেহারা হয়ে নিহত হলো প্রচুর ক্রুসেডার।

ঘণ্টাখানেকের লড়াইতে নাজেহাল হয়ে গেল হুনয়াদির বাহিনী। লড়াই শেষে বিশ্রাম নিলেন সুলতান। এই লড়াইয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হয়েছিল। তাই মুরাদ সিদ্ধান্ত নিলেন, সকালে তিনি সরাসরি তা ক্যাম্পে আঘাত হানবেন।

পরদিন খুব সকালে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে ক্রুসেডারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুরাদ।

মুরাদ আসছেন জানতে পেরে প্রাণ নিয়ে পালালেন যে যার মতো। সবার আগে পালালেন জন হুনয়াদি আর লাডিসলাস। পালিয়ে হাঙ্গেরি ফেরার পথে জন হুনয়াদি বন্দি হলেন ব্রাঙ্কোভিচের হাতে। এক লাখ ফ্লুরিনের বিনিময়ে সার্বিয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে হাঙ্গেরি ফিরে গেলেন তিনি।[৯]

বলকানে অটোমান নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত হলো।

মুরাদ প্রমাণ করলেন, বলকানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন রাখার ক্ষমতা অটোমানদের আছে।

---

৮. Ágoston, G., 2014. Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450–1800. Journal of World History, 25(1), pp.85-124.

৯. Molnár, Miklós (2001-04-30). A Concise History of Hungary. Cambridge University Press p. 65. ISBN 9780521667364. Retrieved 12 September 2012.

গুলবাহার

এক

চমৎকার রোদ উঠেছে বাগানে।

নীল আকাশ, হালকা ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বইছে ফুলের সুবাস। পপলার গাছের নিচে বসে রুমাল সেলাই করছে এক ছিপছিপে কিশোরী।

দুধে আলতা গায়ের রং। নাকটা খাড়া। টানা টানা দুই চোখে শিশুর সরলতা আর বালিকার দুষ্টুমি একসাথে মিশে গেছে। সেলাই শেষ হয়ে আসছে প্রায়।

ডানদিকে হঠাৎ একটা শব্দ হলো। বার্চ গাছের ছালের মধ্যে গেঁথে গেল একটা তীর। মেয়েটা বুঝতে পারল না কী হয়েছে। ডানে বায়ে ভীত হরিণীর মতো কয়েকবার চাইল সে।

একটু পর আরেকটা তীর গাঁথল তার ঠিক সামনের গাছটায়। তীরে একটা নাম লেখা।

মেয়েটা জানে নামটা কার।

ঝকঝকে এক হাসি দিয়ে সুঁই সুতো রেখে সে ওঠে দাঁড়াল। তারপর পা টিপে টিপে তীরটা গাছের গা থেকে খুলতে এগোতে থাকল।

কাছাকাছি পৌছতেই হঠাৎ দুটো তরুণ শক্তিশালী বাহু তাকে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নিল।

তীরের মালিক এসে গেছে। শাহজাদা মুহাম্মাদ।

এই মেয়ে এক আলবেনিয়ান দাসী। নাম গুলবাহার।[১]

---

১. Imber, C., 2009. The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan.

বাগানের ভেতর গুলবাহারকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছিলেন মুহাম্মাদ। গুলবাহারের চোখে তার চোখ আটকে গেল। গুলবাহার লাজরাঙা হয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

মুহাম্মাদ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন–

> Like a slave, you have tied me up to the chain of the locks of your hair, May Allah not liberate me from adoring you.*

গুলবাহারের গোলাপি ঠোঁটে মুচকি হাসির সাথে ফুটে হাফিজ শিরাজীর কবিতা–

> The Earth would die if the sun stopped kissing her.

গুলবাহারকে নিয়ে আজ শাহজাদা শিকারে বের হবেন। পাহারাদারদের দূরে থাকতে বলা হয়েছে। পাহাড়ী বনে বুনো ছাগল শিকার করে গুলবাহারকে দেখাতে খুব ভালো লাগে শাহজাদার। ঘোড়ার কাছে এসে গুলবাহারকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলেন মুহাম্মাদ। তারপর নিজে উঠে গেলেন।

গুলবাহার ঘাবড়ে গেল।

শাহজাদাকে সে প্রশ্ন করল, আমি যদি ঘোড়া থেকে পড়ে যাই?

মুহাম্মাদ জবাব দিলেন, তুমি তোমার সুলতানের সাথে আছ।

ম্যাগনেসিয়ার পাহাড়ী জঙ্গলে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শিকার করেছিলেন মুহাম্মাদ। তার জানা ছিল না, গুলবাহারের প্রতি তার ভালোবাসার খবর অ্যাড্রিয়ানোপলে চলে গেছে।

সকালবেলা শাহজাদার তাঁবু থেকে গুলবাহার যখন বের হলো, তার মুখ আনন্দে ঝলমল করছিল। জীবনভর সে তার সুলতানকে আঁকড়ে ধরেছিল। সে কখনো পড়েনি।

দুই

শাহজাদা যে বেয়াড়া, এটা মুরাদের জন্য নতুন কিছু ছিল না।

মুহাম্মাদ বড় হয়েছে তার বিয়ে দেয়া দরকার সেটা বেশকিছু দিন ধরেই মুরাদ অনুভব করছিলেন।

শাহজাদাদের বিয়ে দিতে হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যের রাজকুমারীর সাথে। তাই প্রধান উজির জান্দারলি খলিল পাশার সাথে কথা বলে যুলকাদিরের আমির সুলেইমান বের কাছে দূত পাঠালেন মুরাদ। এই দূত ছিলেন সানজাক বে খিজির পাশার স্ত্রী এরিন খাতুন।

---

*. Divan - i -Avni (Sultan Muhammad Al Fatih)

এরিন খাতুনের চোখ পড়ল সুলেইমান বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে সিত্তিসাহর ওপর। ১৪৫০ সালের বসন্তে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়েতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বেচ্ছায় রাজি হননি মুহাম্মাদ।

তার প্রিয় গুলবাহার ছাড়া অন্য কাউকে তিনি ভাবতে পারছিলেন না নিজের জন্য। গুলবাহার হতে পারে দাসী, কিন্তু রাজকুমারী সিত্তিসাহ এর চেয়ে গুলবাহার মুহাম্মাদের কাছে অনেক বেশি প্রিয়। অনেক বেশি দামি। মুহাম্মাদকে সে কিনে নিয়েছে তার সরল চোখ দুটোর অব্যক্ত ভাষা দিয়ে, হাসি দিয়ে, আর তার প্রশ্নহীন আনুগত্য দিয়ে।

সিত্তিসাহর এগুলোর কোনোটাই ছিল না। রাজকীয় সৌন্দর্যের সাথে তার ছিল প্রচণ্ড অহংকার। ধুমধাম করে হওয়া মুহাম্মাদের রাজকীয় বিয়েটা তাই সুখের হলো না। শুধু রূপ দিয়ে কখনো পুরুষ মানুষ আটকে রাখা যায় না। পুরুষেরও হৃদয় থাকে। সেটা জয় করার ক্ষমতা রাজকুমারী সিত্তিসাহর ছিল না। ছিল দাসী গুলবাহারের।

বিয়ের পরেও মুহাম্মাদের কোনো পরিবর্তন হলো না।

বেশিরভাগ অবসর সময় তিনি কাটাতে লাগলেন গুলবাহারের সাথে।

প্রথম প্রেম মানুষের জীবনে সবচেয়ে গভীর দাগটা কেটে দেয়। গুলবাহার এখানে সফল ছিল। মুহাম্মাদকে নিজের কাছে আটকে রাখার জন্য তাকে জোর করতে হয়নি। তিনি শুধু চুপচাপ মুহাম্মাদকে পড়তে চেষ্টা করে গেছে।

সুলতানের মনের প্রতিটা কুঠুরির খবর তার কাছে থাকত।

সে বুঝেছিল, এই বুনো ঘোড়াকে নিজের মতো ছুটতে দিতে হবে। তাহলে হয়তো এই ঘোড়া একদিন পেগাসাসকেও ছাড়িয়ে যাবে।

তিন

১৪৫১ সালের এক বিকেলে অ্যাড্রিয়ানোপলে ইন্তেকাল করলেন সুলতান মুরাদ-ই সানি। তখন তার বয়স ৪৭ বছর মাত্র।

তখনো গুলবাহারের শাহজাদা তার আরবি ঘোড়ার পিঠেই ছিলেন। পিতার মৃত্যুর খবর শুনে ঘোড়ার মুখ উত্তর দিকে ঘুরিয়ে ঘোড়া ছুটালেন মুহাম্মাদ।

দরাজ গলায় হাক ছাড়লেন, 'যারা আমাকে ভালোবাসো, আমার সাথে এস।'

পঞ্চম অধ্যায় : বারুদী সালতানাত

আল ফাতিহ

এক

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস। মদিনায় প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে।

শহরের দক্ষিণে থাকা খেজুর গাছগুলি থেকে গতকাল সব খেজুর কেটে নিয়ে আসা হয়েছে। যদিও খেজুর কাটার সময় এখনো হয়নি, তবুও মদিনার কৃষকদের এবার কিছু করার ছিল না। আরবের সম্মিলিত বাহিনী চলে এসেছে মদিনার ঘাড়ের ওপর। উহুদ পর্বত পেরিয়ে দশ হাজার পদাতিক যোদ্ধার বাহিনী অবস্থান নিয়েছে শহরের গেটে। এমতাবস্থায় খেজুর না কাটা আর খেজুর তাদের মুখে তুলে খাইয়ে দেয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

আরবদের সম্মিলিত বাহিনীতে দশ হাজার পদাতিকের সাথে যুদ্ধের ঘোড়া ছিল ছয় শ, সাথে ছিল বেদুইন ক্যাভালরি, প্রায় দুই হাজার। গোটা মদিনার জনসংখ্যা তখনো দশ হাজার ছাড়ায়নি। মোট সক্ষম পুরুষ ও কিশোরদের সংখ্যা মিলে হলো তিন হাজার। এই তিন হাজারকে যুদ্ধের সাজে সাজানোর মতো অস্ত্র মদিনার সর্দারের কাছে নেই। সর্বোচ্চ দেড় হাজার যোদ্ধাকে অস্ত্রসজ্জিত করা যাবে। মদিনার সর্দার পরামর্শ সভা ডাকলেন।

সরদারের নাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

দুই

পরামর্শ সভায় এক অভিনব সিদ্ধান্ত হলো। মদিনার দুই দিকে বিশাল এক পরিখা খনন করা হবে।

এই বুদ্ধি এসেছে ইরান থেকে আসা একজন মুক্ত দাস, সালমান ফারসি (রা.)-এর মাথা থেকে। পরিখা খননের কাজ শুরু হয়ে গেল। মহানবি (সা.) ঘোষণা করলেন, এই কাজে সব মুসলিমকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রতিটি ঘর থেকে পুরুষরা বেরিয়ে এলেন। শুরু হয়ে গেল কাজ। দিন রাত খেটে চলছিল ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজ। পুরুষরা মাটি কাটবে, মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে মেয়েরা পুরুষদের খন্তা-কোদাল, খাবার-পানি এগিয়ে দেবে। পাঁচ গজ গভীর, দশ গজ চওড়া ট্রেঞ্চে মদিনার এক পাশ ঘিরে দেয়া হলো। এরমধ্যে বেঁধে গেল এক সমস্যা। বিশাল এক পাথর পড়ল ট্যাকটিক্যালি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক জায়গাতে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার সময়। মুসলিম বাহিনীর সেরা বীররা কুঠার চালালেন। জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং সবশেষে আলি ইবন আবি তালিব (রা.)। কোনোভাবেই পাথরটা কাটা গেল না। এই পাথর কাটতে না পারলে এখান দিয়ে ট্রেঞ্চ খোঁড়া যাবে না।

খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামলেন কুঠার হাতে।

আল্লাহু আকবার রবে প্রথম আঘাত হানলেন তিনি। কুঠারের আঘাতে অত্যন্ত উজ্জ্বল আগুনের ফুলকি উঠল পাথরের গা থেকে। পাথর কাটলো না। দ্বিতীয়বার একইভাবে আল্লাহু আকবার রবে পাথরে আঘাত হানলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)। এবার আরও উজ্জ্বল আলো দেখা গেল কিন্তু পাথর কাটলো না। তিন বারের বার আল্লাহু আকবার রবের সাথে সাথে পাথর টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এবার আরও উজ্জ্বল আগুনের ফুলকি দেখা গেল। পাথর কাটার পর রাসূলুল্লাহর (সা.) চারপাশে জড়ো হলেন সাহাবিরা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, প্রথমবারের আগুনের ফুলকিতে আমাকে কিসরার প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে। আমার উম্মত ওগুলো জয় করবে। দ্বিতীয়বারের আগুনের ফুলকিতে আমাকে সিরিয়া ও কন্সতুনতুনিয়ার প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে। তিনবারের বার আমি দেখেছি বিশাল জমিন ও সমুদ্র, যা আমার উম্মতের অধীন হবে।[১]

যাদের একথা শোনানো হচ্ছিল তাদের বেশিরভাগই তখন অভুক্ত। অবরোধের কারণে বাইরের সাথে মদিনার যোগাযোগ বন্ধ। অবরোধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাই মদিনার মোট খাবারের মজুদ একসাথে করে সবাইকে দু বেলা করে রেশন দেয়া হবে। অভুক্ত এই মানুষগুলোর কাছে তখন কনস্ট্যান্টিনোপল নামক নগরী পর্যন্ত ভ্রমণ করাই ছিল বিশাল গর্বের ব্যাপার। তখন পর্যন্ত কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী।

এরপর নবিজি (সা.) তাঁর সারা জীবনে একাধিকবার বলেছেন, আমার উম্মতের এক সেনাদল কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করবে। কতই না মুবারক সেই সেনাদল, আর কতই না মোবারক তাদের সেনাপতি![২]

এই ধারণা পরবর্তীকালে সাহাবিদের মনে গেঁথে যায়। কনস্ট্যানটিনোপল জয় পরিণত হয় এক কিংবদন্তীতে।

---

১. Musnad Ahmad

২. (Mustadrak Hakim. vol. 4 pg. 422 and Musnad Ahmad. vol. 4 pg. 335)

তিন

৬৭২ সাল। আমির মুয়াবিয়া (রা.) তখন খলিফা। খালিদ ইবন ওয়ালিদের (রা.) তলোয়ারের আঘাতে রোমানরা সিরিয়া-ফিলিস্তিন আর পূর্ব আনাতোলিয়া থেকে পালিয়েছে ত্রিশ বছর আগেই, যদিও তখন তাদের দখলে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সভ্য ইউরোপ।

মুয়াবিয়া (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলে অভিযান চালাবেন। আলি (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে যুদ্ধের পর থেকে নিজেদের রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নেয়া সাহাবিদের বেশিরভাগই তখন মদিনায়। সরকারি কোনো কাজের ধারে কাছে তারা যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

নবিজির পতাকাবাহক আবু আইয়ুব আল আনসারি (রা.)-এর বয়স তখন আশিরও বেশি। দুর্বল শরীর। চোখে ভালো দেখেন না। মদিনার রাস্তায় তিনি শুনতে পেলেন, কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে। আবু আইয়ুবের (রা.) মস্তিষ্কে ধ্বনিত হলো কুরআনের আয়াত- তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো, হালকা কিংবা ভারী, যেকোনো অবস্থায়...[৩]

আবু আইয়ুব দেখলেন, কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানের খবরে মদিনাতে হইচই পড়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবন উমার, আব্দুল্লাহ ইবন জুবায়ের, আবুশাইবা আল আনসারি, হামিদুল্লাহ আল আনসারি, কা'ব ইবন মালিক, হাফিজ (রা.)-সহ তখনকার সব জীবিত সাহাবিরা তোড়জোড় শুরু করেছেন কনস্ট্যান্টিনোপলে যাবার জন্য। তারা সবাই শুনেছেন, যে সেনাদল প্রথম কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করবে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বৃদ্ধ আবু আইয়ুব (রা.)-কে সবাই মিলে চেপে ধরলেন। এই অবস্থাতে অভিযানে তাকে নেয়া কোনোমতেই ঠিক হবে না। তিনি কারও কথাই শুনলেন না। ৬৭৩ সালে মুসলিম ফ্লিট রওনা হলো কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানে।

চার

তিন দিক থেকে কনস্ট্যান্টিনোপল ঘিরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল মুসলিম বাহিনী। রোডস দ্বীপ জয় করে আব্দুল্লাহ ইবন কায়েসের নৌবাহিনী মার্মারা সাগরে গাল্লিপলি উপদ্বীপের দিক থেকে ঢুকলেন কনস্ট্যান্টিনোপলের পশ্চিমে। পূর্বে আরও এক নৌবাহিনী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে অবরোধ করল বসফরাস, স্মার্নাতে থাকা রোমানদের নৌবহর তাদের সামনে টিকতে না পেরে পালাল। ওদিকে স্থলপথে ইয়াজিদ আর ফুযাইল ইবন উবায়েদের বাহিনী এগোতে লাগল আনাতোলিয়ার বুক চিরে। রোমানরা এগোল তাদের ঠেকাতে।

---

৩. Sura at Tawbah(9:41)

আনাতোলিয়ার তীব্র শীতে মুসলিম বাহিনী টিকতে পারল না রোমানদের সামনে। ত্রিশ হাজার শহিদের লাশ রেখে তাদের পিছু হটতে হলো আনাতোলিয়ার দিকে। আসার পথে সাইলেনিকাতে তারা পড়লেন ঝড়ের মুখে। প্রচণ্ড ঝড়ে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল মুসলিম স্থলবাহিনী।

জলে তখন অন্য বিপদ।

কনস্ট্যান্টিনোপলের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন তারা। কিন্তু রোমানদের বিখ্যাত গ্রিক ফায়ারের সামনে একের পর এক মুসলিম জাহাজ পুড়ে যেতে থাকল। তার মধ্যেই কনস্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত থিওডোসিয়ান ওয়ালে হানা দিলেন অভিজ্ঞ মুসলিম বীরদের নিয়ে গড়া বাহিনী। কিন্তু তাতে খুব বেশি লাভ হলো না। থিওডোসিয়ান ওয়ালের সামনে রোমানদের তীরে শহিদ হলেন আবু শাইবা আল আনসারি, হাফিয আনসারি, হামিদুল্লাহ আল আনসারি, কা'ব ইবন মালিক (রা.)।

পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে যখন অবরোধ তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে মুসলিম বাহিনী, আবু আইয়ুব (রা.) তখন মুসলিম বাহিনীর কমান্ডারকে ডাকলেন। তার হাতে হাত রেখে বললেন– 'যদি কনস্ট্যান্টিনোপল জয় না-ও হয়, আর আমি মারা যাই, তাহলে কনস্ট্যান্টিনোপলের সবচেয়ে কাছে যতদূর তোমরা যেতে পারো, সেখানে আমাকে কবর দিও।'[৪]

এর দুদিন পর মারা গেলেন আবু আইয়ুব আল আনসারি (রা.)। ফিরে আসার আগে তাকে কবর দিয়ে আসা হলো থিওডোসিয়ান ওয়ালের ভেতরের দিকের একটা জায়গাতে। ধীরে ধীরে তার কবরটা পরিণত হলো এক তীর্থস্থানে।

আল তাবারি, আল বালাযুরি, জাকারিয়া আল কাজওয়াইনি, রোমান সম্রাট ম্যানুয়েল ওয়ান এবং পিকে হিট্টি, সবাই লিখে গেছেন, যখনই কনস্ট্যান্টিনোপলে খরা দেখা দিত, খ্রিষ্টান পাদ্রিরা তখন আবু আইয়ুব আল আনসারির (রা.) কবর খুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন।[৫] যতবার এভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে, প্রতিবারই খরা দূর হয়েছে, আকাশ থেকে নেমে এসেছে অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

পাঁচ

আহযাবের যুদ্ধে নবিজি (সা.) তিন হাজার মুসলিমের সামনে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার নব্বই বছরের মাথায় ইসলাম ছড়িয়ে গিয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর সভ্য দুনিয়ার প্রায় পুরোটা জুড়ে।

---

৪. Hāmid, AbdulWāhid. Companions of the Prophet. Book One. New Revised Edition. London: MELS. 1998.p.157-8)

৫. Sumner-Boyd. Hilary and John Freely. Strolling Through Istanbul: The Classic Guide to the City. London: Tauris Parke Paperbacks. 2010.p. 363-4

দু-দুটো গৃহযুদ্ধের কারণে ইসলামের রাজনৈতিক সম্প্রসারণ থেমে গিয়েছিল ৬৫৬ সালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ সেই থেমে যাওয়া অভিযান আবারও জোরদারভাবে শুরু করেন ৭০৫ সালে।

৭১৫ সাল নাগাদ ইসলামি খিলাফত হয়ে উঠে তৎকালীন সময় পর্যন্ত মানুষের জয় করা সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য।

পূর্বে সিন্ধু থেকে পশ্চিমে মরক্কো হয়ে স্পেন-পর্তুগাল পর্যন্ত, দক্ষিণে ইথিওপিয়া থেকে উত্তরে কাজাখস্তান পর্যন্ত চলে গিয়েছিল এর সীমানা।

কিন্তু কনস্ট্যান্টিনোপল জয় তখনো বাকি রয়ে গেল।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলে চালানো অভিযান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল বাইজান্টাইন নৌবাহিনীর দক্ষতার সামনে।

সুলাইমান ইবন আবদিল মালিক খলিফা হবার পর চল্লিশ বছর আগের সেই অসম্পূর্ণ অভিযান আবারও শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

প্রায় দুই লাখ সৈন্যের বিশাল এক নৌবহর প্রস্তুত করা ৭১৭ সালের বসন্ত নাগাদ। [১০]

তখন প্রায় কোনো বিখ্যাত সাহাবিই জীবিত ছিলেন না। কিন্তু এই জনশ্রুতি মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে গিয়েছিল, নবির নামে নাম হবে এমন একজন খলিফা কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করবেন।

খলিফা হবার পর পরই উমাইয়া বংশের সবচেয়ে বিলাসী পুরুষ সুলাইমান আশাবাদী হয়ে উঠলেন; তিনিই সম্ভবত সেই খলিফা যাকে আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট বলা হয়েছে। কারণ, পুরো উমাইয়া গোত্রে শুধু তার নামই ছিল কোনো নবির নামে, সুলাইমান।

ছয়

৭১৭ সালের এপ্রিল মাস।

আড়াই হাজার জাহাজ বের হলো সিরিয়া ও মিসর থেকে। ওদিকে আরব-ইরাক-ইরান ও তুর্কিস্তান থেকে রওনা হলো এক লাখেরও বেশি স্থলসেনা।[১]

এই বিশাল সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর রসদ সরবরাহের জন্য যে সাপ্লাই চেইন ছিল তার সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। উট ছিল দশ হাজার, ঘোড়া ছিল বারো হাজারের বেশি। এগুলো ছিল শুধু সাপ্লাই চেইনের জন্য।

---

১. Treadgold, Warren (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2630-2. p. 346.

আগে থেকেই জয় করে নেয়া সাইপ্রাস ও রোডসে অবস্থান নিল নৌবাহিনী। তারপর খুব ধীরে ধীরে দার্দানেলিস প্রণালিকে ঘেরাও করে এজিয়ান সাগর আর গাল্লিপলি উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল তারা।

ওদিকে স্থলবাহিনী জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছিল আনাতোলিয়ার সমভূমিতে। আরবের মরুতে গরমে দিনের বেলার তাপমাত্রা যেখানে হরহামেশাই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ছুঁই ছুঁই করে সেখানে আনাতোলিয়ার সমভূমিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি। তাই পাহাড়-পর্বত ছাড়া মুসলিম বাহিনীর গতি থামানোর মতো কিছু আনাতোলিয়াতে অবশিষ্ট ছিল না।

জুলাই নাগাদ রোমানদের বেশিরভাগ দুর্গের পতন ঘটল উমার ইবন হুবাইরার বাহিনীর হাতে।

পশ্চিমে গাল্লিপলি উপদ্বীপ দখল করে মার্মারা সাগরের তীর ধরে অগাস্ট নাগাদ কনস্ট্যান্টিনোপলের পশ্চিমে পৌঁছে গেল মুসলিম বাহিনী। ভূমিতে ইউরোপীয় পাশ থেকে সাগরে বসফরাসের এপারে মার্মারা সাগরের দিক থেকে আর পূর্বে কৃষ্ণসাগরের দিক থেকে কনস্ট্যান্টিনোপলকে ঘিরে ফেলা হলো।

মুসলিম বাহিনীর আরেকটি বিশাল কন্টিনজেন্ট অবস্থান নিল আনাতোলিয়ার মাঝামাঝি টরাস পর্বতমালার পেছনে।

শুরু হলো তীব্র অবরোধ।

বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্য তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে নাজেহাল। সম্রাট দ্বিতীয় আনাস্টাসিয়াসকে মাত্রই ক্ষমতা থেকে জোর করে সরানো হয়েছে দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসকে বসানোর জন্য। ওদিকে রোমান জেনারেল লিও দ্যা আইসরিয়ান নতুন সম্রাটের প্রতি সন্তুষ্ট নয় এটাও জানাজানি হয়ে গেল।

ইউরোপের মাটিতে মুসলিমরা এগিয়ে যাচ্ছিল বিনা বাধায়। থ্রেস প্লাবিত করে তারা কনস্ট্যান্টিনোপলের দেয়ালের বাইরে অবস্থান নিল খলিফার ভাই মাসলামা ইবন আবদিল মালিকের অধীনে।

লিও দ্যা থার্ড এরইমধ্যে এক ডাবল গেম সাজিয়ে ফেললেন মনের ভেতর।

মুসলিম বাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপলের বাইরে যখন অবস্থান করছিল, তিনি তখন তাদের সাহায্য করার প্রস্তাব দিলেন। বিনিময়ে চাইলেন রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসার অধিকার।[৭]

সেপ্টেম্বর মাসে মাসলামা ইবন আবদিল মালিকের সাথে লিওর চুক্তি হয়ে গেল।

---

৭. Treadgold, Warren (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2630-2.p.347

লিও তার নৌবাহিনী বসফরাস থেকে সরিয়ে কৃষ্ণসাগরে চলে যাবে, বিনিময়ে তাকে কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের পর অবশিষ্ট রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ঘোষণা করা হবে।

শীত এগিয়ে আসছিল। আনাতোলিয়ার গরমটা আরবের তুলনায় আরামদায়ক হলেও শীত মোটেই আরামদায়ক না। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে দশ-পনেরো ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়, কখনো আরও নিচেও নামে।

শীতে টিকে থাকতে গেলে ভালো আশ্রয় চাই।

লিওকে তাই বলা হলো মুসলিম বাহিনীর রসদপত্রসহ অবস্থানের জন্য ভালো জায়গা ঠিক করতে। লিও বললেন মুসলিম রসদ-খাদ্য মজুদবাহী জাহাজগুলো তার কমান্ডের অধীনে বসফরাসের পাড়ে নিয়ে আসতে।

লিওর মনে তখন ছিল অন্য চিন্তা।

মুসলিমদের রসদ ও খাবারবাহী সবগুলো জাহাজ তিনি নিলেন, বসফরাস পার করলেন, কিন্তু আর কখনো ফেরত দিলেন না। ওদিকে কনস্ট্যান্টিনোপলের গভর্নরকে ততক্ষণে মাসলামা নোটিস দিয়ে দিয়েছেন, কনস্ট্যান্টিনোপলে যেন তাদের জন্য জায়গা খালি করে দেয়া হয়।

শীত শুরু হলো।

সে বছর শীত পড়ল গত এক শ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

লিওর কাছে দেয়া খাবারের জাহাজ আর ফিরল না।

আট

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চার মাসে মুসলিম ফৌজ দুর্ভিক্ষে নাজেহাল হয়ে গেল।

ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে প্রথমে উটগুলোকে জবাই করে ফেলা হলো। তারপর একে একে ঘোড়া। তারপর খাওয়া শুরু হলো গাছের পাতা, ছাল। শেষমেশ তারা খেতে বাধ্য হলেন কাপড়, পঁচা কাঠ।

তত দিনে খলিফার ইন্তেকালের সংবাদ এল মাসলামার কাছে। নতুন খলিফা হয়েছেন উমার ইবন আবদিল আযীয (রহ.)। উমার এই ধ্বসে যাওয়া মৃতপ্রায় বাহিনীকে সাহায্য করতে এক লাখ সৈন্যের আরও এক বাহিনী পাঠালেন প্রচুর খাবার আর ওষুধ দিয়ে।

এপ্রিল মাসে যখন সেই বাহিনী পৌছল, তখন গাল্লিপলি উপদ্বীপ থেকে গোল্ডেন হর্ন লাশে ভরে গেছে। ষাট হাজার লাশ।

ওদিকে কৃষ্ণসাগরের দিক থেকে রোমান সম্রাটের বাহিনীর অ্যামবুশের শিকার হলেন সুলাইমান ইবন মুরাদ, তার ছোট কিন্তু কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা বাহিনীটা ধ্বংস হয়ে গেল মার্মারা সাগরে।

অবরোধ যে টিকবে না বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল।

আর তখনই লিও তার বাহিনী নিয়ে হামলা চালালেন।

বাইজান্টাইনরা এক ধরনের বিশেষ জ্বালানি তৈরি করেছিল, যা দিয়ে আগুন জ্বালালে সেই আগুনকে পানি দিয়ে নেভানো যায় না। রেজিন, ন্যাপথা, চার কোল, পেট্রোল আর নাইটার মেশানো সেই তরল আগুন ছিল মধ্যযুগের যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে রোমানদের একচেটিয়া অস্ত্র। এর নাম গ্রিক ফায়ার।[৮]

লিওর বাহিনীর জাহাজগুলোর মাথায় লাগানো ছিল লম্বা লম্বা সাইফন। এগুলোর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা গ্রিক ফায়ারে পুড়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে হাজারেরও বেশি মুসলিম জাহাজ ছাই হয়ে গেল মার্মারা সাগরে।

গ্রিক ফায়ার ছিল রাসায়নিক অস্ত্র, তা পানিতে নিভত না বলে মুসলিম নৌবাহিনী স্রেফ হতভম্ব হয়ে গেল।

অল্প কিছু ফৌজ বাকি ছিল মুসলিমদের, যাদের তখনো যুদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল। তাদের নিয়ে মাসলামাকে ফিরে আসার আদেশ দিলেন খলিফা।

ফিরে আসার পথে মাসলামার ওপর পুরোদমে হামলা চালাল বুলগার নৌবাহিনী। এই শত্রুর সাথে কখনো মোকাবেলা করেনি উমাইয়া নৌবাহিনী। সম্ভবত লিওর সাথে তাদের চুক্তি ছিল অনেক আগে থেকেই। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলালে পরিষ্কার হয়ে যায়, এই হামলাতে লিওই কলকাঠি নেড়েছেন।

বিধ্বস্ত বাহিনী নিয়ে হতাশ মাসলামা ভূমধ্যসাগর হয়ে লেবাননে ফিরছিলেন। খলিফাকে কী জবাব দেবেন তা বুঝে ওঠতে পারছিলেন না তিনি।

তাকে জবাবটা দিতে হলো না।

ভূমধ্যসাগরে গ্রীষ্মকালীন ঝড়ে পড়ে পুরো মুসলিম নৌবহর সমুদ্রে ডুবে গেল।[৯]

---

৮. Theophanes; Turtledove, Harry (Transl.) (1982). The chronicle of Theophanes: an English translation of anni mundi 6095–6305 (A.D. 602–813). University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-1128-3 p. 52.

৯. Mango, Cyril; Scott, Roger (1997). The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History, AD 284–813. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 0-19-822568-7. p. 550

কনস্ট্যান্টিনোপলের ২য় অবরোধটা মুসলিমদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল। প্রায় চার লাখ সৈন্যের দেড় লাখই সরাসরি নিহত হয়েছিল যুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষে। আড়াই হাজার জাহাজের প্রায় সবই ধ্বংস হয়েছিল আগুনে পুড়ে বা পানিতে ডুবে।

জলে-স্থলে এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের ধাক্কা উমাইয়া খিলাফত আর কোনোদিন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম কোনো সেনাবাহিনী আর কনস্ট্যান্টিনোপলের দেয়াল পর্যন্ত পৌছতে পারেনি।[১০]

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেয়ালের খেতাব নিয়ে অজেয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল কনস্ট্যান্টিনোপলের থিওডোসিয়ান ওয়াল।

নয়

সাত বছরের বাচ্চাটাকে ঘুমের ভেতরেই কোলে করে হাম্মামখানাতে নিয়ে যাওয়া হলো। তার ঘুম ভাঙল না, এত কোমলভাবে।

যখন ঘুম ভাঙল, বাচ্চাটা তখন অনুভব করতে পারল তাকে পানিতে চুবানো হচ্ছে।

হাম্মামখানার ঠান্ডা পানিতে তার ঘাড়ে চেপে বসা শক্ত দুটো হাত তাকে চুবাচ্ছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী সেই হাতের চাপে তার ঘাড় অবশ হয়ে এল।

একবার শ্বাস নেবার জন্য বুকের ভেতর শুরু হয়ে গেল ফুসফুসের আর্তচিৎকার। চোখ-মুখ বিস্ফোরিত হয়ে উঠল তার, সে বোধহয় মারা যেতে চলেছে। দু মিনিট পর, চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ার আগে সুলতান মুরাদের সবচেয়ে ছোট শাহজাদা আহমেদ সম্ভবত একবার তার খুনীর মুখ দেখতে পেয়েছিল।

মধ্যযুগে তুর্কো-মোঙ্গল রাজবংশগুলোতেই শুধু নয়, প্রাচীন ভারতেও ছিল ভাই হত্যার এই ধারা। বিখ্যাত মৌর্য সম্রাট অশোক সিংহাসনে বসার আগে একে একে খুন করেছিলেন তার ৯৯ জন ভাইকে।[১১] তবু লোকে তাকে মহান সম্রাট অশোকই বলে।

মুহাম্মাদকে অশোকের ৯৯ জনকে হত্যা করতে হলো না। তার প্রতিদ্বন্দ্বী শাহজাদা একজনই ছিল।

তার পিতা মুরাদকে নিজের ভাইদের সাথে ৯ বছর সিংহাসন নিয়ে লড়তে হয়েছে, তার দাদা মুহাম্মাদকে লড়তে হয়েছে ৮ বছর। তাকে এসবের কোনোকিছুই করতে হবে না।

---

১০. Lewis, Bernard (2002). The Arabs in History (Sixth Edition). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 0-19-280310-7. p. 79.

১১. Singh, Upinder (2008). A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century. New Delhi: Pearson Education. ISBN 978-81-317-1120-0.p 338

১৪৫১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি অটোমান সালতানাতের মুকুট মাথায় পরলেন শাহজাদা মুহাম্মাদ। তার হাতে উসমানের তলোয়ার তুলে দিলেন গ্র্যান্ড মুফতি-শাইখুল ইসলাম আকা শামসুদ্দিন।

দশ

এর আগেও একবার ক্ষমতায় এসেছিলেন মুহাম্মাদ, দুই বছরের মেয়াদে। উজিরে আযম খলিল পাশার ষড়যন্ত্রে তিনি বেশি দিন সিংহাসনে বসতে পারেননি।

কিন্তু সিংহাসনে বসেই তিনি উজিরে আযমের পদে সেই খলিল পাশাকেই আবারও নিয়োগ দিলেন। এই অভিজ্ঞ লোকটির সেবা তার প্রয়োজন ছিল।

বাবার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ইসহাক পাশাকে তিনি দিলেন আনাতোলিয়ার বেইলার বের দায়িত্ব। এবার তিনি নিজের যুদ্ধবিদ্যার উস্তাদ জাগান পাশাকে করলেন সেনাবাহিনী প্রধান, সেরাসকার।

খলিল পাশা সুলতানকে, জাগান পাশাকে, শায়খুল ইসলাম আকা শামসুদ্দিনকে এবং অবশ্যই ইসহাক পাশাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তার বদৌলতে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল মুহাম্মাদের বদনাম।

মুহাম্মাদ সার্বিয়ান ডেসপটের কাছ থেকে আদায় করা করের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। ওয়ালাসিয়ার ভ্লাদ-বাইজান্টাইন সম্রাটের করও তিনি চাইবামাত্রই কমিয়ে দিলেন। এতে তার বদনাম আরও পাকাপোক্ত হলো। সবাই ভাবতে শুরু করল, নতুন সুলতান একজন ভীরু শাসক।

ফলাফল তিন মাসের মাথাতেই কারামানের বে বিদ্রোহ করে বসলেন।

চোখের পলকেই অযোগ্য, ভীরু বলে পরিচিত সুলতান মুহাম্মাদ পাশার দান উল্টে দিলেন।

তার বাহিনী নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে কারামানের ওপর হামলা চালালেন তিনি। কারামানের ইবরাহিম বে পালাতে পারলেও তার বন্ধু যুলকাদিরের আমির সুলেইমান বে পড়লেন ধরা।

বিপদে পড়লে শত্রুকে জামাই বানানো একটা ভালো পলিসি, যদি আপনার কোনো সুন্দরী মেয়ে থাকে।

সুলেইমান বে তার মেয়ে গুলশার সাথে বিয়ে দিলেন মুহাম্মাদকে। এই বিয়েতে তার চেয়ে মুহাম্মাদের লাভ ছিল অনেক বেশি। সুলেইমান বে যত দিন জিন্দা আছেন, পূর্বদিক থেকে তার আর কোনো ভয় নেই। কারামানের ইবরাহিম বে হামলা করতে আসলে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবেন সুলেইমান বে।

এগারো

জানিসারিরা আবার বিদ্রোহ করল। অ্যাড্রিয়ানোপলের বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গোটা বিশেক মানুষ জবাই করে ফেলল তারা। ভয়ে প্রাসাদে এসে লুকালেন জানিসারিদের পাশা। বিদ্রোহের কারণ, তারা বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট না।

কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করলেন মুহাম্মাদ।

প্রথমে জানিসারিদের বেতন বাড়ানো হলো, তার পরপরই হত্যা করা হলো তাদের আগাকে। বিদ্রোহের নেতাদের একজনেরও ধড়ে মাথা রইল না। জানিসারি ইউনিটগুলো ভেঙে দেয়া হলো এক এক করে। নতুন ইউনিটগুলোর দায়িত্ব দেয়া হলো মুহাম্মাদের প্রতি একান্ত অনুগতদের।

হেভি ক্যাভালরি ইউনিট কাপিকুলু সিপাহীদের সংখ্যা বাড়ালেন মুহাম্মাদ। ছয় হাজার কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি তার রাজধানীর ব্যারাকে সব সময় মজুদ থাকত। জানিসারিরা বিদ্রোহ করলে কাপিকুলুরা সুলতানের পাশে দাঁড়াবে।

বড় ও সুদক্ষ দুটো কোর নিয়ে মুহাম্মাদ তার অধীনে থাকা আমিরদেরও বুঝিয়ে দিলেন, বাড়াবাড়ি করলে রক্ষা নেই।

আজব ও আকিনজি গেরিলা বাহিনীর সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হলো।

ইজমিত বন্দরে একটা জাহাজখানা উদ্বোধন করলেন সুলতান। এই জাহাজখানা থেকেই অটোমান নৌবাহিনীর জন্ম হয়।

যে মুহাম্মাদকে অযোগ্য ভাবা হতো, তিনি আসলে ছিলেন তুখোড় এক স্টেটসম্যান। রাজনীতির ময়দানের এক পাকা খেলোয়াড়, আর যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাসে এক মাস্টারমাইন্ড ট্যাকটিশিয়ান।

আরবি, ফার্সি, তুর্কি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ও স্লাভ, সাত সাতটি ভাষাতে অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে জানতেন তিনি।

তার দুই ওস্তাদ আহমেদ কুরআনি আর শায়খুল ইসলাম আকা শামসুদ্দিন তাকে কুরআন ও হাদিসের বিশদ জ্ঞান দিয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি একজন পণ্ডিতে পরিণত হয়েছিলেন ইহুদি, অর্থডক্স খ্রিষ্টান, ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ও সুফিবাদ বিষয়ে।

তিনি ছিলেন একজন দক্ষ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, যিনি চমৎকার জাহাজের ডিজাইন করতে জানতেন।

কিন্তু এই দক্ষতাগুলোর বাইরে তার যে খেয়াল দুনিয়ার ইতিহাস বদলে দিয়েছিল, তা হলো কামানের প্রতি তার ভালোবাসা। তার ডিজাইন করা কিছু কামান এখনো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। আধুনিক হাউইৎজারের অনেকটা কাছাকাছি তুর্কি বোম্বার্ডের লাইট

ভার্সনটা তারই আবিষ্কার। সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারদের কামানের নকশাকে উন্নত করে তিনি এই হাউইৎজার তৈরি করেছিলেন।

ঠান্ডা মাথার এই সুলতান শত্রুদের নিজের উদ্দেশ্যের কিছুই বুঝতে দিলেন না।

ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকদের দূত তার দরবারে এলে তিনি অন্য সুলতানদের চেয়ে অনেক নম্র ব্যবহার করতে থাকলেন।

তাকে নিয়ে পোপের দরবারে খ্রিষ্টান নেতারা হাসাহাসি করত।

বারো

এখন আমরা যে ইউরোপকে চিনি, ১৪৫০ সালের দিকে তা ছিল অনেক অনেক আলাদা।

ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স দুটো রাজ্যেরই তখন কোমর ভেঙে গেছে হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারের পর। স্পেনে চলছে রিকনকুইস্তা। ইতালি তখন টুকরো টুকরো ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত।

সার্বিয়া অটোমানদের অধীনেও না, আবার মুক্তও না। হাঙ্গেরি-পোল্যান্ড ব্যাটল অফ ভার্নায় হেরে গিয়ে অনেকটাই চুপচাপ।

জার্মানিতে তখন হোলি রোমান এম্পায়ারের শেষ পর্যায় চলছে।

অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দারিদ্র্যে ভরা ইউরোপে ব্যতিক্রম ছিল ইতালিসহ অল্প কিছু জায়গা।

এর মধ্যেই ধীরে ধীরে তখন ফুটতে শুরু করেছিল রেনেসাঁর ফুল। তিন শ বছর পর এর ফলাফল দেখা গিয়েছিল বিশ্বমঞ্চে।

ইউরোপের সবচেয়ে বড় বিবাদ ছিল ইস্টার্ন অর্থডক্স চার্চের সাথে ওয়েস্টার্ন ক্যাথলিক চার্চের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই অটোমানদের ইউরোপে পা রাখার সুযোগ করে দিয়েছিল। এককালের সুপারপাওয়ার রোমান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখন পতনের দ্বারপ্রান্তে। কনস্ট্যান্টিনোপলের আশেপাশের দেড় শ বর্গমাইলেই তার ক্ষমতা তখন সীমাবদ্ধ। বিশ্বের সেরা দুই নৌশক্তি তখন ভেনিস আর জেনোয়া।

মুহাম্মাদের পূর্বপুরুষ বায়েজিদ ইয়িলদিরিম, দ্যা থান্ডারবোল্ট একবার প্রায় জয় করেই ফেলেছিলেন কনস্ট্যান্টিনোপল। শেষ মুহূর্তে তাইমুরের আক্রমণে তার অবরোধ ছেড়ে ফিরতে হয় আনকারাতে।

শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে দেখা কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের স্বপ্ন ছোট্ট মুহাম্মাদের মনে দশ বছর বয়সেই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আকা শামসুদ্দিন।

চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন মুহাম্মাদ। তার বিশ্বাস ছিল তিনিই হবেন সেই মুজাহিদ যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

তেরো

উসমানের বুকে একটা পূর্ণিমার চাঁদ এসে ঠাঁই নিল।

তারপর তার নাভি থেকে গজিয়ে উঠল এক বিশাল গাছ। গাছটি সুন্দর সবুজ ডালপালায় ভরে উঠল।

সময়ের সাথে সাথে গাছটি বড় হতে হতে পেরিয়ে যেতে লাগল চারটি পর্বতমালা; বলকান, আলবুর্জ, ককেশাস আর অ্যাটলাস। গাছের শেকড় থেকে বইতে লাগল চার চারটি নদী। দানিয়ুব, ইউফ্রেতিস, তাইগ্রিস আর নীল। গাছের পাতাগুলো হঠাৎ রূপ নিল তরবারির ফলায়। তারপর হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে। বসন্তের বাতাস।

সে বাতাসে একেকটা পাতা একেকটা তরবারি হয়ে উড়ে যেতে লাগল কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে। দুই মহাদেশ আর দুই সমুদ্রের শহর।

ঘুম থেকে উঠে গেলেন উসমান। উসমান আফেন্দি।

সে অনেক বছর আগের কথা।

তার এই স্বপ্নের কথা জানতেন তার তলোয়ার হাতে ধারণ করা তার প্রতিটি বংশধর। ওরহান থেকে শুরু করে বায়েজিদ ইয়িলদিরিম, মুহাম্মাদ পর্যন্ত সবাই।

শাইখুল ইসলাম আকা শামসুদ্দিনের কাছে শুনেছিলেন মুহাম্মাদ। মহানবি (সা.)-এর কথা, 'নিশ্চয়ই এক দিন কনস্ট্যান্টিনোপল তোমাদের পদানত হবে। কতই না মোবারক সেই সেনাবাহিনী, আর কতই না মোবারক তাদের সেনাপতি।'

১৪৫২ সালের নভেম্বরের ঠান্ডায় ইউরোপ যখন কাঁপছিল, তখন মুহাম্মাদ বসফরাসের ইউরোপীয় পাড়ে এক দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। এশিয়ার পাড়ে ৫০ বছর আগে তার পরদাদা বায়েজিদ বানিয়ে গেছেন আনাদলু হিসারি।

শ্রমিক আর ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বিগুণ মজুরি দিয়ে আট মাসের কাজ তিন মাসে শেষ করিয়ে বাইজান্টাইন সম্রাটকে বোকা বানিয়ে দিলেন তিনি। ১৪৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হলো রুমেলি হিসারি দুর্গের কাজ। এর আরেক নাম বোগাজ কেসেন, অর্থাৎ Throat Cutter.

থ্রোট কাটার বসফরাসের গলা কেটে দিল। প্রণালির দুই পাড়েই এখন মুহাম্মাদের দুই দুর্গ। তার অনুমতি ছাড়া এখানে এখন একটা মাছের পক্ষেও সাঁতার কাটা কঠিন।

ব্ল্যাক সি দিয়ে বসফরাস হয়ে মার্মারা সাগরে ঢোকা অসম্ভব হয়ে গেল জেনোইস জাহাজগুলোর জন্য।

প্রমাদ গুণলেন বাইজান্টাইন সম্রাট। তার দূত একদিকে ছুটল পোপের কাছে। আরেকদিকে ছুটল মুহাম্মাদের কাছে। দুইবার বাইজান্টাইনদের দূতকে ফিরিয়ে দিলেন মুহাম্মাদ। অনুরোধ করলেন তাকে যেন বিরক্ত না করা হয়। তিনবারের বার আবার দূত পাঠালেন বাইজান্টাইন সম্রাট কনস্ট্যানটাইন। একটা ট্রেতে করে ফেব্রুয়ারি মাসে তার কাছে উপঢৌকন পাঠানো হলো অটোমানদের পক্ষ থেকে।

দূতের কাটা মাথা।

চৌদ্দ

মেসিডোনিয়া থেকে আনাতোলিয়া প্রতিটা ইলায়েত থেকে সৈন্য জড়ো হতে লাগল অ্যাড্রিয়ানোপলে। বাড়তে বাড়তে তাদের সংখ্যা শেষমেশ গিয়ে ঠেকল আশি হাজারে।[১২]

চারিদিকে রটে গেছে, সুলতান কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে অভিযানে নামবেন। আর একথা সবাই জানে, কনস্ট্যান্টিনোপলে যে প্রথম প্রবেশ করবে, সে জান্নাতে যাবে।

বে পেশা মধ্যেই শুধু নয়, সিপাহীদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা লেগে গেল।

ইউরোপ তখনও শীতঘুমে মগ্ন।

বসন্ত শুরু হয় এপ্রিলে, তখন ইউরোপের নেতারা বসবেন বৈঠকে। তাদের একমত হতে হতে মে মাস চলে আসবে, সেনা সংগ্রহ করে তৈরি হতে হতে জুন-জুলাই।

মুরাদের হাতে দুটো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হেরে তখন চুপচাপ জন হুনয়াদি।

পোপের ক্রুসেডের ডাকে সাড়া দেবার মতো কেউ ছিল না তখন, তবুও পোপ ভাবলেন সমস্যা নেই। কনস্ট্যান্টিনোপলের থিওডোসিয়ান ওয়াল এক হাজার বছর ধরে যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে অজেয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এবারেও থাকবে। গ্রীষ্মে সৈন্য পাঠানো যাবে ভেবে আপাতত ভেনিস আর জেনোয়াকে বাইজান্টাইনদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বললেন তিনি।

কনস্ট্যান্টিনোপলকে বলা হতো দ্বিতীয় রোম।

খ্রিষ্টান জগতের কাছে রোমান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী ও হোলি অ্যাপোসলস্ চার্চ, হাজিয়া সোফিয়া চার্চের ভিত্তিভূমি হিসেবে পবিত্র এক শহর বলে বিবেচিত হতো কনস্ট্যান্টিনোপল।

মার্চে রোমান সম্রাট বুঝতে পারলেন, মুহাম্মাদ এবার আসবেনই। তিনি তাই সার্বিয়ান ডেসপট জর্জ ব্রাঙ্কোভিচের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার করে নতুন করে মজবুত করলেন থিওডোসিয়ান ওয়াল।

---

[১২]. Kaufmann, J. E.; Kaufmann, Hanna W. (2004). The Medieval Fortress: Castles, Forts, and Walled Cities of the Middle Agess. Boston, Massachusetts: Da Capo Press. ISBN 0-306-81358-0.

খবর গেল মুহাম্মাদের কানে। তার চিঠি পেয়ে থতমত খেয়ে দেড় হাজার সার্বিয়ান হেভি ক্যাভালরি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে রওনা হলেন জর্জ। যেই দেয়াল গড়তে নিজের গাটের পয়সা খরচ করেছেন, সেই দেয়াল ভাঙতে এখন তার নিজের সেনাবাহিনীই আগাচ্ছে। মুহাম্মাদের আদেশ অমান্য করার সাহস তার ছিল না।

এপ্রিলের আগেই কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছল ভেনিস থেকে আসা দু হাজার সৈন্যের নৌবহর। জেনোয়া থেকে পাঠানো জাহাজ বহর বসফরাসের মুখে এলে সুলতানের নৌপ্রধান সুলেইমান তাদের পাল নামাতে বললেন।

তারা পাল নামাল না।

কামানের গোলায় উড়ে গেল তিনটি জাহাজ। বাকিগুলো পালাল।

অনেক ঘুরপথে জেনোয়া থেকে কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছলেন তৎকালীন দুনিয়ার অন্যতম সেরা ডিফেন্সিভ ট্যাকটিশিয়ান জিওভান্নি জিউস্টিনিয়ানি। সাথে মাত্র সাত শ সৈন্য।[১৩]

নগরবাসীকে বীরের মতো যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে বললেন কনস্ট্যানটাইন।

কনস্টন্টিনোপলকে তখন পর্যন্ত বলা হতো বেস্ট ডিফেন্ডেড সিটি ইন দ্যা হিস্টোরি। কিন্তু সম্রাটের জন্য মুহাম্মাদের কাছে দুটো চমক ছিল যার কথা তিনি ভাবতে পারেননি।

এক নম্বরটা ছিল তুর্কি নৌবাহিনী। আর দু নম্বরটা ছিল কামান।

পনেরো

কথায় বলে, সায়েন্স ফলৌজ মানি।

বিশ্বের ইতিহাসে যখন যেখানে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটেছে, বিজ্ঞানীরা দলে দলে সেদিকেই ছুটেছেন। প্রাচীনকালে মিসর ও মেসোপটেমিয়া, তারপর গ্রিস ও রোম, তারপর আব্বাসিয়া খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ। সেখান থেকে চেঙ্গিজ খানের দরবার হয়ে তাইমুরের সমরকন্দ।

হাঙ্গেরিয়ান ইঞ্জিনিয়ার অরবানও প্রথমে চেয়েছিলেন বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে তার কামানের নকশা বিক্রি করতে। কিন্তু সম্রাট তার পছন্দমতো পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম ছিলেন না। ফলে সুলতান মুহাম্মাদের কাছে এলেন অরবান।

তার করা কামানের নকশা দেখে অবাক হয়ে গেলেন সুলতান। প্রযুক্তির দিকে ছিল তার দুর্দান্ত ঝোঁক। অরবানকে প্রচুর উপহার দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন তিনি।

---

[১৩]. Runciman, S.The fall of Constantinople 1453. Cambridge University Press.

মার্চের শেষ নাগাদ তার হাতে চলে এল ইতিহাস বিখ্যাত গ্রেট টার্কিশ বোম্বার্ড দুটোর একটা, নাম ব্যাসিলিকা। তখনো হয়তো কেউ কল্পনাই করেনি, ভবঘুরে ইঞ্জিনিয়ারের কামানটা ইতিহাস বদলে দেবে।

ব্যাসিলিকার ওজন ছিল ১৯ টন। এটির ব্যারেল ছিল ১৯ ফুট লম্বা, গোলার রেঞ্জ ছিল এক মাইল। এক মাইল দূর থেকে ছুটে গিয়ে এটার ছ শ পাউন্ড ওজনের গোলা ছ ফুট পর্যন্ত পুরু দেয়াল ভেদ করে দিতে পারত।

কিন্তু এর কিছু সমস্যাও ছিল।

ব্যাসিলিকাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে প্রয়োজন হতো তিরিশ জোড়া ষাড় আর চার শ সৈন্যের। কামানের ব্যারেল প্রচণ্ড গরম হয়ে যেত সহজেই। একবার গোলাবর্ষণ করার পর ঠান্ডা করে রিলোড করতে এটা সময় নিত তিন ঘণ্টা।

তখনো নিউটনের গতিসূত্র, গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তুর সূত্র অথবা প্রাসের সূত্র কিছুই আবিষ্কার হয়নি। তাই কামানের অ্যাকিউরেসিও ছিল একদমই সাধারণ মানের।

কিন্তু তখনকার কথা চিন্তা করলে ব্যাসিলিকা ছিল অকল্পনীয় এক দানব। যার সমকক্ষ কামান পরবর্তী দুই শ বছরেও ইউরোপ দেখেনি।

ষোল

মুহাম্মাদের চিঠি কনস্ট্যানটাইনের কাছে পৌঁছল।

চিঠিতে সুলতান লিখেছেন– আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তোমরা যদি আমার কাছে শহর হস্তান্তর কর, তাহলে তোমাদের প্রতিটি প্রাণের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। একজন অধিবাসীকেও কোনো প্রকার নির্যাতন করা হবে না। তোমাদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা বাণিজ্য, ধন সম্পদ যা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।

আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে আল্লাহর রাসূল (সা.) ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। তোমাদের গির্জাসমূহ ও গির্জার পাদ্রিদের সবাইকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। কোনো গির্জা লুট করা হবে না, তোমরা আগের মতোই নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবে। একজন গ্রিককেও দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে না।

এই ফরমান যদি তোমরা মেনে নাও, তবে তোমাকে দেয়া হবে পেলোপনিসের রাজত্ব ও একজন রাজার যথার্থ সম্মান। কিন্তু যদি তোমরা কনস্ট্যান্টিনোপল আমার কাছে হস্তান্তর না কর, আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে তোমাদের দেয়ালকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার শক্তি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন।

কনস্ট্যানটাইন এবারে মোটেই অটোমানদের ভয়ে ভীত ছিলেন না।

তার সাহসের উৎস ছিল কনস্ট্যান্টিনোপলকে ঘিরে রাখা ২০ কিলোমিটার লম্বা দানবীয় থিওডোসিয়ান ওয়াল, ভেতরে ও বাইরে ফর্টিফিকেশন মিলিয়ে যা ছিল ৬০ ফুট পুরু!

দেয়ালের উচ্চতা ছিল ৪০ ফুট, প্রতি ৫০ মিটার পর পর এতে ছিল ওয়াচ টাওয়ার, যেখান থেকে শত্রুর ওপর গোলাবর্ষণ ও পাথর নিক্ষেপ করা যেত। চাইলে ঢেলে দেয়া যেত গরম পানি ও ফুটন্ত তেল।[১৪]

শহরে এক বছরের খাবার মজুদ করা ছিল।

কাইজার আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে গ্রীষ্ম পর্যন্ত তিনি অনায়াসে শহর ধরে রাখতে পারবেন। আর তারপর পোপের নৌবাহিনী এসে গেলে এই অবিশ্বাসী অপবিত্র শত্রুরা খ্রিষ্টানদের শক্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হবে।

কাইজার তাই চিঠির নেতিবাচক জবাব দিলেন।

১৪৫৩ সালের বসন্তে, এপ্রিল মাসের ২ তারিখ ইস্টার সানডের দিন মুহাম্মাদ তার বাহিনী নিয়ে শহরের পাশে তাঁবু ফেললেন।

৬ এপ্রিল গোটা শহর ঘিরে ফেলল অটোমান সেনাবাহিনী।

দক্ষিণ দিক থেকে ইসহাক পাশা আনাতোলিয়ান বাহিনী, পশ্চিমে কারাজা পাশার রুমেলিয়ান বাহিনী। উত্তরে তুরাখান বেগের আজব ইনফ্যান্ট্রি ও উত্তর পূর্বে জাগান পাশার শক্তিশালী ক্যাভালরি অবস্থান নিল।

গোল্ডেন হর্নের মুখে নিজের জাহাজ বহর নিয়ে উপস্থিত হলেন সুলেইমান বাল্টোতোলু, অটোমান নৌবাহিনীর প্রথম কাপুদান পাশা।

কনস্ট্যান্টিনোপলকে বলা হতো বেস্ট ডিফেন্ডেড সিটি ইন দ্যা হিস্টোরি। এর ভেতরে থাকা মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্যই ৬২৬ সালে সাসানি সম্রাট খসরুর এক লাখ ত্রিশ হাজারকে ঠেকিয়ে দিয়েছিল, ডিফেন্স সিস্টেমটা ছিল এতটাই উন্নত। সাথে ছিল উন্নত গ্রিক নৌবাহিনী ও তাদের বিখ্যাত গ্রিক ফায়ার, যা উমাইয়া খলিফাদের দুটো নৌবাহিনীকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

কিন্তু তবুও বলতে হয়, বাইজান্টাইনদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অভাব ছিল। সম্রাটের মোট সেনা সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ হাজার, সাথে দু হাজার জেনোইস আর ভেনেশিয়ান সৈন্য যুক্ত হলো, সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে যোগ দিল আরও তিন হাজার যুবক।

---

১৪. Michael Spilling. ed.. Battles That Changed History: Key Battles That Decided the Fate of Nations (London. Amber Books Ltd. 2010) p 187

কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধঃ ট্যাকটিক্যাল ম্যাপ।

শহরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থান নিলেন সম্রাট স্বয়ং, সাথে জেনোইস ট্যাকটিশিয়ান জিওভান্নি জিউস্টিনিয়ানি লঙ্গো। শহরের দেয়ালের দক্ষিণে অবস্থান নিলেন থিওফিলাস পালাইলাগোস, মধ্যভাগে বশিয়ার্দি ব্রাদার্সের অভিজাত বাহিনী, দক্ষিণে ভেনিস থেকে আসা কাতানিওর বাহিনী। আর গোল্ডেন হর্নের মুখে নিজের নৌবাহিনী নিয়ে পজিশন নিলেন গ্যাব্রিয়েল ত্রেভিসানো। গোল্ডেন হর্নের মুখে পানির নিচে বসানো হলো বিশেষ বাইজান্টাইন ডিভেন্সিভ চেইন। জাহাজ উল্টো দিক দিয়ে যদি হার্বারে ঢুকতে চায়, এই চেইন টেনে গ্যাব্রিয়েল চাইলেই জাহাজের তলা ফাটিয়ে দিতে পারবেন।

ওদিকে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছেন মুহাম্মাদ। তিনি নিজের রাজকীয় সোনালি লাল তাঁবু গাঁড়লেন শহরের উত্তর পশ্চিমে। তাঁবু থেকে তিন শ মিটার দূরে বসানো হলো সেই বিখ্যাত কামান, ব্যাসিলিকা। সুলতানের চারপাশে অবস্থান নিল দশ হাজার জানিসারি।

মুহাম্মাদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেকোনোভাবেই হোক কনস্ট্যান্টিনোপল তার চাই।

সতেরো

অবরোধ শুরু হলো।

ব্যাসিলিকার একেকটি গোলার আঘাত কাঁপিয়ে তুলছিল এমনকি থিওডোসিয়াসের দেয়ালকেও।

ছ শ পাউন্ড ওজনের একেকটি গোলা যখন দেয়ালের ওপর পড়ত, আশেপাশের টাওয়ারগুলো কেঁপে ওঠত।

কিন্তু গড়ে প্রতি চারটি গোলার একটি মাত্র টার্গেটে আঘাত হানত এবং একই জায়গাতে দুটো গোলা লাগানো ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সকালে গোলার আঘাতে দেয়ালের যে

জায়গাতে ছিদ্র হয়ে যেত, দুপুরের ভেতরে সেখানে আর কোনো গোলা না লাগাতে পারলে বাইজান্টাইন ইঞ্জিনিয়াররা তা মেরামত করে ফেলত।

একদিনে আটটার বেশি গোলা ছোড়া সম্ভব ছিল না ব্যাসিলিকা থেকে।

অবরোধের বারো দিনের মাথায়, এপ্রিলের ১৮ তারিখ পরপর চারটি গোলা দেয়ালের একই জায়গাতে লাগায় দেয়ালে বিশাল এক গর্ত তৈরি হলো। দেয়ালের কাছে থাকা আনাতোলিয়ান সেনাবাহিনী দ্রুত দেয়ালের ভেতর ঢুকে পড়ল।

কিন্তু ভেতরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল বিভীষিকা।

অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা সাইফন থেকে হঠাৎ গ্রিক ফায়ার বেরিয়ে এসে সামনে থাকা সৈন্যদের পুড়িয়ে দিতে শুরু করল। চারবার গ্রিক ফায়ার ওপেন করার পর অটোমান বাহিনী পিছু হটে গেল।

দুপুরে আবারও এগিয়ে গেল তারা। কিন্তু সরু গলির ভেতরে প্রাণপণে লড়ে তিন শ জীবনের বিনিময়ে তাদের হটিয়ে দিল গ্রিকরা। এক দিনে মারা গেল দুই হাজার অটোমান সৈনিক।

ওদিকে জেনোয়া থেকে আসা নৌবহর বারবার চেষ্টা করছিল সুলেইমানের বাহিনীকে পরাজিত করে গোল্ডেন হর্নের কব্জা নিয়ে নেবার।

২০শে এপ্রিল গোল্ডেন হর্নের মুখে তাদের সাথে সুলেইমানের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো।

অটোমানদের তীরন্দাজরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করে তিনবার শত্রুদের হটিয়ে দিল কিন্তু শেষবারের বার জেনোইসদের দ্রুতগতির আক্রমণের কাছে তারা পরাজিত হলো। চারটা খ্রিষ্টান জাহাজ গোল্ডেন হর্ন দিয়ে ঢুকে কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করলে খ্রিষ্টানরা আনন্দে নেচে ওঠল। এই ব্যর্থতার কারণে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো নৌবাহিনী অফিসারদের।

সুলতান সুলেইমান বালোতলুর শিরোচ্ছেদের আদেশ দিলেন। কিন্তু অন্য অফিসারা আল্লাহর নামে সাক্ষী দিল যে তিনি প্রাণপণে লড়াই করেছেন। তার বাম চোখের নিচে কাটা দাগ এরই সাক্ষী দিচ্ছিল।

মুহাম্মাদ সুলেইমানকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলো। নৌপ্রধান ঘোষণা করা হলো জাগান পাশাকে।

২১শে এপ্রিল ফজরের নামাজের পর এক পাগলাটে পরিকল্পনা ঢুকলো মুহাম্মাদের মাথায়।

ডিফেন্সিভ চেইনের কারণে অটোমান ফ্লীট গোল্ডেন হর্নে ঢুকতে পারছিল না। তিনি নির্দেশ দিলেন, পাহাড়ী উপত্যকার ওপর দিয়ে গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তা তৈরি করার। প্রবল বিরোধিতা করলেন জান্দারলি খালিল পাশা। তিনিসহ একাধিক পাশা বললেন, এটা অসম্ভব।

সুলতান জবাব দিলেন, সম্ভবের সীমা আসলে কতটুকু তা জানতে হলে অসম্ভব কিছু করার চেষ্টা করতে হয়।

এক দিনে হাজার হাজার গাছ কাটা হলো, সেই গাছের ওপর মোষের চর্বি মেখে পিচ্ছিল করা হলো গাছের গুড়ি। এক রাতের মধ্যে সেই গাছের গুড়ির ওপর দিয়ে ষাঁড় দিয়ে টেনে নিয়ে আসা হলো সত্তরটি জাহাজ।

২২ এপ্রিল ভোরবেলা প্রণালিতে থাকা গ্রিক নৌবাহিনী হতবাক হয়ে দেখল গোল্ডেন হর্নে মুসলিম জাহাজের সংখ্যা তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

গোল্ডেন হর্ন মুহাম্মাদের নৌবাহিনীর দখলে চলে গেল।

আঠারো

২৫শে এপ্রিল, ১৪৫৩। সকালবেলা।

জানিসারি জওয়ানেরা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো নিশ্ছিদ্র কাতারে এগিয়ে গেল থিওডোসিয়ান দেয়ালের একটা ফাটলের কাছে।

এক জানিসারি চিৎকার করে ওঠল, পুরুষ হয়ে থাকলে সামনে আয়।

ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ এল। বুকে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জানিসারি যুবক। দুপাশের টাওয়ার থেকে বৃষ্টির মতো তীর ছুটে আসতে লাগল, উপায়ান্তর না দেখে পাঁচটি লাশ রেখে পিছু হটে গেল জানিসারিরা।

এক আহত জানিসারি মৃত্যুর প্রহর গুনছিল। সে চিৎকার করে উঠল, ভাইয়েরা আমাদের লাশকে অপমানিত হতে দিও না।

পিছু হটে যাওয়া জানিসারিরা আবার রুখে দাঁড়াল। পাঁচটা লাশ আনতে দশজন এগিয়ে গেল। তারা লাশের কাছাকাছি পৌছতে না পৌছতেই একের পর এক বুলেট তাদের মাটিতে শুইয়ে দিল।

এবার পেছনে থাকা সব জানিসারিরা এগিয়ে এল ঢেউয়ের মতো।

লাশের স্তূপ পড়েছিল সেদিন কিন্তু কোনো একটা লাশকেও শত্রুর হাতে রেখে যায়নি একজন মুসলিম সৈন্য। তারা তাদের ভাইদের লাশকে অপমানিত হতে দেয়নি।

পঁচিশে এপ্রিলের হামলাতে সাড়ে তিন হাজার অটোমান নিহত হলো। দিনকে দিন এটা পরিষ্কার হতে লাগল, এই দেয়াল ভেঙে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করা আসলে সম্ভব না।

২৮শে এপ্রিল গভীর রাতে গ্রিক ফায়ার ছুঁড়ে হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করল বাইজান্টাইন নৌবাহিনী।

জাগান পাশা দ্রুত তার জাহাজগুলো গ্রিক ফায়ারের রেঞ্জের বাইরে নিয়ে গিয়ে আগুনে তীর বর্ষণ করতে লাগলেন গ্রিকদের জাহাজে। এলিমেন্ট অফ সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে অটোমান নৌবাহিনীকে পরাজিত করতে পারল না গ্রিক বাহিনী। চল্লিশ জন ইতালিয়ান সৈন্যকে বন্দি করল অটোমানরা। তাদের লাশ শূলে গেঁথে শহরের দেয়ালের বাইরে রেখে দেয়া হলো। শত্রুকে ডিমোরালাইজ করার জন্য এই কাজটা করা হয়েছিল।

বাইজান্টাইনরা মোটেই ভয় পেল না।

পরদিন সকালে দেয়ালের ওপর দুই শ ষাটজন অটোমান সেনার ছাল ছাড়ানো শূলে চড়ানো লাশ দেখা গেল।[১৫]

উনিশ

মুহাম্মাদের ইঞ্জিনিয়াররা এক নতুন পরিকল্পনা আঁটলেন।

মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তারা দেয়ালের নিচ দিয়ে শহরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলেন। জোহানেস গ্র্যান্ট নামের এক জার্মান মাইন বিশেষজ্ঞকে আনা হলো এই কাজের জন্য। সমস্যাটা হলো, ১৬ই মে নাগাদ বাইজান্টাইন গোয়েন্দারা এই পরিকল্পনা জেনে ফেলল।

২১-২৩শে মে তারা পাল্টা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অটোমানদের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। অসামান্য বীরত্ব দেখিয়ে বাইজান্টাইনরা গ্রিক ফায়ারে পুড়িয়ে অটোমান সুড়ঙ্গ সেনাদের ছাই করে দিল।

মুহাম্মাদ এবার হাল ছেড়ে দিলেন।

ওয়ার কাউন্সিলের সভায় প্রধান উজির খলিল পাশা সুলতানের সমালোচনা করলেন। উলামাদের বুদ্ধি আর জাগান পাশার পরামর্শে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না বলে তিনি জোরালো মতামত প্রকাশ করলেন। ক্ষয়ক্ষতিতে ক্লান্ত সুলতান আরেকবার বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে দূত পাঠালেন। চিঠিতে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব লেখা ছিল।

---

১৫. Runciman, Steven (1965). The Fall of Constantinople, 1453 (Canto ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521398329

সম্রাট কনস্ট্যানটাইন সাফ জানিয়ে দিলেন, কোনোভাবেই তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না।

২৩শে মে দুজন তুর্কি অফিসার গ্রিকদের হাতে ধরা পড়ল। এই দুজনকে মেরে তাদের মুখ থেকে কোথায় কোথায় সুড়ঙ্গ আছে, তার সব জেনে নিল গ্রিকরা।

২৩শে মে'র মধ্যে গ্রিক ফায়ার দিয়ে তারা সবকটা সুড়ঙ্গে থাকা তুর্কি সৈনিকদের পুড়িয়ে মেরে ফেলল।

মুহাম্মাদ ভাবলেন, অনেক হয়েছে, আর না।

বিশ

২৪শে মে মুহাম্মাদের উস্তাদ শাইখুল ইসলাম আকা শামসুদ্দিন আর মোল্লা আহমেদ কুরআনি তার সাথে দেখা করতে এলেন। এশার পর সাগরের পাড়ে থিওডোসিয়ান দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হতাশ কণ্ঠে কথা বলছিলেন তরুণ সুলতান। মুহাম্মাদ অবাক হয়ে খেয়াল করলেন, তার চির অবিচল উস্তাদের চোখ রক্তলাল হয়ে আছে। ঘামে চুপচুপে হয়ে আছে তার কাপড়।

আকা শামসুদ্দিন সুলতানকে বললেন, একটু আগেই আমি একটা স্বপ্নে সাহাবি হযরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর কবর দেখতে পেয়েছি। গত সাত দিন ধরেই আমি এই কবর খুঁজছিলাম। এইমাত্র স্বপ্নে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। কাল যেখানে আমি জায়নামাজ বিছিয়েছিলাম, সেখানেই ওই পবিত্র কবর।

মুহাম্মাদ, আজ থেকে আট শ বছর আগে রাসূল (সা.)-এর এই পতাকাবাহক এখানে এসে শহিদ হয়েছিলেন। আমাদের উচিত তাদের কবর খুঁজে বের করা। কনস্ট্যান্টিনোপল জয় হবে কিনা তা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। আমরা সেটা পরে দেখব।

মুহাম্মাদ মাত্র তিনজন সঙ্গী সাথে নিয়ে গোপনে কবর খুজতে বের হলেন। সারারাত মশাল জ্বালিয়ে থিওডোসিয়ান দেয়ালের পাশে, সাগরের তীরে তারা সেই জায়গাটা খুঁজলেন।

২৫ মে ভোরবেলা তারা খুঁজে পেলেন আবু আইয়ুব আল আনসারির (রা.) হারিয়ে যাওয়া কবর।[১৬]

কাফন খোলা হলো।

হযরতের পবিত্র হাতে একটা ছোট্ট কাগজ বাধা ছিল। সেখানে লেখা–

> 'তোমরা যদি কোনোদিন কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করত পারো, তাহলে শহরের একটু মাটি আমার হাতে দিয়ে দিও'।

---

[১৬]. প্রাগুক্ত(৫)

কাঁদতে কাঁদতে তাঁবুতে ফিরলেন মুহাম্মাদ।

তিনি যখন তাঁবু থেকে বের হলেন, তাকে দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল।

সেনাবাহিনীকে ডেকে সুলতান ঘোষণা করলেন–

> 'আমরা মুসলমান, আমরা এক আল্লাহর বান্দা, আখেরি নবি মুস্তাফা মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত। আমাদের সামনে আছে রোমান সম্রাটের বানানো বিশাল দেয়াল, যা গত এক হাজার বছরে কেউ ভাঙতে পারেনি।
>
> কিন্তু আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) বলে গেছেন, তার উম্মতের এক অসাধারণ সেনাবাহিনী এই দেয়ালকে গুঁড়িয়ে দিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করবে। আমার মনে হয়, আমাদের নবি (সা.) আমাদের কথাই বলে গেছেন। আমি মুহাম্মাদ বিন মুরাদ আমার পুরো জীবন এই কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের জন্য কুরবানি করে দিতে রাজি আছি। হয় আমি কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করব, নয়তো কনস্ট্যান্টিনোপলের সামনেই আমার মরণ হবে।
>
> নবিজির প্রিয় সাহাবি আবু আইয়ুব আল আনসারি (রা.) তার কবরের জন্য আমাদের কাছে এই শহরের মাটি চেয়েছেন। আমরা কি তার কবরে কনস্ট্যান্টিনোপলের মাটি এনে দিব না?'

সেনাবাহিনী গর্জে ওঠল সুলতানুম! আমরা জান দিয়ে হলেও মাটি এনে দিব।

সুলতান আবার বললেন–

> 'এত বড় বাহিনী নিয়ে এসেও যদি কাল এই শহর জয় না হয়, যদি আমরাই আল্লাহর রাসূলের দেয়া ওয়াদা পূরণ করতে না পারি, আমাদের জন্ম যেন মিথ্যা হয়।
>
> কাল আবার আক্রমণ হবে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা পূরণ করব, কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে আমরা তার সাহাবির হাতে মাটি পৌঁছে দিব ইনশা আল্লাহ!
>
> আল্লাহু আকবার!'

সেনাবাহিনী গগনবিদারী আওয়াজে জবাব দিল, 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! আল্লাহু আকবার!!!'

পুরো বাহিনী নতুন উদ্যমে আবার প্রস্তুত হলো। সুলতান লেগে পড়লেন ছোট কামানগুলো নিয়ে। তিনি চান এগুলোর ব্যারেলে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে এসে কামান বহরের গোটা ফায়ার পাওয়ারকে থিওডোসিয়ান ওয়ালের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে। দানবীয় কামান ব্যাসিলিকার বিশাল গোলায় দেয়ালের যে জায়গাটা আগে নড়বড়ে হয়ে যাবে, সেখানেই অনবরত আঘাত হানতে হবে ছোট কামানগুলো দিয়ে।

তবুও এই দেয়াল ভেদ করা যাবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

একুশ

২২শে মে রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়ছিল।[১৭]

চন্দ্রগ্রহণকে গ্রিকরা বিপদের লক্ষণ হিসেবে দেখত।

২৬শে মে, বসন্তের সকালে উঠে তারা অবাক হয়ে দেখল, ঘন কুয়াশাতে গোট শহর আচ্ছন্ন।

এত ঘন কুয়াশা মে মাসের শেষ দিকে কনস্ট্যান্টিনোপলে কখনোই দেখা যায় না। অভূতপূর্ব এই কুয়াশাতে শহর আচ্ছন্ন হয়ে রইল সারাটা দিন।

সন্ধ্যার ঠিক আগে কুয়াশা কেটে গেল। সন্ধ্যার পর থেকে চার্চ অফ হোলি অ্যাপোসলের চূড়া থেকে বের হলো এক অদ্ভুত দীপ্তি।[১৮] কনস্ট্যান্টিনোপলের মানুষ ভাবল এই আগুন সম্ভবত জোনাস হুনয়াদির ক্যাম্পফায়ারের আগুন। তিনি তাদের উদ্ধার করতে এসেছেন। কিন্তু একটু পরেই জোরালো এক ঝলকানির পর চার্চের গম্বুজ থেকে আলোটা উধাও হয়ে গেল।

গ্রিক অর্থডক্স চার্চের পাদ্রিরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

পবিত্র আত্মা কনস্ট্যান্টিনোপল ছেড়ে চলে গেছেন।

বাইশ

২৮শে মে সারা রাত কিয়ামুল লাইল চলল মুসলিম ক্যাম্পে। দেয়ালের ওপারে চলল গির্জায় প্রার্থনা। দুপক্ষই যার যার স্রষ্টাকে ডাকছে। দুপক্ষই মানে, তিনি আসলে একজনই।

সম্রাটের নির্দেশে শহরের প্রতিটি সক্ষম পুরুষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো।

ওদিকে সুলতান সৈন্যদের উৎসাহ বাড়াতে ঘোষণা দিলেন, শহরে ঢোকার পর শহরের মানুষ ও দেয়াল হবে সুলতানের। বাকি যত ধন সম্পদ আছে সব সৈন্যদের। তবে গির্জা লুট করা যাবে না।

২৯শে মে, ১৪৫৩ সাল।

ভোরবেলায় গর্জে উঠল সুলতানের কামান ব্যাসিলিকা।

যেখানে অন্যদিন এই কামানের গোলা এক জায়গায় খুব কমই পড়ে, সেখানে ছ ঘণ্টার মধ্যে তিনটা গোলা থিওডোসিয়ান দেয়ালের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশে তিন তিনবার আঘাত হেনে ছিদ্র করে ফেলল। এর সাথে যুক্ত হলো সদ্য তৈরি করা হাম্বারা বা হাউইৎজারের গোলাবর্ষণ। হা হয়ে গেল এক হাজার বছর ধরে অপরাজেয় বলে খ্যাত থিওডোসিয়ান ওয়াল।

---

[১৭]. Guillermier, Pierre; Serge Koutchmy (1999). Total Eclipses: Science, Observations, Myths, and Legends. Springer. p. 85. ISBN 1-85233-160-7. Retrieved 27 February 2008.

[১৮]. Kritovoulos, Michael. History of Mehmed the Conqueror. Translated by C. T. Riggs. Princetone, NJ: Princeton University Press. 1954. Pg. 59.

ঝাঁকে ঝাঁকে আজব গেরিলারা সেখান দিয়ে ঢুকতে লাগল। বাইজান্টাইন সম্রাট নিজে এসে তাদের হটিয়ে দিলেন।

আবার ব্যাসিলিকার গোলার ঘায়ে দেয়ালের একটা অংশ ভেঙে পড়ল। সেখান দিয়ে ঢোকার জন্য এগিয়ে গেল ক্রিমিনাল কোর, বাশিবাজুক। সাম্রাজ্যের চোর বাটপার-দাগী আসামীদের ধরে এনে সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে ক্লোজ কমব্যাটে দক্ষ এই বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল।

বাশিবজুকরা ঝাঁকে ঝাঁকে মরল কিন্তু অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি করে গেল গ্রিকদের ফ্রন্ট লাইনে।

এবার এগিয়ে এল জানিসারি বাহিনী।

মেহতার ব্যান্ডের তালে তালে রক্তে ঝংকার তোলা আওয়াজে তাঁতিয়ে উঠল তাদের শোণিত রক্ত।

'আমরা পীরদের কাছে দোয়া চাই।
এক আল্লাহর নামে, মুহাম্মাদ ও আলির নামে!
ইয়া আল্লাহ দয়া করে আমাদের দিকে তাকান,
আপনার মহানুভবতা ও গৌরবের ভালোবাসায় আমরা লড়তে এসেছি।
ইয়া আল্লাহ! দয়া করে আমাদের কাঁদাবেন না!
আমরা পীরদের দোয়া চাই!
দুনিয়া মিথ্যা, তাতে আমাদের কী?
আমরা আল্লাহর ভালোবাসায় জীবন দিয়ে দিই।'

রণ সঙ্গীতের তালে তালে ফুটন্ত রক্ত ধমনীতে নিয়ে তারা গ্রিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একের পর এক জানিসারিদের কাতার গুলি আর তীরে শুয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের টপকে এগিয়ে আসছিল নতুন সৈন্যদের কাতার। একটু পর জানিসারিদের সাথে যোগ দিল তিমারি সিপাহীরা। তাদের পর এল রিজার্ভ বাহিনী, কাপিকুলু।

আনাতোলিয়ার সিপাহীদের নেতা হাসান উলুবাদি একাই মই নিয়ে দেয়ালে চড়ে বসলেন।

গ্রিকদের তীর একের পর এক তার শরীরে ঢুকতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে মই নিয়ে হাসান দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগলেন।

তিনি শুনেছেন, প্রথম যে এই শহরে প্রবেশ করবে সে জান্নাতে যাবে।

মই বেয়ে থিওডোসিয়াসের দেয়ালের ওপর উঠে গেলেন হাসান। এক হাতে কালিমা খচিত পতাকা, আরেক হাতে তলোয়ার।

দেয়ালের ওপরে থাকা বাইজান্টাইন সেনারা তীরের পর তীর ছুঁড়ে গেল হাসানের দিকে, একেকটা তীর গায়ে বেঁধে কিন্তু হাসান থামেন না। তার গতি, বিশাল শরীর আর তীরের পর তীর গায়ে নিয়েও অবিচল হয়ে এগিয়ে যাওয়া দেখে ভয়ের শীতল স্রোত ছড়িয়ে পড়ল বাইজান্টাইনদের ভেতর। বাইজান্টাইনদের ধরে ধরে দেয়ালের ওপর থেকে ছুঁড়ে মারতে থাকলেন হাসান উলুবাদি।

এবার তাকে গুলি করা হলো, ভারী ম্যাচলকের বুলেটে ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে পতাকা বাঁধার খুঁটির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। খুঁটি থেকে বাইজান্টাইন পতাকা খুলে ফেলার সময় তাকে আবার গুলি করা হলো।

হাসানের বিশাল শরীর কেঁপে উঠল গুলির ধাক্কায়। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে থিওডোসিয়ান ওয়ালের ওপর তিনি উড়িয়ে দিলেন হিলালি নিশান।

এবার তার সাহায্যের জন্য হাজির হলেন তার জামাতের ষোলজন সিপাহী, একটু পর তাদের সাথে যোগ দিল আরও এক প্লাটুন জানিসারি।

দেয়ালের নিচেও তখন সমানে চলছে লড়াই। দুপক্ষের ভেতর প্রচুর তীর ও গুলি বিনিময় হতে লাগল। গুলি আর তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে জানিসারিরা তিলাওয়াত করছিল কুরআনের আয়াত–

> 'ফালাম তাক্বতুলহুম, ওয়ালা কিন্নাল্লাহা ক্বতুলুহুম, ওয়ামা রামাইতা ইযা রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা!'
>
> 'নিশ্চয়ই তোমরা তাদের হত্যা করোনি, আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা তাদের ওপর নিক্ষেপ করোনি, আল্লাহই তাদের ওপর নিক্ষেপ করেছেন।' সূরা আনফাল : ১

একটা বুলেট সরাসরি জিওভান্নি জিউস্টিনিয়ানির বর্মাচ্ছাদিত বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তাকে দ্রুত ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো চিকিৎসার জন্য।

কমান্ডারের পতনের ফলে জেনোইসরা পালাতে শুরু করল।

সম্রাট ঘোড়া থেকে নেমে নিজের রাজকীয় পোশাক খুলে ফেলে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।[১৯]

তার ভয়ংকর ক্যাভালরি চার্জ রুখে দিতে গিয়ে শহিদ হলো প্রচুর আজব ও জানিসারি। এর মধ্যেই হঠাৎ দেয়ালের ওপর থেকে ভেসে এল তাকবির, 'আল্লাহু আকবার।'

এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে সবাই তাকাল ওপরের দিকে, দেখল পতপত করে ওড়ছে ইসলামি পতাকা।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর পতাকা।

[১৯]. Nicolle, David (2000). Constantinople 1453: The End of Byzantium (Campaign). 78. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 1-84176-091-9.

হাল ছেড়ে দিল বাইজান্টাইন বাহিনী।

বন্যার পানির মতো শহরে ঢুকে পড়ল অটোমানরা।

সুলতানের নির্দেশে চার্চ অফ হোলি অ্যাপোসল আর হাজিয়া সোফিয়ার দিকে ছুটে গেল সেনাবাহিনীর দুটি রেজিমেন্ট, যাতে গির্জা লুট করা না হয়।

নিজের সাদা ঘোড়ায় চড়ে যখন কনস্ট্যান্টিনোপলে মুহাম্মাদ প্রবেশ করছিলেন, তখন তার মাথা বিনয়ে নুয়ে ছিল। ঘোড়া থেকে নেমে প্রথমে সিজদা করলেন তিনি। তারপর পাগড়ি খুলে শহরের মাটি মাখালেন নিজের মাথায়।

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো তাঁর ইন্তেকালের ৮২১ বছর পর। কনস্ট্যান্টিনোপলের নতুন নাম রাখা হলো 'ইসলামবুল'। 'ইসলামের ঘর।'[২০]

বিকেলে থিওডোসিয়ান ওয়ালের ওপর থেকে চারজন মিলে উলুবাদি হাসানের লাশটা নামাল।

লাশের গায়ে বিঁধেছিল সাতাশটা তীর, ছয়টা গুলি।

মুখে কোনো যন্ত্রণার ছাপ ছিল বলে জানা যায়নি।

তীরের ঝাঁক অথবা বুলেট কিছুই পতাকা থেকে উলুবাদী হাসানকে থামাতে পারেনি।

২০. Sakaoğlu, Necdet (1993–94). "İstanbul'un adları" [The names of Istanbul]. Dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi (in Turkish). Istanbul: Türkiye Kültür Bakanlığı.

খাকান উল বাহরাইন

এক

হাজিয়া সোফিয়া আর চার্চ অফ হোলি অ্যাপোসলের ভেতর তখনো চলছে প্রার্থনা।

তখনো কনস্ট্যান্টিনোপলের অধিবাসীরা ভাবছে ঈশ্বরের সাহায্য নেমে আসবে তাদের ওপর। তাদের প্রার্থনা শেষ হবার আগেই চার্চের দরজায় তুর্কিদের করাঘাত শোনা গেল। শহরজুড়ে লুট শুরু হলো। ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, দোকানপাট, বাজার সবকিছু বেপরোয়াভাবে লুট করতে লাগল তুর্কি সৈন্যরা।

গত ৫৩ দিনের লড়াইয়ে মুসলিম বাহিনীর অন্তত দশ হাজার যোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। খ্রিষ্টানরা সুরক্ষিত ছিলেন থিওডোসিয়ান ওয়ালের পেছনে। তাই তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল এর চার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অটোমানরা শহরে প্রবেশের পরেও লড়াই চালিয়ে যাওয়া প্রায় হাজারখানেক অধিবাসীকে হত্যা করা হলো, বাইরে রটে গেল গণহত্যা শুরু হয়েছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রিকরা পালাতে লাগল। পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ত্রিশ হাজারই বন্দি হয়ে দাস-দাসীতে পরিণত হলো। এদের শতকরা ৭০ ভাগই ছিলেন নারী। বেশিরভাগ পুরুষ পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের স্ত্রী-সন্তান ফেলে।

বিকেলবেলা শহরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুলতান। এক দিনে একটা সুন্দর শহরকে যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে তার সৈন্যরা। দুহাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল।

'ইয়া আল্লাহ! এত সুন্দর শহরটা আমাদের হাতে পড়ে কতই না খারাপ এক জায়গায় পরিণত হয়েছে![১]

---

১. Runciman, Steven (1965). The Fall of Constantinople, 1453 (Canto ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521398329.

তৎক্ষণাৎ শহর লুট বন্ধের ঘোষণা দেয়া হলো।

সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের প্রধান উজির লুকাস নোটারাসকে শহরের গভর্নর পদে বহাল করা হলো। সম্রাটের নিজের কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু সম্রাটের বড় ভাইয়ের যে দুই ছেলে বন্দি হয়েছিল তাদের নিজের প্রাসাদের মাদরাসায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন সুলতান।

কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রবেশের কিছুক্ষণ পর তিনি হাজিয়া সোফিয়া চার্চের দরজায় পৌঁছলেন। তার সামনেই চার্চের দেয়াল থেকে মার্বেল পাথর খুলে নিতে চেষ্টা করছিল এক সৈনিক।

তলোয়ারের এক হালকা আঘাতে সুলতান বুঝিয়ে দিলেন, পরের বার আদেশ অমান্য করলে জীবন হারাতে হবে।

চার্চে ঢুকেই ইমাম সাহেবকে বেদীতে উঠে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন সুলতান। হাজার বছরের পুরোনো চার্চ হাজিয়া সোফিয়ার ভেতরে ধ্বনিত হলো আল্লাহু আকবার-আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এটিই ছিল একমাত্র চার্চ যাকে মসজিদে পরিণত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ক্রিশ্চিয়ানিটির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়ের একটা প্রতীকীকরণ।

হাজিয়া সোফিয়া ছিল খ্রিষ্টবাদের রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক। রাজনৈতিক ক্ষমতার বদলে পাল্টে গেলে এটির পরিচয়।

দুই

ভৌগোলিকভাবে তুরস্ক তথা আনাতোলিয়া ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যের মাঝামাঝি অবস্থিত।

গত চার শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ক্রুসেডাররা জেরুসালেম হয়ে মক্কা-মদিনা জয় করে নিয়ে ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য যে সব অভিযান চালিয়েছে, এশিয়াতে ঢোকার জন্য তাদের প্রথমেই তুরস্ক পেরোতে হতো।

তুরস্কে একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে তাদের এই অভিযানে স্থলপথ ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে যাওয়া।

সুলতান মুরাদ খোদাওয়ান্দিগারের আমলে এটার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। আর সুলতান ইয়িলদিরিম বায়েজিদ নিকোপলিসের যুদ্ধে ইউরোপের বুকের ওপরেই গেঁড়ে দিয়েছিলেন ক্রুসেডের কবর।

এত দিন ইউরোপে অভিযান চালানোর আগে অটোমানদের পেছনে থাকা বাইজান্টাইন শত্রুর কথা চিন্তা করতে হতো। এখন সে শত্রুর গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে।

এই বিজয়ের ফলে মুহাম্মাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। উলামারা তাকে 'আল ফাতিহ্' উপাধি দিলেন। এখনো পর্যন্ত সারা মুসলিম বিশ্ব তাকে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্ বা ফাতিহ্ মেহমেদ খান নামে চেনে। আর খ্রিষ্টান বিশ্বে তার পরিচিতি মেহমেদ দ্যা কঙ্কোয়েরর হিসেবে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী দখলের পর নিজেকে কাইজার-ই-রুম বলে ঘোষণা দিলেন সুলতান। এটা ছিল ইউরোপের জন্য আরেকটি লজ্জা। ক্রিশ্চিয়ানিটির রাজধানীতে পতপত করে ইসলামের চাঁদ-তারা আঁকা কালিমাখচিত পতাকা উড়তে লাগল।

এই অপমান পোপ ফিফথ্ নিকোলাস কোনোভাবেই মানতে পারলেন না। সারা ইউরোপে ক্রুসেডের ডাক দিয়ে বসলেন তিনি। কিন্তু মুহাম্মাদের সাথে সামনা সামনি লড়াইয়ে আসার শক্তি বা সাহস তখন কোনো ইউরোপিয়ান সম্রাটেরই ছিল না।

রেগেমেগে পোপ নিজেই তার বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। কিন্তু ইতালির সীমানা ছাড়াবার আগেই হৃদরোগে তার মৃত্যু হলে এই ক্রুসেড থেমে গেল।[২]

তিন

কাইজার হয়ে বসে থাকার লোক ছিলেন না মুহাম্মাদ। তার লক্ষ্য ছিল বিশাল এক ইসলামি সাম্রাজ্য গড়ে তোলা, যা একই সাথে ধারণ করবে সারা বিশ্বের সংস্কৃতি।

তিনি ছিলেন যথেষ্ট উদার মনের একজন মানুষ।

জেনোডিয়াস স্কলারিসকে ধর্মীয় স্বাধীনতার লিখিত সনদ তুলে দিচ্ছেন সুলতান।

২. Housley, N., 2004. Giovanni da Capistrano and the Crusade of 1456. In Crusading in the Fifteenth Century (pp. 94-115). Palgrave Macmillan UK.

শহরের প্রধান পুরোহিত জেনোডিয়াসকে নিজের হাতে রোব পরিয়ে সসম্মানে তাকে গ্রিক অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের নেতা হিসেবে একজন অটোমান পাশার সমান ক্ষমতা দিলেন সুলতান। তিনি নিশ্চিত করছিলেন, কোনোভাবেই যেন তার কোনো খ্রিষ্টান প্রজার ওপর অত্যাচার না হতে পারে।[১]

পাশাপাশি এতে করে অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের ভেতর অটোমানদের প্রতি উঁচু ধারণার সৃষ্টি হলো।

যেখানে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা তাদের সাথে দাসের মতো ব্যবহার করত, সেখানে বিজয়ী অটোমান মুসলিমরা তাদের সাথে স্বাভাবিক আচরণই করল। যেন তাদের ভেতর কখনো কোনো যুদ্ধই হয়নি।

ধর্মান্ধতার অন্ধকারে যখন ইউরোপে ইহুদিদের কথায় কথায় আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদের দরবারে আশ্রয় পাচ্ছিলেন ইহুদি, অর্থডক্স খ্রিষ্টান, স্লাভ প্যাগান, পারস্যের সুফি, আরবের বেদুইন বা তুর্কমান যাযাবর সবাই।

বাস্তবিক অর্থেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুই সমুদ্র আর দুই মহাদেশের বাদশাহ।

১. 'Millet', Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Ed. Gábor Ágoston and Bruce Alan Masters, (InfoBase Publishing, 2009), p. 383

মশলা

উপনিবেশবাদ কীভাবে শুরু হলো, কী করে ইউরোপিয়ানরা ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়- তা জানতে আমাদের চলে যেতে হবে পঞ্চদশ শতাব্দীর দুনিয়াতে। তখন স্থলে গানপাউডার আর জলে মশলার রাজত্ব।

আপনি আমি মাংসের সাথে যে গরম মশলার স্বাদ পাই, সেই গরম মশলার দাম এক সময় স্বর্ণের চেয়ে বেশি ছিল। হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন। সোনার চেয়ে দামি ছিল লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, জায়ফল, হলুদ, আদা আর এলাচি।

গরম মশলা জন্মাতে প্রয়োজন হয় ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা এবং ৮০%-এর কাছাকাছি আর্দ্রতা। এই তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা ইউরোপে কোনোদিনই ছিল না। ফলে ইউরোপের মানুষ মশলা কী, তা মোটামুটিভাবে জানতই না। তারা প্রথম মশলার ব্যবহার শেখে মাত্র তিন হাজার বছর আগে, লেবানিজদের কাছ থেকে।

এই যে তারা মশলার প্রেমে পড়ল, আর কোনোদিন তারা এই প্রেম থেকে বেরোতে পারেনি।

মশলার কদর তাদের কাছে কতখানি ছিল তার একটা উদাহরণ হলো, ভিসিগথরা ৪১০ খ্রিষ্টাব্দে যখন রোম অবরোধ করে, তখন তারা সোনা-রূপা চাওয়ার বদলে রোম অবরোধ তুলে নেয়ার বিনিময়ে সম্রাটের কাছে তিন হাজার পাউন্ড গোলমরিচ চেয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতার একটা বড় উৎস ছিল এই মশলার বাণিজ্যপথের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ।

তখনকার দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাণিজ্য ছিল মশলা। আর এই বাণিজ্য পথ যারা নিয়ন্ত্রণ করত, বিশ্ব অর্থনীতির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকত তাদেরই কব্জায়।

ভারতের কেরালা, মালাবার, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা, আচেহ, বালি, জাভা, তিমুর, নিউগিনিতে ছিল মশলার খনি। এই অল্প কিছু জায়গা ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও তখন গরম মশলা চাষ হতো না। যখন এসব জায়গার লোকজন টের পেয়ে গেল যে মশলা বেশ দামি জিনিস, তখন তারা মশলা ফলানোর রেসিপিটা রাতারাতি গুম করে দিল।

ফলে ভারতীয় বণিকরা এসব দ্বীপ থেকে মশলা জাহাজে ভাসিয়ে নিয়ে যেত মালাক্কা প্রণালি হয়ে উপমহাদেশের মূল ভূ-খণ্ড পর্যন্ত।

সেখান থেকে আরব বণিকেরা মশলার কাফেলা নিয়ে রওনা হতো পশ্চিমে।

জাহাজগুলো চলাচল করত শ্রীলঙ্কা, গুজরাট, করাচি, হরমুজ প্রণালি হয়ে বাবেল মান্দেব প্রণালি হয়ে এডেন, আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে সিরিয়া, লেবানন, আনাতোলিয়া হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে। পূর্বে কনস্ট্যান্টিনোপল, পশ্চিমে রোম।

বিখ্যাত প্রাচীন বাণিজ্য পথ সিল্ক রোড; উপরের পথটি মূলত স্থল বাণিজ্য ও নিচের পথটি সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করা হতো।

আরেকটা বাণিজ্যপথ আছে, সেটা আরও বিখ্যাত।

পড়াশোনা করেছেন কিন্তু সিল্করোডের নাম শোনেননি, এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা। সিল্করোড ছিল ভারত-চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত চলে যাওয়া বাণিজ্য পথ।

প্রাচীনকালে এই পথ নিয়ন্ত্রণ করতেন রোমান সম্রাট। ইসলাম তার অভ্যুদয়ের ত্রিশ বছরের মধ্যে সিল্ক রোডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। তারপর ধীরে ধীরে জলে-স্থলে মশলার ব্যবসাটা চলে যায় আরব মুসলিমদের হাতে। সম্ভবত আলিফ লায়লার সিন্দাবাদ এই মশলা ব্যবসায়ীদেরই একজন ছিলেন।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ যখন কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে নিলেন, তখন এই দুটো বাণিজ্যপথ সরাসরি ব্লকড হয়ে গেল।

কনস্ট্যান্টিনোপল/ইসলামবুল থেকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা যেত সিল্করোডের প্রবেশপথ। আর অবশ্যই ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগরে প্রবেশের লাইসেন্সটাও ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল/ইসলামবুলের মালিকের একচেটিয়া দখলে।

ফলে মধ্যযুগের শেষ দিকে এসে দুনিয়ার এক নম্বর ব্যবসাটা মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল।

সমুদ্রপথে মশলার বাণিজ্যের ওপর মুহাম্মাদ আল ফাতিহ উঁচুদরের ট্যাক্স বসিয়ে দিলেন। ফলে ইউরোপের রাজ রাজড়ার ডাইনিং টেবিলে মশলার আমদানি কমে গেল। মশলার দাম শেষে এত বাড়ল যে, এক পাউন্ড জায়ফল কিনতে তখন সাত সাতটা মোটাতাজা ষাঁড়ের প্রয়োজন হতো।

এই পরিমাণ দামে মশলা কেনা খুবই কঠিন হয়ে যেতে থাকল ইউরোপের মানুষের জন্য। ইউরোপের ব্যবসায়ীরা কড়া করে ধরলেন কিং-কুইন-মনার্কদের। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছিল না। মুহাম্মাদ আল ফাতিহর সাথে যুদ্ধ করার মতো সাহস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বিকল্প বাণিজ্যপথ বের করার কথা ভাবতে লাগলেন।

সেই পথ বড় কঠিন পথ।

সমগ্র আফ্রিকার পশ্চিম-দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ঘুরে গিয়ে ভারত মহাসাগরে পাল তোলার পথ। ইউরোপিয়ান সম্রাটদের স্পন্সরশিপে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন দুঃসাহসী নাবিকেরা।

কলম্বাস, অ্যামেরিগো ভেসপুচি, ক্যাব্রালদের মতো বেপরোয়া নাবিকরা মশলার দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য জান বাজি রেখে বেরিয়ে পড়লেন। শুরু হলো দি এজ অফ ডিস্কভারির।

পরের তিন শ বছর ইউরোপের সিবোর্ড নেশনগুলো যুদ্ধ করেছে এই মশলার ব্যবসার একচেটিয়া দখল নিয়ে। ষোড়শ শতাব্দীর অটোমান-পর্তুগিজ ওয়ার, অটোমান-ভেনেশিয়ান ওয়ার, স্প্যানিশ-পর্তুগিজ ওয়ারের মূল কারণ ছিল লবঙ্গ ব্যবসা নিয়ে বিবাদ। সেভেন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে ব্রিটিশ-স্প্যানিশ ওয়ার, ডাচ-ব্রিটিশ ওয়ারের মূলে ছিল গোলমরিচের ব্যবসা।

গরম মশলার গরম, একটা সময় সোনার চেয়েও বেশি ছিল।

আধুনিক উপনিবেশবাদের জন্মদাতা যদি রেনেসাঁ হয়, তবে জননী অবশ্যই গরম মশলা।

হেরেম-ই হুমায়ুন

শাহী হেরেমের প্রধান চত্বর।

এক

হেরেম শব্দটার প্রাকৃতিক উদাহরণ দেখা যায় কোনো এক পরাক্রমশালী পুরুষে, যে তার স্ত্রী-সন্তানদের একটা বিশাল দলকে আগ্রাসীভাবে রক্ষা করে চলেছে অন্যদের কাছ থেকে। যাতে তার জিনের পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হওয়া অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ বাধাগ্রস্ত করতে না পারে।

ইতিহাসে প্রথম হেরেমটা সম্ভবত তৈরি করেন মিসরের ফারাওরা। তাদের মধ্যেই এই প্রথা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে। তারপর সেখান থেকে তা পৌঁছে যায় পূর্বে।[১]

মিসর থেকে ধীরে ধীরে পারস্যে পৌঁছায় এই ধারণা। তারপর তা ছড়িয়ে যায় আরও পূর্বে, ভারতে। ভারতের প্রথম বিখ্যাত হেরেমের মালিক মহান মৌর্য সম্রাট অশোক।

১. Assmann, J., 2003 The mind of Egypt: History and meaning in the time of the pharaohs. Harvard University Press.

তার হেরেমে ছিল পাঁচ শর বেশি উপপত্নী, তারপর ধীরে ধীরে ভারতে এই হেরেম নামের জিনিসটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।[২]
ওদিকে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম নামের এক জীবন ব্যবস্থার জন্ম হয় আরবের মরুতে। ইসলাম পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করে দেয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের অবস্থান।

চতুর্থ হিজরিতে নাযিল হওয়া পর্দার বিধানের পর থেকে মুসলিম নারীরা সাধারণত জনসমক্ষে এলে নিজেকে আপাদমস্তক আবৃত করে রাখতেন। এই প্রথার শুরু যে, ইসলাম করেছে ব্যাপারটা তা নাও হতে পারে। শুরুটা সম্ভবত রোমানদের মধ্যেই প্রথম। রোমান অভিজাত নারীরা সাধারণত প্রকাশ্যে নিজেদের আবৃত রাখতেই পছন্দ করতেন। এটা ছিল তাদের সামাজিক মর্যাদা ও রহস্যময়তার প্রকাশ। কিন্তু ইসলাম এটাকে বাধ্যবাধকতায় পরিণত করে।

সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষী, যেখানেই নগরায়ণ হয়েছে, সেখানেই ক্ষমতা অনেক বেশি কুক্ষিগত হয়েছে পুরুষের হাতে। যাযাবর সমাজে যেখানে নারী ও পুরুষকে প্রায় একই রকম কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়। সেখানে শহুরে সমাজে বিষয়টা মোটেই তা নয়।

এ কারণেই প্রাচীন সিরিয়া ও ইরানের মেয়েদের সমাজের। ক্ষমতা কাঠামোতে দুর্বল অবস্থানের বিপরীতে বেদুইন আরব ও মধ্য এশিয়া-ইউরেশিয়ান স্তেপপের যাযাবর তুর্কো-মোঙ্গল নারীদের ছিল অনেক বেশি স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনচেতা মেয়েরা নগরায়ণ ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই ধীরে ধীরে পড়ে যায় সভ্যতার ফাঁদে, সঠিকভাবে বলতে গেলে পুরুষদের ফাঁদে। তাই কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ নয়, হেরেমের জন্ম আসলে নগরায়ণের হাত ধরে। যেখানেই নগর গড়ে ওঠেছে, সেখানেই তৈরি হয়েছে ক্ষমতা ও সম্পদ বন্টনের শ্রেণিবিন্যাস। কিছু পুরুষ উঠে গেছে এই শ্রেণিবিন্যাসে পিরামিডের একেবারে ওপরে। তারপর তারা ক্রমেই হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে ভোগবাদী, গড়েছে হেরেম। এর একটা বড় উদাহরণ চেঙ্গিজ খানের মোঙ্গল সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য গড়ার আগে মোঙ্গলদের মধ্যে হেরেমের কোনো প্রচলন ছিল না। কিন্তু মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার ত্রিশ বছরের মধ্যেই চেঙ্গিজ খানের হেরেমে স্থান হয় তিন হাজার নারীর। তারপর তার নাতি কুবলাই খানের আমলে তা পৌঁছায় সাড়ে সাত হাজারে।[৩]

এ কারণেই যাযাবর তুর্কি যারা স্বাধীনচেতা নারীদের ব্যাপারে ছিল যথেষ্ট উদার। সভ্যতা ও রাষ্ট্রক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তারাই একদিকে ভারতে তৈরি করল পনেরো হাজার নারীর হেরেম,

---

২. Boesche, R., 2003. Kautilya's Arthasastra on war and diplomacy in ancient India. The Journal of Military History, 67(1), pp.9-37.
৩. Weatherford, J., 2011. The secret history of the Mongol queens: how the daughters of Genghis Khan rescued his empire. Broadway Books.

যার মালিক ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন খিলজি। অন্যদিকে, অটোমান সাম্রাজ্যে তারা তৈরি করছিল মানুষের ইতিহাসে তৈরি হওয়া সবচেয়ে বিখ্যাত হেরেম। সংখ্যার দিক থেকে নয়, সমৃদ্ধির দিক থেকে।

দুই

নার্ভা, ট্রাজান, হ্যাড্রিয়ান, অ্যান্টোনিয়াস পিউস, মার্কাস অরেলিয়াস।

পরপর ক্ষমতায় বসা পাঁচজন বিখ্যাত রোমান সম্রাট। ইতিহাস এই পাঁচজনকে মনে রেখেছে ফাইভ গুড এম্পেররস্ হিসেবে।[৪] এদের মধ্যে একটা জিনিস কমন। এরা কেউ কোনো সম্রাটের ঔরসজাত নন, সবাই পালিত। এদের সিংহাসনে বসা সম্ভব হয়েছে কারণ, সম্রাট মৃত্যুর সময় কোনো পুত্রসন্তানকে জীবিত ও যোগ্য অবস্থাতে রেখে যেতে পারেননি।

এখন থেকে মাত্র চল্লিশ বছর আগেও বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ছেচল্লিশ বছরের কাছাকাছি। এখন থেকে পাঁচ শ বছর আগে তা ছিল আরও কম।

তার মানে এই না যে মানুষ তখন গড়ে তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ বছর বাঁচত। ঘটনা হলো, শিশু মৃত্যুহার ছিল খুবই বেশি। সাধারণত গড়ে জন্মের দুবছরের মধ্যেই প্রতি পাঁচটি শিশুর দুটি ইহধাম ত্যাগ করত। পাঁচ বছরের মধ্যে আরও একটা, বাকি যে দুটো বাঁচত তাদের যেকোনো একটা দেখা যেত পূর্ণ বয়সে পৌছানোর আগেই সাধারণ কোনো এক রোগেই শেষ। আপনার-আমার কাছে উন্নত চিকিৎসাবিদ্যার এই যুগে কলেরা, প্লেগ বা গুটিবসন্ত হয়তো কোনো বিষয়ই না। কিন্তু মাত্র এক শ বছর আগেও কোনো গ্রামে কলেরা বা গুটিবসন্ত দেখা দিলে আশেপাশের গ্রামের লোকজন অনেক সময় ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে জান নিয়ে পালাত। কলেরা কেটে গেছে শুনলে তবেই গ্রামে ফিরত।

তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের আগ পর্যন্ত, একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল সন্তান। যত বেশি সন্তান, তত বেশি তাদের জিনের টিকে থাকার সম্ভাবনা। কারণ, প্রতি পাঁচজনে হয়তো একজন বা দুজনই বেঁচে থাকত পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত।

তাই কোনো সম্রাট বা সুলতানের সন্তানসন্ততির সংখ্যা, বিশেষ করে পুত্র সন্তানের সংখ্যা কম থাকা মানে তার মাথা নষ্ট হবার যোগাড়। উপযুক্ত পুত্র সন্তান না রেখে মরা মানে তাদের কাছে সব থাকার পরেও হাতে হারিকেন নিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করা। কারণ, তার বংশের বাতি জ্বালানোর মতো কেউ থাকছে না। সাম্রাজ্য চালানো যার-তার কাজ না। সাম্রাজ্য সেই ভালোভাবে চালাতে পারে, যার শক্তহাতে রাজদণ্ড ধরে রাখার ক্ষমতা আছে।

এটা ছিল সুলতানের দিক থেকে হেরেমের প্রয়োজনীয়তা। হেরেমের দাসীদের অনেকের জন্যেও হেরেম ছিল বেশ লাভজনক। বেশিরভাগ দাসীরই জীবন শুরু হতো গ্রাম্য কৃষকের মেয়ে হিসেবে, যাদের সামাজিক কাঠামোর ওপর দিকে ওঠার সুযোগ ছিল যথেষ্ট কম।

---

[৪]. Machiavelli. Discourses on Livy. Book I. Chapter 10.

আরও একটা বড় সম্ভাবনা ছিল, যুদ্ধ বা মহামারীতে অকালে জীবন হারানোর। হেরেম তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেও তারা পেত জীবনের নিরাপত্তা, সেই সাথে সর্বোচ্চ মানের জীবনযাপনের সুযোগ। সেই সাথে ভাগ্যের সহায়তা আর নিজ মেধাবলে অনেকেই হতে পারত সুলতানের স্ত্রী বা উপপত্নী অথবা পাশা/বে বা অন্য কোনো উঁচুমানের সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী। এভাবে একজন কৃষকের সন্তানের জীবন শেষ করার সম্ভাবনা ছিল একজন সুলতানা বা পাশার স্ত্রী হয়ে, যা তখনকার বড় ঘরের মেয়েদের জন্য ছিল রীতিমতো স্বপ্ন। এ ছাড়াও যেসব মেয়েরা সুলতান বা পাশাদের স্ত্রী হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না, তিন থেকে নয় বছর হেরেমে কাজ করার পর সুলতানের মা নিজ উদ্যোগে ধুমাধাম করে ভালো পাত্র দেখে তাদের বিয়ে দিতেন।[৫]

অটোমানদের হেরেম তাই একপাক্ষিকভাবে লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখানে উভয়পক্ষেরই স্বার্থ উপস্থিত ছিল।

তিন

হেরেম বলতে কিছুদিন আগেও পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা যা বুঝেছেন, তার সাথে অটোমানদের হেরেমের ধারণার ছিল বিশাল তফাত। হেরেম শব্দটাকে অনেক পশ্চিমা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রোমান সাম্রাজ্যের পতিতালয়গুলোর প্রতিশব্দের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তারা সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন মূলত ইসলামবুলে থাকা ভেনিসের রাজদূতদের। যারা নিয়মিত প্রাসাদে আসা যাওয়া করত। গ্রিক ঐতিহাসিকদের খুবই বিরল কিছু ক্ষেত্রে প্রাসাদে কাজ করা খোজাদেরও সূত্র হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। খোজারা বাদে বাকিদের হেরেমে প্রবেশের কোনো উপায়ই ছিল না। তাই তাদের হেরেমসংক্রান্ত বক্তব্য মূলত বিভিন্ন গুজব, গালগপ্পো আর কাল্পনিক ধারণারই সংমিশ্রণ বৈ কিছু নয়। তাতে সঠিক তথ্যের পরিমাণ নেহায়েত অপ্রতুল। অটোমানদের হেরেমকে বুঝতে হলে, তাকে অটোমানদের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। যে কাজটা অধুনা করার চেষ্টা করেছেন কলিন ইম্বার, ইবের ওরতায়লি ও লেসলি পিয়ার্স।

প্রকৃতপক্ষে হেরেম বলতে বোঝানো হতো সুলতানের পরিবার এবং পরিবারের দাসদাসীদের বাসস্থানকে। সুলতানের পরিবারের সদস্যদের বাইরে এখানে সরাসরি সুলতানের মালিকানায় থাকা দাস-দাসীরা থাকত।[৬] এই জায়গায় এসে অটোমানরা অন্য সবার চেয়ে আলাদা হিসেবে নিজেদের চিনিয়েছে। অটোমান হেরেমের দুটি অংশ ছিল, একটা ছিল দাসদের জন্য, অপরটা দাসীদের জন্য।

দেভশির্মে পদ্ধতিতে সুলতানের মালিকানায় যেসব দাসরা আসত তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে মেধাবী কিশোরদের বাছাই করে নিয়ে আসা হতো এই হেরেমে। তারপর

---

৫. Peirce. L.P., 1993. The imperial harem: Women and sovereignty in the Ottoman empire. Studies in Middle Eastern Hist.

৬. Peirce. L.P., 1993. The imperial harem: Women and sovereignty in the Ottoman empire. Studies in Middle Eastern Hist.

তাদের ভর্তি করিয়ে দেয়া হতো রাজকীয় প্রশাসনিক বিশ্ববিদ্যালয় এন্দেরুনে। এখানে তারা ইসলামি জ্ঞানের সাথে সাথে প্রাসাদের নিয়মকানুন শিখত বাধ্যতামূলকভাবে। সেই সাথে শিখত যুদ্ধবিদ্যাও এ ছাড়া তাদের প্রত্যেককে নিজ মেধা অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেয়া হতো। এই প্রক্রিয়াটার মূল উদ্দেশ্য ছিল, সালতানাত পরিচালনা করার জন্য যোগ্য প্রশাসক তৈরি করা, যারা ভবিষ্যতে সানজাক বে, বেইলারবে, জেনারেল অথবা পাশা হয়ে সাম্রাজ্যের সেবা করবে। প্রায় দশ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঁচিশ বছর পর্যন্ত এখানে থাকার পর তারা পেত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

অন্যদিকে, যেসব দাসী বিভিন্ন যুদ্ধ, চুক্তি, কর বা উপহার সূত্রে প্রাসাদে আসত অথবা যাদের দাস বাজার থেকে কিনে আনা হতো তাদের মধ্যে সেরাদের বাছাই করে আনা হতো মেয়েদের হেরেমে। এখানে থেকে তারা ধর্মীয় জ্ঞান, প্রাসাদের নিয়মকানুন শেখার পাশাপাশি শিখত সেলাই, কুটির শিল্পের কাজ, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি ও রান্না। তাদের শেখানো হতো তুর্কি, আরবি ভাষা এবং ফার্সি সাহিত্য। এ ছাড়াও নিজ নিজ মাতৃভাষা নিয়ে পড়াশোনারও সুযোগ ছিল। চাইলে তারা বিজ্ঞান, গণিত বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিষয়েও পড়াশোনা করতে পারত।[৭]

হেরেমের এই দাসীদের এমনভাবে গড়ে তোলা হতো, যেন তারা ভবিষ্যতে একজন সুলতানার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে পারে। যেন হতে পারে একজনের সুলতানের মা। কিন্তু তাদের জীবন সহজ ছিল না। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের হেরেমের ক্ষমতা কাঠামোর ওপরের দিকে তুলে আনার জন্য তাদের অসামান্য মেধা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে হতো। এটা ছিল এমন এক জায়গা, যেখানে ওপরে উঠার ইঁদুর দৌড়ে সবাই সবার প্রতিদ্বন্দ্বী।

চার

অটোমান হেরেমের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান প্রথম মুরাদ হলেও কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর হাতেই হেরেম তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করে।

এ সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলকান ও স্লাভ অঞ্চল থেকে আসা যুদ্ধবন্দি ও সুলতানের স্ত্রী, উপপত্নীরা মিলে ক্রমেই বাড়িয়ে তোলেন হেরেমের আকার। এর সাথে ছিলেন সুলতানের মা, ফুফু ও অন্যান্য রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়রা।

মুহাম্মাদের সময় থেকে অটোমান সুলতানরা রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন শাহজাদিদের বিয়ে করলেও সাধারণত তাদের সাথে তারা দূরত্ব বজায় রাখতেন। কারণ, এসব শাহজাদির আনুগত্য সুলতানের প্রতি নয়, নিজের পরিবারের প্রতিই বেশি থাকত। এ ছাড়া কোনো শাহজাদির গর্ভে জন্মানো শাহজাদাকে ভবিষ্যতে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নানার পরিবার

---

৭. Peirce, L., 1993. The imperial harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. New York-Oxford. p.242.

থেকে উস্কানি দেয়ার সম্ভাবনাও থাকত। এই সম্ভাবনা নাকচ করতে সুলতানরা শাহজাদিদের সাথে যৌন সম্পর্ক যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত করে এনেছিলেন।

এ কারণে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সময় থেকে অটোমানদের হেরেমে রাজকন্যার চেয়ে দাসীদের প্রবেশই আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে।

বলকান অঞ্চল, গ্রিস, ইতালি, ককেশাস, আনাতোলিয়া, রাশিয়া ও সিরিয়া থেকে আনা দাসীরা হতো সুলতানের শয্যাসঙ্গিনী। কিন্তু সাদা চোখে ব্যাপারটা যতটা সহজ মনে করা হয়, ব্যাপারটা আসলে ততটা সহজ ছিল না।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহর হেরেমে মোট দাসীর সংখ্যা ছিল তিন শর কাছাকাছি। এদের বেশিরভাগই কখনো সুলতানকে সামনাসামনি দেখেনি। সুলতানের কাছে পৌঁছানোর দরজা ছিলেন হেরেমের সর্বময় কর্ত্রী সুলতানের মা ওয়ালিদ খাতুন।[৮]
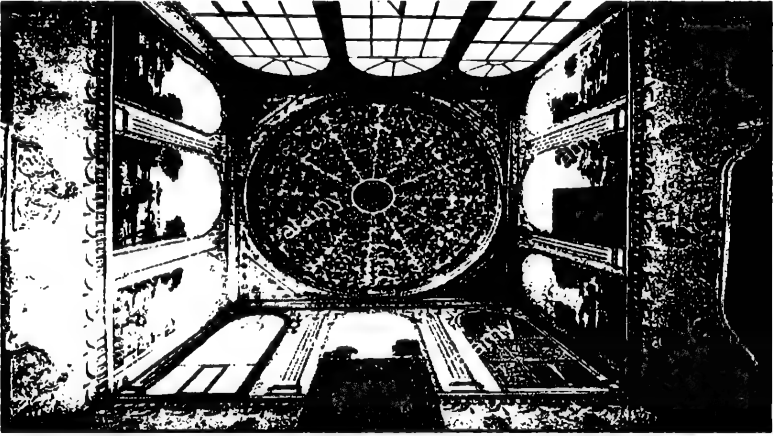
ওয়ালিদা খাতুনের কামরা।

ওয়ালিদ খাতুন হচ্ছে সুলতানের মায়ের উপাধি। ইনি ছিলেন সালতানাতের সেই দুজন ব্যক্তির একজন যিনি সুলতানের সিদ্ধান্তে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতেন। অপরজন ছিলেন শাইখুল ইসলাম। ওয়ালিদ খাতুনের পরই হেরেমের ক্ষমতা কাঠামোয় স্থান ছিল শাহজাদিদের। দাসীরা থাকত প্রাসাদে তাদের জন্য নির্ধারিত কামরায়। এসব কামরা ছিল বেশ সাজানো গোছানো। যেসব দাসী সৌন্দর্যের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা-দীক্ষায় দ্রুত উন্নতি করতে পারত তাদের খবর হেরেমের আগাদের মাধ্যমে পৌঁছে যেত সুলতানের মায়ের কাছে। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে সুলতানের মা কালফা

৮. Baykan, A., 1994. The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. by Peirce Leslie P..(Studies in Middle Eastern History) 374 pages. illustrations. appendix. notes. bibliography. index. New York & Oxford: Oxford University Press. 1993. $19.95 (Paper) ISBN 0-19-508677-5. Review of Middle East Studies. 28(2). pp.200-201.

হিসেবে বেছে নিতেন। কালফারা ছিল প্রকৃতপক্ষে দাসীদের নেত্রী। প্রত্যেক কালফার অধীনে বেশ কিছু দাসী থাকত।

কালফাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে রুপে গুণে অনন্যা বলে তুলে ধরতে পারত তবেই তার সুযোগ হতো সুলতানের মায়ের খাস বাদী হিসেবে কাজ করার। আর যেহেতু সুলতান প্রায়ই তার মায়ের কাছে দেখা করতে যেতেন, সেখানে তার চোখ পড়ত তাদের প্রতি এবং ছেলের হাবভাবে তার মা বুঝে নিতেন, কাকে তার ছেলের কাছে পাঠাতে হবে।

এ ছাড়াও মাঝে মাঝে সুলতানের জন্য জলসার আয়োজন করা হতো। সেখানে কাউকে ভালো লাগলে সুলতান তার দিকে নিজের বেগুনি রুমাল ছুঁড়ে দিতেন।

এই বেগুনি রুমাল পাওয়া বা সুলতানের মায়ের মাধ্যমে সুলতানের কাছে যাবার অনুমতি পাওয়া দাসীদের বলা হতো গোজদে। এদের অধিকাংশই জীবনে এই একটি রাত ছাড়া দ্বিতীয়বার আর কখনোই সুলতানের সান্নিধ্য পেত না। কিন্তু যারা সুলতানকে সন্তুষ্ট করতে পারত তাদের জন্য খুলে যেত সৌভাগ্যের দরজা। তাদের জন্য নতুন কামরা বরাদ্দ করা হতো। যারা এই বিশেষ সুবিধা পেত, তাদের বলা হতো ইকবাল। এ ছাড়াও কোনো দাসী সুলতানের শয্যাসঙ্গিনী হবার পর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা হতো সে গর্ভবতী হয় কিনা। যদি সে গর্ভবতী হয়ে যেত, তবে তাকেও ইকবালদের মতো কামরা দেয়া হতো।

এই ইকবালদের মধ্যে সাধারণত চারজনকে সুলতান কাযিন হিসেবে বেছে নিতেন। কাযিনরা ছিলেন সুলতানের মা ও শাহজাদিদের পরপরই হেরেমের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য। তাদের সুলতান প্রায়ই উপহার পাঠাতেন। যদিও সব দাসীর জন্যেই দৈনিক বেতন ও মাসিক পোশাকের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কাযিনদের বেতন ছিল অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। মূলত সুলতানের পুত্রসন্তানের মায়েরাই কাযিন হতেন। তারা ক্ষমতা ও মর্যাদায় ছিলেন সুলতানের স্ত্রীদের সমান।[৯]

শাহজাদার জন্ম দেয়া একজন দাসীর জন্য ছিল স্বপ্ন। কারণ, শাহজাদার মা হেরেমের স্থায়ী সদস্য হয়ে যেতেন, তাকে অপরাধ করলেও সহজে কোনো রকম শাস্তি দেয়া হতো না। কিন্তু শাহজাদার মা হওয়া তাদের জন্য নিয়ে আসত আরেকটা বিপদ। সন্তানের বয়স সাত (কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ বা বারো) বছর হবার সাথে সাথেই তাকে নিয়ে কাযিনকে রওনা হতে হতো সানজাকে। এটা ছিল কাযিনের ওপর অর্পিত নতুন এক দায়িত্ব। সন্তানকে সঠিকভাবে বড় করা এবং তাকে সালতানাত চালানোর যোগ্যতা সম্পন্ন একজন শাহজাদা হিসেবে গড়ে তোলার কঠিন দায়িত্ব পালন করতেন কাযিনরা। ফলে ছেলে বড় হবার সাথে সাথে তারা রাজধানী থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য হতেন।[১০]

---

৯. Peirce. L.. 1993. The imperial harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. New York-Oxford. p.242.

১০. Imber. C.. 2009. The Ottoman Empire. 1300-1650: the structure of power Palgrave Macmillan.

এতে করে সুলতান আরেকটা সুবিধা লাভ করেন। তা হলে, শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করার জন্য তার মা ছাড়া আর কোনো নারী অবশিষ্ট থাকতেন না। এতে করে ঘর সামলানো তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। একমাত্র ওয়ালিদ খাতুন ছাড়া হেরেমে কারও জায়গাই প্রতিযোগিতাবিহীন ছিল না।

ওয়ালিদ খাতুন যাবতীয় বিষয় তো দেখাশোনা করতেনই। সেই সাথে তিনি দিওয়ান (দরবার) ঠিকভাবে চলছে কি না তার খবরাখবরও রাখতেন। উজিরে আযম, শাইখুল ইসলাম, পাশা, বেইলারবেদের সাথে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন কিজলার আগার মাধ্যমে।

কিজলার আগা ছিলেন হেরেমের প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, একজন খোজা। তিনি মূলত সুলতানের সাথে সুলতানের মায়ের দেখা সাক্ষাতের লিয়াজো অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। এ ছাড়া হেরেমের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও ছিল তার। সুলতান কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিলে উজিরে আযম বা শাইখুল ইসলাম সাধারণত কিজলার আগার মাধ্যমে ওয়ালিদ খাতুনের সাথে যোগাযোগ করে তাকে বোঝাতেন। ফলে ওয়ালিদ খাতুন তার ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। সুলতানও যতটা সম্ভব রক্ষা করতেন নিজের মায়ের কথা। এভাবেই হেরেমের মাধ্যমে সুলতান নারীদের কর্তৃত্ব একজন নারীর হাতেই রাখতেন, যা তাকে সাম্রাজ্যের অন্যান্য কাজে মনোযোগী হতে সাহায্য করেছিল।

পাঁচ

আপাতদৃষ্টিতে সুলতানের হাতের পুতুল মনে হলেও কাযিন ও ইকবালদের ছিল সালতানাতে শক্তিশালী অবস্থান। তারা প্রায়ই সুলতানকে প্রভাবিত করতেন নিজেদের ছলা কলা দিয়ে, কখনো কখনো ভালোবাসা দিয়েও।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মুহাম্মাদ আল ফাতিহর প্রিয়তমা দাসী গুলবাহারের কথা, যিনি তিনজন রাজকুমারীকে হটিয়ে সুলতানের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন সুলতান। গুলবাহারকে নিয়ে নামে-বেনামে কুড়িটিরও বেশি কবিতা লিখেছিলেন মুহাম্মাদ।

এভাবেই হেরেমের দাসীরা একটু একটু করে ক্ষমতার সোপান ধরে ওপরে উঠে হতেন সুলতানের প্রিয়তমা। হটিয়ে দিতেন রাজকুমারীদের আর শাহজাদার মা হয়ে পেতেন রানীর সম্মান। তারপর শাহজাদা যখন সানজাক বে হয়ে কোনো প্রদেশে যেতেন তখন তার মা-ই হতেন ওই সানজাকের ডি ফ্যাক্টো রুলার। আর যার সন্তান ক্ষমতার চূড়ায় উঠে সিংহাসনে বসতেন তার ক্ষমতা হতো সুলতানের ক্ষমতারই কাছাকাছি, কোনো ক্ষেত্রে এমনকি সুলতানের চেয়েও বেশি।

কোনো কাযিনের গর্ভে একবার শাহজাদা জন্মানোর পর সম্ভবত তার সাথে বিশেষ কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে নিশ্চিত করা হতো, সে যেন আর গর্ভবতী না হয়। ফলে তার সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু থাকত শাহজাদাই।*

অটোমানরা একের পর এক প্রায় এগারো প্রজন্ম পর্যন্ত অত্যন্ত সফল সব শাসক তৈরি করেছে। এর একটা বড় কারণ ছিল, তারা শাসকদের মায়েদের অত্যন্ত যত্নের সাথে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। এমনকি এগারো প্রজন্মের পরেও বারবার অটোমান রাজবংশে জন্ম নিয়েছেন বেশ কয়েকজন শক্তিমান সুলতান।

ক্ষমতার পিরামিডের একেবারে তলানি থেকে চূড়ায় ওঠা, শূন্য থেকে সুলতানা হওয়া মায়েদের সন্তানেরা অসাধারণ হবে, এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

* জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটা নিশ্চিত না।

আবার হুনয়াদি

এক

জুলাই মাসের সকাল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পের চারপাশ ঘুরে দেখছেন সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্।

শাইখুল ইসলাম আক শামসউদ্দিনের কাছে তিনি ইসলামের গাজি হবার যে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তা তাকে তাড়িয়ে বেড়াত নতুন অভিযানের জন্য। কনস্ট্যান্টিনোপলকে ইসলামবুলে পরিণত করার পর তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল উত্তরে।

সময়টা ১৪৫৬ সাল।

মুহাম্মাদ সার্বিয়ান ডেস্পট জর্জ ডুরাড ব্রাঙ্কোভিচের রাজ্যকে বিনা বাধায় দখল করেছেন গত মাসেই। জুনের শেষ নাগাদ তিনি পৌঁছেছেন বেলগ্রেডে। হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় এর নাম নান্দোরফেহেরভার।

বেলগ্রেড দুর্গ গোটা বলকানের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে খ্যাত ছিল। ১৪০২ সালে আনকারার যুদ্ধে অটোমানরা হেরে যাবার পর পর এই দুর্গ স্টিফেন বালকোভিটজের অধীনে চলে আসে। তিনি বাইজান্টাইন ও আরব ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে এটার ডিফেন্স সিস্টেমকে এতটা উন্নত করেছিলেন যে, এটা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে কোনো আক্রমণের শিকারণ হয়নি। কারণ, এটা আক্রমণ করে দখল করা সম্ভব, তা কোনো রাজা ভাবতেও পারেননি।

দুর্গের বাইরের দেয়ালটা ছিল অত্যন্ত পুরু। তার ঠিক পেছনেই প্রচুর টাওয়ার; যেখান থেকে সহজেই তীর বর্ষণ করা যায়।

বাইরের এই দেয়ালের পর ছিল পর্বতের কোল ঘেঁষে শহর। সেই শহরের কেন্দ্রে, পর্বতের চূড়ায় ছিল আরও এক দেয়াল। এই দেয়ালের ভেতরে ছিল মূল শহর।

শহরের উত্তর দিক ঘেঁষে বয়ে গেছে দানিয়ুব নদী। দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়ে শহরকে পাশ কাটিয়ে দানিয়ুবে পড়েছে সাভা নদী।

কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের পর 'অসম্ভব' শব্দটা একটা কৌতুকে পরিণত হলো মুহাম্মাদের কাছে। সারা বিশ্ব তাঁকে একনামে আল-ফাতিহ বা বিজয়ী হিসেবে ডাকতে অভ্যস্ত ছিল তখন। ৩০০ কামানের এক সুবিশাল আর্টিলারি ব্রিগেড নিয়ে বেলগ্রেডের দেয়ালকে গুঁড়িয়ে দেয়া তার কাছে মোটেই অসম্ভব মনে হয়নি।

নিজের বাহিনীর ওপর গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুলতান ক্যাম্পের এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াচ্ছেন। ক্যাম্পের বাম দিকটায় আছে আনাতোলিয়া থেকে আসা ত্রিশ হাজার মিডিয়াম ক্যাভালরি সৈন্য। ডানে আছে রুমেলির পনেরো হাজার মিডিয়াম ক্যাভালরি। বাহিনীর ঠিক মাঝামাঝি আছে মুহাম্মাদের সেরা সেনাদল জানিসারি বাহিনী, এরা সংখ্যায় সাত হাজার। আট হাজার কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি সৈনিক অবস্থান নিয়েছে ক্যাম্পের একটু ডানদিক ঘেঁষে পেছনে সাভা নদীর তীর ধরে।

বেলগ্রেডের ভীষণ পুরু দেয়ালের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন ফাতিহ্।

এই দুর্গ ভীষণ মজবুত। তিনি জানেন না এই দেয়াল ভাঙতে তার কত দিন লাগবে। তবে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে করেই হোক নান্দোরফেহেরভারের ওপরে তিনি চাঁদ-তারার পতাকা উড়িয়ে দেবেন।

১ জুলাই অবরোধ শুরু হলো। টানা দুসপ্তাহ চলল অবরোধ।

দুই শ অটোমান জাহাজ দখল করে আছে দানিয়ুবের উত্তর তীর। যেখান থেকে আসার কথা হাঙ্গেরির সাহায্য।

ওদিকে দুর্গের খাবার পানি ফুরিয়ে আসছে।

ভেতরে অপেক্ষা করছে জন হুনয়াদির সম্বন্ধী মাইকেল জিলাগিয়াগির সাত হাজার সৈন্য। তারা ভালো করেই জানে, এই দুর্গের পতন হলে হাঙ্গেরিকে মুহাম্মাদের হাত থেকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে।

দুই

পোপ ক্যালিক্সিটাস থ্রি তার পূর্ববর্তী পোপ নিকোলাসের ভুলটা করলেন না।

জন হুনয়াদি মারফত মুহাম্মাদের বেলগ্রেড অভিযানের ব্যাপারে তিনি আগেই খবর পেয়েছিলেন। তাই তিনি দেরি না করে ফ্রান্সিস্কান ক্যাথলিক যাজক জন ক্যাপিস্ট্রানোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হাঙ্গেরির দিকে, উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ খ্রিষ্টানদের ক্রুসেডে উদ্বুদ্ধ করা। সারা ইউরোপের সব ক্যাথলিক চার্চে বলে দেয়া হয়েছিল দুপুর ১২টায় বেলগ্রেডের জন্য প্রার্থনা করে ঘণ্টা বাজাতে।[১]

---

১. Thomas Henry Dyer (1861). The history of modern Europe: From the fall of Constantinople. J. Murray. p. 85.

ক্যাপিস্ট্রানো তার কাজ ভালোমতোই করেছিলেন। মাত্র তিন মাসে তিনি তৈরি করেছিলেন সাধারণ কৃষকদের নিয়ে এক বিশাল ক্রুসেডার বাহিনী।

এদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। এরা খুব একটা প্রশিক্ষিত ছিল না, কিন্তু এদের ছিল ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা আর তুর্কিদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ। কারণ, তুর্কিরা ঈশ্বরের পবিত্র ইউরোপকে অপবিত্র করেছে। দখল করে নিয়েছে কনস্ট্যান্টিনোপল। এই বাহিনী সাভা নদী ধরে অটোমান ক্যাম্পের পশ্চিমে অবস্থান নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরিদের বিপরীতে লড়ে ক্যাম্পের কাছে এরা পৌঁছতে পারছিল না। ওদিকে পারছিল না দুর্গের ভেতরেও ঢুকতে।

সুযোগটা এসে গেল ১৪ জুলাই, যখন জন হুনয়াদি পৌঁছে গেলেন নান্দোরফেহেরভার।

কেউ তাকে একটা সৈন্যও দেয়নি মুহাম্মাদের সাথে লড়ার জন্য। যত ব্যারনের কাছেই তিনি গেছেন সবাই তাকে হতাশ করেছেন শুধু এই কারণে যে, তিনি জিতলে হাঙ্গেরির ওপর তার প্রভাব আরও বেড়ে যাবে।

নিজের দশ হাজার সুশিক্ষিত হেভি ক্যাভালরির সাথে আরও দশ হাজার লাইট ক্যাভালরি নিয়ে জন হুনয়াদি দানিয়ুবের দিকে এগোলেন। সাথে ছিল দুই শ করভেট জলযান।[২]
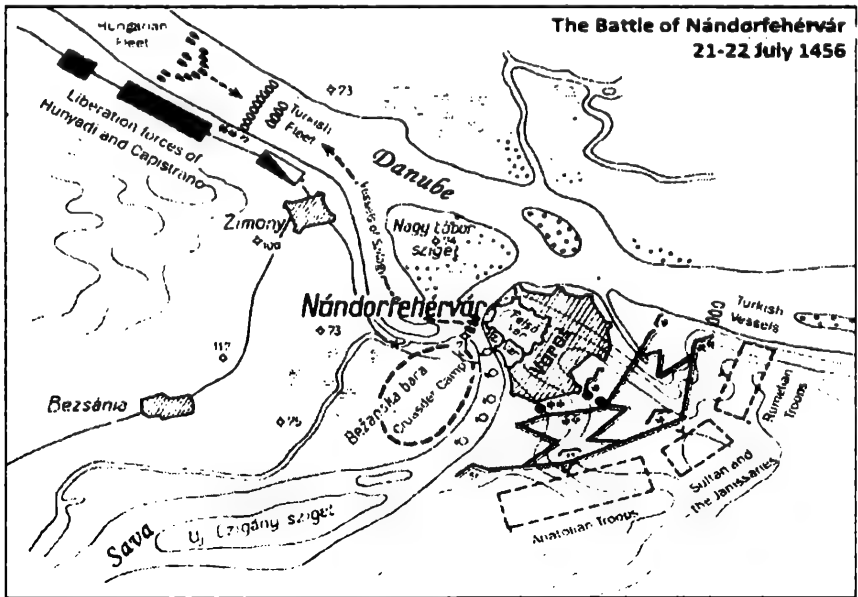
ট্যাকটিক্যাল ম্যাপঃ বেলগ্রেডের যুদ্ধ।

২. Stanford J. Shaw (1976). History of the Ottoman Empire and modern Turkey. Volume 1, Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808. p. 63. ISBN 978-0521291637.

১৪ জুলাই সকাল থেকে দানিয়ুবে হুনয়াদির সাথে জাগান পাশার প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো। পাঁচ ঘণ্টা ধরে লড়াইয়ের পর তুর্কিরা দুঃসাহসী হয়ে উঠলে দু পক্ষের যোদ্ধাদের রক্তে নদীর পানি লাল হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক মধ্য দুপুরে হঠাৎ ঘটে গেল বিপর্যয়।

হুনয়াদির দুটো করভেট তাদের র‍্যাম বিঁধিয়ে জাগান পাশার সবচেয়ে বড় জাহাজ দুটোকে বিঁধে ফেলল। তলা ফেটে জাহাজগুলো ডুবে গেল।

পরের আধঘণ্টার মধ্যে হুনয়াদির নৌবাহিনী তিনটা বড় তুর্কি গ্যালি ডুবিয়ে দিল, আরও চারটা গ্যালি দখল করে নিল। এ ছাড়াও দশটি গ্যালি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। একের পর এক জাহাজ দখল হয়ে যাচ্ছে দেখে মুহাম্মাদ জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

দানিয়ুব হুনয়াদির দখলে চলে এল।

বেলগ্রেড দুর্গে প্রবেশ করল জীবন রক্ষাকারী খাবার ও পানি, সাথে গোলাবারুদ।

তিন

দানিয়ুব দখল করেও হুনয়াদি খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। মুহাম্মাদের কামানগুলোর ভারী গোলাবর্ষণে ২১ জুলাই নাগাদ গুঁড়ো হয়ে গেল বেলগ্রেডের মজবুত বাইরের দেয়ালটার একটা পাশ। তিনি আদেশ দিলেন সন্ধ্যার পর সর্বাত্মক হামলা পরিচালনা করা হবে।

সন্ধ্যার পর যথারীতি শুরু হলো হামলা। দুর্গের বাইরের দেয়াল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল জানিসারি বাহিনী। এবার তারা চেষ্টা করতে লাগল যে করেই হোক ভেতরের দেয়াল দখল করার চেষ্টা করতে লাগল। একবার দেয়ালের মাথায় চড়ে পতাকা গেড়ে দিতে পারলেই খেলা শেষ।

দুর্গের সব জানালা বন্ধ করে হুনয়াদির সৈন্যরা ছাদ থেকে জানিসারিদের শেষ লাইনের পেছনে কাঠ, তুলা, মোম, তেলসহ যাবতীয় দাহ্য পদার্থ ছুঁড়ে স্তুপ করে ফেলল। ২১ শে জুলাই রাত ১১টার দিকে সেই স্তুপে আগুন লাগানো হলো হুনয়াদির নির্দেশে। জানিসারিরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল মূল বাহিনী থেকে। দেয়ালের এপারে মূল বাহিনী, ওপারে জানিসারিরা আর মাঝখানে আগুনের দেয়াল। অসহায় জানিসারিরা বুঝতে পারল এবার তাদের কপালে দুঃখ আছে।

যা হবার তাই হলো।

রাতের অন্ধকারে খ্রিষ্টানদের হাতে একের পর এক জানিসারি মরতে লাগল।

এর মধ্যেই বেপরোয়াভাবে দেয়াল বেয়ে ভেতরের ছাদে উঠে গেল এক কোম্পানি জানিসারি।

দুর্গের ছাদে তাদের সাথে হুনয়াদির সৈন্যদের হাতাহাতি লড়াই হতে লাগল।

এক জানিসারি প্রায় উড়িয়েই দিয়েছিল পতাকা। কিন্তু নেশাগ্রস্তের মতো লড়তে থাকা টিটাস ডুগোভিচ পতাকা গাঁড়তে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে দুর্গের ছাদ থেকে লাফ দিল।

পতাকা আর গাঁড়া হলো না বেলগ্রেডের মাথায়।

পরদিন সকালে বোঝা গেল, প্রাণ দিয়েছে দুই হাজার জানিসারি। কিন্তু খেলা তখনো শেষ হয়নি।

ক্যাপিস্ট্রানোর সেনারা সকালবেলা যাতে তুর্কিদের কোনো কিছু লুট না করে সেজন্য তাদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল। কিন্তু তারা এই আদেশ না মেনে সকাল থেকেই সিপাহীদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

কোনোভাবেই সংঘর্ষ ঠেকানো যাচ্ছে না দেখে ক্যাপিস্ট্রানো গর্জে ওঠে, 'ঈশ্বর যা শুরু করেছেন তা শেষ তিনিই করবেন। আক্রমণ করো।'

চল্লিশ হাজার কৃষক সেনা স্বর্গে যাবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠল। প্রাণের মায়া না করে তারা বেপরোয়া হামলা করে বসল তুর্কিদের দুই উইংয়ে একইসাথে।

ঠিক এই সময়, অজানা কারণে তুর্কি সৈন্যরা অদ্ভুত কিছু একটা দেখে ভীত হয়ে উল্টোদিকে ঘুরে পালাতে শুরু করল।[২]

ডানে-বামে ময়দান খালি হয়ে গেলে মাঝখানে একাই পাঁচ হাজার জানিসারি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আল ফাতিহ। বেপরোয়াভাবে সামনে এগোলেন তিনি। মাত্র পাঁচ হাজার যোদ্ধা নিয়েই তিনি লড়ে যাচ্ছিলেন সমানে সমান। এবার ময়দানে নেমে এলেন জন হুনয়াদি।

---

[২]. Friedrich W.D. Brie (2012). The Brut; Or, the Chronicles of England. p. 524. ISBN 978-1407773421.

মুখোমুখি লড়াইয়ের প্রথম আঘাতেই এক নাইটকে মাথা কেটে হত্যা করলেন সুলতান, কিন্তু ঠিক পর মুহূর্তেই তার উরুতে একটা তীর ঢুকে গেলে ধমনী কেটে রক্ত বেরুতে লাগল।[৪] ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে থাকায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুলতান অজ্ঞান হয়ে গেলেন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে।

জ্ঞান হারানোর আগে তিনি চারজনকে অভিশাপ দেন। জানিসারিদের আগা হাসান, সার্বিয়ান ডেস্পট জর্জ ডুরাড ব্রাঙ্কোভিচ, যাজক জন ক্যাপিস্ট্রানো আর জন হুনয়াদি। যুদ্ধক্ষেত্রে পালানোর সময় নিহত হলেন হাসান।

তুর্কিদের বেলগ্রেড জয়ের আশা এখানেই শেষ হয়ে গেল। ক্রুসেডার বাহিনী নরক নামিয়ে আনল তুর্কিদের ওপর। তেরো হাজার অটোমান সৈনিক এদিন নিহত হলো ক্রুসেডারদের হাতে।[৫]

এই পরাজয়ের পর পরবর্তী ৬৫ বছর আর বেলগ্রেড জয় করতে পারেনি অটোমানরা।

সুলতানের জ্ঞান ফেরে সারানা নামের এক শহরে। জ্ঞান ফেরার পর তিনি রাজধানীতে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। একশ চল্লিশ গাড়ি আহত সৈনিককে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ইসলামবুলে।

ওদিকে কাকতালীয়ভাবেই বেলগ্রেড থেকে ফেরার তিন সপ্তাহ পরেই মহামারী প্লেগ নেমে এল ক্রুসেডারদের ওপর। হুনয়াদি মারা গেলেন প্লেগে, মারা গেলেন ক্যাপিস্ট্রানোও। তিন মাসের মাথায় প্রাণ গেল জর্জ ডুরাড ব্রাঙ্কোভিচেরও।

জন হুনয়াদিকে টর্চ বিয়ারার অফ ক্রিশ্চিয়ানডম উপাধিতে ভূষিত করলেন পোপ।[৬]

সারা ইউরোপের ক্যাথলিক চার্চগুলোতে বেজে ওঠল বিজয়ের ঘণ্টা নুন বেল, ঠিক বেলা ১২টা বাজে।

চার্চের সেই বেল এখনো বাজে, একই সময়ে।

---

৪. Freely, J., 2009. The Grand Turk: Sultan Mehmet II-Conqueror of Constantinople and Master of an Empire. The Overlook Press.

৫. Norman Housley (1992). The Later Crusades, 1274-1580: From Lyons to Alcazar(First ed.). p. 104. ISBN 978-0198221364.

৬. Munsen, R.H., 2005. Stephen the great: leadership and patronage on the fifteenth-century Ottoman frontier. East European Quarterly, 39(3), p.269.

ইমান, ইনসাফ, ইনসানিয়াত
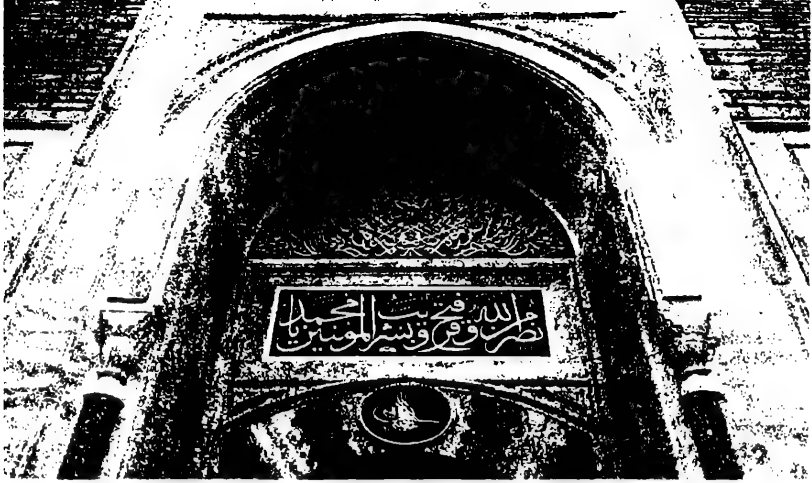
তোপকাপি প্রাসাদের সদর দরজা, বাব-ই হুমায়ুন।

এক

একটা সাম্রাজ্যের ভিত হলো তার সার্বজনিনতা। তার শাসকের দূরদর্শিতা আর প্র্যাগম্যাটিজম।

মাটির মানুষ বা মহাকশের তারাদের মতো সাম্রাজ্যেরও জীবনচক্র আছে। সাম্রাজ্য জন্মায়, বিকশিত হয়, নিজের শক্তিমত্তার শিখরে পৌছায়। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। একটা সময় নিভে যায়। সুপারনোভার পর একটা তারা যেমন মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যায় তার অস্তিত্বের ছাপ। তেমনি সাম্রাজ্যের পতনের পরও তা মানব সভ্যতায় নিজের স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়।

চেঙ্গিজ খান ও তার বংশধরদের তলোয়ারের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া আব্বাসীয় খিলাফত আর অটোমান তুর্কিদের দাপটে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্যও জগতের বুকে রেখে গিয়েছিল তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এমন এক সময় জন্মেছিলেন যখন এশিয়া ও আফ্রিকাতে চলছিল আব্বাসীয় খিলাফতের উত্তরাধিকার নিয়ে ঠান্ডা লড়াই। ঠিক একইভাবে ইউরোপে চলছিল রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের লড়াই।

অটোমান সালতানাত তার ধর্মীয় পরিচয় ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দুটো লড়াইতেই জড়িয়ে গেল। একদিকে তারা ছিলেন গাজিদের বংশধর, ইসলামের পতাকা উঁচু করে ধরা ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে মর্যাদার কাজ। অন্যদিকে, তাদের প্রজাদের সবচেয়ে বড় অংশ ছিল অর্থডক্স খ্রিষ্টান। যারা বাইজান্টাইন কানুনে চলে অভ্যস্ত।

একটা সাম্রাজ্যের সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করে তার সার্বজনীন হবার ক্ষমতার ওপরে। এখানেই মুহাম্মাদ আল ফাতিহ অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে অটোমান সালতানাতকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে শুরু করলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই তিনি তার সালতানাতের শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থাকে এমন রূপ দিতে শুরু করলেন। এটা পরবর্তীকালে তার সালতানাতের প্রজাদের জন্য তৈরি করেছিল তৎকালীন পৃথিবীর প্রায় যেকোনো সাম্রাজ্যের চেয়ে বেশি উন্নত জীবনের সম্ভাবনা। তিনি মোট সাতটি ভাষা জানতেন। জানা মানে আনাড়িভাবে জানা না, চমৎকারভাবে জানা।

তুর্কি, আরবি, ফার্সি, গ্রিক, ল্যাটিন, সার্ব আর হিব্রু।[১]

এতগুলো ভাষা জানার কারণে তার পক্ষে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ধারণ করা সম্ভব ছিল। তার বাবা ছিলেন এশিয়ান মুসলিম, মা ছিলেন গ্রিক খ্রিষ্টান থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া মুসলিম।

একদিকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য অন্যদিকে ইসলামি খিলাফতের উত্তরসূরি হবার গভীর ইচ্ছা ছিল তার মধ্যে। আর এই ইচ্ছার অনেক ফলাফলই সূচনা করেছে রাষ্ট্র কাঠামোর অনেক নতুন ধারণার।

রাজ্যের বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও শ্রেণির মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সুলতান মুহাম্মাদ সেক্যুলার আধুনিক রাষ্ট্রের মতো সবার জন্য একই আইনের প্রচলন করার কোনো চেষ্টা করেননি। তিনি বরং মিল্লাত সিস্টেম নামের এক বিশেষ বিচারব্যবস্থা তৈরি করেন। যার ধারণা তিনি পেয়েছিলেন মদিনা সনদ থেকে।

মিল্লাত সিস্টেম অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মের মানুষের জন্য সালতানাতে ছিল ভিন্ন ভিন্ন আদালতের ব্যবস্থা।[২]

---

১. Norwich. John Julius (1995). Byzantium.The Decline and Fall. New York: Alfred A. Knopf. pp. 81–82. ISBN 0-679-41650-1.

মুসলিমদের জন্য ছিল শারীয়াহ্ আদালত। খ্রিষ্টানদের জন্য ছিল রোমান কানুনে চলা ক্যানন কোর্ট, অর্থডক্স, ক্যাথলিক, আর্মেনিয়ান ও সিরিয়ান খ্রিষ্টানদের জন্য ছিল আলাদা আলাদা আদালত। ইহুদিদের জন্য ছিল হালখাহ আইন অনুযায়ী করা রাব্বানিক আদালত।[৩]

পঞ্চদশ শতাব্দীর অর্ধ বর্বর ইউরোপ থেকে নির্যাতিত ইহুদিরা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে পালাচ্ছিল এশিয়ার দিকে, তখন তাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয়ে উঠেছিল অটোমান সালতানাত। ইতিহাসে প্রতিটি শক্তিশালী ইসলামি সাম্রাজ্যই যথেষ্ট পরিমাণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে।

মুহাম্মাদের আমলে জার্মানি থেকে অটোমান সালতানাতে পালিয়ে আসা ইহুদি রাব্বি ইয়িজ্জাক সাফারি। যিনি পরবর্তী সময়ে অ্যাড্রিয়ানোপলের প্রধান রাব্বি হয়েছিলেন, তিনি জার্মান স্বজনদের কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কেন তোমরা তুর্কিতে আসছ না? কী নেই এখানে? মুসলিমদের শাসনাধীনে থাকা কি খ্রিষ্টানদের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম নয়?[৪]

মুহাম্মাদের আমলেই সারা বিশ্বে ইহুদিদের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে থেসালোনিকি। এমনকি এখন থেকে এক শ বছর আগেও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ইহুদিদের বাস ছিল থেসালোনিকিতেই।[৫]

অর্থডক্স খ্রিষ্টানদেরও দেয়া হয়েছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা। তাদের ধর্মগুরু প্যাট্রিয়ার্ক জেনোডিয়াস স্কলারিয়াস পেয়েছিলেন একজন সানজাক বের সমান ক্ষমতা।

সুলতানের নির্দেশে বাইবেলকে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেন জেনোডিয়াস। এতে করে খ্রিষ্টানদের মনে আশার সঞ্চার হয়, কাইজার বোধহয় এবার খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন। বাস্তবে তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ, সুলতান নিজেকে একজন গাজি হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী এক বান্দা বলেই মনে করতেন।

দুই

অটোমানদের একটা বৈশিষ্ট্যবোধক দিক ছিল তাদের অসাধারণ বিচার ব্যবস্থা। গোটা বিচার ব্যবস্থা ছিল সরাসরি সুলতানের দরবারের অধীনে।

প্রতিটি প্রদেশকে ভাগ করা হয়েছিল একেকটি প্রশাসনিক কাযায়। প্রতিটি কাযাকে বিভক্ত করা হয়েছিল নিহায়া নামের ছোট ছোট এলাকায়। প্রতিটি নিহায়াতেই ছিল একেকটি আদালত।

---

২. Ortaylı, İlber. "Osmanlı Barışı (Ottoman Peace)". İstanbul: Timaş Yayınları (Timaş Press). 2007. p. 148. ISBN 978-975-263-516-6 (in Turkish).

৩. প্রাগুক্ত(২)

৪. "Letter of Rabbi Isaac Zarfati". Turkishjews.com. Retrieved 2012-10-16.

৫. Gilles Veinstein. Salonique 1850–1918. la "ville des Juifs" et le réveil des Balkans. pp. 42–45

এসব আদালতে বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেতেন মুফতি-উলামারা। কাজি পদটা বিশেষভাবে তাদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। কোনো বে অথবা পাশার কী ক্ষমতা ছিল না কাজির কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার। সংশ্লিষ্ট সানজাকের সানজাক বের দায়িত্ব ছিল কাজির আদেশ বাস্তবায়নে তাকে যথাযথ সহায়তা করা। তিমারি সিপাহীরা যার যার এলাকায় এক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করত। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে জানিসারি জামাতও রিজার্ভ থাকত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায়।

তবে কাজিদের কারও রায়ে অসন্তুষ্ট হলে পাশারা অভিযোগ করতেন সুলতান বরাবর। সুলতান সেই অভিযোগ পৌঁছাতেন শাইখুল ইসলামের কাছে। তিনি যে রায় দিতেন তাই হতো চূড়ান্ত। যেসব ক্ষেত্রে শরিয়াতে স্পষ্ট বিধান নেই সেসব ক্ষেত্রে সুলতানের আইন অনুসারেই বিচার হতো। কিন্তু সুলতানের কোনো ক্ষমতাই ছিল না শরিয়াতে হস্তক্ষেপ করার।

অটোমানরা ধারণা করেছিল ইসলামের সোনালি যুগের সেই বিচার ব্যবস্থা যেখানে ইহুদির বর্ম চুরির অপরাধ প্রমাণ করতে না পারলে খলিফা বর্ম ফেরত পান না। মূলত তাদের মাধ্যমেই ইউরোপ প্রথম স্বাধীন বিচার বিভাগের ধারণা পায়।

তিন

বিশাল বিস্তৃত প্রশাসন ও বিচার বিভাগ চালনা করতে প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার। মুহাম্মাদ বুঝতে পেরেছিলেন, একটি শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া তিনি কখনোই সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে করতে পারবেন না। তাই তিনি দ্রুত সারা সালতানাতে এক শিক্ষাকাঠামো তৈরি করেন। যা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত।

শুধু রাজধানী ইসলামবুলেই তিনি গড়ে তোলেন ১৯২ টি ইমারত। প্রতিটি ইমারতের কেন্দ্রে থাকত একটি করে মসজিদ। মসজিদের পাশেই মাদরাসা, লাইব্রেরি, হাসপাতাল, হোস্টেল, মুসাফিরখানা, হাম্মামখানা, ছাত্র, পথিক ও দরিদ্রদের জন্য খাবার রান্না করার লঙ্গরখানা। যেখানে রোজ তিনবেলা অসহায় মানুষের জন্য পোলাও, গোশত, স্যুপ, রুটি ও জর্দা রান্না করা হতো।[৬]

প্রতিটি ইমারতের চারপাশে বেশ কিছুটা জায়গা ক্যাম্পাস হিসেবে ছেড়ে দেয়া হতো। যেখানে এই কমপ্লেক্সগুলো স্থাপন করা হতো।

এগুলো ছিল মূলত প্রাথমিক মাদরাসা যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে তুর্কি, আরবি ও ফার্সি ভাষা শেখানো হতো। পাশাপাশি পড়ানো হতো গণিত, জ্যামিতি এবং কুরআন হাদিস। সাথে সাথে ছাত্রদের শিখতে হতো তলোয়ারবাজি, তীরন্দাজি, ঘোড়সওয়ারি, জিমন্যাস্টিকস আর কুস্তি।

---

৬. Singer, Amy. Serving up Charity: The Ottoman Public Kitchen pg 486

সুলতানের নিজের মসজিদ ফাতিহ মসজিদেই প্রতিদিন ছয় হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করত।

প্রতিটি মসজিদের কাছেই স্থাপন করা হয়েছিল একেকটি বাজার। উদ্দেশ্য ছিল মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সরকারি অনুদান নয় বরং নিজের আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়। শুধু আয়া সোফিয়ার কাছে তৈরি করা শপিং কমপ্লেক্সেই ছিল একশর বেশি দোকান।

সুলতানের ইচ্ছায় ইসলামবুলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৮টি মাদরাসা। এগুলোর প্রতিটি পরবর্তী তিন শ বছর ধরে ইসলামি জাহানের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম সারির ছিল।
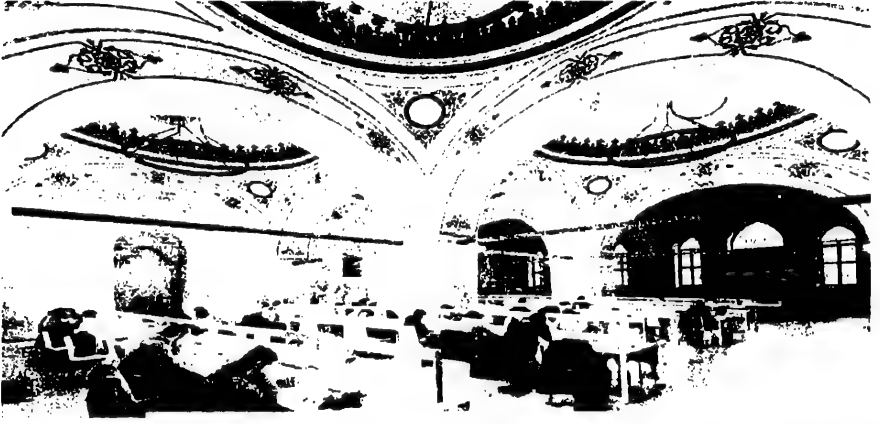
সুলতান বায়েজিদ লাইব্রেরিতে এখনো পড়াশোনা করে হাজার হাজার জ্ঞানপিপাসু।

দূর দূরান্ত থেকে স্কলারদের অতি উঁচু বেতনে এখানে অধ্যাপনার জন্য নিয়ে আসা হতো। এগুলোতে শেখানো হতো গণিত, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ফিকহ, ভূগোল ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেত শুধু মেধাবীরাই। প্রত্যেকের জন্য নিজের পছন্দমতো বিষয় নেয়ার সুযোগ ছিল, যাতে মেধার বিকাশ সুন্দর হয়।

এখানকার শিক্ষকদেরই একজন ছিলেন আলি কুশজি যিনি কোপার্নিকারে একশ বছর আগেই ধারণা দেন পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। কোপার্নিকাসের অন্তত এক শ বছর আগে।[৭*]

চার

শিক্ষিত জনশক্তিদের যথাযথ কর্মসংস্থান না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। নষ্ট হয়ে যায় সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। অটোমান সালতানাতে শিক্ষিত লোকদের জন্য ছিল কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ।

---

৭. Ragep. F. Jamil (2004). "Copernicus and his Islamic Predecessors: Some Historical Remarks". Filozofski vestnik. XXV(2): 125–142 [139]

*. অ্যারিস্টার্কাস ক্লাসিক্যাল যুগে এই ধারনা নিয়ে এলেও পরে তা একেবারেই ধামাচাপা পড়ে যায়।

সাধারণত একজন পড়াশোনা শেষ করা মেধাবী মাদরাসা ছাত্র জীবন শুরু করতেন কোনো সাধারণ প্রাথমিক মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু এই প্রাথমিক মাদরাসা শিক্ষকদের বেতনই ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়। দৈনিক কুড়ি আকচে করে মাসে ছয় শত আকচে বেতনে তারা নিজেদের ক্যারিয়ার শুরু করতেন, যা ছিল সে সময়ের হিসেবে একজন সিপাহীর আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। সাধারণত সময়ের সাথে সাথে দৈনিক বেতন বিশ আকচে থেকে পঁচিশ আকচে, পঁচিশ থেকে ত্রিশ আকচে করে বাড়ত। একবার যদি কোনো শিক্ষক বিখ্যাত হয়ে যেতেন এবং শহরের কোনো বড় সরকারি মাদরাসায় তার পদোন্নতি হতো, তবে তার মাসিক বেতন তিন হাজার আকচে ছাড়িয়ে যেত। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর ইসলামবুলের মাদরাসাগুলোর উঁচুপদের অধ্যাপক উলামাদের অনেকের বেতনই ছিল মাসে পনেরো হাজার আকচে, যা ছিল রীতিমতো বিরাট অঙ্কের অর্থ।[৮]

শিক্ষকতা পেশায় যত দ্রুত উন্নতি করা যেত বিচারকের পেশাটায় তত দ্রুত উন্নতি করা যেত না। বিচারকরা শিক্ষকদের চেয়ে সামান্য বেশি বেতনে ক্যারিয়ার শুরু করলেও তাদের পদোন্নতি হতো ধীরে। এ কারণে কাজি হবার চেয়ে মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষক হওয়াটাকেই বেশি পছন্দ করতেন। তাছাড়া শাহি মাদরাসার ফিকাহর বিশেষজ্ঞ আলেমদের জন্য সরাসরি কাযাস্কার বা সামরিক আদালতের কাজির পদে যোগদানের সুযোগ ছিল, যা সরাসরি বিচারক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা কাজিরা পেতেন না।[৯]

এ ছাড়া প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজন হতো প্রচুর দাপ্তরিক কর্মচারীর। তাদের বেতন সাধারণ হলেও, তা ছিল সম্মানজনক জীবিকার হিসেবে যথেষ্ট।

তাই সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর অটোমান সালতানাতে পড়াশোনা করে কেউ বেকার থাকত না।

পাঁচ

প্রশাসন চালানোর জন্য প্রয়োজন ছিল উঁচুমানের নেতৃত্বের। সুলতান তাই তার প্রাসাদের বাইরের অংশে স্থাপন করেছিলেন বিশ্বের প্রথম পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেইনিং সেন্টার। এটাই বিখ্যাত এন্দেরুন।

এন্দেরুনে পড়াশোনার ছিল সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন। দেভশির্মেহ পদ্ধতিতে যেসব খ্রিষ্টান ছেলেদের বলকান ও ককেশাস অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হতো তাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবীদের ভর্তি করা হতো এখানে। এন্দেরুনে তারা প্রথমে শিখত তুর্কি ও আরবি ভাষা, তারপর শিখত ফারসি। এই ভাষাগুলোর সাথে ইচ্ছা করলে তারা গ্রিক, ল্যাটিন, রুশ বা বলকানের ভাষাগুলোও শিখতে পারত। এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব

---

৮. Imber, C., 2009. The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan,p.242

৯. প্রাগুক্ত (৮), পৃ: ২৪২-২৪৬

দেয়া হতো ইসলামি শরিয়াহ এবং প্রাসাদের নিয়মকানুন শেখার ব্যাপারে। সেই সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ছাত্রদের শেখানো হতো সরকার পরিচালনার পদ্ধতি।

ছাত্রদের যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য ছিল আলাদা ঘোড়দৌড়, নেযাহবাজি, তলোয়ারবাজি ও তীরন্দাজির ক্লাস। সেসময়ে প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যার প্রতিটি দিকের সাথে পরিচিত করে তোলা হতো সব ছাত্রকে।

এতগুলো বিষয় শেখানোর উদ্দেশ্য ছিল সব বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরি করা।

এন্দেরুন স্কুল পরিচালনা করতেন কাপি আগা নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যার পদমর্যাদা ছিল উজিরে আযমের পরপরই।[১০]
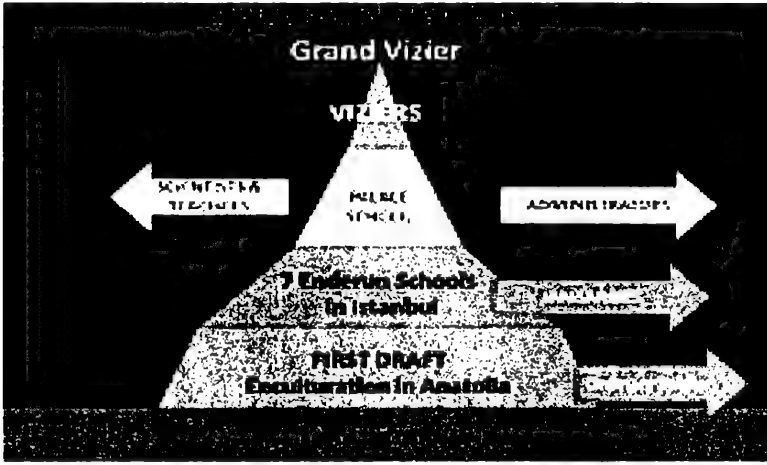
এন্দেরুনের প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন ধাপ।

এন্দেরুনের সিলেবাস যেমন ছিল বিশাল, তেমনি পড়াশোনাও ছিল বেশ কঠিন। তাই এখানে খুবই মেধাবী ও চৌকস না হলে কোনো ছাত্রের পক্ষে বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব হতো না। যারা পড়াশোনায় খুব একটা ভালো না কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় চমৎকার, তাদের ভর্তি করে নেয়া হতো জানিসারি বা কাপিকুলু বাহিনীতে। যারা পড়াশোনায় ভালো, তাদের পছন্দমতো উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রাসাদের বিশেষ মাদরাসায় ভর্তি করে দেয়া হতো। সেখানে তারা বেছে নিত যার যার পছন্দের বিষয়। এদের মধ্যে থেকেই তৈরি হতো সালতানাতের ভবিষ্যৎ শিক্ষাবিদ, উলামা, বিজ্ঞানী আর ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার। সাত বছর পর এখান থেকে পড়াশোনা শেষে তারা সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতেন। কাপি আগা নিজে তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতেন এবং বেরিয়ে যাবার আগে সুলতান তাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন।

---

১০. Lewis, B., 1963. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire (Vol. 9). University of Oklahoma Press.

ছয়

এন্দেরুনের সবচেয়ে অসাধারণ ছাত্র, যারা একইসাথে পড়াশোনা, প্রশাসনিক জ্ঞান আর যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ, তাদের সুলতান রেখে দিতেন নিজের কাছে। এরা সুলতানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করত। এদের রেখে দেয়া হতো ভবিষ্যতে বড় কোনো দায়িত্ব দেয়ার জন্য। সুলতানের সুনজরে থাকা ছাত্ররা সুলতানের আশেপাশে থাকার মতো বিভিন্ন কাজ পেত। যেমন সুলতানের প্রধান পানি ও শরবতবাহক, পতাকাবাহক, অস্ত্রবাহক, খাবার পরিবেশক, শাহী আস্তাবলের প্রধান, বাজপাখি রক্ষক, শিকারী কুকুরদের পরিচালক, প্রধান মালি এবং প্রাসাদের প্রধান দ্বাররক্ষী।

মনে হতে পারে যে এগুলো খুবই হালকা ও অপ্রোয়জনীয় দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্বগুলোতে থেকে তারা সব সময় সুলতানের কাছাকাছি থেকে শিখত কীভাবে সালতানাত পরিচালনা করতে হয়।

পরবর্তী সময়ে এদের মধ্যে থেকেই পাশা নিয়োগ দেয়া হতো। যারা পাশা হতে পারত না, তারা নিয়োগ পেত বিভিন্ন সানজাকের সানজাক বে অথবা কাপিকুলু বাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদ।

এক একজন সানজাক বে (প্রাদেশিক গভর্নর) তিন বছর মেয়াদে তার সানজাকে দায়িত্ব পালন করতেন। তারপর সেখান থেকে বদলি হয়ে পদোন্নতির সাথে সাথে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সানজাকে যেতেন। অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে সানজাক বে দের ভেতর দুজনকে পদোন্নতি দেয়া হতো যথাক্রমে আনাতোলিয়া ও রুমেলির বেইলারবে (গভর্নর জেনারেল) পদে। বেইলারবে ছিলেন তার অধীনে থাকা সব সানজাক বের ওপর কর্তৃত্বশীল। বেইলারবেকে নিয়োগ দেয়ার আগে উজিরে আযমকে অবশ্যই সুলতানের অনুমতি নিতে হতো।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহর সময় থেকে অটোমান সালতানাতে উজিরে আযমদের যুগ শুরু হয়, যারা সুলতানের পরেই রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাদের কাছে থাকত রাষ্ট্রের সীলমোহর। সুলতানের অনুপস্থিতিতে তারাই নিতেন রাষ্ট্রের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

সুলতান মুহাম্মাদ সাধারণত পরামর্শ সভা বা দিউয়ানে অংশগ্রহণ করতেন না। দিউয়ানের আলোচনায় তার পক্ষ থেকে অংশ নিতেন উজিরে আযম, বাকি সব পাশারা তার অধীনে থাকতেন।

আড়ালে খাঁজকাটা দেয়ালের পেছন থেকে সবার ওপরে থাকা সুলতানের চোখ দেখত কে কী করছে, বলছে। একে বলা হতো নযর-ই-সুলতান।

রাষ্ট্রের কর্মচারী নিয়োগ দেয়া, সেনাবাহিনী প্রধান ছাড়া অন্যান্য যেকোনো সেনাকর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া ছিল উজিরে আযমের কাজ। পদাধিকার বলে তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবেও ভূমিকা পালন করতেন।

সুলতানের সীলমোহর ছিল সাত ঘোড়ার লেজের প্রতীকওয়ালা। উজিরে আযমের সিলমোহরে ছিল পাঁচ ঘোড়ার সিল।

প্রধান উজিরের সাথে থাকতেন আরও তিন সহকারী উজির, যাদের প্রতীকে থাকত তিন ঘোড়ার প্রতীক।

সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক বিভাগ ছিল মোট চারটি।

১. শাসন বিভাগ

২. বিচার বিভাগ

৩. অর্থ বিভাগ ও

৪. সচিবালয় বা আমলাতন্ত্র

ক্যাডারভিত্তিক দক্ষ এক প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন মুহাম্মাদ আল ফাতিহ, যা নিশ্চিত করেছিল প্রতি ধাপে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য। তার প্রশাসন ছিল তার যুগের অন্য যেকোনো সালতানাত বা সাম্রাজ্যের চেয়ে বেশি দক্ষ। পূর্বে-পশ্চিমে চলতে থাকা অভিজাততন্ত্রের বিপরীতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন যোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব দেয়ার উপযোগী একটি ক্ষমতা কাঠামো।

এন্দেরুন থেকে বের হওয়া দেভশির্মেহ পদ্ধতিতে নিয়ে আসা সুলতানের এসব কুলেরা* ছিল তার প্রতি একান্তই অনুগত। বিশ্বস্ততার শত সহস্র পরীক্ষা দিয়ে কেবল তবেই একজন এন্দেরুন গ্র্যাজুয়েট পাশা হতে পারত। একারণে অন্যান্য সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বাদশাহ/সুলতান/সম্রাটদের সাথে অভিজাতদের নিয়মিত বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কথা শোনা গেলেও, পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অটোমানদের মধ্যে সুলতানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা জিনিসটা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়।

নিজের দাসদের নিয়ে গড়ে তোলা কেন্দ্রীয় সরকারব্যবস্থা সুলতানকে গাজি ও অভিজাত পরিবারগুলোর ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে। ফলে তার পক্ষে সালতানাতকে বাধাহীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে ওঠে।

ভিন্ন দেশ থেকে শিশু বয়সে তুলে আনা এই পাশাদের বেশিরভাগেরই পরিবার, মা-বাবা, আত্মীয়, সংসার সবই ছিলেন সুলতান। তাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল সুলতানের প্রতি। তাই সুলতানকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস দেখানোর কেউ অটোমান সাম্রাজ্যে ছিল না। এর মাধ্যমে আরও নিশ্চিত হয়েছিল আইনের শাসন, ন্যায়বিচার আর পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্ভেজাল মেরিটোক্রেসি।

সাত

সুলতান সার্বিয়া থেকে আনাতোলিয়া পর্যন্ত ভূখণ্ডকে অনেকগুলো সানজাকে বিভক্ত করলেন। প্রতি সানজাকে ছিল একজন করে সানজাক বে। সানজাক বে'রা সানজাককে ভাগ করতেন অসংখ্য তিমারে। প্রতিটি তিমারের দেখাশোনা করতেন একজন তিমারি

---

*. কুল হলো দাস ও স্বাধীন মানুষের মাঝামাঝি এক অবস্থান, যা কেউ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

পাশা। তিমারি পাশার অধীনে একেকটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বরাদ্দ করা হতো সিপাহীদের জন্য। এদের বলা হতো তিমারি সিপাহী। এদের একেকজনের অধীনে থাকত নিজের পরিবার, কখনো কখনো তাদের পুরো গ্রাম।

তিমারি সিপাহীরা কিন্তু নিজেরা জমি চাষ করত না। চাষের কাজ করত সাধারণত অমুসলিম কৃষকরা। সিপাহীরা মূলত পশুপালনের কাজ করত আর ফসল তোলার মওসুম এলে খাজনা আদায় করত।

মুসলিম কৃষক ছিল সংখ্যায় অনেক কম।

মুসলিমদের ঝোঁক ছিল মূলত প্রশাসন আর সেনাবাহিনীতে।

কৃষকদের কাছ থেকে তিমারি সিপাহীরা খারাজ আদায় করত। সেখান থেকে নিজেদের একটা অংশ রেখে তারা বাকিটা জমা দিত তিমারি পাশার কাছে। তিনি নিজের অংশ নিয়ে বাকিটা জমা দিতেন সানজাক বের কাছে। যেহেতু সানজাক বে'কে সুলতান বেতন ও আলাদা জমি দিতেন, তাই তার জন্য আলাদা কোনো অংশ ছিল না।

পুরোটা কর তাই জমা হতো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

এর সুবিধা ছিল অনেকগুলো।

এক নম্বর সুবিধা হলো সম্পদের বণ্টন। সালতানাতের প্রতি অংশের মানুষের কাছেই সম্পদ ছিল। সুলতানের শাসনামলে একবারও কৃষক বিদ্রোহ ঘটেনি, এটার বড় একটা কারণ এটা।

দুই নম্বর সুবিধা ছিল, যেহেতু তিমারি সিপাহীদের তাদের পারফর্ম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে জমি বণ্টন করা হতো, তাই যুদ্ধের সময় তারা প্রাণপণে চেষ্টা করত সেরা পারফর্ম্যান্স দেখানোর। যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করার ক্ষমতাই কেবল এনে দিতে পারত নতুন জমির মালিকানা।

তিন নম্বর সুবিধা ছিল, সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশটা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে সব সময় যুদ্ধে নামার জন্য তৈরি থাকত।

এ কারণে ইউরোপের কিং-মনার্ক-এম্পেররা যখন এপ্রিল-মে মাসের বসন্তে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন, ততক্ষণে লড়াইয়ের জন্য বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন মুহাম্মদ। ইউরোপিয়ান আর্মি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হতে জুন-জুলাই এসে পড়ত। আর তত দিনে মুহাম্মাদের বাহিনী চলে আসত স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে।

সবচেয়ে বড় যে পার্থক্যটা জমির বণ্টনের ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে অটোমান সালতানাতকে আলাদা করেছে তা হলো ইউরোপে মানুষ ছিল দুই বর্ণে বিভক্ত। শাসক আর শাসিত।

অভিজাত বংশের ছেলে মাতাল হোক, পাগল হোক বা হোক অযোগ্য অচল, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে সে জমিদারী ঠিকই পেত। রাজার যুদ্ধ করার প্রয়োজনে সে তার যোগ্যতা অনুসারে সৈন্য যোগাত। সৈন্য বেশি যোগাতে না পারলেও ঘুরেফিরে ক্ষমতা থেকে যেত তার বংশের হাতেই।

কিন্তু অটোমান সালতানাতে জমিদারী বা তিমারের কোনো উত্তরাধিকার ছিল না। আপনি হয়তো অনেক ভালো সৈনিক, তাই আপনাকে সুলতান তিমার দিয়েছেন। কিন্তু তার মানে এই না যে আপনার বংশধররাই এই তিমারের মালিক থাকবে। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে যেদিন তারা ব্যর্থ হবে সেদিন তিমার চলে যাবে অন্য কারও কাছে।

মুসলিমদের আয়ের ওপর কোনো কর বসানো হতো না। আয়ের ওপর কর বসানোর বদলে ইসলামি অর্থনীতি কর বসায় মানুষের উদ্ধৃত সঞ্চয়ের ওপর। এই সেভিংস ট্যাক্সের নাম যাকাত। যাকাত আদায় ও বণ্টন করা হতো খুবই কড়াকড়িভাবে।

অমুসলিমদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, তাই তাদের জন্য চালু ছিল জিযিয়া কর। প্রত্যেকে তার বার্ষিক আয়ের ০.৫% জিযিয়া কর দিত। এর বিনিময়ে সে পেত রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা।

প্রথম দিকে জিযিয়া দেয়ার ভয়ে খ্রিষ্টানরা বনে জঙ্গলে পালিয়ে যেত। ফলে নিয়ম করা হলো কোনো জনপদের কেউ ট্যাক্স না দিয়ে পালিয়ে গেলে তার ট্যাক্সের বোঝা চাপবে ওই জনপদের বাকিদের ওপর। ফলে পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে হলেও পালানো বন্ধ করতে বাধ্য হলো অমুসলিম জিম্মিরা।

কিছুদিনের মধ্যে তারা যখন বুঝে গেল যে, এই রাষ্ট্রে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি। তখন তারা উল্টো তাদের আত্মীয় স্বজনকে মুসলমানদের অধীনে বাস করতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকল। মুহাম্মাদের সরকার তার প্রজাদের খাবার, পোশাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ছিল পুরোমাত্রায় সক্ষম।

কোনো গরিব মানুষ না খেতে পেয়ে বা টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার ঘটনা ছিল বিরল। বরং অনেক সময়েই ধনীরা যাকাত দেয়ার লোক খুঁজে পেতেন না। দান করার ব্যাপারে সালতানাতের ধনীদের মধ্যে চলত প্রতিযোগিতা। কেউ পরহেজগারির জন্য দান করতেন, কেউ করতেন সুনামের জন্য। কিন্তু এতে করে ধনী ব্যবসায়ী এবং বে-পাশাদের ভেতর ব্যাপকভাবে দানের যে সংস্কৃতি তৈরি হয়, তা টিকে আছে আজও।

অটোমানদের জন্য দান ছিল উৎসবের মতো। একজন পাশার ছেলের খাতনা হলে, তিনি তার সাথে অন্তত শ খানেক গরিব শিশুর খাতনার ব্যবস্থা করতেন।

সন্তানের পড়াশোনা যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতো। সেদিন পাশারা পঞ্চাশ থেকে শুরু করে এমনকি (উজিরে আযম বা বেইলারবেদের ক্ষেত্রে) এক হাজার শিশুর শিক্ষার দায়িত্বও বহন করতেন।[১১]

তুরস্ক এখনো পৃথিবীর বৃহত্তম মানবিক সহায়তা দানকারী দেশগুলোর একটি।

আট

সমাজের শ্রমিক-কারিগরদের অধিকার রক্ষার জন্য ছিল আখি ভ্রাতৃসংঘ। কোনো মালিক বেতন দেয়া নিয়ে গড়িমসি করলে তাকে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হতো। ইসলামবুলের আখি শায়খদের সাথে প্রতিমাসেই বৈঠকে বসতেন উজিরে আযম। তিন থেকে চার মাস পরপর সুলতান হয় প্রাসাদে তাদের ডাকতেন নয়তো তাদের তেকিতে গিয়ে দেখা করে আসতেন।

সালতানাতের কুকুর-বিড়ালদের জন্যও ছিল হাসপাতাল। শীতের সময় মানুষ পাহাড়ে গিয়ে পশুপাখিদের জন্য খাবার রেখে আসত, যাতে শীতে তুষারপাতের ভেতর পশুপাখিদের না খেয়ে মরতে না হয়।[১২]

একদিকে ইসলামি সভ্যতার ঐতিহ্য, অন্যদিকে গ্রিক-রোমান সভ্যতার প্রজ্ঞা দুইয়ে মিলে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ নিজের সালতানাতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিকে বাইজান্টাইন রোমানদের উত্তরসূরি হিসেবে, অন্যদিকে ইসলামি খিলাফতের দাবিদার হিসেবেও। পরিচ্ছন্ন অর্থব্যবস্থা, চমৎকার সামাজিক মূল্যবোধ, শক্তিশালী বিচার বিভাগ ও সুশাসন একটি ভবিষ্যৎ বিশ্বশক্তির জন্ম দিতে নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করছিলেন।

ইতিহাস তার যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা করেছে, তার ছিঁটেফোঁটাও করেনি শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাধীন বিচার বিভাগ নিয়ে। হেরেম নিয়ে যে পরিমাণ যৌন সুড়সুড়িমূলক কল্পকাহিনির বই পশ্চিমা লেখকরা লিখেছেন, হেরেমের শিক্ষাকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসা নারী ও পুরুষ ক্যাডেটদের অসাধারণত্বের কারণ নিয়ে তার সিকিভাগও লেখা হয়নি। অথচ এই ফ্যাক্টরগুলোই ধীরে ধীরে অটোমানদের পরিণত করেছিল যাযাবর অশ্বারোহী থেকে বিশ্বের এক নম্বর সুপারপাওয়ারে।

নিজের সময়ের চেয়ে অন্তত চার শ বছর এগিয়ে ছিলেন প্রাগম্যাটিস্ট স্টেটসম্যান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ। বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর অনেক ধারণাই যার তৈরি করা রাষ্ট্র কাঠামোর নীরব সাক্ষী।

---

[১১]. Kia, M., 2011. Daily life in the Ottoman Empire. ABC-CLIO.p.156

[১২]. https://www.dailysabah.com/feature/2015/01/18/the-ottomans-exemplary-treatment-of-street animals

ট্রেবিজন্ড অভিযান

এক

১৪৬১ সালের বসন্তে সুলতান ফের অভিযানে বের হবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ছিলেন কিছুটা একনায়কতান্ত্রিক একজন কমান্ডার। তার সব জেনারেলদের তিনি নিজ হাতে পরিচালনা করতেন। অনেক সময়েই যুদ্ধ বিষয়ক কোনো কাউন্সিলের ধার তিনি ধারতেন না, সরাসরি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন।

এপ্রিলে তার বাহিনী নিয়ে তিনি যখন বুর্সায় পৌছালেন তখন একসাথে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। পশ্চিমে চিওস, লেসবস, রোডস আর সাইপ্রাস সবাই ভয় করতে লাগল যে তাদের ওপরেই হয়তো হামলাটা আসছে। ওদিকে উত্তরে ক্রিমিয়া, মলদাভিয়া, পূর্বে সিনোপ আর ট্রেবিজন্ড সবাই ভাবতে লাগল যে, এই বুঝি অটোমানরা এসে ঘাড় মটকাল।

সুলতানের নৌবাহিনী রওনা হলো কাসিম পাশার নেতৃত্বে, কাসিম পাশাকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল একগাদা চিঠি। বলে দেয়া হয়েছিল কবে কোনো চিঠি খুলতে হবে। চিঠিগুলোতে যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেভাবেই এগোতে লাগলেন কাসিম পাশা।

ওদিকে সুলতান নিজের ৮০ হাজার পদাতিক আর ৬০ হাজার সওয়ার নিয়ে এগিয়ে চললেন আনাতোলিয়ার বুক চিরে।[১]

আনাতোলিয়ার বুকের ওপর আছে বিশাল টরাস পর্বতমালা।

রওনা হবার আগে মুহাম্মাদকে তার এক জেনারেল প্রশ্ন করেছিলেন তাদের অভিযান কোন দিকে হবে।

---

১. John Freely, The Grand Turk: Sultan Mehmed II, Conqueror of Constantinople and Master of an Empire (New York: Overlook Press, 2009), p. 67

সুলতান জবাব দিলেন- যদি আমার একটা দাড়িও জানতে পারে আমার মগজে কী আছে তো আমি ওই দাড়িটা তুলে ফেলব।[২]

উনত্রিশ বছরের একরোখা যুবক মুহাম্মাদ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত রাস্তায় এগোতে লাগলেন পূর্বে এবং মাস খানেকের মাথায় পৃথিবীর ইতিহাসে চতুর্থতম জেনারেল হিসেবে টরাস পর্বতমালা পেরিয়ে যান নিজের বাহিনী নিয়ে। আগে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কেবল তিনজন।

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট, পম্পেই আর তাইমুর।[৩]

একমাস চলার পর মুহাম্মাদ সিনোপে উপস্থিত হন। তত দিনে তার নৌবাহিনী সেখানে কাজের কাজ সেরে ফেলেছে।

সিনেপের পতন হলো। সিনোপের শাসককে দেয়া হলো গ্রিসে বিশাল ভূখণ্ড। ওদিকে ট্রেবিজন্ডের শাসক ডেভিড কমনেস প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কীভাবে অটোমানদের পরাজিত করা যায়।

ট্রেবিজন্ড ছিল রোমান সাম্রাজ্যের শেষ স্বাধীন অঞ্চল। ট্রেবিজন্ডের রাজা ডেভিড ছিলেন এক দক্ষ কূটনীতিক। জর্জিয়ার রাজা, ক্রিমিয়ার জেনোইস এবং সাদা ভেড়া তুর্কমান যাযাবর গোত্রের অধিপতি উজুন হাসানকে নিয়ে তিনি অটোমানদের বিরুদ্ধে এক সামরিক জোট গড়ে তুললেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হলো না।

আনকারা-শিভাস পেরিয়ে সুলতান এমন এক অবস্থানে আসলেন যেখান থেকে তিনি একাধারে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, ক্রিমিয়া বা আক কয়ুনলু যে কাউকে আক্রমণ করে বসতে পারেন।

দুই

উজুন হাসানের বিশাল এক সেনাবাহিনী থাকলেও সুলতানের সামনে দাঁড়ানোর জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সেটা তার ছিল না। তিনি তাই বিপুল পরিমাণ উপহার দিয়ে তার মা সারাহ খাতুনকে পাঠালেন সুলতানের কাছে। সারাহ খাতুন ছিলেন খ্রিষ্টান বংশোদ্ভূত।

সুলতানের কাছে তিনি যখন পৌছলেন তখন সুলতান ককেশাস পর্বতমালার জিগানাস পাস অতিক্রম করেছেন ছ হাজার ফুট পাহাড় বেয়ে।

'কেন এত কষ্ট করছেন?'

---

[২]. Doukas. 45.15; translated by Magoulias. Decline and Fall. p. 258

[৩]. Kritoboulos. IV.26. 27; translated by Riggs. History of Mehmed. p. 169

সারাহ খাতুনের এই প্রশ্নের জবাবে সুলতান জবাব দিলেন, 'মা, আমি একজন গাজি, ইসলামের তলোয়ার আছে আমার হাতে। আমি যদি এইটুকু কষ্ট না করি তো হাশরের ময়দানে যখন আমার চেহারা ধুলায় ধূসরিত হবে। তখন আল্লাহকে কী জবাব দিব?[৪]

উপহারে কাজ হলো না। কাজ হলো সারাহ খাতুনের মাতৃসুলভ আচরণে। সুলতানের মা মারা গেছিলেন বারো বছর আগে। সুলতান সারা খাতুনকে মা বলে ডাকা শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে কথা দিলেন যে উজুন হাসানকে তিনি আক্রমণ করবেন না, যদি উজুন হাসান চুপ থাকে।

সারাহ গ্যারান্টি দিলেন যে উজুন হাসান ট্রেবিজন্ডকে সাহায্য করবেন না। সুলতান এবার দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে ট্রেবিজন্ড অবরোধ করলেন।

অবরোধের আগে তাদের শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালে নিজেদের শক্তিশালী দেয়ালের ওপর ভরসা করে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। ৩২ দিন ধরে সুলতান ট্রেবিজন্ড অবরোধ করে রাখার পর ডেভিড কমনেন্স বুঝতে পারলেন সাম্রাজ্য রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব না।

নিজের ও পরিবারের জীবনের নিরাপত্তার শর্তে তিনি শহরের ফটক খুলে দিলেন ১৫ আগস্ট ১৪৬১ সালে।[৫]

মুহাম্মাদ আল ফাতিহর কাছে আত্মসমর্পণ করছেন ডেভিড কমনেন্স।

[৪]. Babinger, Franz. Mehmed the Conqueror and his Time. Princeton NJ: Princeton University Press, 1978. ISBN 0-691-01078-1,p.193

[৫]. Chalkokondyles. 9.76; translated by Kaldellis, The Histories, vol. 2 pp. 361-363

শহরের অধিবাসীদের বড় এক অংশকে দাসে পরিণত করা হলো। ৮০০ শিশুকে নিয়ে যাওয়া হলো জানিসারি বাহিনীর জন্য।

শহরের কেন্দ্রীয় চার্চকে মসজিদে পরিণত করা হলো।

সিনোপ আর ট্রেবিজন্ড, সাথে আমাস্রা বন্দরের পতনের ফলে ব্ল্যাক সির গোটা পশ্চিম ও দক্ষিণ তীর অটোমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ল ভেনিস ও জেনোয়ার স্থল বাণিজ্য।

এই বিজয়ের সাথে সাথে পৃথিবীর বুক থেকে চির দিনের জন্য মুছে গেল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ অংশটাও।

ট্রেবিজন্ডের পতনের সাথে সাথে ভেনিস-জেনোয়া পোপকে চাপ দিতে লাগল নতুন করে ক্রুসেড ঘোষণার জন্য। ওদিকে নিজেরা নিতে লাগল নৌ যুদ্ধের প্রস্তুতি।

কিন্তু এর চেয়ে অনেক ভয়াবহ এক বিপদ তৈরি হচ্ছিল ব্ল্যাক সির উত্তর উপকূলে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বীর-মহাবীর

শয়তানের ছেলে

এক

রথ ছুটে চলেছে সেগেসভার দুর্গের দিকে।

সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে হবে সেগেসভার।

ড্রাকুলের* স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। প্রসব যন্ত্রণায় তিনি একেবারেই কাতর হয়ে পড়েছেন। দেরি হয়ে গেলে লেডি ইউপ্রাক্সিয়াকে বাঁচানো যাবে না।

সময়টা ১৪৩১ সালের ডিসেম্বর মাস।

রাত ঠিক ১২টায় ড্রাকুলা রাজবংশের দ্বিতীয় ভ্লাদের স্ত্রী নিয়ানা তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন। সন্তানের জন্মের ঠিক পূর্বমুহূর্তে অদ্ভুত এক ঝড় ওঠে। কার্পেথিয়ানের এদিকটায় ডিসেম্বর মাসে এমন ঝড় সাধারণত দেখা যায় না।

বাচ্চার জন্মের মুহূর্তে এক জান্তব চিৎকার দিয়ে উঠে বসেন ইউপ্রাক্সিয়া। মেঘে ঢেকে যায় পূর্ণিমার চাঁদ।*

এই শিশুটি অশুভ এক সময়ে জন্ম নিয়েছে।

শিশুটির শারীরিক বৈশিষ্ট্য চমৎকার তবে তার চোখ অদ্ভুত রকমের সবুজ। সে চোখে তাকালে মনে হয় মানুষ এভাবে তাকাতে পারে না।[১]

দুই

১৪০৮ সালে সম্রাট জন সিগিসমুন্ড ইউরোপ থেকে মুসলিম, অর্থডক্স খ্রিস্টান, প্যাগান ও জিপসিদের তাড়াতে এক গুপ্তসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিকভাবে এটি ছিল আসলে অটোমানবিরোধী জোট।

---

*. ড্রাকুল ছিলেন ড্রাকুলার বাবা

*. রোমানিয়ান কিংবদন্তী থেকে নেয়া।

১. Florescu, Radu R.; McNally, Raymond T. (1989). Dracula, Prince of Many Faces: His Life and his Times. Back Bay Books. ISBN 978-0-316-28656-5 .p 84

এই সংঘের নাম অর্ডার অফ দ্যা ড্রাগন।

কিং ফিফথ হেনরি অফ ইংল্যান্ড, কিং লাডিসলাস অফ পোল্যান্ড, কিং ভ্লাদিস্লাভ অফ বোহেমিয়া, সিক্সথ চার্লস অফ ফ্রান্স, আলফানসো অফ অ্যারাগন, ডিউক অফ নেপলসসহ গোটা ইউরোপের রাজরাজড়াদের বেশিরভাগই ছিলেন এই সিক্রেট সোসাইটির সদস্য।[২]

এদেরই একজন ছিলেন ভ্লাদ ড্রাকুল। ১৪৩১ সালে যিনি ওয়ালাসিয়ার শাসনভার পান সম্রাট সিগিসমুন্ডের কাছ থেকে। একই বছর জন্ম নেয় তার দ্বিতীয় সন্তান ভ্লাদ।

ড্রাকুল তত দিনই নিরাপদ ছিলেন, যত দিন সম্রাট জন সিগিসমুন্ড জীবিত ছিলেন। সিগিসমুন্ডের মৃত্যুর পর জন হুনয়াদি হাঙ্গেরির ক্ষমতায় আসেন। যিনি ভ্লাদকে পছন্দ করতেন না। তিনি ওয়ালাসিয়ার ক্ষমতায় বসাতে চেয়েন ভ্লাদিস্লাভকে।

ওয়ালাসিয়ার সিংহাসনে টিকে থাকার জন্য ড্রাকুলের তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে অটোমানদের সমর্থন। সুলতান মুরাদেরও সেসময় হাঙ্গেরির সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল একটা বাফার স্টেট। ড্রাকুলকে সমর্থন দিয়ে তিনি সেটা পেয়ে গেলেন। বিনিময়ে ড্রাকুল তাকে দিলেন আনুগত্যের শপথ, জানিসারি বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য প্রতি তিন বছরে এক হাজার করে বালক আর প্রতিবছর পাঁচ হাজার ডুকাট করে জিযিয়া কর। অটোমান সুলতানের প্রাসাদে পাঠানো হলো ড্রাকুলের দুই ছেলে ভ্লাদ আর রাদুকে।

কিন্তু দিন শেষে তিনি ছিলেন অর্ডার অফ দ্যা ড্রাগনের সদস্য।

নিজের বড় ছেলেকে তিনি রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছেই, যে ছিল যুদ্ধ করার উপযুক্ত।

১৪৪৪ সালে ক্রুসেড অফ ভার্নাতে ঠিকই খ্রিষ্টানদের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ড্রাকুলের বড় ছেলে। ড্রাকুল সে সময় সুলতানকে বুঝ দিলেন যে তার বড় ছেলে তার কথা শোনেনি, তার কোনো দোষ নেই। আর জন হুনয়াদিকে তিনি বুঝালেন তার দুই ছেলে অটোমানদের হাতে থাকায় তার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়া সম্ভব হয়নি।

যা বোঝার তা সবাই ঠিকই বুঝে নিল।

ওদিকে দুই ওয়ালাসিয়ান প্রিন্স ভ্লাদ আর রাদু তখন জানিসারিদের সাথে যুদ্ধ শিখছে। জানিসারি ওয়ারফেয়ার, ক্যাভালরি ট্যাকটিক্স, অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যালকেমি, ইতিহাস আর তুর্কি ও আরবি ভাষা শিখে দুই প্রিন্স দিনকে দিন অলরাউন্ডার হয়ে উঠছিল।

---

২. Rezachevici, "From the Order of the Dragon to Dracula".

এদের মধ্যে ছোট প্রিন্স রাদুর সাথে শাহজাদা মুহাম্মাদের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠল। ওদিকে তার বড় ভাই ভ্লাদ বয়স বাড়ার সাথে সাথে হয়ে ওঠছিল অদ্ভুত স্বভাবের।

প্রায়ই সে ইঁদুর, পাখি বা বেড়াল মারত।

তার প্রাণী হত্যার ধরন ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা।

একটা লম্বা লোহার শলা সে প্রাণীর মলদ্বার দিয়ে প্রবেশ করাত। তারপর একটু একটু করে তা ঠেলে দিত ভেতরের দিকে। একটা সময় শলাটা প্রাণীটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বীভৎস মৃত্যু ঘটত প্রাণীটার।

সুলতান মুরাদ কোনোদিন জানতে পারেননি, তারই প্রাসাদে, তার শাহজাদাদের সাথেই বেড়ে ওঠছে ইতিহাস কুখ্যাত পিশাচ ড্রাকুলা।

ড্রাকুলা মানে শয়তানের সন্তান।[৩]

এক দিন সে শয়তানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল নিষ্ঠুরতায়।

তিন

ব্যাটল অফ ভার্নায় মুরাদের কাছে হেরে তিন বছর বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ান হুনিয়াদি।

তারপর হুট করে এক দিন তিনি হাজির হন ট্রানসিলভানিয়াতে। তার নির্দেশে সেখানকার অভিজাতরা হত্যা করে মির্সিয়াকে।[৪] ভ্লাদের বড় ছেলে মির্সিয়া থার্ডকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়। ক্ষমতায় বসেন ভ্লাদিস্লাভ।

এই খবর পেয়ে মুরাদ বিশ হাজার অটোমান সিপাহী দিয়ে ভ্লাদকে ওয়ালাসিয়াতে পাঠিয়ে দেন। ভ্লাদ ছিল দুর্ধর্ষ এক যোদ্ধা। মুখোমুখি হয়েলে সে হত্যা করে ভ্লাদিস্লাভকে। তারপর ওয়ালাসিয়ার ইতিহাসে নতুন এক যুগ শুরু হয়।

ড্রাকুলার যুগ।

১৪৪৮-১৪৫৬ সাল পর্যন্ত ওয়ালাসিয়াতে নিজের নিয়ন্ত্রণকে পাকাপোক্ত করে ভ্লাদ। পুরো ওয়ালাসিয়ান অভিজাত সম্প্রদায় এবার ড্রাকুলার থাবায় পড়ে যায়। তাদের দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোতে থাকে বীভৎস মৃত্যু।

---

৩. Treptow, Kurt W. (2000). Vlad III Dracula: The Life and Times of the Historical Dracula. The Center of Romanian Studies. ISBN 973-98392-2-3.,p.10

৪. Treptow, Kurt W. (2000). Vlad III Dracula: The Life and Times of the Historical Dracula. The Center of Romanian Studies. ISBN 973-98392-2-3.,p.53

চার

১৪৫৬ সাল, সেন্ট বার্থেলোমিউর উৎসব।

ড্রাকুলা দুর্গে ডিনারে ডাকা হয়েছে দশ হাজার মানুষকে। খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর ড্রাকুলা হাজির হলেন। দুর্গের সবাইকে জানানো হলো, এই মুহূর্ত থেকে তারা বন্দি।

ড্রাকুলা জানালেন তিনি ক্ষুধার্ত। তার সবুজ চোখজোড়া ঝিলিক দিয়ে ওঠল। নিজের ঘন ভ্রু উচিয়ে তিনি রোমহর্ষক একটা হাসি দিলেন।

সাথে সাথে প্রতিটি বৃদ্ধলোককে আলাদা করা হলো খাবার টেবিল থেকে। তারপর একে একে তাদের মলদ্বার দিয়ে লোহার শলা প্রবেশ করানো হলো। সেই শলা বের হলো মুখ দিয়ে। মৃত মানুষগুলোর রক্তে ভিজিয়ে পাউরুটি খেলেন ভ্লাদ।

ইতিহাস কুখ্যাত রক্তপিপাসু পিশাচের মানুষ মারার অভিযান এখানেই শুরু।[৫]

১৪৫৬-১৪৬২ এই ছয় বছরে প্রায় এক লাখ মানুষ মেরেছেন ড্রাকুলা।[৬]

ড্রাকুলা ১৪৫৭ সালে ওয়ালাসিয়ার সব ভিক্ষুককে প্রাসাদে ডেকে এনে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ভোজসভা শেষ করে তাদের সবাইকে প্রাসাদে তালাবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

এ ব্যাপারে ড্রাকুলার ব্যাখ্যা ছিল, তার রাজ্যে কোনো ভিখারি থাকবে না।

রাজ্যের যেসব অভিজাতরা তার বাবা ড্রাকুলের সাথে বেঈমানি করেছিল। তাদের অন্তত দশ হাজারকে মলদ্বার দিয়ে শলাকা প্রবেশ করিয়ে মারে ড্রাকুলা। একবার তার আদেশ অমান্য করাতে ত্রিশ হাজার ব্যবসায়ীকে একইভাবে শুলে চড়িয়ে মারেন তিনি।

তার বর্বতার বিশেষ শিকার ছিল নারীরা। নিজের এক রক্ষিতা একবার তাকে মিথ্যা বলে। ফলে সেই রক্ষিতার যোনিদেশ দিয়ে তিনি ভোঁতা এক শূল ঢুকিয়ে দেন। সেই শুল বের হয় বুক চিরে।

রাজ্যের চোর-ডাকাতদের ধরে গণহারে শূলে চড়ান ভ্লাদ। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে চুরি বন্ধ হয়ে যায়।

তার রাজ্যে কারও চুরি করার সাহস নেই তা প্রমাণ করার জন্য তিনি রাজধানীর কেন্দ্রে একটা সোনার পেয়ালা রেখে দিয়েছিলেন। পেয়ালাটা চার বছরে একচুলও এদিক থেকে সেদিকে সরেনি।[৭]

---

[৫]. প্রাগুক্ত(৩),পৃঃ৭৪

[৬]. https://listverse.com/2013/01/26/10-fascinating-facts-about-the-real-dracula/

একবার এক চোর চুরি করে পালানোর সময় এক গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ে। সারা রাত ঘুরেও তাকে খুঁজে না পেয়ে ড্রাকুলা ওই গ্রামের সবাইকে এবং ওই চোরের বংশের সবাইকে শুলে চড়িয়ে মারেন।

তার সবচেয়ে প্রিয় নৃশংসতা ছিল নারীদের স্তন কেটে তাদের স্বামীদের সেই স্তন চিবিয়ে খেতে বাধ্য করা, তারপর তাদের যোনিদেশে গরম লোহার শলা ঢুকিয়ে তা মুখ দিয়ে বের করে আনা।

অনেক সময় মুখ দিয়ে শলাকা ঢুকিয়েও যোনি দিয়ে বের করা হতো।

বাচ্চাদের পুড়িয়ে রোস্ট করে সেই রোস্ট খেতে বহু মাকে বাধ্য করেছে ইতিহাস কুখ্যাত এই নরপিশাচ।

১৪৫৯ সালে কাউন্সিল অফ মন্টোয়াতে পোপ দ্বিতীয় পিউস অটোমানদের বলকান থেকে তাড়াতে এক ক্রুসেড ঘোষণা করেন। পোপের এই ক্রুসেডে কোনো রাজা সাড়া না দিলেও ভ্লাদ ড্রাকুলা ঠিকই এই সুযোগ লুফে নেন। এর পেছনে কারণ ছিল দুটি।

এক. পোপের দেয়া চল্লিশ হাজার খণ্ড স্বর্ণ।

দুই. অর্ডার অফ দ্যা ড্রাগনের শপথ পূর্ণ করা।

১৪৫৯ সালে যে অটোমানদের সমর্থনে ক্ষমতায় বসেছিলেন সেই অটোমানদেরকেই কর দিতে অস্বীকৃতি জানান ড্রাকুলা।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান স্টিফেন অফ মলদাভিয়ার সাথে যুদ্ধ করে তার রাজকোষ খালি। আগামী বছর তিনি জিযিয়া পাঠিয়ে দেবেন।

এদিকে মুহাম্মাদের গোয়েন্দারা পোপ আর হাঙ্গেরির সাথে ড্রাকুলার সম্পর্ক ঠিকই টের পেয়ে সুলতানকে জানান। সুলতান ড্রাকুলার সাথে দেখা করার জন্য হামজা বে নামের একজন পাশাকে পাঠান দশ হাজার অশ্বারোহী দিয়ে। তাকে বলা হয়েছিল গোপনে ফাঁদে ফেলে ড্রাকুলাকে বন্দি করে নিয়ে আসতে।

ড্রাকুলা টের পেয়ে যান ঘটনা। হামজা বেসহ তার দশ হাজার অশ্বারোহীর সবাইকে শুলে চড়িয়ে মারা হয়।[৮]

খবর শুনে উজিরে আজম মাহমুদ পাশাকে সুলতান ওয়ালাসিয়া পাঠান আঠারো হাজার সৈন্য দিয়ে।

---

৭. প্রাগুক্ত(৬)

৮. 'Vlad the Impaler second rule [3]'. Exploringromania.com. Archived from the original on 2009-06-08. Retrieved 2012-08-17.

তিনি ওয়ালাসিয়া পৌঁছে জানতে পারেন, পাহাড়ী এলাকাতে একটু আগেই প্রবেশ করেছেন ড্রাকুলা। যাবার আগে বিশ হাজার তুর্কি মুসলিম ও অর্থডক্স খ্রিষ্টানকে শুলে চড়িয়ে মেরে গেছেন।

এত বর্বর এই মানুষরূপী নরকের জানোয়ারকে পোপ অভিহিত করেন খ্রিষ্টানদের নায়ক হিসেবে।

ড্রাকুলা ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন, তার একার পক্ষে অটোমানদের সাথে লড়া সম্ভব না। তাই তিনি হাঙ্গেরির রাজা ম্যাথিয়াস করভিনাসকে এক চিঠি লেখেন।

চিঠিতে লেখা ছিল-

> 'পুড়িয়ে মারা বা জবাই করা বাদেই আমি মোট ২৩, ৮৮৪ জন তুর্কিকে শুলে গেঁথে মেরেছি, এদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু আছে, যুবক ও বৃদ্ধ আছে, সুস্থ ও অসুস্থ আছে। এই ২৩, ৮৮৪ জন তুর্কিকে আমি হত্যা করেছি। লোয়ার দানিয়ুব থেকে কার্পেথিয়ান পর্যন্ত যেখানেই এই অপবিত্র জানোয়ারদের পেয়েছি, সেখানেই তাদের হত্যা করেছি। মহান সম্রাটের জানা উচিত, আমি অটোমান সুলতানের সাথে শান্তি ভঙ্গ করেছি।
>
> যতক্ষণ এই মাটি থেকে অপবিত্র মুসলিম, ঈশ্বরের শত্রু তুর্কিদের হটানো না হচ্ছে, এই ধ্বংসযজ্ঞ চলবেই।'[১]

১. Adrian Axinte, 'Dracula: Between Myth and Reality', Student paper for Romanian Student Association, Stanford University.

ড্রাকুলার মুখোমুখি

এক

করাত দিয়ে একটু আগেই চিরে ফেলা হয়েছিল সতেরো জনকে। মলদ্বারের দিক থেকে শুরু করে তারপর একদম মাথা পর্যন্ত।

লাশের টুকরোগুলো থেকে ঝরে পড়া রক্তের কিছু ফোঁটা এখনো লেগে আছে ড্রাকুলার ঠোঁটে। একটু আগেই সকালের নাশতা সেরেছেন ভ্লাদ ড্রাকুলা।

এরই মধ্যে খবর এল সুলতানের দূত এসেছে তার সাথে দেখা করতে। ড্রাকুলা তাদের সামনে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সামনে আনার পর দূতদের কুর্নিশ করতে বলা হলো।

তারা কেউ কুর্নিশ করলেন না।

ড্রাকুলা কুর্নিশ না করার কারণ জানতে চাইলে তারা জানালেন, মুসলমান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না।

হো হো করে হেসে ওঠলেন ড্রাকুলা। তৎক্ষণাৎ আদেশ করা হলো দূতদের মাথার পাগড়ি কপালের দুপাশে পেঁচিয়ে পেরেক গেথে তাদের হত্যা করার।

প্রথমে তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। তারপর পাগড়ি শক্ত করে পেঁচিয়ে কপালের দুপাশে গিঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বিপরীত দিক থেকে দুজন মিলে টান দিল। তারপর হাতুড়িপেটা করে মাথায় গাথা হলো পেরেক।

মাথার দুপাশের ক্যারোটিড ধমনী প্রথমে ফুলে ওঠল।

দূতদের মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল অল্প সময় পরেই। তারপর চোখগুলো বিস্ফারিত হলো। নাক, কান আর মাথার দুপাশ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে পড়তে তাদের দাড়ি ভিজে গেল।

আরও জোরে একটা টান দেয়া হলো পাগড়ির দুই বিপরীত প্রান্তে।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল তুর্কি দূতেরা।

ক্যারোটিড ছিঁড়ে গেছে।

দুই

সুলতানের কাছে দূতদের মাথা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সাথে একটা চিঠি।

চিঠিতে লেখা, 'পরেরবার কথা বলতে চাইলে শিক্ষিত দূতদের পাঠাবেন।'

ক্রোধে ফুঁসতে লাগলেন সুলতান।

উজিরে আজমকে বলা হলো তখুনি আঠারো হাজার সিপাহী নিয়ে রওনা হতে। ড্রাকুলাকে বন্দি না করে ফেরা যাবে না। রওনা হয়ে গেলেন মাহমুদ পাশা।

ওয়ালাসিয়া পৌঁছতে তার সময় লাগল দেড় মাস। সেখানে তিনি একটা দুর্গের দখলও নিয়েছিলেন। পাহাড়ী পথের বাঁকে এক সন্ধ্যায় একদল জিপসি তাকে জানাল, ড্রাকুলাকে তারা পাহাড়ের ঢালে দলবলসহ দেখেছে। ঢালে নামার জন্য সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন মাহমুদ পাশা।

নিচে নামার পর তারা ঘোড়ার খুরের ছাপ অনুসরণ করে অনেক দূর গেল। কিছুই পাওয়া গেল না। স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে ড্রাকুলা।

ক্লান্ত বাহিনী নিয়ে দুর্গে ফিরলেন পাশা। পরের রাতে ড্রাকুলার খোঁজে আবার বেরুলেন তিনি। দুর্গ থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে এক জঙ্গলের কাছে তার বাহিনীকে আচমকা তিনদিক থেকে আক্রমণ করা হলো।

আঠারো হাজারের সাত হাজারই মারা গেল হাঙ্গেরিয়ান হ্যান্ডগানার আর ওয়ালাসিয়ানদের বুলেটের ঘায়ে।

বাহিনী নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন মাহমুদ পাশা।

যখন তিনি দুর্গের সামনে গেলেন, দেখতে পেলেন দুর্গের গেট হা হয়ে আছে। গেটের ওপর লোহার শুলে গাঁথা অবস্থায় ঝুলছে ছয় শ তুর্কির লাশ।

ড্রাকুলা তার দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছে। আঠারো হাজার সৈন্যের সাত হাজারই নিহত। অপমানিত চেহারায় সুলতানের দরবারে ফিরলেন পাশা। ড্রাকুলাকে তিনি কোনোমতেই ঠেকাতে পারছেন না।

তিন

সুলতান এবার নিজেই অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার ইচ্ছা ছিল ট্রেবিজন্ড জয়ের পর ব্ল্যাক সির ওপারে জেনোইস বন্দর কাফ্ফা জয় করে ব্ল্যাক সির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবেন। তা আর হলো না।

ওদিকে উল্লাসে মেতে উঠলেন পোপ, ম্যাথিয়াস করভিনাস আর রোডসের নাইটরা।

আরও একজন ভেতরে ভেতরে খুশি হলেন, জেনোয়ার ডিউক। তিনি নিশ্চিত, এই যাত্রায় তার রাজ্য মুহাম্মাদের হাত থেকে বেঁচে গেছে। সুলতান এখন দানিয়ুব পেরিয়ে ড্রাকুলার পেছনে লাগবেন।

ফেব্রুয়ারি ১৪৬২ নাগাদ সুলতান তার পাশা ও বেইলারবেদের নির্দেশ দিলেন যার পক্ষে যত সৈন্য জড়ো করা সম্ভব সবাইকে নিয়ে ইসলামবুলে আসতে।

ড্রাকুলার মাথা নিয়ে আসতে হবে দানিয়ুবের ওপার থেকে।

ষাট হাজার সিপাহী প্রস্তুত হলো। জিহাদের ডাক শুনে আরও ত্রিশ হাজার যুবক যোগ দিল সুলতানের সাথে। আরও ষাট হাজার মিস্ত্রি, কারিগর, শ্রমিককে নেয়া হলো। এই অভিযান হবে ভয়ানক কঠিন। বরফ কেটে রাস্তা বানিয়ে এগোতে হবে, অনেক জায়গাতেই নদীর ওপর সেতু বানাতে হবে। কোনো কোনো জায়গাতে পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে হবে।

তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য সুলতান থ্রেস দিয়ে না ঢুকে ব্ল্যাক সি ধরে জাহাজে করে রওনা হলেন। ওদিক দিয়ে সিনোপ থেকে রওনা হলো অটোমান ফ্লিট, তিন শ জাহাজের এক বহর।[১] তার সৈন্যদের পরিবহন করতে খরচ হলো তিন লাখ দিনার।

সুলতান সাথে নিলেন এক শ কুড়িটি হাম্বারা। এরা বর্তমান হাউইৎজারের পূর্বপুরুষ।

ওয়ালাসিয়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে পুরো মে মাস লেগে গেল।

চার

ওয়ালসিয়ার খটখটে গরমের দুপুর।

তুর্কিরা দানিয়ুব পেরোনোর জন্য নদীর তীরে লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে। নদীর ওপারে ড্রাকুলা আছেন বলে জানা গেছে। সন্ধ্যার আগেই নদী পেরিয়ে ওপারে ক্যাম্প করা চাই।

সুলতানের নির্দেশে প্রথমেই নদীর ওপারে গেল জানিসারি বাহিনী।

---

১. Babinger, Franz. Mehmed the Conqueror and his time, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992. ISBN 0-691-01078-1,p.205

শুরু হয়ে গেল লুকিয়ে থাকা ওয়ালাসিয়ান গেরিলাদের আক্রমণ। একের পর এক জানিসারি শহিদ হতে লাগলেন শত্রুর গুলিতে। কিন্তু জানিসারি কমান্ডার রাদু বে থামলেন না। রাদু বে আর মিহালোলু আলি বের নেতৃত্বে গুলি বৃষ্টি উপেক্ষা করে সামনে এগোতে লাগল জানিসারি বাহিনী।

তারা আসলে অন্যদের জন্য নিজেদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। জানিসারিরা গুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখবে আর সে সুযোগে মূল বাহিনী নদী পার হয়ে ওপারে চলে আসবে, এটাই ছিল সুলতানের পরিকল্পনা।

কয়েক শ জানিসারি মারা যাবার পর শেষ পর্যন্ত নদী পার হওয়া শেষ হলো। কামান পার করে আনার পরপরই সমানে তুর্কি ফিল্ড আর্টিলারি গোলাবর্ষণ শুরু করল তাদের কামান থেকে। এরপর দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ওয়ালাসিয়ানরা পালাল।

শুরু হলো নদীর পাড়ে ট্রেঞ্চ খোঁড়া।

ট্রেঞ্চের ভেতরে রাত কাটানোর একটা বড় সুবিধা হলো ক্যাভালরি অ্যাটাক থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

পাঁচ

পুরো বাহিনীর জন্য ট্রেঞ্চ খুঁড়তে লেগে গেল চার দিন।

এরই মধ্যে সুলতান খবর পেলেন, পুরো ওয়ালাসিয়া ও বুলগেরিয়ার যেখানেই মুসলিম বা অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের পাচ্ছে সেখানেই শুলে চড়াচ্ছে ড্রাকুলা।

জুনের সাত তারিখ নাগাদ অটোমান বাহিনী ওয়ালাসিয়ার রাজধানী তের্গোভিস্তের দিকে আগানো শুরু করল।

পুরো ওয়ালাসিয়ার কোথাও একটা তাজা ঘাস নেই। সব ঘাস কেটে সেগুলোর গোড়াতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গাছের সব পাতা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। জমির সব ফসল কেটে ফেলা হয়েছে। রাস্তার দুধারে পড়ে আছে গরু ও ঘোড়ার চেটেপুটে খেয়ে নেয়া কঙ্কাল।

যতদূর চোখ যায়, একটা মাছিও নেই। পুরো এলাকাটাকে শ্মশান করে দিয়ে বুখারেস্টে পালিয়ে গেছে ড্রাকুলা। প্রতিটি কূপের সব পানি হয় শুকিয়ে ফেলা হয়েছে, নয়তো তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুর্কিদের পোশাক পরে ক্যাম্পের দিকে হেঁটে আসছে ডজন ডজন জীবন্ত লাশ। এদের কারও, কারও সিফিলিস, কারও কুষ্ঠ আর কারও কারও প্লেগ রোগ আছে।

ক্ষুধা, পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে টানা দশ দিন ধরে পথ চলল তুর্কি বাহিনী। তারপর তারা তাঁবু গাঁড়লো বুখারেস্টের বাইরে। ইতোমধ্যেই ড্রাকুলার পাঠানো জীবন্ত লাশ স্ট্যাটেজি কাজ করা শুরু করেছে। তুর্কি ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়েছে প্লেগ।

১৭ জুন, দুপুর নাগাদ সুলতান খবর পেলেন, তার নৌবাহিনী ব্রেইলিয়া বা চিলিয়া কোনো বন্দরই দখল করেনি। দুটো বন্দরের অবস্থাই এত করুণ, তাতে জাহাজ ভিড়ানো অসম্ভব। সব কিছু ছারখার করে গেছে ড্রাকুলা।

হতাশ সুলতান মাগরিবের পর তাঁবুতে ঢুকলেন। তার বাহিনী ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, অসুস্থ।

অর্ধেকের বেশি উট ও ঘোড়া মরে গেছে প্লেগে।

সুলতান কিছুতেই পিছু হটার কথা ভাবতে পারছেন না। তেত্রিশ হাজার মুসলিমের রক্তের বদলা না নিয়ে দানিয়ুব ছাড়ার কথা ভাবতে তার নিজের কাছেই ঘেন্না লাগছে। মাগরিবের নামাজের পরপরই সুলতান সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন কেউ যেন রাতে তাঁবু থেকে বের না হয়। ড্রাকুলার পাঠানো জ্যান্ত লাশের দল সন্ধ্যার পরেই দলে দলে ক্যাম্পে আসে। তাদের হাতে থাকে মশাল, গায়ে মরণ ডেকে আনা রোগ।

ছয়

ড্রাকুলার কাছে এটা পরিষ্কার ছিল, কোনোমতেই তার পক্ষে খোলা ময়দানে সুলতানের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব না। জানিসারি বা কাপিকুলু যেকোনো একটা বাহিনীর সামনে পড়লেই তার খেলখতম হয়ে যাবে।

এ কারণে প্রথম থেকেই তার প্ল্যান ছিল সুলতানকে হয়রান করা। এরপর গেরিলা পদ্ধতিতে করে হিট অ্যান্ড রান ট্যাকটিক্সে সুলতানের বাহিনীকে আচমকা হামলা চালিয়ে পরাজিত করা।

এত দিন ধরে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে সুলতানকে প্রায় সাত শ কিলোমিটার জায়গা ধরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুরতে বাধ্য করেছে সে। এখন ফুরিয়ে গেছে পানি, সেই সাথে সুলতানের ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়েছে প্লেগ।

এটাই আক্রমণের সঠিক সময়।

বিকেল নাগাদ নিজের বাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করল ভ্লাদ ড্রাকুলা। একদিকে চব্বিশ হাজারের মূল লাইট ক্যাভালরি, অন্যদিকে ছয় হাজার হেভি ক্যাভালরি। প্রথম বাহিনীর নেতৃত্বে ড্রাকুলা নিজে, আর দ্বিতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে কাউন্ট গেলস।

কালো চাদরে গা ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যা নামার ঠিক পরপরই সুলতানের পুরো ক্যাম্প রেকি করে এল ড্রাকুলা নিজেই।

তারপর সে নিজের বাহিনী নিয়ে ক্যাম্পের কাছের এক পর্বতের পেছনে পজিশন নিল। বিপরীত দিকে জঙ্গলের ভেতরে বাকি ছয় হাজার সেনা নিয়ে পজিশন নিল গেলস। ঠিক হলো, রাত দশটার দিকে যখন সবাই ঘুমিয়ে যাবে ঠিক তখনই হামলা করা হবে।

হামলার দশ মিনিট আগে, বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগল ড্রাকুলা। তার একটু পরই আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল, বাতাস বইতে লাগল খুব জোরে, সেই সাথে ঘনিয়ে ওঠল কুয়াশা।

ঠিক রাত দশটায় ঘূর্ণিবায়ুর বেগে অটোমানদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল ড্রাকুলা বাহিনী।

আক্রমণের সময় কুয়াশা হবে এটা যেন আগে থেকেই জানত ড্রাকুলা। তাই সে সবাইকে বলে রেখেছিল ঘোড়ার সাথে একটা করে মশাল বেঁধে নিতে। তার সৈনিকদের সবার পরনে ছিল তুর্কিদের পোশাক।

হামলার শুরুতেই একটা জোরালো আওয়াজ করে শত্রুদের জাগিয়ে দিল ড্রাকুলা।

তারপর শুরু হলো এক হত্যাযজ্ঞ।
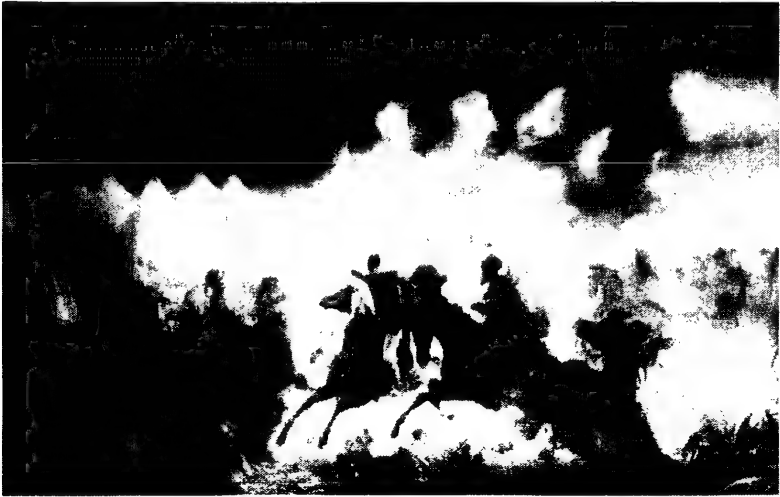
রাতের আঁধারে অটোমানদের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভয়াবহ গেরিলা আক্রমণ চালায় ড্রাকুলা বাহিনী।

ড্রাকুলা বাহিনীর হামলায় ঝাঁকে ঝাঁকে তুর্কিরা মরতে লাগল।

একের পর এক যাকে তারা সামনে পাচ্ছিল তাকেই কচুকাটা করে ফেলছিল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই প্রথম ক্যাভালরি চার্জ শেষ করে ফিরে গেল ড্রাকুলা।

এই দশ মিনিটে তিন হাজার অটোমান শহিদ হয়ে গেল।

পরেরবার আবারও হামলা করল সে, অটোমানরা তৈরি হবার আগেই। বিশৃঙ্খলভাবে লড়াই করে কোনো কূল পাচ্ছিল না বিশাল অটোমান সেনাবাহিনী। শত্রুদের পরনে তুর্কিদের পোশাক থাকায় অনেক সময় ভুল করে নিজেরাই নিজেদের হত্যা করতে থাকল তারা।

সুলতানের তাঁবু ভেবে ভুল করে ইসহাক পাশার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল ড্রাকুলা। লড়াইয়ের জন্য তলোয়ার ধরার আগেই ইসহাক পাশা নিহত হলেন।

আক্রমণের তোড়ে টিকতে না পেরে পিছু হটে গেলেন মাহমুদ পাশা।

সুলতানের তাঁবু এবার ড্রাকুলার নাগালে চলে এল। সুলতানের জীবন বিপন্ন দেখে নির্দেশ অমান্য করে বের হলেন গাজি আলি বে, তিনি জীবন মৃত্যু সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে তিনি শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে তার সাথে এসে হাজির হলেন সুলতানের বন্ধু, ড্রাকুলার ছোট ভাই রাদু বে।

রাদু বের চার হাজার অশ্বারোহী জানবাজি রেখে হামলা করে ড্রাকুলাকে পিছু হটিয়ে দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে গেলসের ছয় হাজার সৈন্য আক্রমণ না করেই পালিয়ে গেল। ওমর বে সুলতানের তাঁবু আক্রমণের খবর শুনে নিজের গাজিদের নিয়ে ধাওয়া করলেন ড্রাকুলাকে।

তুর্কিদের ক্যাম্পে পড়ে রইল কুড়ি হাজার লাশ। পাঁচ হাজার ওয়ালাসিয়ান, পনেরো হাজার তুর্কি।[২]

সাত

পরদিন সকালে সুলতানের তাঁবুর সামনে ড্রাকুলা বাহিনীর দুই হাজার ওয়ালাসিয়ানের মাথা নিয়ে হাজির হলেন ওমর বে।[৩] সুলতান নির্দেশ দিলেন, ড্রাকুলার মাথা না পাওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবেই।

গোঁয়ারের মতো এগোতে লাগল অটোমান বাহিনী। তিন দিন একটানা মার্চ করে তের্গোভিস্তেতে ড্রাকুলার রাজধানীর মুখে এসে থামলো তারা। রাজধানীর গেটে কোনো পাহারা না দেখে বোকা বনে গেলেন সুলতান। গেটের ভেতর ঢোকার পরেই অবাক হলেন তার নজরে পড়ল রক্ত জমিয়ে দেয়া ভয়ানক এক দৃশ্য।

---

[২]. Florescu, Radu R.; McNally, Raymond T., Dracula: Prince of many faces – His life and his times. Little, Brown and Company, Boston, MA, 1989. ISBN 978-0-316-28656-5,p.147

[৩]. প্রাগুক্ত(৩),পৃঃ ২০৭

কুখ্যাত ফরেস্ট অফ দ্যা ইম্পেলডঃ এখানে কুড়ি হাজারেরও
বেশি মানুষকে শূলে বিদ্ধ করে মেরে রেখে যাওয়া হয়েছিল।

বিশ হাজার মানুষের পচাগলা লাশ একের পর এক সারি বেঁধে থাকা শুলের আগায় ঝুলছে। ঘোড়ারা পর্যন্ত এই দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে ছটফট করতে শুরু করল।

বীভৎস এই দৃশ্য দেখে পুরো সেনাবাহিনী অসুস্থ হয়ে পড়ল।

সুলতান তের্গোভিস্তে জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।

পরদিন তুর্কিরা জাহাজে উঠল বাড়ি ফেরার জন্য। এই অভিযান চালানো আর সম্ভব না। ফেরার পথে ব্রেইলিয়া আর চিলিয়া জালিয়ে দিলেন সুলতান। পথে যা পড়ছিল সব ধ্বংস করতে করতে বুলগেরিয়া ফিরল অটোমান বাহিনী।

নিকোপলিসে এসে রাদু বেকে ওয়ালাসিয়াতে পাঠানো হলো তার ভাইকে শায়েস্তা করার জন্য। সাথে দেয়া হলো চল্লিশ হাজার ক্যাভালরি, দশহাজার ইনফ্যান্ট্রি।

পরের এক মাসে ফুরিয়ে এল ড্রাকুলার হাতে থাকা টাকা পয়সা। সৈনিকদের বেতন দিতে না পেরে ক্রমেই চাপে পড়ে যাচ্ছিল সে। এরই মধ্যে রাদু বে তাকে কয়েকবার আক্রমণ করেন।

উপায়ান্তর না পেয়ে ড্রাকুলা হাঙ্গেরিতে পালাতে বাধ্য হলো। সেখানে তাকে বন্দি করলেন ম্যাথিয়াস করভিনাস।[৪]

১৪৬২ সালের শেষ নাগাদ ওয়ালাসিয়া চলে এল অটোমানদের পতাকাতলে।

[৪]. reptow, Kurt W. (2000). Vlad III Dracula: The Life and Times of the Historical Dracula. The Center of Romanian Studies. p.153 ISBN 973-98392-2-3

গেরিলা

এক

১৫ আগস্ট গ্রিকদের জন্য একই সাথে আনন্দের ও দুঃখের দিন।

১২৬১ সালের ১৫ অগাস্ট গ্রিকরা ল্যাটিনদের হাত থেকে অষ্টম মাইকেলের নেতৃত্বে কনস্ট্যান্টিনোপল উদ্ধার করে। তার ঠিক দুই শ বছর পর, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ স্বাধীন অংশ ট্রেবিজন্ড ১৪৬১ সালের ১৫ অগাস্ট অটোমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

যে সাম্রাজ্য প্রথম খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তার চুরমার হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়াটা ইউরোপ কোনোভাবেই হজম করতে পারছিল না।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মুসলিমদের হাতে চলে যাওয়াতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল দুই বাণিজ্যিক শক্তি ভেনিস আর জেনোয়ার, বিশেষভাবে ভেনিসের।

আরামসে চার শ বছর ধরে চালানো ব্যবসায় লালবাতি জ্বলার উপক্রম হওয়াতে ভেনিসের মাথা খারাপ হয়ে গেল। রিপাবলিক অফ ভেনিস গত ১১ বছর ধরে সুলতানের সাথে শান্তি বজায় রাখলেও তলে তলে ঠিকই কখনো বাইজান্টাইনদের, কখনো কারামানিদের আর কখনো ড্রাকুলাদের সাহায্য করেছে অটোমানদের বিরুদ্ধে।

ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে পোপকে ব্যবহার করে ভেনিস এর আগেও ক্রুসেড ডাকিয়েছে। ১৪৬৩ সালের শুরুতে তারা আবারও তাই করল। পোপ দ্বিতীয় পিউস ক্রুসেড ডাকলেন অটোমানদের বিরুদ্ধে।

সিদ্ধান্ত হলো, দক্ষিণে পোপের নৌবহর ভেনিশিয়ানদের সাথে মিলে গ্রিকদের সাহায্যে মোরিয়ান পেনিনসুলা জয় করে নেবে। ঠিক একই সাথে উত্তরদিক থেকে অটোমানদের ওপর আঘাত হানবে হাঙ্গেরির সম্রাট ম্যাথিয়াস করভিনাস।

ওদিকে পূর্বে অটোমানদের জন্য ওঁৎ পেতে আছে পুরোনো শত্রু কারামানিরা, সেই সাথে নতুন শত্রু আক কয়ুনলু।

১৪৬৩ সালের বসন্তে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ খবর পেলেন বসনিয়ার রাজা থমাস হাঙ্গেরির পরামর্শে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ফলে তিনি একটা অভিযান চালিয়ে বসনিয়া জয় করে নিলেন। এজন্য তাকে কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। বসনিয়ানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এর পেছনে বড় ভূমিকা ছিল বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর চালানো চার্চের অকথ্য শোষণের।[১]

১৪৬৩ সালের শরতে খেলার হিসেব নিকেশ বদলে যায়। উত্তরে হাঙ্গেরি আর দক্ষিণে ভেনিস যৌথ অভিযান শুরু করে।

ছয় মাসের মধ্যে মোরিয়ান উপকূল তুর্কিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভেনিস তার নৌশক্তির জানান দেয়। ওদিকে শীতের ঠিক আগে ম্যাথিয়াস করভিনাস বসনিয়া দখল করে ফেলেন।

১৪৬৩ সালের ২০ অক্টোবর দুঃসাহসী এক অভিযান চালিয়ে ওমর বে পুনরায় মোরিয়ার উপকূল উদ্ধার করলেন। কিন্তু তাতে বেশি দিন কাজ হলো না। ভেনিসের ফায়ার পাওয়ারের সামনে অটোমান নৌবাহিনীর অবস্থা কেরোসিন হয়ে যেতে লাগল।

সুলতান গোল্ডেন হর্নে নতুন এক জাহাজখানা আর দার্দানেলিসের দুই পাড়ে দুই দুর্গ নির্মাণের আদেশ দিলেন। এর ফলে ভেনিসের পক্ষে ব্ল্যাক সি হয়ে সিল্করোডে ঢাকা অসম্ভব হয়ে গেল।

যুদ্ধের মোড় ঘুরতে শুরু করল যখন উজিরে আযম মাহমুদ পাশা সুলতানের আদেশে বিশাল এক বহর নিয়ে এসে মোরিয়াতে নামলেন। শক্তির ভারসাম্য ঝুঁকে গেল অটোমানদের দিকে।

১৪৬৪ সালে ১৫ আগস্ট পোপ পিউস মারা গেলে অর্থ সংকটে পড়ল ভেনিসের বাহিনী।

এসব কিছুর মধ্যেই হাঙ্গেরির হাত থেকে আবারও বসনিয়া ছিনিয়ে নেন সুলতান। তারপর তিনি নজর দিলেন আলবেনিয়ার দিকে। কিন্তু আলবেনিয়াতে একাই এক শ হয়ে দাঁড়ালেন ইসকান্দার বেগ। তার দুর্দান্ত গেরিলা ট্যাকটিক্সের জন্য আলবেনিয়ার পশ্চিম অংশ পরপর দু বছর সুলতানের হাত থেকে বাঁচল।

ওদিকে পূর্বে চলছিল আরেক বিবাদ।

১৪৬৪ সালে ইবরাহিম বের মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে কারামানের সিংহাসন নিয়ে লড়াইতে নামে। উজুন হাসান সমর্থন দেন ইসহাককে, মুহাম্মাদের সমর্থন পেলেন পীর আহমেদ।

---

১. Mitja Velikonja. Religious Separation and Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina. transl. Rang'ichi Ng'inga. (Texas A&M University Press. 2003). 35.

যুদ্ধে জেতার পর আহমেদ তা বেমালুম ভুলে গেলেন। ফলে মুহাম্মাদ ক্ষিপ্ত হয়ে এক অভিযানে ১৪৬৬ সালে অটোমানদের পৌনে দুই শ বছরের পুরোনো শত্রু কারামানদের তাড়িয়ে কারামান জয় করে নেন।

যুদ্ধ দিনকে দিন জটিল হতে থাকে।

ভেনেশিয়ানরা শুরু করে সুলতানকে বিষ দেয়া। বিশ বছর সময়ের ভেতর তারা সুলতানকে ১৬ বার বিষ দেয়।[১] ইয়াকুব পাশা নামে এক ইহুদি চিকিৎসক অন্তত চারবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে সুলতানকে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু এজিয়ান সাগরের বস কে হবে সেই ফয়সালা ১৪৬৭ সাল নাগাদ অমীমাংসিতই থেকে যায়।

১৪৬৩-১৪৬৭ এই সময়ে সুলতানের মূল সাফল্য দুটি।

এক. বসনিয়া জয় করা।

দুই. চিরশত্রু কারামানকে চুরমার করে দেয়া।

কিন্তু আলবেনিয়ার ব্যাপারটা ছিল একদমই আলাদা। আলবেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে তখন ঘাটি গেড়েছিলেন ইতিহাসের সেরা গেরিলা যোদ্ধাদের একজন।

দুই

লম্বা একহারা শক্ত গড়নের লোকটার চোখ দুটো একটু অন্যরকম। কেমন যেন জ্বলজ্বল করে।

চওড়া কাঁধ, বিশাল বুক, প্রশস্ত কপালে চুল কিছুটা কম, উঁচু নাক আর লম্বা ঘাড়ের এই লোকটা ক্রুইয়া দুর্গে প্রবেশ করেছে একটু আগে। সাথে তিন শ অশ্বারোহী, হাতে একটা চিঠি।

চিঠির লেখক সুলতান মুরাদ।

ক্রুইয়া দুর্গের গভর্নরের পদ ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে চিঠিতে। দুর্গের নতুন গভর্নর হিসেবে এই লম্বা লোকটাকে পাঠানো হয়েছে।

নেতার আনুগত্য করা ইসলামে ফরজ, যতক্ষণ সে ন্যায়ের ওপর থাকে। অধোবদনে তাই দুর্গের গভর্নর নিজের সীলমোহর ছেড়ে দিলেন নতুন গভর্নরের কাছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিজের তল্পিতল্পা গুছিয়ে রওনা হলেন সেমেন্দিরের দিকে। তাকে পাঁচ শ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে বলা হয়েছে আগামী সাত দিনে, কাজটা খুবই কঠিন।

দুর্গ থেকে বের হবার সময় তিনি একবারও ভাবলেন না সুলতানের চিঠিটা জাল করাও হতে পারে।

---

১. http://www.worldhistoria.com/the-top-100-generals-of-history_topic124028.html

লম্বা লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রুইয়া দুর্গের দখল বুঝে নিলেন।

পরদিন ভোরে দেখা গেল দুর্গের সামনে জমা হয়েছে ৮ হাজার অশ্বারোহী। দুর্গের মাথা থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে হিলালী নিশান। তার বদলে উড়ছে ক্রসের দুপাশে ডানা মেলা দুই মাথাওয়ালা এক ঈগলের পতাকা। সেদিন থেকে ক্রুইয়ার নাম হয়ে গেল ঈগলের বাসা।

সময়টা ১৪৪৪ সাল, লম্বা লোকটার নাম জর্জ ক্যাস্ট্রিওতি ইস্কান্দার বেগ। তাকে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা ৫০ জন জেনারেলের একজন বলা হয়।

তিন

শান্তিকালীন অবস্থায় যুদ্ধকালীন কঠোরতা ছাড়তে না পারলে তার ফলাফল হিসেবে বিদ্রোহ আসেই।

সুলতান মুরাদ এই ভুলটাই করেছিলেন আলবেনিয়ান কাউন্টদের সামলাতে গিয়ে। মুরাদের ভয়ে যেসব আলবেনিয়ান কাউন্টরা তাদের সন্তানদের অ্যাড্রিয়ানোপলে পাঠান তাদেরই একজন ছিলেন ইসকান্দার বেগের বাবা। এদের অনেকেই তখন ইসলামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত।

ইসকান্দারের বাবা ইসকান্দারসহ তার চার ছেলেকে সুলতানের দরবারে যখন পাঠান তখন ইসকান্দারের বয়স ১৮, বাকিদেরও তার কাছাকাছি।

এদের প্রত্যেককে জানিসারি বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। ইসকান্দার শুধু তার ভাইদের ভেতরেই সেরা ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার সময়ে পুরো এন্দেরুনেই সেরা। নিজেকে একটু একটু করে ওপরে তুলে নিয়ে গেছেন, তারপর এক সময় পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর কমান্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অটোমান সেনাবাহিনীতে।[৩] একই সাথে যোগাযোগ রেখেছেন পোপ ও আলবেনিয়ান লর্ডদের সাথেও।

১৪৫০ সালে সুলতান মুরাদ ইস্কান্দার বেগকে দমন করতে এক লাখ সৈন্য নিয়ে ক্রুইয়া অবরোধ করেন।

ক্রুইয়া দুর্গটা আলাদাভাবে কোনো ভবন ছিল না। এটা আসলে ছিল ইটালিয়ান আল্পস পর্বতমালার এক্সটেন্ডেড একটা অংশের গা খুঁদে তৈরি করা এক স্থাপনা।

এই দুর্গ তাই কামান দেগে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। এর দেয়ালের নিচে মাইন পোতাও সম্ভব ছিল না। কারণ, এর দেয়াল বলে আলাদা কিছু নেই, পুরোটাই পর্বত।

মুরাদের এক লাখ সৈনিকের বিপরীতে ইসকান্দার বেগের হাতে ছিল মাত্র আঠারো হাজার সৈন্য, যার প্রায় পুরোটাই লাইট ক্যাভালরি। আর এ অবস্থায় তিনি সেটাই

---

৩. Francione, Gennaro (2003). Skenderbeu: Një hero modern (in Albanian). Shtëpia botuese "Naim Frashëri". ISBN 978-99927-38-75-7.p.15

করলেন, যা তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল। 'হিট অ্যান্ড রান ট্যাকটিক্স' আর 'স্কর্চড আর্থ ট্যাকটিক্স'-এর মিশেলে গেরিলা ওয়ারফেয়ার।

দুর্গের ভেতরে চার হাজার সৈন্য রেখে বাকিদের নিয়ে তিনি পর্বতের গভীরে লুকালেন। তারপর সুযোগ বুঝে একের পর এক গেরিলা হামলা চালাতে লাগলেন অটোমানদের ওপর।

কখনো তিনি তিরানার পাশ থেকে অটোমানদের ওপর হামলা করতেন। অটোমানরা তাকে ধরতে গেলে জঙ্গলে পালিয়ে যেতেন তিনি। আবার কখনো তিনি দুর্গের পেছন দিক থেকে হামলা করতেন অটোমান গ্যারিসনের ওপর। মুহূর্তে হামলা করে মুহূর্তেই উধাও, মাঝখানে পড়ে থাকত কিছু লাশ।

তার পিছু নিতে গিয়ে পর্বতের গিরিপথে তার বাহিনীর পাতা অ্যামবুশে কয়েকবার কচুকাটা হয় অসংখ্য অটোমান সৈনিক। ছয় মাসে প্রায় বিশ হাজার অটোমান নিহত হয় তার বাহিনীর হাতে। অক্টোবরের শেষ দিকে তিনি যে ফাইনাল অ্যাসল্ট করেন তা ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য।[৪]
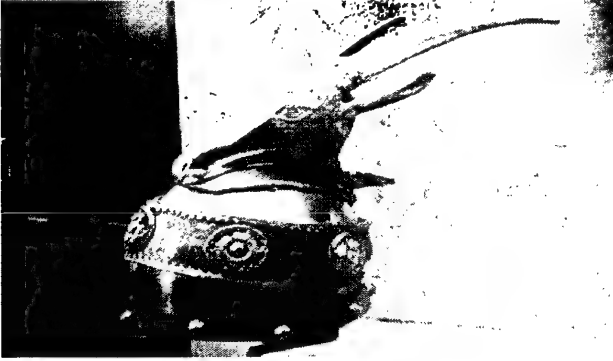
ইসকান্দার বেগের শিরস্ত্রাণ।

একপাল পাহাড়ী ছাগলের পিঠে উঁচু মোমবাতি বেঁধে দিয়ে সেগুলোকে গভীর রাতে ক্যাম্পের বাইরের দিকে ছেড়ে দেয়া হয়। অটোমানরা দ্রুত সেগুলোর দিকে মার্চ করলে। তিনি ঠিক তার উল্টো দিক থেকে অটোমান ক্যাম্পে তার দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে ঢুকে ক্যাম্প তছনছ করে আগুন জ্বালিয়ে দেন।[৫]

সেবারে খালি হাতে ক্রুইয়া থেকে ফিরতে বাধ্য হলেন সুলতান মুরাদ।

---

৪. Jacques, Edwin. Shqiptarët: Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme. Trans. Edi Seferi. Tirana: Mcfarland, 1995. ISBN 0-89950-932-0,p.207

৫. Francione, Gennaro (2006) [2003]. Aliaj, Donika, ed. Skënderbeu, një hero modern : (Hero multimedial) [Skanderbeg, a modern hero (Hero multimedia)] (in Albanian). Translated by Tasim Aliaj. Tiranë, Albania: Shtëpia botuese "Naim Frashëri". ISBN 99927-38-75-8,p.90

চার

সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ তার রাজত্বের প্রথম আট বছর ইসকান্দার বেগের দিকে নজর দেবার সুযোগ পাননি। এই সুযোগে ইসকান্দার বেগ নিজের বাহিনীকে সুসংগঠিত করে তোলেন।

১৪৬৬ সালে সুলতান বলবন পাশাকে ক্রুইয়া অবরোধ করতে ৩০ হাজার যোদ্ধাসহ পাঠান। তিনি কোনোভাবেই দুর্গ জয় করতে পারলেন না। উল্টো ইসকান্দার বেগের গেরিলা হামলাতে তার তিরিশ হাজারের সাত হাজারই নিহত হয়, মারা যায় অন্তত এক ডজন তুর্কি জেনারেল।

এই খবর শুনে সুলতান নির্দেশ দেন এলবাসান নামের এক দুর্গ তৈরির, যা ক্রুইয়াকে আলবেনিয়ার বাকি অংশ থেকে আলাদা করে দেবে।

পরের বছর, ১৪৬৭ সালে সুলতান নিজে মোট সত্তর হাজার যোদ্ধা নিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ক্রুইয়াকে সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং চার মাস ধরে অবরোধ করে রাখেন।

কিন্তু শীত আসতেই ইসকান্দার বেগের তীব্র গেরিলা হামলা শুরু হয়। তারা রাতে হামলা করতেন, যাতে অন্ধকারে সহজে গা ঢাকা দেয়া যায়।

শীত এসে পড়ার পর উপায়ান্তর না দেখে অবরোধ উঠিয়ে ইসলামবুলে ফিরে যান সুলতান।

বিপুল সাহস আর ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিলেন ইসকান্দার বেগ।

গোটা ইউরোপে এই কিংবদন্তীকে আজও একনামে স্মরণ করা হয় চ্যাম্পিয়ন অফ ক্রিশ্চিয়ানডোম হিসেবে যিনি নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন অন্তত তিন হাজার তুর্কিকে।[৬]

এই মহাবীরের মৃত্যু হয় ১৪৬৮ সালে, ম্যালেরিয়া জ্বরে।[৭]

ক্রুইয়া আর স্খোদরের ডিফেন্স সিস্টেম তিনি এতটাই উন্নত করেছিলেন যে, তার মৃত্যুর পরেও সেগুলো অটোমানদের বিরুদ্ধে টিকে ছিল দশ বছর।

---

৬. Cohen, Richard (2003). By the Sword: A History of Gladiators, Musketeers, Samurai, Swashbucklers, and Olympic Champions. Random House, Inc., ISBN 978-0-8129-6966-5.p.151

৭. Noli, Fan S. (1947). George Castrioti Scanderbeg (1405–1468). International Universities Press. OCLC 732882.p.38

মরণপণ লড়াই

এক

ইউরোপে যখন অটোমানদের সাথে ভেনিস-হাঙ্গেরি আর পোপতন্ত্রের জোটের যুদ্ধ চলছিল, তখন পূর্বে শুরু হয়েছিল আরেক বিবাদ। এই বিবাদ ছিল পশ্চিমের যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি জটিল।

সেলজুকদের পতনের পর আনাতোলিয়ায় সেলজুক সালতানাত-ই রুমের উত্তরাধিকার নিয়ে সেই সুলতান মুরাদ আউয়ালের সময় থেকে অটোমানদের সাথে কারামানিদের লড়াই চলছিল। এই লড়াইকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে এসেছিলেন সুলতান বায়েজিদ ইয়িলদিরিম, কিন্তু কারামানের পরাজিত বে পালিয়ে গিয়ে আমির তাইমুরের দরবারে আশ্রয় নিলে খেলার ছক পালটে যায়। পরবর্তী সময়ে তাইমুরের কাছে বায়েজিদ পরাজিত হবার পর অটোমানদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে যায়। এই ধাক্কা সামলে উঠতে তাদের প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল।

সুলতান মুরাদ সানির সময়ে অটোমানরা ফের কারামান আক্রমণ করে। সেবার কারামানের বে মামলুক সুলতানের দরবারে আশ্রয় নেন। তখনো অটোমানরা মামলুকদের নিজেদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার বলে মনে করত। তাই কারামান সেবারের মতো বেঁচে যায়। কিন্তু সুযোগ বুঝে অটোমানদের শত্রুদের সাথে হাত মেলাতে কারামান কখনোই দ্বিধা করেনি। সেলজুকদের রাজধানী কোনইয়া ছিল তাদের দখলে, তাই অটোমানরা আনাতোলিয়ার একচ্ছত্র নেতৃত্বের দখলও পাচ্ছিল না।

সুলতানের আদেশে জেদিক আহমেদ পাশা ১৪৬৬ সালে অটোমানদের পৌনে দুই শ বছরের পুরোনো শত্রু কারামানিদের তাড়িয়ে কারামান জয় করে নেন।[১]

কারামান আনাতোলিয়ার প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, আর আক কয়ুনলু আমিরাত ছিল উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়ায়। কারামান অটোমানদের হাতে এসে পড়ায় একদিকে অটোমানদের পূর্ব সীমান্তের প্রতিবেশী হলো আক কয়ুনলু। অন্যদিকে, দক্ষিণে অটোমানদের সীমান্ত চলে গেল সিরিয়ার মামলুক সালতানাতের কাছাকাছি।

এখানে এসে সমস্যাটা আর আঞ্চলিক রইল না। এই সমস্যা থেকে শুরু হলো খিলাফত নিয়ে এক সুদীর্ঘ লড়াই।
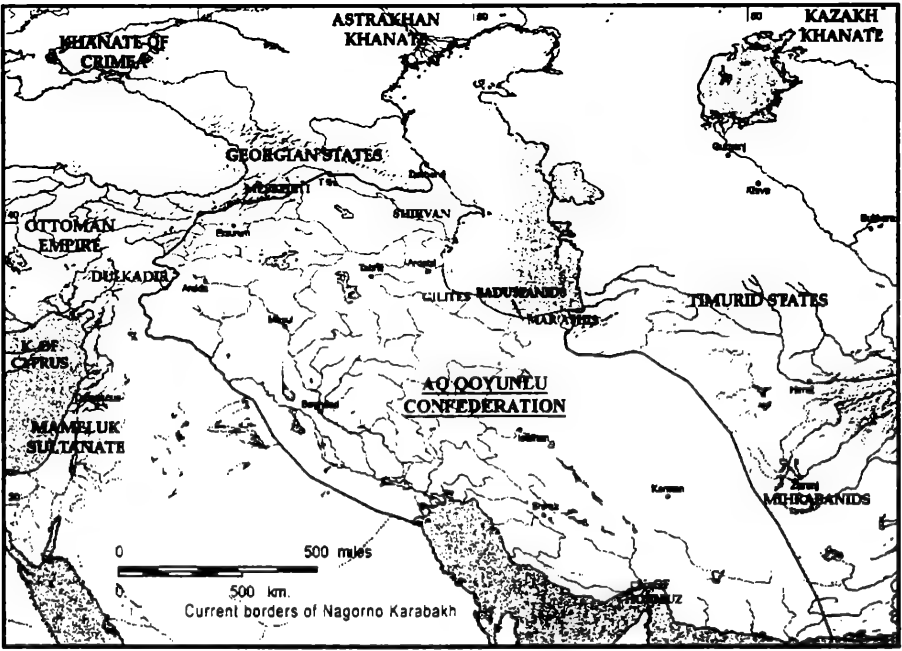
১৪৭০ সালে আক কয়ুনলু সালতানাত মধ্যপ্রাচ্যের এক বিশাল অংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

দুই

উজুন হাসান ১৪৬৬ সালে মুহাম্মাদ আল ফাতিহর সাথে লড়াই করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। পূর্বে তার ঘাড়ের ওপরেই হাজির ছিল চিরশত্রু কারা কয়ুনলু আমিরাত, তাদের দখলে ছিল পুরো ইরাক আর আজারবাইজানসহ ককেশাসের বড় একটা অংশ। ইরানের একটা বিশাল এলাকা ছিল কারা কয়ুনলুদের প্রভাব বলয়ে।[২]

তাইমুরি সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর ধীরে ধীরে ইরাক, ইরান ও ককেশাসে কারা কয়ুনলু, আক কয়ুনলু এই দুটি আমিরাত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আদিতে এরা ছিল দুটি তুর্কমান গোত্র। আক কয়ুনলু মানে সাদা ভেড়া, কারা কয়ুনলু মানে কালো ভেড়া।

১৪৬৯ সালে পূর্ব আনাতলিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে চাপচুরমাকের যুদ্ধে কারা কয়ুনলুর সুলতান জাহান শাহ আক কয়ুনলুর খান উজুন হাসানের হাতে পরাজিত হলে সমগ্র ইরাক ও ককেশাস উজুন হাসানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এরপর উজুন হাসান পূর্বে এগিয়ে গিয়ে তাবরিজ অধিকার করে তাবরিজকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করলেন। সেই সাথে তিনি ঘোষণা করলেন, যেহেতু আব্বাসিয়া খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ তার দখলে এসে গেছে, তাই তারই মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়া উচিত।[৩]

Encyclopædia Britannica. "Kara Koyunlu" Online Edition. 2007

৩. প্রাগুক্ত(১)

এই ঘোষণা শুনে ঘাবড়ে গেল মামলুকরা। কারণ, আব্বাসিয়া খলিফা ছিলেন মামলুকদের কাছে আশ্রিত। খলিফাকে আশ্রয় দেয়া এবং হজের ব্যবস্থাপনা তাদের কাছে থাকায় তারা গোটা ইসলামি জাহানের নেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এবার তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল।

ওদিকে মুহাম্মাদ আল ফাতিহর কাছেও ছিল খলিফা হবার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ। তার যুক্তি ছিল, মামলুকরা যখন ক্রুসেডার আর মোঙ্গলদের সাথে লড়েছিল তখন ইসলামি দুনিয়ার নেতৃত্ব তাদের হাতে থাকাটাই ছিল যৌক্তিক, কিন্তু বিগত প্রায় এক শতাব্দী ধরে ক্রুসেডের পুরো লড়াইটা অটোমানরা একাকীই লড়ে যাচ্ছে। তাই ইসলামি জাহানের নেতৃত্বের হক তাদেরও আছে।

এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায় কুরআনের আয়াত–

> 'তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম-সাধনা করেছে আল্লাহর পথে?'

এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না। আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী–

> 'যারা ইমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও ধন-প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম।' আত তওবা : ১৯-২২

কে হবে ইসলামি জাহানের নেতা, তা নিয়ে উজুন হাসান ও মুহাম্মাদ আল ফাতিহর দাবির মুখে শুরু হতে থাকে নতুন স্নায়ুযুদ্ধ। কারামানের পীর আহমেদ এসময় উজুন হাসানের কাছে আশ্রয় নিলে মুহাম্মাদ আল ফাতিহর সাথে উজুন হাসানের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য।

তিন

শাহানশাহ-ই ইরান, পাদিশাহ-ই ফার্স, সুলতান আস সালাতিন, খাকান-ই তুর্কমান, খান-ই আগ কোয়ুনলু উজুন হাসানের দূত এসেছে ইসলামবুলে।

পূর্ব আনাতোলিয়া, কুর্দিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, কারাবাগ, মেসোপটেমিয়া, সমগ্র ইরান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি উজুন হাসান অটোমান সালতানাতের সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর কাছে কর দাবি করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, ট্রেবিজন্ড ও কারামান দখলের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে যদি এক লাখ দিনার না পাঠানো হয় এবং বার্ষিক পঁচিশ হাজার দিনার কর না দেয়া হয় তবে তিনি

তার বাহিনী নিয়ে এসে সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। বসফরাসের এপার থেকে অটোমানদের নাম নিশানা মুছে দেয়া হবে।[৪]

সুলতানের চেহারায় ক্রোধের বদলে একটা মুচকি হাসি ফুটে ওঠল।

তিনি বিনীত কণ্ঠে দূতকে জানালেন, তোমাদের খানকে বলো, এ বছর আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নেই। এত অর্থ যোগাড় করে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আগামী বছর তোমাদের যা প্রয়োজন তা আমি তোমাদের নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।[৫]

মুহাম্মাদ এখন আর সেই কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ী একুশ বছরের তরুণ অথবা নাইটদের সামনে একাই রুখে দাঁড়ানো চব্বিশ বছরের বেপরোয়া যুবক নন।

তার বয়স চল্লিশ। সময় গড়িয়ে গেছে একটু একটু করে, নদীর স্রোতের মতোই।

তিনি জানেন, উজুন হাসানের ক্ষমতা কত বেশি।

মুহাম্মাদের মনে পড়ল ছোটবেলায় পড়া ইতিহাসের কথা, তার পরদাদা বায়োজিদ একবার গোটা আনাতোলিয়া জয় করেছিলেন। তাইমুর তা কেড়ে নেন, পূর্ব আনাতোলিয়া তিনি দান করেন সাদা ভেড়া তুর্কমান উপজাতিকে, এদেরই আক কয়ুনলু বলা হয়।

কারা কয়ুনলুদের সুলতান জাহান শাহকে হারানোর পর উজুন হাসানের নেতৃত্বে এরা ছেয়ে ফেলেছে মধ্যপ্রাচ্যের এক বিরাট অংশ, বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যগুলোর একটার মালিক এখন আক কয়ুনলুর খান।

তার সাথে জোট বেধেছে সুলতানের সবচেয়ে বড় শত্রু ভেনিস। এমনকি পোপের সমর্থনও উজুন হাসানের পক্ষে, কারামানিরা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তার দরবারে। যতদূর জানা গেছে হাঙ্গেরির সম্রাটও তাকে সমর্থন জানিয়েছেন।

তিন বছর হলো উজুন হাসান আজারবাইজানিদের কাছ থেকে তাবরিজ কেড়ে নিয়ে তাবরিজকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেছেন। তার ফরমানে যেকোনো সময় হাজির হতে পারে লাখের বেশি সৈন্য, যুদ্ধের ময়দানে দুই লাখের বেশি সৈন্য হাজির করার ক্ষমতা আছে এই সুলতানের।

মুহাম্মাদ গত সাত বছরে তার বেশিরভাগ সম্পদ ব্যয় করেছেন নিজের নৌবহরের পেছনে। তার বেশিরভাগ সৈন্য এখন আলবেনিয়া আর হাঙ্গেরি সীমান্তে ব্যস্ত।

বয়সের সাথে সাথে মানুষ স্থির হয় তিনি জানেন, বেপরোয়া আচরণ এখন তাকে মানায় না।

---

৪. Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time, edited by William C. Hickman and translated by Ralph Manheim (Princeton: University Press, 1978), pp. 19

৫. Doukas 45.10; translated by Harry J. Magoulias, Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks (Detroit: Wayne State University, 1975), p. 257

চার

পুরো সেনাবাহিনীর চার ভাগের তিন ভাগকে সুকৌশলে বসফরাসের এপারে নিয়ে আসা হয়েছে গত তিন মাসে।

পাহাড়ী অঞ্চলে লড়াই করার বিশেষ মহড়া চলছে বারবার।

দুই শাহজাদা ভালোই বড় হয়েছে। বড় শাহজাদা বায়েজিদের বয়স এখন ২৪, মুস্তাফার বয়স ২২। বায়েজিদ ধীরস্থির প্রকৃতির, মুস্তাফা আগুনের গোলা।

শাহজাদাদের উঁচু পর্বতের ওপর লড়াই শেখানোর জন্য জেদিক আহমেদ পাশা দিনরাত পরিশ্রম করছেন। এরই মধ্যে দুঃসংবাদটা এল।

উজুন হাসানের বাহিনী গোটা পূর্ব আনাতোলিয়া লুট করে কারামানে প্রবেশ করেছে। আনাতোলিয়ার বেইলার্বি দাউদ পাশা উজুন হাসানের সামনে টিকে থাকতে না পেরে আনকারা থেকে পিছু হটে কোনিয়াতে চলে এসেছেন।

উজুন হাসান বলেছেন, তিনি ইসলামবুল লুট করে নিয়ে যাবেন।

ক্ষোভে ফেটে পড়লেন সুলতান।

গত ছয় মাস তিনি তৈরি হচ্ছিলেন একটু একটু করে, উজুন হাসানের জন্য। তার প্রস্তুতির জন্য আরও মাস খানেক সময় দরকার ছিল।

তুর্কমান যোদ্ধা চলে এসেছেন সময়ের আগেই। যতটা না নিজের স্বার্থ তিনি পূরণ করছেন। তার চেয়েও বেশি লাভ করে দিচ্ছেন হাঙ্গেরি আর ভেনিসকে।

সাত দিনের মধ্যে সুলতান মার্মারা সি, দার্দানেলিস, বসফরাস, ব্ল্যাক সি, দানিয়ুব নদীতে নৌবাহিনীর অবস্থান জোরদার করলেন। ভেনিসকে এই যুদ্ধের সুযোগ নিতে দেয়া যাবে না।

বুলগেরিয়ার নিকোপলিস, সোফিয়া আর সার্বিয়ার সেমেন্দিরে স্ট্যাটেজিক পজিশনে সৈন্য রেখে বাকিদের নিয়ে তিনি ইসলামবুল থেকে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় পা রাখলেন।

পাঁচ

শাইখুল ইসলাম জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

প্রতিটি শহরে যুবকরা তৈরি হচ্ছে উজুন হাসানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য।

সুলতান জানেন, এই লড়াইটা হবে তাইমুরের সাথে বায়েজিদের সেই যুদ্ধের মতোই ভয়ংকর। এই যুদ্ধে হারলে অটোমান সালতানাতকে মুছে দেয়া হবে এশিয়া থেকে। ইউরোপে একজোট হয়ে ভেনিস-হাঙ্গেরি আর মলদাভিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বে বলকান মুসলিমদের ওপর।

কঠিন এই মুহূর্তে তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রাদুকে ডাকলেন। ড্রাকুলার ছোট ভাই রাদু যখন আগস্টের শুরুতে সুলতানের সাথে মিলিত হলেন, শৈশবের বন্ধুর সান্নিধ্য তাকে দিল নতুন সাহস।

১১ আগস্ট, ১৪৭৩ সাল। সকালবেলা দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল আরজিনজানের এক পার্বত্য উপত্যকায়।

অটোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা এক লাখ আশি হাজার। কামান আছে চার শ।

আক কয়ুনলুদের তাঁবু ছেয়ে ফেলেছে পুরো দিগন্ত। সংখ্যায় তারা আড়াই লাখেরও বেশি। গোটা তুর্কমান-ইরান-আফগানের শক্তি এক করে নিয়ে এসেছেন উজুন হাসান।*

ছয়

সকাল আটটা।

১১ আগস্ট ১৪৭৩।

উজুন হাসান কুলকারচেলি পর্বতকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার পানির কূপগুলো কব্জা করে নিয়েছেন।

তার আড়াই লাখ সৈন্যের সবাই ঘোড়সওয়ার। বাহিনীর পুরো সেন্টারটা হেভি ক্যাভালরিদের নিয়ে তৈরি। এদের একদম মাঝখানে অবস্থান নিয়েছেন উজুন হাসান।

বাহিনীর অগ্রভাগে উগুরলু মুহাম্মাদ, তার নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার সওয়ার। ডানে জয়নাল আবেদিন, পঞ্চাশ হাজার ঘোড়সওয়ার তার কমান্ডে। বাঁয়ে কাসিম বের অধীনে ত্রিশ হাজার সওয়ার। এই তিন বাহিনীর পেছনে উজুন হাসান, তার সাথে আছে চল্লিশ হাজার হেভি ক্যাভালরি, এদের অনেকেই বন্দুকে সজ্জিত।

বাহিনীর পেছনে আছে রিজার্ভ ফোর্স, তাদের সংখ্যা এক লাখের কাছাকাছি।

মুহাম্মাদের সেনাবাহিনী উপত্যকার ঢালু দিকটাতে দাঁড়িয়ে আছে।

বাহিনীর অগ্রভাগে বাইজান্টাইন বংশেরই এক সন্তান। কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের পর কাপিকুলু বাহিনীতে আসা খাস মুরাদ পাশা। তার অধীনে দশ হাজার তিমারি সিপাহী। তার দুপাশে চার আকিনজি বের নেতৃত্বে মোট ত্রিশ হাজার আকিনজি লাইট ক্যাভালরি।

* উইকিসহ ইন্টারনেটে থাকা বেশিরভাগ সাইটে এই যুদ্ধে উভয় বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৮৫,০০০-১,১০,০০০ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ট্রেবিজন্ড অভিযানে অটোমানরা প্রায় দেড় লাখ সৈন্য নিয়ে আসে, উজুন হাসানের মোকাবিলায় তারা এক লাখের কম সৈন্য আনবে তা বিশ্বাসযোগ্য না। এ ছাড়া ভেনিসের সাথে সাময়িক যুদ্ধবিরতি থাকায় মুহাম্মাদ তার বাহিনীর একটা বড় অংশকে এ যুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। ফোরাত থেকে সিন্ধু পর্যন্ত ভূখণ্ডের মালিক উজুন হাসান এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে নিউমেরিক্যাল সুপিরিয়রিটি ছাড়া লড়াইয়ে নামবেন সেটাও অলীক কল্পনা।

ডানে বায়েজিদের বিশ হাজার আনাতোলিয়ান সিপাহী। বাঁয়ে মুস্তাফার অধীনে বিশ হাজার রুমেলিয়ান সিপাহী।

ফরমেশনের ঠিক সেন্টারে আছে সুইডিশ প্রযুক্তিতে তৈরি করা ওয়াগন ফোর্ট্রেস আরাবা। আরাবার ভেতরে 'তাঁবুর জঙ্গি' ফরমেশনে দশ হাজার জানিসারির নেতৃত্বে আছেন রাদু বে। তার ঠিক পেছনেই সুইসাইড মিশন সারভাইভ করে আসা চার হাজার সিলাহদার পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ। আরাবার পেছনে আছেন জেদিক আহমাদ পাশা, আট হাজার কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি নিয়ে।

এদের পেছনে রিজার্ভ আর্মির নেতৃত্বে মাহমুদ পাশা আর দাউদ পাশা, চল্লিশ হাজার আজব তাদের অধীনে। পেছনের ডান দিকে লুকিয়ে আছে আকিনজি লাইট ক্যাভালরি বাহিনীর আরেকটা অংশ।
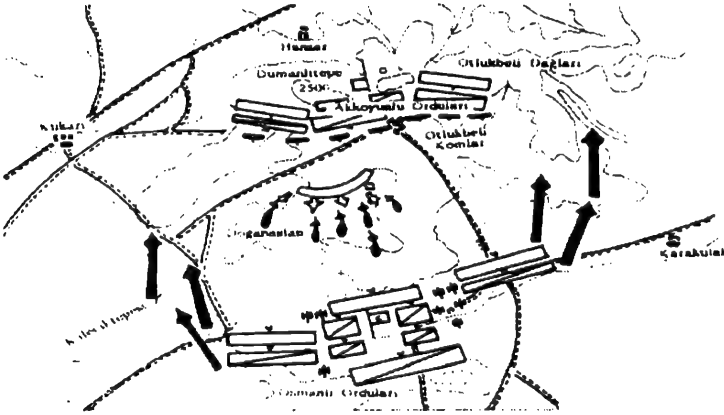
ট্যাকটিক্যাল ম্যাপঃ ওটলুকবেলির যুদ্ধ। ম্যাপের দক্ষিণে
উসমানী বাহিনী, উত্তরে আক কয়ুনলু বাহিনীর অবস্থান দেখা।

যুদ্ধ শুরু হলো। উজুন হাসানের বড় ছেলে উগুরলু মুহাম্মাদ দুর্দান্ত দাপটে তার সওয়ারদের নিয়ে অটোমানদের ওপর ঝড় তুললেন। এক ঘন্টার মধ্যেই অটোমান বাহিনীর ডান বাহুতে চিড় ধরল। তুর্কমেন লাইট ক্যাভালরি দমকা হাওয়ার মতো একবার আছড়ে পড়ত, ঠিক পরমুহূর্তেই পিছু হটত। বায়েজিদ তার বাহিনী নিয়ে তুর্কমেনদের পিছু ধাওয়া করতেই তাদের ছোঁড়া তীরের ঝাঁক তার বাহিনীকে ছেঁকে ধরল। প্রচুর সৈন্য হারিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন শাহজাদা। ফ্ল্যাংকিংয়ের সুযোগ পেয়ে কাসিম বে সেন্টারে চাপ বাড়াল। কিন্তু খাস মুরাদ পাশার বীরত্বের কারণে তার বেশি দূর আগানো সম্ভব হয়নি।

ওদিকে মুস্তাফা রুমেলিয়ান ক্যাভালরি নিয়ে ঠেকিয়ে রাখছিলেন জয়নাল আবেদিনের বাহিনীকে।

খাস মুরাদ পাশা সংখ্যায় কম হয়েও সমানে সমান লড়ছিলেন উগুরলু মুহাম্মাদের সাথে। কিন্তু আক কয়ুনলুদের লাইট ক্যাভালরির দ্রুতগতির পার্থিয়ান শটের সামনে পড়ে তার

সৈন্যরা কাতারে কাতারে মরতে শুরু করল। মধ্য এশীয় স্তেপের যোদ্ধাদের সাথে গতিতে পাল্লা দেয়া আরব বেদুইন ছাড়া অন্য কারও পক্ষেই সম্ভব না।

এরই মধ্যে ময়দানে নেমে এলেন উজুন হাসান নিজে।

এবার বায়েজিদের রাইট উইং একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বীরের মতো লড়েও জীবন দিলেন খাস মুরাদ পাশা ও তার বেশিরভাগ সৈনিক। অটোমানদের সেন্টার ফ্রন্টের ডিফেন্স সিস্টেম একেবারে ভেঙে গেল।

বামে মুস্তাফা শত্রুর সংখ্যা ও গতি কোনোটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। সুলতানের মুখের সামনে চলে এল আক কয়ুনলুর বিশাল বাহিনী।

ক্যাভালরি চার্জের আদেশ দিলেন উজুন হাসান।

প্রায় এক লাখ অশ্বারোহী বর্শা বাগিয়ে একরোখাভাবে ছুটল সুলতান বরাবর।

বন্ধুর বিপদে নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে এগোলেন রাদু বে।

দশ হাজার জানিসারি একসাথে হেকে ওঠল, 'ইয়া আল্লাহ! বিসমিল্লাহ!! আল্লাহু আকবার!!!'

তিন হাজার জানিসারি সামনে এগিয়ে গুলি ছুড়তে শুরু করল। পেছন থেকে বাকি সাত হাজার ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়তে থাকল, গর্জে ওঠল তোপখানার চার শ কামান। এ ছাড়াও আরাবার ওয়াগনগুলোর ভেতর থেকে সমানে ছোঁড়া হচ্ছিল তীর।

ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড়। ক্যাভালরি চার্জের সামনের দিকে থাকা সৈন্যরা কামানের গোলার সামনে পড়ে তছনছ হয়ে গেল। বিকট শব্দে ঘাবড়ে গিয়ে উল্টো দিকে ছুটল অনেক ঘোড়াই। সামনের কাতারের উল্টোদিকে ঘুরে যাওয়া ঘোড়াগুলোর সাথে পেছন থেকে আসা ঘোড়াগুলোর মুখোমুখি সংঘর্ষে পুরো আক কয়ুনলু বাহিনীর ফরমেশন নষ্ট হয়ে গেল। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে যুক্ত হলো অনবরত তীরবৃষ্টি ও গোলাবর্ষণ।

বেলা বারোটার মধ্যেই উজুন হাসানের প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লাশ হয়ে গেল।

বিশৃঙ্খলার সুযোগে বাম বাহু থেকে মুস্তাফা তীরের মতো ঢুকে পড়লেন জয়নাল আবেদিনের ব্যূহ ভেদ করে। মুস্তাফার একার তলোয়ারের আঘাতেই তিরিশ জনেরও বেশি তুর্কমানের প্রাণ গেল।

একটু সময় নিয়ে নিজেকে সামলে সেন্টারে আবারও মানুষের ঢেউ তুলে এগোলেন উজুন হাসান।

এবার বেরিয়ে এলেন স্বয়ং সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ।

সুলতানের কাপিকুলু হেভি ক্যাভালরি আর রাদুর জানিসারি আর্টিলারি-ইনফ্যান্ট্রি মাত্র দুঘণ্টায় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল আক কয়ুনলুর সেন্টারকে। এর মধ্যেই লড়াইয়ে ফিরলেন ডান বাহুর বায়েজিদ। হঠাৎ বাম বাহু থেকে উধাও হলেন মুস্তাফা। পেছন থেকে দাউদ পাশা চলে এলেন একদম সামনে। সুলতান আর রাদু দুইজন দুটো বল্লমের মতো ঘেরাও করে ফেললেন উজুন হাসানকে।

সুলতানের প্রিয় কামান ব্যাসিলিকা আর সুলতানিয়া অগ্নি উদগীরণ করতে লাগল। সাথে যোগ দিল কামানবহরের হাউইৎজারগুলো। ব্যাসিলিকা আর সুলতানিয়ার একেকটা ফায়ারে আধ টন ওজনের গোলা আছড়ে পড়ছিল আক কয়ুনলুদের ওপর, এমন বিভীষিকা তারা কখনো দেখেনি। উজুন হাসানের পার্সোনাল গার্ড বাহিনী অচিরেই ছিন্নভিন্ন মাংসের স্তূপে পরিণত হলো।

এর মধ্যে আক কয়ুনলু শিবিরের ঠিক পেছনে পৌঁছে গেলেন শাহজাদা মুস্তাফা। তারপর তাদের ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বায়েজিদ ডানদিক থেকে পালাবার পথ আটকে দিলেন। তিনদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পতাকা ফেলে পালালেন উজুন হাসান।

আট ঘণ্টার যুদ্ধে চুরমার হয়ে গেল আক কয়ুনলুর গর্ব।[৬]

আরজিনজানের দুমানলিটেপ পর্বতের চূড়ায় বিজয়ীর বেশে আসরের নামাজ আদায় করলেন সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্।

এই যুদ্ধের মাধ্যমে উজুন হাসানের খলিফা হওয়ার স্বপ্নের বারোটা বেজে গেল। সেই সাথে শেষ হলো বাইজু নোইয়ান থেকে তাইমুর হয়ে উজুন হাসান পর্যন্ত প্রায় দুই শ ত্রিশ বছর ধরে পূর্ব আনাতোলিয়াতে টিকে থাকা মোঙ্গল আধিপত্যের উত্তরাধিকার।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনীগুলোর একটাকে পরাজিত করে সত্তর বছর আগে পরদাদার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন মুহাম্মাদ।

ব্যাটল অফ আনকারা আর ব্যাটল অফ ওটলুকবেলি, পঞ্চদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুটো লড়াই হয়েছে মুসলিমদের মধ্যেই।

---

৬. Uyar, M. and Erickson, E.J., 2009. A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. ABC-CLIO, p.86

সন্ন্যাসী জেনারেল

এক

সুলতান নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাত পা নড়ছে না।

তোপকাপির সুলতানি দিওয়ানে দুঃসংবাদ নিয়ে হাজির হয়েছেন কাউন্টেস মারিয়া, রাদু বের স্ত্রী। রাদু বে আর নেই।

মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সেই আচমকা মারা গেছেন এই বীর। রাদুর স্ত্রী সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন স্বামীর শরীর ঠান্ডা, কোনো শ্বাস-প্রশ্বাস নেই।

সবাইকে দরবার থেকে চলে যেতে বললেন মুহাম্মাদ।

তারপর তিনি তোপকাপি প্রাসাদের খাস কামরার বারান্দায় গিয়ে নির্বাক চোখে বসফরাসের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

কত অভিযান, কত খেলা, কত স্মৃতি...উচ্ছল। কৈশোর, রঙিন তারুণ্য আর দুঃসাহসী সেই যৌবনের দিনগুলিতে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলেন রাদু। সুলতানদের কোনো বন্ধু থাকে না, ভাই থাকে না, পুত্র থাকে না, পিতা থাকে না, তাদের থাকে শুধু তলোয়ার। যত দিন তলোয়ার দিয়ে শাসন করার ক্ষমতা থাকে, তত দিন সুলতান টিকে থাকেন। যখন ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, তাকে নেমে যেতে হয়।

এই উত্থান পতনের খেলাতে তিরিশটা বছর তার বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন ওয়ালাসিয়ান প্রিন্স।

সুলতানের জন্য কী করেননি তিনি?

বাইজান্টাইনদের তীর বৃষ্টির ভেতর কনস্ট্যান্টিনোপলের দেয়ালের মধ্যে ঢুকেছেন।

বন্ধুর জীবন বাঁচাতে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নিয়েছেন সেই রাতে, যে রাতে ড্রাকুলার হামলাতে তছনছ হয়ে গিয়েছিল পুরো অটোমান বাহিনী। ব্যাটল অফ ওটলুকবেলিতে জীবন বাজি রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন দুজন।

যুদ্ধের ময়দানে যে বন্ধুত্ব হয় তার চেয়ে খাঁটি বন্ধুত্ব বোধহয় আর নেই। সুলতান ধীরে ধীরে একা হয়ে যাচ্ছেন। উস্তাদ আকা শামসুদ্দিন চলে গেছেন অনেক আগেই। তারপর গেলেন জাগান পাশা। একে একে ওপারে চলে গেছেন ইসহাক পাশা, শাহাবুদ্দিন পাশা, সাইফ পাশারা। আজ বিদায় নিলেন রাদু আল ওয়াসিম।

হয়তো তারও আর খুব বেশি সময় হাতে নেই।

দুই

আবেগ দিয়ে রাজনীতি চলে না।

রাদু বের মৃত্যুর অনেক বছর আগে থেকেই রোমানিয়ার পূর্বে মলদাভিয়াতে নতুন এক শত্রু মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছিল।

স্টিফেন দ্যা গ্রেট নামের এই সন্ন্যাসী রাজা ১৪৬৭ সালের পর অর্ধেকেরও কম সেনা নিয়ে হাঙ্গেরির সম্রাটকে আর ১৪৭১ সালে তিন ভাগের এক ভাগ সেনা নিয়ে পোল্যান্ডের রাজাকে হারিয়ে দিয়ে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সবার চোখ খুলে দিয়েছেন।

তার রাজধানী থেকে সমুদ্রপথে বা স্থলপথে যেদিক থেকেই হোক ইসলামবুল পৌঁছাতে তিন সপ্তাহ সময়ই যথেষ্ট, যেটা সুলতানের জন্য যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ।[১] তার ওপর গত দুই বছর ধরে সে ঠিকমতো খাজনা দিচ্ছে না।

বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাহত মুহাম্মাদ অনেকটাই শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তিনি এই মুহূর্তে কোনো অভিযানে যেতে চাচ্ছেন না।

কিন্তু স্টিফেনকে দমন না করলে সামনে ওয়ালাসিয়া হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। অগত্যা তাই তিনি খাদিম সুলাইমান পাশাকে আলবেনিয়ার স্খোদরে দুর্গের অবরোধ তুলে নিয়ে ওয়ালাসিয়ার দিকে রওনা হতে বললেন।[২]

তাকে চল্লিশ হাজার যোদ্ধা দেয়া হলো। যাবার পথে এরা স্খোদরে থেকে আসা চল্লিশ হাজার এবং বুলগেরিয়া ও ওয়ালাসিয়া থেকে আসা আরও চল্লিশ হাজার যোদ্ধার সাথে মিলিত হবে।

সুলাইমান পাশা গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ রওনা দিলেন, পৌঁছলেন নভেম্বরে। এটা যুদ্ধের মৌসুম না।

গোটা ইউরোপ জুড়ে ঝিরঝির করে তুষার পড়া শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার বাহিনী কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। যত উত্তরে যাওয়া হচ্ছে ঠান্ডা আরও বাড়ছেই।

---

১. Letter to Leonardo Loredano, written on 7 December 1502

২. The Chronicles of the Ottoman Dynasty

স্টিফেনের দেখা নেই। সে তার বাহিনী নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। যাবার আগে মাঠে ময়দানে যেখানে যা ছিল সব ধ্বংস করে গেছে, কোথাও একটা ঘাস পর্যন্ত নেই। পুরো নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাস ভর স্টিফেনকে ট্র্যাক করা হলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না মলদাভিয়া পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা। এসব জায়গাতে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে দিব্বি ছয় মাস কাটিয়ে দেয়া যায় যদি লোকাল সাপ্লাই ভালো থাকে।

জানুয়ারির শুরুতে সুলাইমান পাশা খবর পেলেন, পোডাল্ট ইনাল্ট ব্রিজের ওপারে যে জঙ্গল সেটা পেরিয়ে চার শ ফুট নিচে নামলেই একটা ট্রেইল পাওয়া যাবে। সেটা ধরে এগোলেই স্টিফেনকে পাওয়া যাবে।

নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর বাহিনী নিয়েও কোনো সময় নষ্ট না করে হিমাঙ্কের অনেক নিচে তাপমাত্রায় হাড় কাপানো শীতের ভেতর লড়াইয়ে বেরুলেন পাশা। এত ঠান্ডায় কামান-বন্দুক জমে যায়, বিশেষ করে কামান। তাই কামানগুলো পেছনে রেখেই অটোমান বাহিনী আগাতে লাগল।

জানুয়ারির দশ তারিখ রাতে পোডাল্ট ইনাল্ট ব্রিজ পার হবার সিদ্ধান্ত হলো।

তিন

স্টিফেন গত সাত দিন ধরে ইচ্ছে করেই তার ছয় শ সওয়ারকে ব্রিজের আশেপাশের জলাভূমির দিকটাতে পায়ের ছাপ রেখে আসতে বলছেন।

তিনি একটা ফাঁদ পেতেছেন।

পোডাল্ট ইনাল্ট ব্রিজের চারদিকে জলাভূমি পেরিয়ে খাড়া পর্বত আর সামনে ঘন জঙ্গল, রাস্তা শেষ হয়ে গেছে জঙ্গলে ঢুকে।[৩]
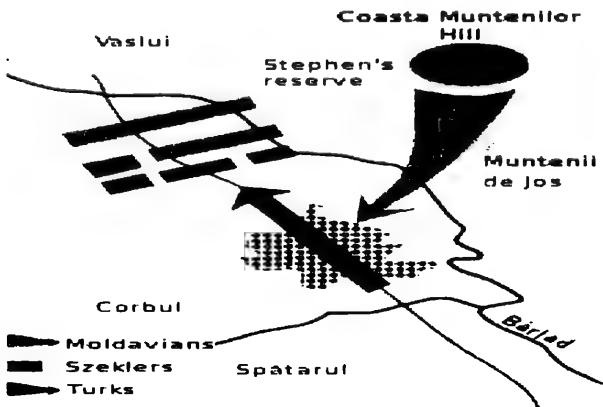
ট্যাকটিক্যাল ম্যাপঃ ব্যাটল অফ পোডাল্ট ইনাল্ট।

---

৩. Istoria lui Ştefan cel Mare. p. 129

তার পরিকল্পনাটা হলো অটোমানরা এই ব্রিজ পার হবার সময়ে তিনি সোজাসুজি সামনে না এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবেন। তার প্রথম রেইড পার্টি ঘন কুয়াশার মধ্যে অটোমানদের ওপর প্রথম ঝটিকা আঘাত হেনে আবার জঙ্গলের ভেতর ঢুকবে, ঠিক এমন সময় দুই পাশ থেকে তার হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যরা অটোমানদের ওপর হামলা চালাবে। সম্ভবত এ সময় ব্রিজটা ভেঙে যাবে। কারণ, তিনি আগেই ব্রিজের তলার কিছু ভারী তক্তা কেটে রেখেছেন।

ব্রিজ ভাঙার পর সামনে আগানো ছাড়া অটোমানদের কোনো পথই থাকবে না।

আর সামনে ঘন জঙ্গল।

এই জঙ্গলের প্রতিটা গাছের ডালপালার খবরও তার লোকজন রাখে। অটোমানরা ভিনদেশি, তারা এখানে দাঁড়াতেই পারবে না।

স্টিফেন যা যা হিসেব করেছিলেন ঠিক তাই হলো।

ব্রিজ পার হবার পর সুলাইমান পাশার পেছন দিক থেকে ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের ড্রাম বেজে ওঠল। এরা ছিল স্টিফেনের সেনাবাহিনীর ড্রামার। কুয়াশার মধ্যে কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু ড্রামের আওয়াজ অনুসরণ করতে পেছনে ফিরলেন পাশা।

হঠাৎ একেবারে শূন্য থেকে এসে স্টিফেনের প্রথম রেইড পার্টি পেছন থেকে তার ওপর আঘাত হানল। আক্রমণের প্রচণ্ডতা এত বেশি ছিল যে, তিনি ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই শহিদ হয়ে গেলেন দুই হাজার যোদ্ধা। এই শক কেটে যাওয়ার আগেই তার দুই ফ্ল্যাঙ্কে একসাথে আঘাত হানল স্টিফেনের আরও দুটি গেরিলা ইউনিট।

জোর কদমে লড়ে সুলাইমান রেইড পার্টিকে তাড়াতে পারলেও হাঙ্গেরিয়ানরা তার বড় ধরনের ক্ষতি করল। দুই ফ্ল্যাঙ্কের লাইনগুলো রীতিমতো চুরমার হয়ে গেছে। এরই মধ্যে জঙ্গলের ভেতর থেকে সাদা পোশাকে বেরিয়ে এল স্টিফেনের মূল বাহিনী।

সামনে পেছনে একসাথে যুদ্ধের দামামা, দুই পাশে হাঙ্গেরিয়ানদের হামলা আর সরাসরি মুখের ওপর কুয়াশার মধ্যে সাদা পোশাকে লুকিয়ে থাকা মূল বাহিনীর হামলায় পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গেল অটোমান সেনাবাহিনী।

ভয় পেয়ে তাড়াহুড়া করে পালাল বিশ হাজার ওয়ালাসিয়ান। অটোমানদের পেছনটা ফাঁকা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ব্রিজ। যেন নরক নেমে এল সুলাইমান পাশার ওপর।

তার এক লাখ বিশ হাজারের চল্লিশ হাজার যুদ্ধের ময়দানেই মারা গেল। তিরিশ হাজার বন্দি হলো, বাকিদের বেশিরভাগই জলাভূমির হিমশীতল কাদাপানিতে জমে মারা গেল।

চার দিন ধরে ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে আসতে আসতে শত্রুর সাথে লড়াই করলেন পাশা[৪]। শেষতক ওয়ালাসিয়া পৌঁছে তারপর তিনি স্টিফেনের হামলা থেকে নিরাপদ একটা আশ্রয় পেলেন।

চারজন পাশা বন্দি হয়েছিলেন এই যুদ্ধে।[৫]

ব্যাটল অফ পোডাল্ট ইনাল্টকে বলা হয় খ্রিষ্টানদের ইতিহাসে ইসলামের বিরুদ্ধে সেরা বিজয়।[৬] স্টিফেনের মাত্র চল্লিশ হাজার সৈনিক এই যুদ্ধে এক লাখ চল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের এক সুবিশাল বাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল।

সারা ইউরোপ এই বিজয়ের খুশিতে সাত দিন ধরে উৎসব করে। কিন্তু স্টিফেন ছিলেন মধ্যযুগের ইউরোপিয়ান রাজ-রাজড়াদের চেয়ে অনেক আলাদা। এই সন্ন্যাসী রাজা চল্লিশ দিন যাবত উপবাস করলেন। তিনি উপবাস ভাঙতেন শুধু রুটি আর পানি দিয়ে।

ওদিকে ইসলামবুলে চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করেন মুহাম্মাদ আল ফাতিহ। হয় বিজয়, নয় শাহাদাতই এবার তার লক্ষ্য। স্টিফেনকে শিক্ষা না দিয়ে তিনি কোনোভাবেই রাজধানীতে ফিরবেন না। আনাতোলিয়া আর রুমেলিতে ফরমান জারি করা হলো, 'জিহাদের জন্য তৈরি হও মুসলিম সিংহের দল।'

---

[৪]. A Documented Chronology of Roumanian History – from prehistoric times to the present day, Oxford 1941, p. 108

[৫]. প্রাগুক্ত(৪)

[৬]. Catholic Encyclopedia

সুলতানের শেষ লড়াই

এক

একটা সালতানাত যতই শক্তিশালী হোক, এক লাখ বিশ হাজার যোদ্ধার সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়া এক বিশাল আঘাত। তার ওপর যদি সেই কাটা ঘায়ে কেউ নুনের ছিটা দেয় এই বলে যে ক্রস হিলালের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে, আট শ বছর ধরে জিততে থাকা একটা জাতির তা কোনোভাবেই হজম হবে না।

কিন্তু তবুও রাতারাতি একটা নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তোলা মুখের কথা না।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহর আরও প্রায় এক লাখ সৈন্য ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে তাদের নিয়ে আসা ছিল কঠিন একটা কাজ।

পশ্চিমে ভেনিস আর আলবেনিয়া, পূর্বে আনাতোলিয়া আর উত্তরে হাঙ্গেরি এই তিন সীমান্তেও নিযুক্ত রাখা লাগত প্রচুর সৈন্য। পূর্ব সীমান্তে উজুন হাসানের তুর্কমেনদের ঠেকাতে প্রয়োজন ছিল প্রচুর সৈন্যের।

সুলতান তাই ১৪৭৬ সালের গ্রীষ্মে যে বাহিনী নিয়ে মলদাভিয়া অভিযানে বের হলেন তার মধ্যে নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

সাত হাজার জানিসারি, পাঁচ হাজার কাপিকুলু, তিন হাজার সিলাহদার, এক হাজার বাশিবাজুক, পাঁচ হাজার তিমারি সিপাহি, সাত হাজার আজব আর আকিনজি। বাকি পঁচিশ হাজারই ছিল তোফরাখ।

তোফরাখরা হলো বিভিন্ন শহর থেকে জিহাদে আসা যুবক। এদের কেউ শুধু ইসলামের জন্য এসেছে, কেউবা এসেছে লুট করতে কেউ আবার এসেছে যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে ঢুকতে।

এই যুদ্ধে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ কোনো জেনারেলকে সাথে নেননি, তিনি একাই পুরো বাহিনী পরিচালনার ভার নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন যাতে পুরোপুরিভাবে নিজের মতো করে যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়।

মলদাভিয়াতে সুলতানের এই তিপ্পান্ন হাজারের বাহিনীর সাথে যোগ দিল ১২ হাজার ওয়ালাসিয়ান যোদ্ধা। সুলতানের এদের ওপর কোনো আস্থাই ছিল না। কারণ, অ্যাটাকিং ফোর্স হিসাবে ওয়ালাসিয়ানরা দুর্দান্ত হলেও শত্রুর কাউন্টার অ্যাটাকে তারাই সাধারণত সবার আগে বাড়ির পথ ধরে।

সুলতান তাই ওয়ালাসিয়ানদের মূল যুদ্ধের বাইরে রেখেই যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

ওদিকে স্টিফেনের হাতে তখন চল্লিশ হাজার সৈনিক। সেই সাথে আছে পাঁচ হাজার হাঙ্গেরিয়ান, পাঁচ হাজার পোলিশ আর কয়েক হাজার লিথুয়ানিয়ান ফাইটার। বেশিরভাগই ইরেগুলার ট্রুপস, তবে গেরিলা যুদ্ধে এরা ঝানু খেলোয়াড়।

স্টিফেন তাই বলটা নিজের কোর্টে রাখার জন্যই গেরিলা ট্যাকটিক্স অনুসরণ করতে চাইলেন। বিভিন্নভাবে সুলতানের স্কাউটদের বিভ্রান্ত করে তাদের ভুল পথে পরিচালিত করলেন। সুলতান মাসখানেক চেষ্টা করেও কোনোভাবেই ধরতে পারলেন না ঠিক কোথায় স্টিফেন দ্যা গ্রেট অবস্থান নিয়েছেন।

ওদিকে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে যেদিকেই যাচ্ছিলেন স্রেফ ছারখার করে দিচ্ছিলেন স্টিফেন। সুলতানের সেনাবাহিনী খাবারের অভাবে মারাত্মকভাবে ভুগতে লাগল। মলদাভিয়া পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা জায়গা। ঘোড়া বা মানুষ কারও জন্যই সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার ছিল না। আর যাও ছিল সব পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত জুলাইয়ের মাঝামাঝি স্টিফেনের পজিশন সুলতানের কাছে ধরা পড়ে গেল। নিজের মূল বাহিনী থেকে দুটো অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তিনি তিনদিক থেকে স্টিফেনকে ঘেরাও দিয়ে আগাতে লাগলেন।

স্টিফেনও সহজ পাত্র ছিলেন না। তিনি তখন পর্যন্ত নিজের গোটা মিলিটারি ক্যারিয়ারে অপরাজিত ছিলেন। হাঙ্গেরির সম্রাট ম্যাথিয়াস করভিনাস, এমনকি ক্রিমিয়ান তাতাররাও তিন থেকে পাঁচগুণ বেশি সৈন্য নিয়ে তার সাথে পেরে ওঠেনি।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন খোলা ময়দানে অটোমানদের মুখোমুখি না হয়ে তাদের একটা জঙ্গলের মধ্যে টেনে আনবেন। তারপর জঙ্গলের দুদিক ঘেরাও দিয়ে বাকি দুই দিকে আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মেরে ফেলবেন।

তাই তিনি পিছু হটতে লাগলেন র‍্যাজবোনের এক জঙ্গলকে লক্ষ্য করে। তার পিছু নিয়ে মুহাম্মাদ ঢুকে পড়লেন জঙ্গলের মধ্যে। তিনি হয়তো জানতেন না এটা তার জীবনের শেষ যুদ্ধ হতে যাচ্ছে।

দুই

স্টিফেন তার সৈন্যদের জঙ্গলের কিনারায় পাঠিয়ে অপেক্ষায় রইলেন। পুরো জঙ্গলের এখানে ওখানে গানপাউডার ছিটিয়ে দেয়া হলো। মুসলিম ফোর্স জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই

আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সারা জঙ্গলে দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। শত শত মুসলিম যোদ্ধা পুড়ে যেতে লাগলেন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে।
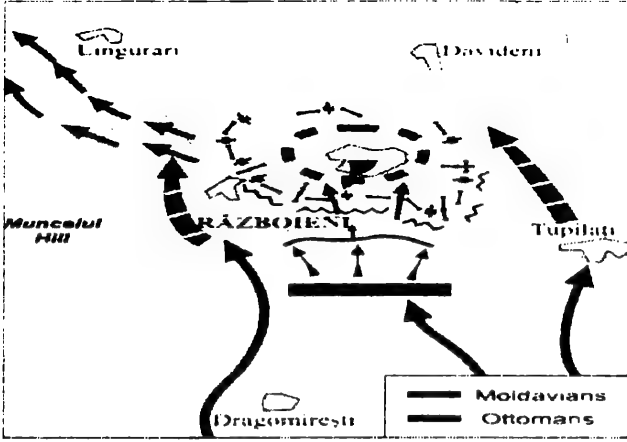
ট্যাকটিক্যাল ম্যাপঃ ব্যাটল অফ ভ্যালিয়া আলবা।

মুহাম্মাদ জঙ্গলের ভেতর থেকে দ্রুত তার বাহিনীকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

তারপর মুসলিম ফৌজ দুই দিক থেকে ঘুরে এসে জঙ্গলের কিনারার দিকে থাকা মলদাভিয়ানদের প্রেস করলে তারা দ্রুত পিছু হটে আরেকটা জঙ্গলে ঢুকে গেল। ঘন জঙ্গলে অনভ্যস্ত তুর্কি-আরবি ঘোড়াগুলো সিদ্ধান্ত নিতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছিল। তাই গতিতে মলদাভিয়ানদের হারানো গেল না।

সুলতান তবুও আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের বাহিনী নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে শুরু হলো তীব্র লড়াই।

জঙ্গলের অলিগলি নিজের হাতের তালুর মতো চিনতেন স্টিফেন। তাই কয়েকটি উঁচু জায়গা থেকে তার সৈনিকেরা বৃষ্টির মতো তীর আর গুলি ছুড়তে লাগল মুসলিমদের ওপর।

বাহিনীর সামনের দিকে থাকা আজব-আকিনজি আর বাশিবাজুকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শয়ে শয়ে মুসলিমদের লাশে ভরে গেল র‍্যাজবোন জঙ্গলের মাটি।

এই যুদ্ধে মুহাম্মাদ এসেছিলেন শতাব্দী প্রাচীন ইসলামি শপথ নিয়ে, হয় জয়, নয় শাহাদাত। রণসংগীত মেহতার বেজে ওঠল–

মাথার পাগড়ি খুলে গেছে, বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন
তলোয়ার আজ রক্তে রাঙাবো, আল্লাহ আমার সহায় হোন।
তরবারির ভাষায় আমাদের ক্রোধ ঝরে পড়ে
শত্রুর মরণ ডেকে আনে এই তলোয়ার!!
ইয়া আল্লাহ! বিসমিল্লাহ!! আল্লাহু আকবার!!!

রণসংগীত গাইতে গাইতে তিনি নিজে ঢুকে পড়লেন জঙ্গলের মধ্যে, ভয়ংকর এক লড়াই শুরু হলো। এদিন এই জঙ্গলে যুদ্ধের কোনো নিয়ম মানা হয়নি, যে যাকে যেভাবে পেরেছে শুধু মেরেছে।

টানা চার ঘণ্টা লড়াইয়ের পরও যুদ্ধের কোনো ফয়সালা হচ্ছিল না দেখে নিজের সিলাহদার বাহিনীকে নিয়ে সুলতান স্টিফেনের মূলবাহিনীর ওপর জান বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্টিফেন সুলতানের মুখোমুখি না হয়ে জঙ্গলের বামদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু তিনি দেখলেন জঙ্গলের বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছে একটা অটোমান ডিভিশন। তিনি আবার জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলেন, কিন্তু সুলতানের তলোয়ার বেপরোয়াভাবে কচুকাটা করছিল একের পর এক শত্রুকে। স্টিফেনের শেষ ভরসা পোলিশ হুসাররা একবার ক্যাভালরি চার্জ করার চেষ্টা করল। কিন্তু মুহাম্মাদের রক্তে তখন শহিদ হবার রোখ চেপেছে, কোনো কিছুতেই কাজ হলো না। সুলতানের বুকের বর্মে দুটো বুলেট আটকে গেল, হাতে তীর বিঁধল, কিন্তু তিনি থামলেন না।

যুদ্ধের নিয়ম হলো কমান্ডার উন্মাদ হয়ে গেলে তার সৈনিকরাও উন্মাদ হয়ে যায়। মলদাভিয়ার জঙ্গলেও তাই হলো।

র‍্যাজবোনের জঙ্গলের এই ভয়াবহ লড়াইয়ে টিকতে না পেরে উত্তর-পশ্চিমে প্রাণ নিয়ে পালালেন স্টিফেন। শেষ মুহূর্তে তার পেছনে লাগল অটোমান হেভি ক্যাভালরি কাপিকুলু ডিভিশন। তারা তাকে হাঁকিয়ে দিয়ে এল পোল্যান্ডের সীমানা পর্যন্ত।

প্রাণপণে লড়ে যুদ্ধে জিতেছিলেন মুহাম্মাদ, কিন্তু এই যুদ্ধে ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তিরিশ হাজার মুসলিম শহিদ হয়েছিলেন, পক্ষান্তরে মলদাভিয়ান বাহিনীর প্রতি চারজনে তিনজনই এই যুদ্ধে নিহত হয়।[১] পুরো জঙ্গল আর উপত্যকা জুড়ে এত সাদা হাড় পড়ে ছিল যে, এই যুদ্ধের নামকরণই করা হয় ব্যাটল অফ ভ্যালিয়া আলবা-সাদা হাড়ের উপত্যকার যুদ্ধ।

যুদ্ধে জেতার পরও কোনো জায়গা দখলে রাখতে ভাগ্যের সহায়তা দরকার পড়ে। এই সহায়তা মুহাম্মাদ পেলেন না।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই মলদাভিয়াতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মহামারী ছিল প্লেগ। আরও পাঁচ হাজার মুসলিম সৈন্যের মৃত্যু হলো মহামারীতে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। বাধ্য হয়ে সুলতান অভিযান বন্ধ করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ।

কিন্তু স্টিফেনকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বীর কাকে বলে।

ড্রাকুলার গর্দান

এক

ওয়ালাসিয়া, মলদাভিয়া আর ট্রান্সিলভানিয়া নিকোপলিসের ক্রুসেডের আগ পর্যন্ত হাঙ্গেরির সম্রাটের অধীনে ছিল। নিকোপলিসের ক্রুসেডে খ্রিষ্টানরা হেরে যাওয়ার পর ওয়ালাসিয়া অটোমানদের অধীনে চলে আসে। কিন্তু ওয়ালাসিয়ানরা ইসলাম গ্রহণ করতে কখনোই তেমন আগ্রহ দেখায়নি। ওয়ালাসিয়া তাই শাসন করা হতো ওয়ালাসিয়ার ভয়ভদের (কাউন্ট) মাধ্যমে। মলদাভিয়া আর ট্রান্সিলভানিয়া তখনো ছিল হাঙ্গেরির অধীন। মুহাম্মাদ আল ফাতিহর সামনে টিকে থাকতে না পেরে ড্রাকুলা যখন ওয়ালাসিয়ার দখল ছেড়ে হাঙ্গেরিতে পালায়। তখন ওয়ালাসিয়ার নিয়ন্ত্রণ চলে আসে রাদু বের কাছে। রাদু বের মৃত্যুর পর খালি হয়ে যায় ওয়ালাসিয়ার সিংহাসন।

ব্ল্যাক সি উপকূল, রাশান সমভূমি, পোল্যান্ড আর বলকান উপদ্বীপের মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল বলে ওয়ালাসিয়া, মলদাভিয়া আর ট্রান্সিলভানিয়া নিয়ে হাঙ্গেরি আর অটোমান সালতানাতের ভেতর চলছিল প্রতিযোগিতা।

মৃত বন্ধু রাদুর সিংহাসনে ড্রাকুলার এক চাচাত ভাই প্রিন্স বাসরাবকে বসিয়েছিলেন সুলতান। ওয়ালাসিয়ার সিংহাসন দখলের জোর সম্ভাবনা দেখে হাঙ্গেরির সম্রাট ম্যাথিয়াস করভিনাস এবার ছেড়ে দিলেন তার কাছে থাকা বন্দি নরপিশাচ ড্রাকুলাকে। ড্রাকুলার সামনে টিকে থাকার মতো শক্তি বা সাহস কোনোটাই বাসরাবের ছিল না। এর সাথে ড্রাকুলাকে বাড়তি সুবিধা দেয় ম্যাথিয়াস করভিনাসের পাঠানো দুই শ দক্ষ হ্যান্ডগানার ও প্রায় দশ হাজার লাইট ক্যাভালরি। স্টিফেন দ্যা গ্রেটও ফিরে আসেন তাকে সাহায্য করতে।[১]

আবার নরহত্যায় মেতে ওঠে ড্রাকুলা।

---

১. Andreescu, Ştefan (1991). "Military actions of Vlad Ţepeş in South-Eastern Europe in 1476". In Treptow, Kurt W. Dracula: Essays on the Life and Times of Vlad Ţepeş. East European Monographs. Distributed by Columbia University Press. pp. 135–151. ISBN 0-88033-220-4.p.146

ওয়ালাসিয়ার বেশ কিছু অংশের দখল নিয়ে ড্রাকুলা রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। এই খবর শুনে রাজধানী থেকে পালিয়ে গেলেন বাসরাব।
সুলতানের কাছে খবর পৌছল, ঘুমন্ত পিশাচ আবার জেগে ওঠেছে।

দুই

১৪৭৬ সাল, ডিসেম্বর মাস।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে গোটা ওয়ালাসিয়া।

তের্গোভিস্তের কাছের একটি জনপদকে ঘিরে ফেলেছে ড্রাকুলা বাহিনী। সেখানকার লোকেদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তারা অটোমানদের সাহায্য করেছে।

এক এক করে লাইন ধরে দাঁড় করানো হলো ছেলেবুড়ো সবাইকে। তারপর গরুর গাড়িতে করে নিয়ে আসা খুঁটিগুলো গাড়ি থেকে নামানো হলো। হিসেব করেই শূল আনা হয়েছে, কত মানুষকে শূলে চড়ানো দরকার তা আগে থেকেই গুনে গিয়েছিল ড্রাকুলার গুপ্তচর।

গুনে গুনে আট হাজার মানুষের পায়ুপথ দিয়ে শূল প্রবেশ করিয়ে বের করে আনা হলো মুখ দিয়ে। তারপর জ্বালিয়ে দেয়া হলো বাড়িঘর, ক্ষেত, সবকিছু।

ড্রাকুলা তখন জানত না, তার মৃত্যুদূত ইসলামবুল থেকে রওনা হয়ে গেছে। দশ হাজার আকিনজি, চার হাজার জানিসারি ও এক হাজার কাপিকুলুর এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ড্রাকুলাকে শায়েস্তা করতে পাঠানো হয়েছে দুর্ধর্ষ গাজি আলি বেকে।

তিন

আলি বেকে বোকা বানাতে বারবার পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে তাকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করল ড্রাকুলা। চতুর আলি বে এই ফাঁদে মোটেই পা দিলেন না। তিনি স্থানীয় কিছু লোকজনের সাথে দ্রুত সুসম্পর্ক গড়ে তুললেন। এদের অনেকেরই আত্মীয়স্বজন ছিল ড্রাকুলার পৈশাচিকতার শিকার।

কিছু স্থানীয় যুবকের সাথে কয়েকজন ওয়ালাসিয়ান জানিসারি খুব সাবধানে মিশে গেল ড্রাকুলার বাহিনীতে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে এক দিন আলি বে খবর পেলেন। ড্রাকুলা বুখারেস্টের কাছাকাছি রাসারটাউ জঙ্গলের কাছে সন্ধ্যার দিকে বাহিনী নিয়ে ভোজের আয়োজন করেছে।

ঠিক সন্ধ্যার আগের আধো আলো আধো অন্ধকারে সেখানে এসে ওঁৎ পেতে রইলেন আলি বে।

ড্রাকুলা সেখানে আসার সাথে সাথে তাকে কোনো প্রকার সুযোগ না দিয়েই চতুর্দিক থেকে হামলা শুরু করে অটোমান বাহিনী। লড়াই শুরুর আগেই গাজিদের ঝাঁক ঝাঁক তীর আর জানিসারিদের গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ড্রাকুলা বাহিনী শুধু টিকে থাকে সামান্য কিছু হাঙ্গেরিয়ান হ্যান্ডগানার। ঘন জঙ্গলের কাভার নিয়ে তাদের ওপর গুলি চালিয়ে জানিসারিরা হাঙ্গেরিয়ানদের লাশে ভরে ফেলে জঙ্গল। এরই মধ্যে নিজের অনুগত কয়েকজন সওয়ার নিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে পালাল ড্রাকুলা।

ড্রাকুলা কোনদিকে পালাবে আগেই তা হিসেব করে রেখেছিলেন আলি বে। একদিক থেকে গাজি, দুদিক থেকে কাপিকুলু আর অন্যদিক থেকে জানিসারিদের ঘেরাওয়ে পড়ে নিজের বাহিনীসহ প্রাণ হারাল ড্রাকুলা।[২]

চার

ড্রাকুলার কাটা মাথা দেহ থেকে আলাদা করে একটা মধুর বোতলে চুবিয়ে রাখা হলো। কফিনে থাকল মুন্ডুকাটা লাশ।

ইসলামবুলে ফেরার পর দেখা গেল মাথা আছে, কিন্তু কফিন ফাঁকা।

ল্যাশটা আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ড্রাকুলার কাটা মাথা শূলে গেঁথে মধুতে চুবিয়ে ইসলামবুলের সদর দরজায় ঝুঁলিয়ে রাখা হয়েছিল একটানা ছয় মাস। এটাই ছিল অটোমান সুলতানের ন্যায়বিচার।

---

২. প্রাগুক্ত(১),পৃঃ১৪৭

ক্রিমিয়ার চিঠি

সুলতানের দরবারে ক্রিমিয়া থেকে চিঠি এসেছে।

চেঙ্গিজ খানের বংশধর মেনলি গিরাই খানের চিঠি।

চেঙ্গিজ খান তার সাম্রাজ্যকে চার ভাগে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের চার ছেলের মাঝে। সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগ পড়েছিল জোচির সন্তান বাটু খানের ভাগে। বাটু খান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার গড়ে তোলা সাম্রাজ্যই উলু জোচি বা কিপচাক খানাত বা গোল্ডেন হোর্ড নামে পরিচিত হয়।

১৩৭০ সালের পর তাইমুরের উত্থানের সাথে সাথে ঘনিয়ে আসতে থাকে গোল্ডেন হোর্ডের পতন। ১৪৫০ সালের পর গোল্ডেন হোর্ডের ভেঙে যাওয়া টুকরোগুলোর মধ্যে প্রধান হয়ে উঠে ক্রিমিয়ান তাতারদের রাজ্য, ক্রিমিয়ান খানাত।

১৪৭৫ সালে জেনোয়া পোপের অনুমতি নিয়ে ক্রিমিয়ার খানের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়ে তাকে বন্দি করে।[১]

মুহাম্মাদকে নিজের সুলতান ও বড় ভাই সম্বোধন করে মেনলি গিরাই খান এক আবেগপূর্ণ চিঠি লিখে তাকে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে উদ্ধার করার অনুরোধ করেন।[২] সুলতান তখুনি তৈরি হতে বললেন জেদিক পাশাকে। জেনোয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা তার ১৪৫৬ সাল থেকেই ছিল। কিন্তু ড্রাকুলার খপ্পরে পড়ে সেই অভিযান তার আর চালানো হয়নি।

১৪৭৬ সালের এপ্রিলের শেষেই বেরিয়ে পড়েন জেদিক পাশা। জুনের শুরুতে তার বিখ্যাত কাফফা অভিযান শুরু হয়।

---

১. http://www.hurriyetdailynews.com/the-crimean-tatars-and-the-ottomans-64230

২. Subtelny, Orest (2000). Ukraine: A History.University of Toronto Press. ISBN 0-8020-8390-0.

পঁচিশ হাজার সৈনিকের নৌবাহিনী নিয়ে তিনি কাফফা দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। একে একে কাফফা, সলদাইয়া আর চেম্বালোসহ সবকটি জেনোইস দুর্গ তিনি মাত্র দুই মাসে জয় করে নেন। পুরো জেনোইস ব্ল্যাক সি ফ্লিটের দফারফা করতে তার তিন মাসও লাগেনি।

এই অভিযানের ফলে ক্রিমিয়ান খানাত (বর্তমান ইউক্রেন ও রাশিয়ার অংশ), চলে আসে সুলতানের পতাকাতলে। ব্ল্যাক সি পরিণত হয় তার ব্যক্তিগত লেকে।

১৪৭৯ সাল নাগাদ ভেনিসের সাথে বোঝাপড়া এক চরম মুহূর্তে আসে।

আক্রমণাত্মক মুসলিম বাহিনীর হামলায় ভেনিসের গোটা নৌ বহরের উপস্থিতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে দেখে বাধ্য হয়ে এক অপমানজনক চুক্তিতে সই করে তৎকালীন পৃথিবীর সেরা নৌশক্তি ভেনিস।

চুক্তিতে ভেনিস সুলতানকে বাদশাহ এবং ইউরোপের কাইজার হিসেবে স্বীকার করে নেয়। একই সাথে মুসলিম জাহাজের ওপর হামলা চালানো বন্ধের প্রতিজ্ঞা করে।

বার্ষিক দশ হাজার ডুকাট কর ও গত ১৬ বছরের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লাখ ডুকাট তারা এককালীন দেয়। এর সাথে তারা চিওস, লেসবস, ইউবিয়া ও লেমনস দ্বীপের দাবি ছেড়ে দেয়। আলবেনিয়া একমাত্র টিকে থাকা দুর্গ স্খোদরের চাবিও তুলে দেয়া হয় সুলতানের হাতে।[৩]

এর বিনিময়ে তারা পূর্ব ভূমধ্যসাগর, মার্মারা সাগর, কৃষ্ণসাগর হয়ে গোটা অটোমান সালতানাতে বাণিজ্যের অনুমতি পায়। এক টানা সাফল্যের ফলে জেদিক আহমেদ পাশাকে কাপুদান রইস বা গ্র্যান্ড অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।

এই সময়গুলোতে একটু একটু করে অচল হয়ে যাচ্ছিলেন এক সময় ইউরোপ আর এশিয়া দাপিয়ে বেড়ানো বীর মুহাম্মাদ।

অটোমান সুলতানদের একটা বংশগত রোগ ছিল। আর্থ্রাইটিস।

কারামান অভিযানের পর থেকেই ক্রমে ঘোড়ার পিঠে চড়াটা সুলতানের জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ব্যথা নিয়েও তিনি দুটো ভয়ংকর যুদ্ধে লড়েছেন, ওটলুকবেলি আর ভ্যালিয়া আলবা।

কিন্তু বয়স কাউকে ক্ষমা করে না। সময়ের সাথে সাথে ওজনে ভারী হতে থাকেন সুলতান, সেই সাথে বাড়ে আর্থ্রাইটিসের ব্যথা।

সারা জীবন তিনি যুদ্ধের ময়দান আর বিভিন্ন অভিযানে কাটিয়েছেন। তার ঘোড়া অনবরত ছুটে চলেছে আনাতোলিয়া, মোরিয়া, জর্জিয়া, ইউক্রেন হয়ে মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, ওয়ালাসিয়া, মলদোভা, বসনিয়া আর আলবেনিয়ার প্রান্তরে।

---

৩. Alexander Mikaberidze(2011).Conflict and Conquest in the Islamic World. p.917

ক্ষমতায় যখন এসেছিলেন তখন অটোমান সালতানাত ছিল চারদিকে প্রবল শক্তিশালী সব শত্রু দিয়ে ঘেরা। গলার কাঁটার মতো বিঁধে ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। আটাশ বছরের মধ্যে তিনি একটু একটু করে ইতিহাসের স্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন উল্টোদিকে।

গত চারটি শতাব্দী জুড়ে যে ক্রুসেড বারবার জেরুজালেম থেকে মক্কা মদিনা পর্যন্ত দখল করার জন্য বারবার হামলে পড়েছিল সারা ইউরোপের শক্তি নিয়ে, সেই ক্রুসেডের রোখ তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো এখন নিজেদের পিঠ বাঁচাতেই ব্যস্ত।

তিনি গড়েছেন নতুন প্রশাসন, নতুন আইন ও বিচার ব্যবস্থা, নতুন, আধুনিক এক সেনাবাহিনী, দুর্ধর্ষ এক আর্টিলারি কোর, এক চমৎকার নৌবাহিনী। শত শত মসজিদ মাদরাসা, কয়েক হাজার লঙরখানা, যেখানে গরিব মানুষ ও মুসাফিরদের খাবারের কোনো অভাব হয় না।

সারা সাম্রাজ্যে তিনি নিশ্চিত করেছেন আইনের শাসন।

তিনি ধ্বংস করেছেন তিরিশটিরও বেশি শহর, গড়েছেনও অনেক।

১২০৪ সালে হওয়া চতুর্থ ক্রুসেড ও ১৪৫৩ সালের অবরোধে ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হওয়া কনস্ট্যান্টিনোপলকে ২৫ বছরের মাথায় তিনি পরিণত করেছেন বিশ্বের অন্যতম ঐশ্বর্যশালী শহরে।

হারানো সৌন্দর্য ফিরে পাওয়া ইসলামবুল।

তারুণ্যের সেই দুর্বার গতি এখন আর নেই। তবু তিনি মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে ঘুরতে বের হন গভীর রাতে। দেখেন তার জনগণ কেমন আছে। মাঝে মাঝে ঘুরে আসেন সাহাবি হযরত আইয়ুব আল আনসারি (রা.)-এর কবর থেকে।

ফজর পড়ে প্রাসাদে ফেরার সময় মাঝে-মাঝে তিলাওয়াত করেন সূরা নাসর।

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে! আর মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকবে। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসা কর ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল।'

সুলতান, কাইজার, পোপ

এক

কনস্ট্যান্টিনোপল তার জন্ম থেকেই রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরমে পৌঁছে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগে ভাগ হওয়ার পরে।

পশ্চিমের রোমে যে সমস্যা ছিল, পূর্বের কনস্ট্যান্টিনোপলে তা ছিল না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে রোমের চেয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল অনেক বেশি সুরক্ষিত। ভ্যান্ডাল, ফ্রাঙ্ক, গথ আর হুনদের আক্রমণ থেকে তা ছিল অনেকটাই নিরাপদ।

ফলাফল, ৪১০ সালেই রোমের অবস্থা দাঁড়ায় ধ্বংসস্তুপের মতো, ৪৭৬ সালে তা হয়ে যায় ভুতুড়ে রাজধানী।

প্রধান কারণ, ইউরোপীয় বর্বর জাতিগুলোর আক্রমণ।

আর কনস্ট্যান্টিনোপল টিকে থাকে ইউরোপের রাজধানী হয়ে, আরও প্রায় সোয়া সাত শ বছর।

দুই শহরের ভেতর চলেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রোম ধ্বংস হলেও টিকে গিয়েছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ, রোমান সাম্রাজ্যের পতন যুগে চার্চই হয়ে ওঠে পশ্চিমের ক্ষমতার কেন্দ্র।

পোপের ছিল অবাধ, অমোঘ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা, সম্পদ আর আনুগত্য পাবার অধিকার। এক সম্রাট আরেক সম্রাটকে মানতে না পারে, কিন্তু দিন শেষে পোপকে তার মানতেই হবে।

চার্চ তাই ক্রমেই ক্ষমতার রাজনীতিতে পাকাপোক্ত আসন করে নেয়। আর ক্রুসেডের রমরমা যুগে জগতের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন পোপ।

ক্যাথলিক পোপের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্বের ইতিহাস বহু পুরোনো। পোপ যখনই সুযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন জেরুসালেম থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিয়ে মক্কা-মদিনা পর্যন্ত খ্রিষ্টবাদের ক্ষমতাকে পৌঁছে দিতে।

ইতিহাসে কিছু মানুষ জন্মান, যারা সময়ের গতিপথকে বদলে না দেয়া পর্যন্ত স্থির হন না। এদেরই একজন ছিলেন মুহাম্মাদ আল ফাতিহ। ১৪৫৩ সালে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে তিনি ক্রুসেডারদের ক্ষমতার ওপর বড় রকমের আঘাত হানেন।

তারপরের সাতাশটা বছর তাকে লড়তে হয়েছে একে একে জন হুনয়াদি, ইস্কান্দার বেগ, কাউন্ট ড্রাকুলা, ম্যাথিয়াস করভিনাস আর স্টিফেন দ্যা গ্রেট ও উজুন হাসানের সাথে।

১৪৭৯ সাল নাগাদ নিজের সব শত্রুকেই নাজেহাল করে ফেলেন সুলতান। তার শেষ মঞ্জিল হয়ে দাঁড়ায় ক্রুসেডের কেন্দ্রস্থল, রোম আর ভ্যাটিকান। ১৪৮০ সালের গ্রীষ্মে গোল্ডেন হর্ন থেকে হিলালি নিশানে কালিমা তাইয়িবা লেখা নিয়ে বের হয় দেড় শ জাহাজ। এতে ছিল ৯০ টি ছোট গ্যালিয়ট, ৪৮ টি মাঝারি গ্যালিয়েজ আর এক ডজন বড় গ্যালি।

এই জাহাজগুলোতে থাকা ২০ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন দুনিয়ার সেরা জেনারেলদের অন্যতম জেদিক আহমেদ পাশা।

উদ্দেশ্য ছিল রোম আক্রমণ।

আড়াই মাস পর তারা ইতালি পৌঁছলেন।

তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল দ্রুত একটি বন্দর জয় করে নিজেদের একটা লজিস্টিক বেস। তৈরি করে ইতালিতে পরবর্তী অপারেশন চালানো। নোঙর করার জন্য জেদিক পাশা বেছে নিলেন ইতালিয়ান বন্দর অটরান্টোকে।

এরই মধ্যে কারা যেন রটিয়ে দিল স্বয়ং সুলতান মুহাম্মাদ রোম দখল করতে আসছেন।

এই খবর প্লেগের জীবাণুর মতোই ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপে।

অটরান্টো শহরের তিরিশ হাজার অধিবাসীর বিশ হাজারই প্রাণ নিয়ে পালাল। ফ্লোরেন্স-মিলান খালি হয়ে গেল তিন দিনের মধ্যেই। সুলতান আসছে শুনে ভয়ে রোম থেকে আভিগননে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলেন পোপ।[১]

পোপ রোম থেকে পালিয়ে যাবেন শুনে ইউরোপ নড়েচড়ে বসল। ফ্রান্স-হোলি রোমান এম্পায়ার, ক্যাস্টিলিয়া, অ্যারাগন, হাঙ্গেরিসহ সবাই মিলে এক ক্রুসেড চালিয়ে মুহাম্মাদকে থামানোর শপথ নিল।

মুহাম্মাদ তখন কনস্ট্যান্টিনোপলে বসে অপেক্ষা করছিলেন দূত কখন একটা সুখবর দেবে।

---

১. Frazee, C.A., 2006. Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453-1923. Cambridge University Press.p.17

জেদিক পাশার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য অটোমান নৌবাহিনী মে থেকে আগস্টের মধ্যে অটরান্টোর সব ডিফেন্স সিস্টেমকে চুরমার করে দিল। পোপ দিনরাত ভাবতে লাগলেন রোম লুট হলে তার সম্পদের পর্বতের কি হবে।

অটরান্টো দুর্গ জয় করে নিল অটোমানরা চাপ চাপ রক্ত আর আগুনের মধ্যে দিয়ে।

আট হাজারের বেশি ইতালিয়ান দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিল।

দখল করার পর দেখা গেল, ছয় মাসের শীতকালে বিশ হাজার সেনার একটা গ্যারিসন টিকিয়ে রাখতে যে ধরনের লজিস্টিক সাপ্লাই দরকার অটরান্টোতে তা নেই। বাধ্য হয়ে জেদিক পাশা অক্টোবরে আলবেনিয়া ফিরে গেলেন। কেবল আট শ যোদ্ধাকে দুর্গটা ধরে রাখার জন্য রেখে যাওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত পাকাপোক্তই ছিল। পরের বসন্তে সুলতান নিজেই রোম দখলের জন্য এক লাখের বেশি সেনা নিয়ে আসবেন। শীতের মধ্যেই অটরান্টোতে অভিযান চালাল খ্রিষ্টানরা। কিন্তু দুর্গের পতন হলো না।

১৪৮১ সালের এপ্রিলে আবারও গুজব ডালপালা মেলতে লাগল, সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ রোম জয় করতে বেরুচ্ছেন।

হারিয়ে যাওয়া ঈগল

এক

বসন্তের চমৎকার এক সকাল।

মার্মারা সাগরের তীর ধরে ফুরফুরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে গেবজের ওপর দিয়ে। ঠান্ডা খুব বেশি না। গাছগুলো সব ফুলে ভরে ওঠেছে, অদ্ভুত সুন্দর তাদের ঘ্রাণ। ক্যাম্পের কাছেই আছে সুন্দর একটা বাগান। বাগানের ভেতর ছোট্ট একটা হ্রদ।

সুলতান তাঁবু থেকে বের হতে পারছেন না। তার উরুসন্ধিতে তীব্র ব্যথা। আর্থ্রাইটিসের ব্যথাটা তাকে ছাড়ছেই না। গুলবাহার খাতুন তাকে হাজারবার নিষেধ করেছেন অভিযানে বের হতে। কিন্তু ঈগলদের তো জন্মই হয় ওড়ার জন্য, ডানায় যত ব্যথাই থাক না কেন।

এখন তিনি বুঝতে পারছেন, গুলবাহারের কথা না শোনাটা ঠিক হয়নি।

কিন্তু যুদ্ধ না করে তিনি কীভাবে থাকবেন?

চৌত্রিশ বছর আগে যখন গুলবাহার প্রথম তার হেরেমে আসেন তখন তার নেশা ছিল শিকার, তারপর ধীরে ধীরে তার নেশা হলো যুদ্ধ। সুলতানা কোনোদিন তার এই নেশায় বাধা দিতে চেষ্টা করেননি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে প্রচণ্ড আর্থ্রাইটিসের ব্যথাতে প্রাসাদ থেকে খুব বেশি বের হন না তিনি।

এবার জোর করেই বের হয়েছেন সুলতান।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। নীল আকাশে হাসতে থাকা সোনালি সূর্যটা একটা সময় পশ্চিমে গড়াতে থাকল সেই সাথে বাড়তে থাকল সুলতানের ব্যথা। তার প্রিয় পাত্রদের অনেকেই সারা দিন তার তাঁবুতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারামানি মুহাম্মাদ পাশা, আহমেদ পাশা, দাউদ পাশা, মাসিহ পাশা, সাইফ পাশা, মুসলেহউদ্দিন পাশা। অনেক দূরে আছেন উজিরে আযম, রইস-ই দরিয়া জেদিক আহমেদ পাশা।

সুলতানের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসতে লাগল। তিনি এপাশ-ওপাশ করতে পারছেন না বিছানায়। ব্যথায় চেহারা নীল হয়ে গেছে। পারস্য থেকে আসা হেকিমকে ডাকা হলো। হেকিম সুলতানকে ওষুধ দিলেন।

পরদিন সকাল নাগাদ ব্যথা কমে গেল। সুলতান বিছানা থেকে ওঠেন। সবার সাথে কথাবার্তা বললেন।

পরদিন সকালে বাহিনী পূর্বে রওনা হবে বলে সিদ্ধান্ত হলো। বিকেলে আরেক দফা ওষুধ দেয়া হলো সুলতানকে।

কিন্তু ফজরের নামাজে সুলতান এলেন না। গত তিরিশ বছরে এইবার দ্বিতীয়বার। আগে একবার ফজরের সময় অচেতন ছিলেন তিনি। ভেনিশিয়ানরা তাকে বিষ খাইয়েছিল।

যোহরের ওয়াক্ত গড়িয়ে গেল, সুলতানের ঘুম ভাঙল না। আসরের সময় ডেকে আনা হলো কিংবদন্তী ইহুদি চিকিৎসক ইয়াকুব এফেন্দিকে, সুলতানের সবচেয়ে বিশ্বস্ত চিকিৎসক। ইয়াকুব এসে দেখলেন, প্রচণ্ড প্রাণশক্তির একরোখা, দুর্ধর্ষ মানুষটা নিথর হয়ে আছেন।

এখনো শ্বাস পড়ছে। কিন্তু চোখ খুলছেন না তিনি।

নিজের চিকিৎসা বিদ্যার সবটুকু দিয়ে তিনি চেষ্টা করলেন যাতে সুলতানের জ্ঞান ফেরে। চেষ্টাতে কাজ হলো। এশার পর চোখ খুললেন মুহাম্মাদ।

একটু পরেই পৌঁছুলেন গুলবাহার খাতুন। সারা রাত সেবা করলেন তিনি, সুলতানের শারীরিক অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল সকালে কিন্তু ইয়াকুব মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না।

পরদিন বিকেল পর্যন্ত গুলবাহার খাতুনের সাথে সময় কাটালেন সুলতান মুহাম্মাদ। তার রোগমুক্তি উপলক্ষে বিশেষ মাহফিলের আয়োজন করেছেন মুহাম্মাদ পাশা।

মাহফিলের আয়োজনে নিষেধ করে দিলেন সুলতান। তিনি একাকী থাকতে চান, শুধুই গুলবাহারের সাথে। একমাত্র মানুষ, কোনোদিন যাকে সন্দেহ করেননি তিনি। এশার নামাজের পর সুলতান তাঁবুতে ফিরলেন।

তার অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে।

ছোটবেলার কথা, কেন যেন বাবার আদর পেতেন না শৈশবে।

তারপর আলি আর আলাউদ্দিন মারা গেল।

তিনি হলেন ওয়ালিয়েদ শাহজাদা। অন্য কাযিনদের চেয়ে খানিকটা অবহেলিত দুঃখিনী মা হুমা খাতুন তার সুলতান হওয়া চোখে দেখার আগেই মারা গেলেন।

তার বন্ধু রাদু আর মাহমুদ পাশার কথা মনে পড়ল, মনে এদিনের কাছের জঙ্গলে শিকারের সেই দিনগুলি।

চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগল কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের কথা। মনে পড়ল বায়েজিদ, মুস্তাফা, জেম আর জেভেরেনহানের জন্মের কথা। ট্রেবিজন্ড অভিযান, ড্রাকুলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলো। মনে পড়ল শাইখুল ইসলাম, তার উস্তাদ আকা শামসুদ্দিনের সৌম্য শান্ত মুখখানি। তার জীবনে এই লোকটার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

ইয়াকুব এলেন একটু পর।

দেখলেন সুলতানের গা গরম হয়ে এসেছে। তিনি সুলতানকে ওষুধ দিতে চাইলেন। সুলতান তার হাত ধরে ফেললেন। বললেন সময় এসে গেছে। এই কথা আরও একজন শুনলেন। গুলবাহার খাতুন।

সুলতানের কথা শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন গুলবাহার। সুলতানা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন বলে হইচই পড়ে গেল। তবে জ্ঞান ফিরতে বেশিক্ষণ লাগল না।

পরদিন সকালে সুলতানকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখা গেল। একদম ছোট্ট শিশুর মতোই শুয়ে ছিলেন তার গুলবাহারের কাছে।

নিশ্বাস পড়ছিল না আর।

মুহাম্মাদ আর নেই।

সারা রাত ঘুমাননি গুলবাহার, মুহাম্মাদ পাশা আর ইয়াকুব এফেন্দি।

সুলতানার আদেশে মুহাম্মাদ পাশা বাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে ছুটলেন।

প্রথমদিকে খবরটা গোপন রাখার চেষ্টা করা হলেও কয়েক দিনের মধ্যেই দিকে দিকে খবর ছুটল, মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ইন্তেকাল করেছেন।

প্রতি নামাজের জামাতের পর মসজিদে মসজিদে হাউমাউ করে কাঁদছিল মানুষ। খবর পাওয়ার পর ইসলামবুলের মানুষ সেদিন সারা দিন কেঁদেছিল।

সেই কান্না একটু একটু করে ইথারে ছড়িয়ে পড়েছিল বসনিয়া থেকে সিলিসিয়া, আলবেনিয়া থেকে কারামান, ক্রিমিয়া থেকে অ্যাড্রিয়াটিক পর্যন্ত।

মুহাম্মাদের মৃত্যুর খবরে উল্লাসে মেতে ওঠেছিল ইউরোপ।

পোপের কাছে ভেনিসের দূতের যে চিঠি পৌঁছেছিল, তাতে লেখা ছিল–

La Grande Aquilla Lé Morta.
The Great Eagle is Dead.[1]

ইউরোপজুড়ে প্রতিটি ক্যাথলিক চার্চে দুপুর ১২টায় ঘণ্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন পোপ, ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। স্পেনের কর্দোবা থেকে হাঙ্গেরির বুদা পর্যন্ত চার্চের ঘণ্টাগুলো বেজে ওঠল এক এক করে। আজ তাদের উৎসবের দিন, তাদের শত্রু মেহমেদ মারা গেছে।

The Great Eagle is Dead!!

১. Freely, J., 2009. The Grand Turk: Sultan Mehmet II-Conqueror of Constantinople and Master of an Empire. The Overlook Press. p.180

আবার গৃহযুদ্ধ

এক

পোপ ইতালি ফিরলেন।

অটোমান বাহিনী ইতালি থেকে সরে গেছে। তাদের সুলতান ইন্তেকাল করেছেন। কমান্ডার ইন চিফ জেদিক আহমাদ পাশাকে ইসলামবুলে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

ইসলামের তলোয়ার যাকে বলা হতো সেই মুহাম্মাদ আল ফাতিহের মৃত্যুতে অকল্পনীয়ভাবে ভারমুক্ত হয়ে গেল ভ্যাটিক্যান।

মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মারা যাওয়াটা কেউই কল্পনা করেনি।

হয়তো বেঁচে থাকলে জুলাই-আগস্ট নাগাদ দেড় লাখ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ইতালিতে প্রবেশ করতেন মুহাম্মাদ। সেক্ষেত্রে চিরদিনের জন্য বদলে যেতে পারত পৃথিবীর ইতিহাস। রোমের পতন হলে পোপতন্ত্র ভেঙে পড়ত, ইউরোপের পাওয়ার স্ট্রাকচার এই পতনের জন্য তখনো তৈরি ছিল না।

সেক্ষেত্রে সম্ভবত চিরদিনের জন্য পতন ঘটত খ্রিষ্টান-প্যাগান পশ্চিমা সভ্যতার।

কিন্তু যেকোনোভাবেই হোক, শেষ মুহূর্তে পতনের হাত থেকে বেঁচে গেল রোম। সুলতানের ইন্তেকালের পর যে রাজনৈতিক নাটক জমে উঠল তার দুই ছেলের মাঝে তা বিশ্বরাজনীতিতে এনেছিল অন্যরকম এক স্থিতিশীলতা।

দুই

মুহাম্মাদ তার দ্বিতীয় সন্তান মুস্তাফাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। যোদ্ধা ও শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ কিন্তু তিনি মারা যান বাবার মৃত্যুর আগেই।

বাকি দুই ছেলে বায়েজিদ আর জেমের মধ্যে সুলতানের পছন্দ ছিল জেম। বায়েজিদ যুদ্ধের ময়দানে খুব বেশি প্রতিভাবান ছিলেন না।

কিন্তু সালতানাতের নিয়মানুসারে যে আগে রাজধানীতে পৌঁছাবে তারই সুলতান হবার কথা। আর একারণে বায়েজিদ বৈধভাবেই নিজেকে সুলতান দাবি করেন। বেশিরভাগ পাশা ছিলেন তার পক্ষে, সাথে তিনি পেয়েছিলেন মা গুলবাহার খাতুন আর শাইখুল ইসলামকে।

জানিসারিদের আগাও যখন বায়েজিদের পক্ষে যোগ দিলেন তখন জেমকে ক্ষমতার লড়াই থেকে পিছু হটতে হলো।

জেম এর আগে কারামানের সানজাক বে হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে আনাতোলিয়ায় তার একটা আলাদা জনপ্রিয়তা ছিল। সেই সাথে কারামানের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল সিরিয়া সীমান্তের কাছাকাছি। তাই জেম সিরিয়ার মামলুক এবং আনাতোলিয়ার তুর্কমেনদের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে বায়েজিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামলেন।

কিন্তু যে ক'বার সিংহাসন উদ্ধারে জেম বের হলেন প্রতিবারই বায়েজিদ তাকে পরাজিত করলেন। ফলে শেষমেশ জেম আশ্রয় নিতে বাধ্য হন পিতার শত্রু মামলুক সুলতান কাইত বের কাছে।[১]

এরই মধ্যে প্রশাসনে জেমের যত সমর্থক আছে তাদের ছেটে ফেললেন বায়েজিদ। সবচেয়ে মারাত্মক কাজটা করলেন জেদিক পাশাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে।[২]

১৪৮৩ সাল নাগাদ জেম আরও একবার সৈন্য যোগাড় করে জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন পূর্ব আনাতোলিয়া দখল করার চিন্তা নিয়ে। খবর পেয়ে বায়েজিদ জেমের সব ধরনের রসদ সরবরাহের পথ আটকে দিলেন। কোণঠাসা জেম প্রাণভয়ে পালালেন নাইট হসপিটালারদের আস্তানা রোডস দ্বীপে এবং তারপর তিনি বুঝলেন, নাইটদের বিশ্বাস করাটাই তার ভুল হয়েছে। তার বাকি জীবন কেটেছে বায়েজিদের দান অথবা ক্যাথলিকদের দয়ার ওপর নির্ভর করে।

রোডস থেকে নাইটরা তাকে ফ্রান্সে পাঠাল, ফ্রান্সের সম্রাট তাকে বিক্রি করে দিলেন পোপের কাছে, প্রায় একজন ক্রীতদাসের মতোই।[৩]

---

১. Freely, John (2004). Jem Sultan. The adventures of a Captive Turkish Prince in Renaissance Europe. Hammersmith, London: Harper Collins Publishers. p. 145.
২. Finkel, C., 2005. OsmanÕs dream. The Story of the Ottoman Empire. p.89
৩. Ménage, V.L., 1965. The Mission of an Ottoman Secret Agent in France in 1486. Journal of the Royal Asiatic Society, 97(2), pp.112-132.

পোপ তাকে নিয়ে পরবর্তী দশ বছর খেলেছেন এক নোংরা খেলা, তাকে বন্দি করে রেখে মাসে মাসে বায়েজিদের কাছে অর্থ চাওয়া হতো এবং অর্থ না পেলে তাকে ছেড়ে দেয়ার ভয় দেখানো হতো। বায়েজিদ তার বাবার মতো একরোখা ছিলেন না। যে ভয় মুহাম্মাদকে দেখিয়ে কোনো ফায়দা হওয়ার কথা ছিল না সেই ভয় বায়েজিদকে অনায়াসেই দেখানো যেত।

এক পর্যায়ে জেমকে বন্দি রাখা বাবদ পোপের বার্ষিক আয় দাঁড়ায় এক লাখ বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রায়। এই বিশাল অঙ্কের অর্থ বায়েজিদ প্রতিবছর পরিশোধ করতেন যা ছিল পোপের বাকি সব সম্পদ থেকে পাওয়া বার্ষিক আয়ের সমান।[৪]

এদিকে ইউরোপের পূর্বে অটোমানদের যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি দেখা যাচ্ছিল তার ঠিক উল্টোটা ঘটে চলেছিল ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে।

সেখানেও এক বিদ্রোহী শাহজাদা শেষ পর্যন্ত ডেকে এনেছিলেন ধ্বংস।

স্পেনে ৭৮১ বছর ধরে চলা মুসলিম শাসনের শেষ ডেকে আনল আবু আব্দুল্লাহর বিদ্রোহ।

গ্রানাডার উত্তর থেকে ঝড় আসছে, ঝড়ের নাম রিকনকুইস্তা।

৪. Gök, İlhan (2014). II. Bâyezîd Dönemi İnÔâmât Defteri ve Ceyb-i Hümayun Masraf Defteri (Thesis). p. 580.

সপ্তম অধ্যায় : নয়া দুনিয়ায়

রিকনকুইস্তা

এক

ইসলাম যে বিপ্লবী বাণী নিয়ে ৬১০ সালে আরবে হাজির হয়েছিল, তা মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই তৎকালীন মানবসভ্যতার দুই তৃতীয়াংশ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল আরব মুসলিমরা।[১] এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাদের ত্যাগী মনোভাব, যাযাবর স্বভাব আর বাস্তববাদী চিন্তাভাবনার।

আরব কমান্ডাররা জন্ম থেকেই যুদ্ধের মাঝে বড় হতেন। এখন যেমন আমাদের মায়েরা ছেলেদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা সরকারি অফিসার হবার স্বপ্ন দেখান, তখনকার আরবের মায়েরা তাদের ছেলেদের স্বপ্ন দেখাতেন মুজাহিদ হওয়ার। মুজাহিদ মানে শুধু যোদ্ধা নয়, মুজাহিদ মানে মিশনারি, যে কালিমাকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য লড়াই করে। অহেতুক মানুষ মারা জিহাদ শব্দের সংজ্ঞায় পড়ে না।

এই দুর্দান্ত স্বপ্নবাজ, কিন্তু বাস্তববাদী জাতিটা যখন অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে প্রাচুর্যের বন্যায় ভেসে গেল তখন থেকেই তাদের মধ্যে শহুরে সুশীলতার জন্ম হতে লাগল।

জগতের অর্থ-বিত্ত ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজনীতি সবকিছুই তাদের আওতায় চলে এসেছিল অষ্টম শতাব্দীতে। কিন্তু যে বিপ্লবী জীবনাদর্শ তাদের হাতে এই প্রাচুর্য এনে দিয়েছিল, তা প্রাচুর্যের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিলাসিতার নিচে চাপা পড়তে লাগল। একটা সভ্যতার পতন আসলে এভাবেই হয়। দুই-তিন প্রজন্মের মানুষ এর ভিত্তি গড়ে। চার থেকে আটটা প্রজন্ম একে উপভোগ করে এবং তারপর ধীরে ধীরে ভোগবিলাসের ফলে তারা সেই কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে, যা তাদের ক্ষমতার শিখরে তুলে এনেছিল।

স্পেনেও ব্যাপারটা এমনই ছিল।

---

১. Blankinship, Khalid Yahya (1994). The End of the Jihad State, the Reign of Hisham Ibn 'Abd-al Malik and the collapse of the Umayyads. State University of New York Press. p 37 ISBN 0-7914-1827-8

অষ্টম শতাব্দীতে মাত্র আট বছরের মধ্যে জাবাল আত তারিক (আজকের জিব্রাল্টার) থেকে পশ্চিমে পর্তুগাল আর উত্তরে বার্সেলোনা ছাড়িয়ে ফ্রান্সের নারবোন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল ইসলামের বিজয় রথ।

তারপর হঠাৎ করেই তা থেমে গেল।

কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করতে গিয়ে আড়াই লাখ যোদ্ধা হারায় উমাইয়া খিলাফত। আজ থেকে তেরো শ বছর আগের আড়াই লাখ যোদ্ধা যখন সারা পৃথিবীর জনসংখ্যাই ছিল দুই কোটির কাছাকাছি।

এর ফলে ফ্রান্সে অভিযান চালানোর জন্য নতুন সেনাবাহিনী পাঠানো উমাইয়াদের পক্ষে আর কখনোই সম্ভব হয়নি। ৭৫০ সাল নাগাদ উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটলে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে স্পেনের আমির বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আব্বাসীয়রা মাগরিব অঞ্চলকে কখনোই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। ফলে স্পেনের মুসলিম আমিরাত ধীরে ধীরে সমগ্র উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তবুও যত দিন যোগ্য লোকের হাতে ক্ষমতা ছিল তত দিন স্পেন-পর্তুগালের ইসলামি আমিরাত ছিল গোটা ইউরোপের সবচেয়ে উজ্জ্বল সভ্যতার এক নিদর্শন। দশম শতাব্দীতে আমির আবদুর রহমানের আমলে এই আমিরাত পার করে তার স্বর্ণযুগ।

গিবন, হিট্টি, রজার বেকন, মুর, যোসেফ হেলসহ সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন ইসলামি আল আন্দালুসের ঐশ্বর্য আর উৎকর্ষের কথা।

এই আমিরাতই ইউরোপে প্রথম নিয়ে আসে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বার্তা। নবম ও দশম শতাব্দীর একটা বিশেষ সময়কে পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা এল কনভিভেন্সিয়া বলে ডাকেন তার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজিরবিহীন নিদর্শনের জন্য; যা ইউরোপ এমনকি এখনো শিখতে পারেনি।[২] গোটা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চা হয়ে পড়ে কর্দোবা কেন্দ্রিক। আর ঠিক সেই সময়টাতেই মরুভূমির ধুলো থেকে উঠে আসা বেদুইন রক্তের শান শহুরে ঐশ্বর্যের জরিতে হারিয়ে যেতে শুরু করে।

আমির আবদুর রহমানের পর একের পর এক অযোগ্য শাসক আন্দালুসের আমিরের তখতে বসতে থাকেন। ওদিকে খ্রিষ্টানরা কখনোই ভিসিগথিক হিস্প্যানিয়ার স্বপ্ন ভুলতে পারেনি। কর্দোবার স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধি আল মানসুরের মৃত্যু হয় একাদশ শতাব্দীতে। তারপরই ধীরে ধীরে আন্দালুসের আমিরাতের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে যেতে থাকে।

এরই মধ্যে ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া আমিরদের মধ্যে শুরু হয় গোত্র প্রীতি, আরবের পুরোনো ব্যাধি। এর সাথে এসে মিশে যায় প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের দর্শন,

---

২. Menocal, Maria Rosa (2002), "The Ornament of the World: how Muslims, Jews, and Christians created a culture of tolerance in medieval Spain", Little, Brown, Boston.

যার ফলাফল তাইফা পিরিয়ড। একাদশ শতাব্দীর শুরুতে গোটা আল আন্দালুস ভাগ হয়ে যায় বাইশটি খুদে নগর রাষ্ট্রে (তাইফা)।[৩]
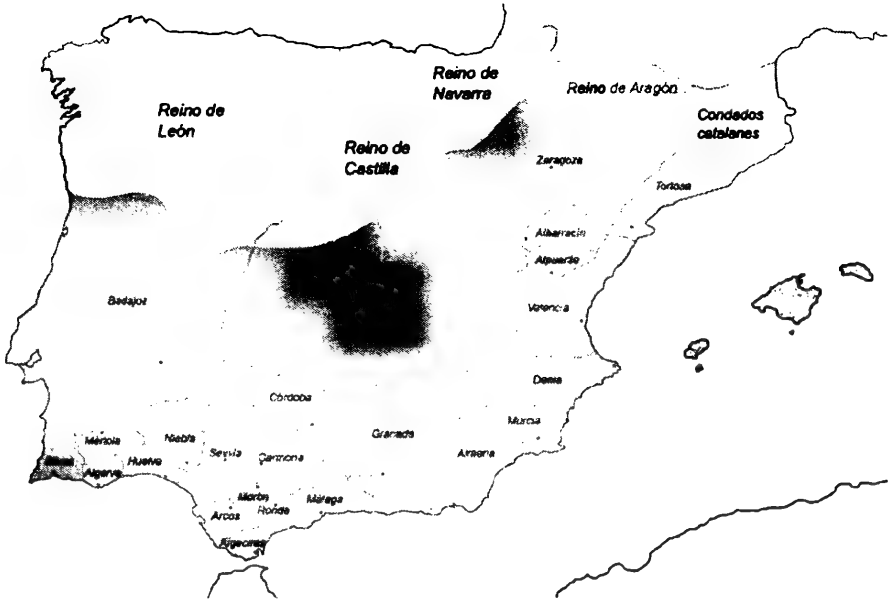
একাদশ শতাব্দীর শুরুতে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া আল আন্দালুস।

দুই

এক শ বছর ধরে উত্তর স্পেনের খ্রিষ্টান রাজ্যগুলি এই সুযোগটাই খুঁজছিল।

এক তাইফার আমিরের সাথে আরেক তাইফার আমিরের যুদ্ধ ছিল রোজকার ঘটনা। ১০২০ সালে যেখানে বাইশটি তাইফা ছিল ১০৬০ সাল নাগাদ সেখানে তাইফার সংখ্যা দাঁড়ায় নয়টিতে, মানে বড় তাইফাগুলো একে একে ছোটগুলিকে গ্রাস করেছিল। এক তাইফার সাথে আরেক তাইফার যুদ্ধ সাধারণ মুসলিমরা কখনই ভালো চোখে দেখেনি। ফলে তারা রাজনীতি ও যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা শুরু করেন।

এতে করে আমিরদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে মার্সেনারির। যেহেতু মুসলিমদের হাতে অর্থের কোনো অভাব ছিল না, তাই জিহাদ ছাড়া কোনো আমিরের জন্য ভাড়া খাটার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করতেন না। ফলে আমিররা একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে খ্রিষ্টান রাজাদের সাহায্য নেয়া শুরু করলেন। আর এভাবেই জন্ম নিলেন এক স্প্যানিশ জায়ান্ট, আলফানসো। ক্যাস্তিলিয়া আর লিওনকে তিনি একত্রিত

Tolan, John (2013). Europe and the Islamic World: A History. Princeton: Princeton University press. p. 40, 39-40.

করে নিজের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে নিলেন, তারপর ১০৮৫ সালে জয় করে নিলেন টলেডো। আতঙ্কিত মুসলিমরা একইসাথে দুটো সত্য আবিষ্কার করল।

এক. আন্দালুসের রাজধানী কর্দোবা সরাসরি শত্রুর মুখের ওপর পড়েছে; দুই. তাদের এখন আর জিহাদ করার মতো ক্ষমতা নেই।

এক শ বছরেরও বেশি সময় ঘরে বসে বাহাস বিতর্ক করে আর দাবা খেলে তাদের যুদ্ধ চেতনায় মরচে ধরে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে মাগরেবে তখন আবির্ভাব হয়েছিল একদল নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমের, যারা নতুনভাবে নিজেদের দাখিল করেছিল সপ্তম শতাব্দীর বিপ্লবী ইসলামে। এদের নামই আল মুরাবিতিন।[৪]

স্পেনের মাওলানারা এক যৌথ ঘোষণায় জিহাদের ফতোয়া জারি করলেন। কর্দোবার আমির আল মুতামিদ জাবাল আত তারিক পেরিয়ে জিহাদের আহ্বান জানালেন মুরাবিতিনের আমির ইউসুফ বিন তাশফিনকে।

ইউসুফ বিন তাশফিন আরেকবার ইসলামের পতাকাকে রক্ষার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। আলফানসোকে শোচনীয়ভাবে মারকাজুল জাল্লাকায় পরাজিত করে তিনি আল আন্দালুসকে (স্পেনকে) তখনকার মতো বিপদমুক্ত করলেন।

এ ছিল কেবল এক সাময়িক মুক্তি। টিকে থাকার সংগ্রাম নিজেরটা নিজেকেই করতে হয়। যে জাতি মরতে ভয় পায়, অপমানের মৃত্যু শেষমেশ তাদেরই দরজাতে কড়া নাড়ে।

মুরাবিতিন আন্দোলন আন্দালুসের বিলাসী মুসলিমদের মাঝে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

মুরাবিতিনরা তাদের কেন্দ্র উত্তর আফ্রিকাতে দুর্বল হয়ে যায় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ফলাফল হিসেবে শুরু হয় দ্বিতীয় তাইফা পিরিয়ড। আমিররা আবারও নিজেদের মাঝে কোন্দল শুরু করেন। তারা যখন নোংরা রাজনীতিতে ব্যস্ত, তখন পোর্তো আর লিসবন দখল করে খ্রিষ্টানরা গঠন করে নতুন রাজ্য, কিংডম অফ পর্তুগাল।[৫]

তিন

দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝিতেই স্পেনের মুসলিমদের জন্য পরাধীনতার জিঞ্জির তৈরি হয়েছিল, কিন্তু আরেকটি বিপ্লবী আন্দোলন তা রুখে দিল। এর নাম মুওয়াহহিদিন।

এরা ছিল আধুনিক সেক্যুলারদের আদর্শিক পিতৃপুরুষ।

---

৪. Messier, Ronald A. The Almoravids and the meanings of jihad. Santa Barbara, CA. Praeger Publishers, 2010.

৫. Wiedemann, B.G., 2015. The kingdom of Portugal, homage and papal ÔfiefdomÕin the second half of the twelfth Century. Journal of Medieval History, 41(4), pp.432-445.

আন্দালুসের মাটিতে এরাই শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছিল ইসলামের রাজনৈতিক ঝাণ্ডা। কিন্তু তাতে স্পেনের বিলাসী মুসলিমদের হুঁশ ফেরেনি।

সেনাবাহিনীর জন্য মুওয়াহহিদিনরা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল উত্তর আফ্রিকার বার্বার উপজাতিদের ওপর।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আল আন্দালুসে মুসলিমদের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল উত্তর আফ্রিকার বার্বার মুসলিমদের সাহায্যের ওপর। আল মুওয়াহহিদিন আমিরাতের পতনের পর তাই আল আন্দালুসের মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে হঠাৎ এল চরম আঘাত।

ব্যাটল অফ নাভাস ডি তুলুসায় এক গাদ্দারের ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত হয়ে জীবন দিল গোটা মুওয়াহহিদিন বাহিনীর পঁচিশ শতাংশ। এই যুদ্ধে মুওয়াহহিদিনদের এতই ক্ষতি হয়েছিল যে, তারা আর কখনো জাবাল আত তারিক পেরিয়ে আল আন্দালুসে আসেনি।

সময়টা তখন ১২১২ সাল।[৬]

তারিক বিন জিয়াদের আন্দালুসের বয়স পাঁচ শ বছর হয়ে গেছে তখন।

এক বিজয়ী জাতির তলোয়ারে নয়, হৃদয়ে মরচে ধরেছে।

যাদের হৃদয়ে মরচে ধরে, তাদের পতন কেউই ঠেকাতে পারে না।

চার

খিলাফত ইসলামকে যেখানেই নিয়ে গেছে সেখানেই ক্ষমতা কাঠামোতে আলেম-উলামাদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

[৬]. https://historyofislam.com/the-fall-of-granada/

উলামাদের ছিল এন্টি এস্ট্যাবলিশমেন্ট আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র) থেকে শুরু করে ইমাম আবু হানিফা (র), তার পথ ধরে হানাফি, শাফিঈ ও হাম্বলি ইমামরা। মোঙ্গল আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর এন্টি এস্ট্যাবলিশমেন্ট আন্দোলনগুলো উলামাদের রাজনীতি সচেতনতারই উদাহরণ।

এশিয়ার উলামারা বাদশাহদের সাথে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মিসরের ওপারে লিবিয়ান মরুভূমি যেখানে মিসরকে লিবিয়া থেকে আলাদা করেছে, সেখানে থেকে গোটা উত্তর পশ্চিম আফ্রিকাতে থাকা মালেকি মাযহাবের আলেমদের এই ধরনের লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়নি।

স্পেনের পতনে এই ফেনোমেনার এক বিশাল ভূমিকা ছিল।

মুরাবিতিন আমির ইউসুফ বিন তাশফিন আলফানসোকে পরাজিত করে যখন মরক্কোতে ফিরে আসলেন তখন মাত্র শুরু হচ্ছে ক্রুসেডের যুগ।

স্পেনের মুসলিম নাম ছিল আল আন্দালুস। সেখানকার নগর রাষ্ট্রগুলোর নাম ছিল তাইফা।

তাইফার আমিরদের মধ্যে চলা নোংরা রাজনীতিতে বিরক্ত হয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন জাবাল আত তারিক পেরিয়ে মরক্কোতে ফিরে আসেন। কিন্তু তাদের এই নীচতার খবর পৌঁছে যায় সুদূর মধ্য এশিয়াতে থাকা ইমাম গাযযালির (র) কাছে। তিনি ফাতওয়া জারি করে মুরাবিতিনের আমিরকে নির্দেশ দেন আন্দালুসের তাইফাগুলোকে মুরাবিতিন আমিরাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে।

১০91 সালের মধ্যে ইউসুফ বিন তাশফিন ইমাম গাযযালির (র) নির্দেশ পালন করে তাকে চিঠি দেন। কিন্তু এরই মধ্যে আফ্রিকাতে বার্বার গোত্রগুলোর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলে ইউসুফ ও তার উত্তরাধিকারীরা আফ্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ক্রুসেড জেরুসালেমের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে তা নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক আলোচনা হলেও স্পেনের ওপর ক্রুসেডের প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুবই কম।

১০৯৭ সালের মধ্যে ক্রুসেডাররা আল আন্দালুসের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা মুসলিমদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। হাজার হাজার মুসলিম ও ইহুদিকে বহিষ্কার করা হয় ক্যাস্তিলিয়া ও লিওন থেকে। তবু আফ্রিকাতে আরেকবার জ্বলে ওঠল আশার আলো।

বার্বারদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভেতর থেকেই আফ্রিকায় তৈরি হয় নতুন এক আন্দোলন। মুতাজিলাদের এই আন্দোলনকে বলা হয় আল মুওয়াহহিদিন আন্দোলন। এরা ক্ষমতা কাঠামোতে উলামাদের হস্তক্ষেপকে কমিয়ে দেয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিল।

এই রেশনালিস্ট আন্দোলন প্রথম প্রথম দারুণ সাড়া জাগল। স্পেনের অর্ধেকের বেশি এলাকা তারা পুনরুদ্ধার করে নিল ১১৫৭ সালের ভেতরেই। উলামাদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়াটা শুরুতে তাদের বিভিন্ন সুবিধা এনে দিলেও আখেরে এর ফল ভালো হল না।

১২১২ সালের যুদ্ধে মুওয়াহহিদিনরা যখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। তখন উলামারা তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে নীরব রইলেন। এই নীরবতার ফলে মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে গ্রানাডা ছাড়া কর্দোবা, সেভিয়া, জেদিস, তুলতুলাইয়াসহ প্রায় সব আন্দালুসি তাইফা খ্রিষ্টানদের হাতে চলে গেল। উলামাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটাই কমে যাওয়ায় তারা চাইলেও বড় ধরনের কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি।

১২৫২ সাল নাগাদ পর্তুগাল মুসলিম শাসনমুক্ত হলো। স্পেনে বাকি রইল শুধুই গ্রানাডা আমিরাত। গ্রানাডার শাসনভার নিলেন নাসরি গোত্রের শাসকেরা। উপায়ান্তর না দেখে তারা ক্যাস্তিলিয়ার রাজার সাথে চুক্তিতে এলেন। বার্ষিক মোটা অঙ্কের করের বিনিময়ে তারা শান্তিতে বসবাস করার নিশ্চয়তা পেলেন।

গোটা ইতিহাসে মুসলিম-খ্রিষ্টানদের মধ্যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী শান্তি চুক্তি টেকেনি। সব সময়েই যে পক্ষ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল তারা চেষ্টা করেছে সন্ধির শর্তগুলো যেন এমন হয় যাতে সুযোগ পেলেই অপর পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

ক্যাস্তিলিয়ার রাজা গ্রানাডার সাথে চুক্তির সময় মুখে শান্তির কথা বললেও করের পরিমাণটা এমনই বসালেন যাতে মুসলিমরা শান্তিতে না থাকতে পারে। একদিকে ক্যাস্তিলিয়ার খাই মেটাতে বাড়তি কর দিতে দিতে চরমভাবে বিরক্ত হচ্ছিল গ্রানাডাবাসী, আর অন্যদিকে সেই করের অর্থে ক্রমেই ফুলে ফেঁপে ওঠছিল ক্যাস্তিলিয়ার সেনাবাহিনী।

১৪১৭ সালে আমির ইউসুফের ইন্তেকালের পর থেকে গ্রানাডার সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এটা হয়ে উঠে এমন এক রাজ্য, যেখানে সবাই রাজা হতে চায়। ক্রমেই বাড়তে থাকে অন্তর্কোন্দল। ওদিকে ক্যাস্তিলিয়ান আর্মির হাতে আসে নতুন অস্ত্র, কামান।
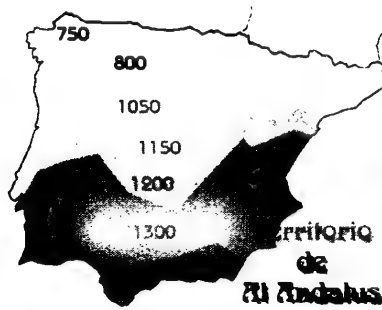
ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যেতে থাকা আল আন্দালুসের মানচিত্র সাক্ষী, যাদের লড়াইয়ের মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়, তাদের কেউই রক্ষা করতে পারে না।

১৪২০ সালের দিকে লেখা এক পাণ্ডুলিপিতে ঐতিহাসিক ইবনে হুযাইল গ্রানাডার ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করে লিখে গেছেন, 'এটি হলো এমন এক রাজ্য, যেখানে সব সময় চলে অন্তর্কোন্দল। এটা সারা মুসলিম জাহান থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণে সমুদ্রের জলরাশি, আর বাকি তিনদিকে বিধর্মীদের রাজ্য, আর দুটোই তাদের দিন-রাত ভর নির্যাতন করে যাচ্ছে।'

অনেকটা আজকের বাংলাদেশের মতোই।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ডিসাইসিভ বিয়েগুলোর একটা হয় ১৪৬৯ সালে। কনের নাম ইসাবেল অফ ক্যাস্তিলিয়া, বরের নাম ফার্দিনান্দ অফ অ্যারাগন। বিয়ে পড়ান স্বয়ং পোপ।[১] এই বিয়ের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্পেনের সবচেয়ে বড় দুই খ্রিষ্টান রাজ্যকে একত্রিত করে এক সাম্রাজ্যে পরিণত করা। ঠিক তাই হয়েছিল।

এত দিন পর্যন্ত ক্যাস্তিলিয়ার চেয়ে অনেক কম জনবল নিয়েও তাদের বিরুদ্ধে টিকে ছিল গ্রানাডা, সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালার নীলচে সবুজ শৈলশিরাগুলো তাদের জন্য ছিল প্রাকৃতিক বেষ্টনী। রেইনো লা ক্যাস্তিলিয়ার একার পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই বিয়ে ক্যাস্তিলিয়া, লিওন আর অ্যারাগনকে ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রানাডায় হামলার ক্ষমতা এনে দিল।

Mcmurry, W.M., 1977 Ferdinand, Duke of Calabria, and the Estensi: a relationship honored in music. The Sixteenth Century Journal, pp.17-30.

মুসলিমরা যতটা বিক্ষিপ্ত ছিল, খ্রিষ্টানরা এবার ততটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠল। গ্রানাডা ছিল এমন এক রাজ্য যেখানে সব অভিজাতরাই নিজেকে রাজা ভাবত।

আন্দালুসিয়ার মুসলিমরা বাদবাকি মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আফ্রিকার উত্তর উপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিন শ বছর ধরে তাদের বিপদে বার্বার গোত্রগুলো এগিয়ে এসেছে, ঢাল হিসেবে রক্ষা করেছে আন্দালুসের ভাইদের।

১২৯২ সালের ব্যাটল অফ তাইফায় হেরে গিয়ে বার্বার মুসলিমরা আজকের জিব্রাল্টার, তৎকালীন জাবাল আত তারিকের নিয়ন্ত্রণ হারায়।

মুওয়াহহিদিনদের পতনের পর উত্তর আফ্রিকার উপকূলে নেমে আসে বিপদের কালো মেঘ। পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর জেনোয়ার নৌবাহিনী একে একে দখল করে নেয় তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া আর মরক্কোর বেশিরভাগ অঞ্চল। পরবর্তী সময়ে লিবিয়াও চলে যায় পর্তুগিজদের হাতে।[২] ফলে ভূমধ্যসাগরের ওপার থেকে সাহায্য আসার পথও আন্দালুসের মুসলিমদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

একমাত্র আশ্রয় ছিল মরক্কোর শরিফের রাজ্য। যা প্রাণপণে টিকে ছিল পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

আরও পূর্বে, ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান কাঁপিয়ে তোলা বীর জেদিক আহমেদ পাশাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। মুহাম্মাদ আল ফাতিহর মৃত্যুর পর ভূমধ্যসাগরে থেমে গিয়েছিল অটোমানদের অগ্রাভিযান।

মুহাম্মাদের উত্তরাধিকারী বায়েজিদ কমান্ডার হিসেবে তার বাবার ধারে কাছেও ছিলেন না। তার ওপর তার ভাই জেম সুলতান নাইটদের কাছে বন্দি থাকাতে তিনি রাজনৈতিকভাবে পোপের কাছে দুর্বল হয়ে পড়েন। কারণ, পোপ জেমকে মুক্তি দিলেই তিনি আনাতোলিয়াতে ফিরে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা ছিল।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে দানা বেঁধেছিল আরও এক সমস্যা।

ভেনিসের মশলার ব্যবসায় লালবাতি জ্বলছিল একদিকে অটোমান অন্যদিকে মিসরের মামলুকদের কর দিতে দিতে।

ভেনিস বেশি ভয় পেত অটোমানদের। অটোমান তাদের যুদ্ধস্পৃহা, বীরত্ব ও প্রযুক্তি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই ভেনিস নিজে অটোমানদের মোকাবেলা না করে মামলুক সুলতানকে বিপুল পরিমাণ ঘুষ সাধল। সেই সাথে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রস্তাবও দিল।

মামলুকদের সাথে অটোমানদের সম্পর্ক সেই কারামান দখলের পর থেকেই খারাপ ছিল। ফলে মামলুকরা আনাতোলিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করতে থাকল।

---

২. https://historyofislam.com/the-fall-of-granada/

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে যে বাহরিয়্যা মামলুকরা ক্রুসেড ও মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে লড়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর বুরুজি মামলুকরা হয়ে পড়েছিল তাদের ছায়ামাত্র।

ভেনিসের উসকানিতে তারা অটোমানদের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বায়েজিদ ভূমধ্যসাগরে কোনোরকম অভিযানের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন পূর্ব দিকে।

ওদিকে পশ্চিমে, গ্রানাডা তখন একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে খ্রিষ্টান ক্যাস্তিলিয়ার কর পরিশোধ করতে করতে। জনগণ বিরক্ত ছিল করের বোঝায়; সুলতান আবু হাসান বিরক্ত ছিলেন কারণ, তার জনগণের অর্থ দিয়েই তার জনগণকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছিল ক্যাস্তিলিয়া।

১৪৮১ সালে তিনি হামলা চালিয়ে একটি ক্যাস্তিলিয়ান নৌ বন্দর দখল করেনিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল এই বন্দর দিয়ে তিনি মরক্কোর সুলতানের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে এখান দিয়েই তুর্কি ও মামলুকদের কাছ থেকে আসা সাহায্য গ্রানাডায় পৌঁছাবে।[৩]

তারপর তিনি আলহামা শহর আক্রমণ করলেন। যদিও শহরটা দখল করা গেল না, কিন্তু তবু ক্যাস্তিলিয়ার কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল।

এর ঠিক এক বছর পর, ক্যাস্তিলিয়ানরা গ্রানাডার দুর্গ লোযা অবরোধ করল।

দুর্গ তারা জয় না করতে পারলেও বন্দি করে নিয়েছিল শাহজাদা আবু আব্দুল্লাহকে, এখানেই খেলার মোড়টা ঘুরে গেল।

সম্রাট ফার্দিনান্দ আবু আবদুল্লাহকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, সে যদি তার বাবাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারে তবে তিনি তাকে গ্রানাডার আমির হিসাবে মেনে নেবেন আর দুই রাজ্যের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি ও স্থাপন করা হবে।[৪]

আবু আবদুল্লাহ আলহামরায় ফিরলেন মুসলিম শাহজাদা হিসেবে না, ফার্দিনান্দের বিশ্বস্ত তলোয়ার হিসেবে।

আলহামরা থেকে তিনি চলে গেলেন আলবেসিনে। সেখানে গিয়ে নিজেকে তিনি গ্রানাডার সুলতান ঘোষণা করলেন। তার বাবা তখন অসুস্থ।

---

৩. Hillgarth, J. N. (1978). The Spanish Kingdoms: 1250–1516. Volume II: 1410–1516, Castilian Hegemony. Oxford: Clarendon Press, Oxford University Press. pp. 367–393. ISBN 0-1982-2531-8.

৪. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Boabdil". Encyclopædia Britannica. 4 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 94.

এমতাবস্থায় ফার্দিনান্দ হামলা করে বসলেন রোন্ডা দুর্গে।

রোন্ডা দুর্গের পতন হলো ফার্দিনান্দের সামনে।

এরপর ফার্দিনান্দ আরও এগিয়ে এসে মালাগা অবরোধ করলেন। প্রাণপণে লড়ে মালাগাকে রক্ষা করলেন আবু আবদুল্লাহর চাচা আল জাগাল।

তত দিনে আল জাগালের চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল মামলুক সুলতান ও অটোমান সুলতানের কাছে।

মামলুক সুলতান তখন যুদ্ধ করছিলেন অটোমানদের বিরুদ্ধে। অটোমানদের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ এতই বেশি ছিল যে এজন্য ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলের সাথে হাত মেলাতেও তার বাঁধল না। সাহায্য চেয়ে আসা চিঠির জবাবে তিনি একটা চিঠি পাঠালেন গ্রানাডাতে। তাতে লেখা ছিল, 'আমি ফার্দিনান্দকে তার অপকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করেছি।' পেছন পেছন তিনি ক্যাস্তিলার কাছ থেকে ময়দা কিনছিলেন আর সেই পয়সায় আরও জোর কদমে গ্রানাডার ওপর আঘাত হানতে এগোচ্ছিলেন ফার্দিনান্দ।[৫]

ওদিকে অটোমান সুলতান বায়েজিদের তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। একদিকে তাকে পোপের খাই মেটাতে হচ্ছে বছরে এক লাখ বিশ হাজার ডুকাট দিয়ে। অন্যদিকে, ভেনিস-হাঙ্গেরি-ফ্রান্স আর হোলি রোমান এম্পায়ার মিলে পোপকে নিয়মিত ঘুষ দিচ্ছে নতুন করে ক্রুসেড ঘোষণার জন্য। তার ওপর মামলুকদের বেদুইন ক্যাভালরির হাতে মার খেয়ে বায়েজিদের তুর্কি ক্যাভালরির ষাট হাজারের মতো সৈন্য নিহত হয়েছে ১১৮৫-১১৮৭ এই তিন বছরে।

তবু বায়েজিদ ভূমধ্যসাগরের ওপার থেকে আসা মুসলিম ভাইয়ের চিঠিকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি মোরিয়ার সানজাক বে, বিখ্যাত অটোমান ক্যাপ্টেন কামাল রইস পাশাকে স্পেন অভিযানের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কামাল রইসের সাথে ছিল দশ হাজার সৈন্যের মাঝারি আকারের এক ফ্লিট।

তুর্কি বাহিনী গোটা স্পেনের দক্ষিণ উপকূল জুড়ে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করল। তাদের চলাচলে বিপদ বুঝে জেনোইসরা আফ্রিকার উপকূল থেকে দূরে থাকা শুরু করল। ১৪৮৭ সালে কামাল রইসের এক দুঃসাহসী অভিযানে মালগা থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন ফার্দিনান্দ। কিন্তু শীত চলে আসায় নিজের বাহিনী নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন কামাল রইস।

এই সময় পোপের কাছ থেকে পাওয়া অর্থে নতুন করে নিজের বাহিনী সাজিয়ে মালাগা অবরোধ করে বসেন ফার্দিনান্দ,

---

[৫]. Meyerson, Mark D. (1991). The Muslims of Valencia in the Age of Fernando and Isabel: Between Coexistence and Crusade. Berkeley: University of California Press. p. 64ff. ISBN 0-520-06888-2. LCCN 90-35502. OCLC 21447250. Retrieved June 16, 2013

দাঁতে দাঁত চেপে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছিলেন আল জাগাল। খাবারের অভাব এমন অবস্থায় পৌঁছে যে দুর্গের সৈন্যরা লতাপাতা, গাছের ছাল, পশুর কাঁচা চামড়া, কুকুর বিড়ালের মাংস খেয়ে কোনো রকমে খ্রিষ্টানদের প্রতিহত করতে থাকে।

আরেকবার বেইমানি করলেন আবু আব্দুল্লাহ্। তার উজির আবুল কাসিম ছিল ফার্দিনান্দের গোয়েন্দা। আবুল কাসিমের পরামর্শ আর আবু আবদুল্লাহর লোভ দুইয়ে মিলে ফার্দিনান্দের সাথে তাদের এক গোপন চুক্তি হলো। মালাগার পতন হলে আব্দুল্লাহকে গ্রানাডার ডিউক বলে ঘোষণা করা হবে।[৬]

গ্রানাডার আরও কিছু গাদ্দার জুটল আবু আব্দুল্লাহর সাথে। তাদের বেইমানির ফলে দুর্গের ডানদিক দিয়ে খ্রিষ্টান বাহিনী দুর্গের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা দখল করে নিল।

অনেক কষ্টে কোনোমতে টিকে থাকা আল জাগাল এবার হাল ছেড়ে দিলেন। মালাগা চলে গেল খ্রিষ্টানদের কব্জাতে।

কামাল রইস শীত শেষে ফিরে এসে দেখলেন মালাগা শেষ। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আবারও ফার্দিনান্দের কয়েকটি বন্দর হামলা চালিয়ে লুট করে নিলেন। কামাল রইসের হাতে এত সৈন্য ছিল না যা দিয়ে তিনি ইসলামবুল থেকে ছয় হাজার কিলোমিটার দূরের এই শহর দখলে রাখতে পারবেন।

মালগার পতনের পর গ্রানাডার পতন ছিল কেবলই সময়ের ব্যাপার। একে একে বাজা, আলমেরিয়া, সিউতা, মার্বেলা সব গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ও বন্দর কেড়ে নিলেন ফার্দিনান্দ। হাজার হাজার মুসলিম পরিণত হলো দাসে।

এক মালাগাতেই হত্যা করা হয়েছিল চৌদ্দ হাজার মানুষকে।[৭]

আবু আব্দুল্লাহকে তখনো প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছিল, তাকেই গ্রানাডার সিংহাসনে বসান হবে। তিনিও তা শুনছিলেন। ১৪৮৯ সালে গ্রানাডার সিংহাসনে যখন আবু আব্দুল্লাহকে বসান হলো, তখন তাকে আল হামরার চাবি ফার্দিনান্দের কাছে তুলে দিতে বলা হলো।

এত দিন পর তিনি ফার্দিনান্দের আসল চরিত্র ধরতে পারলেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছেন ক্যাথলিক সম্রাট।

গ্রানাডাবাসী তাদের শেষ ক্ষমতাটুকু নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো, কিন্তু ফার্দিনান্দের বিশ হাজার অশ্বারোহী আর দশ হাজার ইনফ্যান্ট্রির মোকাবেলাতে তারা সাত হাজার সৈন্যও প্রস্তুত করতে পারেনি।

---

৬. প্রাগুক্ত(৩)

৭. Prescott, William Hickling (1854). History of the reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic, of Spain. p. 222-223. Retrieved 2013-02-22.

ফসল কাটার মৌসুমে ফার্দিনান্দের বাহিনী যখন গ্রানাডাবাসীদের ক্ষেতখামার সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন, তখন আর কিছু করার ছিল না।

১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারি, আলহামরার চাবি সুলতান আবু আবদুল্লাহ ফার্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলার হাতে তুলে দেন।[৮]

আবু আব্দুল্লাহর বেশির ভাগ সভাসদই ছিল গাদ্দার। তারা চাইলে গ্রানাডাবাসী বীরের মতো টিকে থাকতে পারত মে মাস পর্যন্ত, তত দিনে তুর্কিদের সাহায্য চলে আসত। কিন্তু তারা সুলতানকে অবরোধের মুখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে। এদের অনেকেই কোথায় কোথায় মুসলিমদের খাবারের গুদাম আছে তা খ্রিষ্টান গোয়েন্দাদের চিনিয়ে দিত। আলহামরা থেকে যেদিন আবু আব্দুল্লাহকে বের করে দেয়া হয় সেদিন সে কাঁদতে কাঁদতে সিয়েরা নেভাডার ওপর দিয়ে বারবার তাকাচ্ছিলেন আলহামরার দিকে।

তার মা তাকে ঘৃণাভরে বলছিলেন–

পুরুষের মতো যা রক্ষা করতে পারনি, নারীর মতো কেঁদে তা তুমি ফেরত পাওয়ার আশা করো না।[৯]

স্পেনের মুসলমানদের পতনের কারণ যতটা না বাইরের সাহায্যের অভাব, তার চেয়ে অনেক বেশি ইমানদারীর অভাব। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য আর ক্ষুদ্রস্বার্থের চিন্তা তাদের পতিত করেছিল ধ্বংসের গহ্বরে।

'নিশ্চয়ই তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের দুই হাতেরই উপার্জন।' সূরা শু'আরা : আয়াত ৩০

---

৮. Early Modern Spain: A Documentary History, ed. Jon Cowans, (University of Pennsylvania Press, 2003), p.15.

৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Aixa

কলোনিয়াল দুনিয়ায়

এক

মিসরের ফারাও দ্বিতীয় রামসিসের কফিন যেদিন প্রথম খোলা হয়। সেদিন তার মমির ভেতর দুটো অদ্ভুত জিনিস পাওয়া যায়। এই দুটো জিনিসের সেখানে থাকার কথা ছিল না।

জিনিস দুটো হলো তামাক আর কোকোয়া।[১]

আজ থেকে সাড়ে পাঁচ শ বছর আগে ইউরেশিয়া বা আফ্রিকার কোথাও এই দুটো জিনিস ছিল না। তাহলে এই দুটো জিনিস সাড়ে তেত্রিশ শ বছর আগে মিসরে গেল কীভাবে?

দুই

সাড়ে তিন হাজার বছর পুরোনো এক সভ্যতা ছিল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অংশে। নাম ওলেমাক।

এই সভ্যতার বাসিন্দাদের নাক অদ্ভুত রকম থ্যাবড়া। দাঁতের সামনের পাটি উঁচু, কপালটাও উঁচু থেকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গেছে, অনেকটাই আফ্রিকানদের মতো। কিন্তু সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কোনো আফ্রিকান লোক সেখানে গেছে বলে জানা যায়নি। অন্তত লিখিত কোনো প্রমাণ নেই।

মেক্সিকোতে জুনি নামে একটা উপজাতি আছে। এদের জেনেটিক প্রোফাইল টেস্ট করে খাঁটি জাপানিজ বেশকিছু জিন পাওয়া গেছে। জুনিরা মেক্সিকান অন্যান্য উপজাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের চাল-চলন ও আচার-আচরণই শুধু নয়, আকার আকৃতিতেও তারা অন্য রকম।

---

[১]. "Curse of the Cocaine Mummies" written and directed by Sarah Marris. (Producers: Hilary Lawson, Maureen Lemire and narrated by Hilary Kilberg). A TVF Production for Channel Four in association with the Discovery Channel, 1997.

তিন

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে একটা খাল খননের সময় শ্রমিকেরা ২৫টি মুদ্রার সন্ধান পায়। মুদ্রার গায়ে লেখা হিজিবিজি ভাষা পড়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

একটু একটু করে সেই খবর পৌঁছাল খননকারীদের সাথে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে।

তিন বছর পর জানা গেল এগুলো চীনা রাজবংশ শাঙ ডাইন্যাস্টির সম্রাট হুঙেটির মুদ্রা।[২]

সম্রাট হুঙেটির রাজত্বকাল ছিল কবে শুনলে আশ্চর্য হতে হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ২৬০০ অব্দে, আইমিন আজ থেকে ৪৬০০ বছর আগে। যখন গির্জাতে ফারাও খুফু পিরামিড বানাচ্ছিলেন, তখনকার কথা।

চার

মানুষ কখনই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার মতো সুশীল প্রাণী ছিল না।

পৃথিবীর বুকে পা রাখার পর থেকেই সে ঘুরে বেড়িয়েছে এখান থেকে ওখানে, বারবার চিনতে চেয়েছে অজানাকে।

আফ্রিকা বা আরব উপদ্বীপের কাছাকাছি কোথাও থেকে মানুষের ওই যাত্রার শুরু বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করে থাকেন। সভ্য হবার পর প্রত্যেক সভ্যতাই চেষ্টা করেছে নিজেদের সভ্যতার কথা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে নিয়ে যেতে।

আমেরিকা আবিষ্কারের যে গল্প এখন আমাদের শোনানো হয় তা কোনোভাবেই আমেরিকা অবিষ্কারের প্রথম গল্প না। সেই গল্পটা বড়জোর প্রথমবারের মতো আমেরিকাকে কলোনি বানানোর গল্প।

তার আগে বহুবার দুঃসাহসী মানুষেরা আমেরিকায় গেছেন।

নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের এই রেসে সম্ভবত পাইওনিয়ার ছিল চাইনিজরা।

চাইনিজরা এখন পর্যন্ত দাবি করছে মিং ডাইন্যাস্টির অ্যাডমিরাল ঝেং হোর কথা। কিন্তু ঝেং হো আমেরিকাতে পৌঁছেছেন তার কোনো প্রমাণ সরাসরি দেয়া সম্ভব হয়নি।

ঝেং হো একজন মুসলিম ছিলেন।

---

২. Dean, James (January 1884). "Anthropology". The American Naturalist. University of Chicago Press for The American Society of Naturalists. 18 (1): 98–99. doi:10.1086/273578. JSTOR 2450831.

তার আগেও মুসলিমরা বারবার চেষ্টা করেছে অসীম আটলান্টিক পাড়ি দিতে। এদের মধ্যে একজনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, নাম খাসখাস ইবনে সাইদ ইবনে আসওয়াদ। তার সম্পর্কে আল মাসউদি নবম শতাব্দীতে লিখেছেন, তিনি আটলান্টিক পেরিয়ে ওপারে গিয়েছিলেন এবং তারপর সেই দেশ থেকে জাহাজ বোঝাই করে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। আল মাসউদি এই কথা লিখেছেন ৮৮৯ সালে, তার বই মুরুয আদ দ্বোয়াহাব ওয়াল মাদিন আল জাওহারে, কর্দোবার খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদের আমলে।[৩]

এই দুজনের মাঝখানে চাপা পড়ে গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চারার সম্রাটের কথা।

মালি সাম্রাজ্যের নাম যারা শুনেছেন তারা অবশ্যই জানেন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল মালি সাম্রাজ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি বলা হয় এই সাম্রাজ্যের সম্রাট মানসা মুসাকে।

মানসা মুসার চাচা দ্বিতীয় আবুবকর এতই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ছিলেন যে, তিনি একবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি আটলান্টিক মহাসাগর কোথায় শেষ তা দেখে ছাড়বেন।

এই সিদ্ধান্ত ঠিক রাখতে গিয়ে তিনি নিজের সিংহাসন ছেড়ে চার শ জাহাজের এক বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন পশ্চিম আফ্রিকা উপকূল থেকে সোজা পশ্চিমে। সাত বছর পর তিনি ফিরে আসেন, চার শ জাহাজের মধ্যে কেবল একটি নিয়ে, কিন্তু তাতে তিনি অনেক সম্পদ বোঝাই করে নিয়ে এসেছিলেন।[৪]

কিন্তু এরাই আমেরিকার মাটি ছোঁয়া পুরোনো দুনিয়ার প্রথম সভ্য মানুষ নন।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে পাওয়া চীনা সম্রাটের মুদ্রা, ফারাওয়ের মমিতে পাওয়া ওল্মাক আর কোকোয়া এবং ওলেমাক সভ্যতা ও জিনোনি উপজাতির মানুষের দৈহিক গড়ন। এই তিনটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয়, হাজার হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ পুরোনো পৃথিবী থেকে নতুন পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করছে।

খ্রিষ্টান ইউরোপ বা মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য থেকে নয়। মানুষের আমেরিকার টিকিট কাটা শুরু হয়েছিল জাপান, চীন বা আফ্রিকার কোনো কালো মানুষের মাধ্যমেই।

অথবা শুরুটা পলিনেশিয়ান নাবিকদের দিয়েও হতে পারে। প্যাটাগোনিয়ার মালভূমিতে একবার দুটো মুরগির শুকনো হাড় পাওয়া যায়। কার্বন টেস্ট করে পাওয়া গিয়েছিল, মুরগি দুটো সেখানে এসেছে অন্তত তিন হাজার বছর আগে এবং সেগুলো পলিনেশিয়ান বনমুরগি।

---

৩. Ali al-Masudi (940). Muruj Adh-Dhahab (The Book of Golden Meadows). Vol. 1. p. 268.

৪. "Abbas Hamdani. An Islamic Background to the Voyages of Discovery. Language and Literature" in The Legacy of Muslim Spain(Studien Und Texte Zur Geistesgeschichte Des Mittelalters). 1994. ed. Salma Khadra Jayyusi.

আমেরিকা আবিষ্কারের পেটেন্ট তাই ইউরোপিয়ান এক্সপ্লোরার বা ইসলামিক মুবাল্লিগ কারোরই প্রাপ্য নয়। সেটা বরং পেতে পারেন কোনো আফ্রিকান বা পলিনেশিয়ান নাবিক কিংবা কোনো চাইনিজ অভিযাত্রী।

কিন্তু তাদের দুটো ঘাটতি ছিল।

এক নম্বর ঘাটতি ছিল, তারা ওই জায়গাগুলোকে কলোনাইজ করতে পারেননি।

দুই নম্বর ঘাটতি হলো, তারা কখনোই আসা যাওয়ার রাস্তাকে নেভিগেশন চার্টে নিয়ে আসতে পারেননি। খাসখাস ইবনে সাইদের চার্ট নাকি ছিল, কিন্তু হালাকু খানের হাতে বাগদাদের বাইতুল হিকমাহ ধ্বংসের সাথে সাথে সেটাও হারিয়ে গেছে।

তাই ১৪৯২ সালে কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তখন একটা নতুন যুগের শুরু হয়। তিনি শুধু গিয়ে ফিরে আসেননি, আসা যাওয়ার পুরো পথ নেভিগেশন করে খুলে দিয়েছেন অজানাকে জানার স্থায়ী পথ।

সেই সাথে তিনি জন্ম দিয়েছেন দুটো শব্দের, কলোনাইজেশান আর গ্লোবালাইজেশান।

ভূগোলকটা কীভাবে ইউরোপের হাতের মুঠোয় ঢুকল, সেই গল্পের শুরুটা এখানেই।

আটলান্টিক ছাড়িয়ে

এক

আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে মধ্যযুগের ইউরোপে তখন চাউর ছিল হাজার রকম গুজব।

গভীর কুয়াশা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন এই সাগরের গভীরে নাকি ড্রাগন, ক্র্যাকেন, হাইড্রাসহ হাজারটা দানবের বাস। বুড়োরা বলত, এই সাগরের কোনো শেষ নেই।

স্পেন বা পর্তুগাল থেকে তাই কোনো জাহাজই পশ্চিমে বেশিদূর যেতে রাজি হতো না। পশ্চিমে গেলেই সর্বনাশ।

কলম্বাস যখন পর্তুগালের রাজা জনের কাছে গেলেন, তখন এসবের সাথে সাথে জন আরেকটা কথাও ভাবলেন। পশ্চিমে যেতে যেতে সে যদি জাহাজ নিয়ে সূর্য ডোবার জায়গাটা পার হয়ে যায় তাহলে তো সে আর কোনোদিনই ফিরে আসতে পারবে না। তখন যে টাকা পয়সা খরচ করে তাকে আমি পাঠাব, সেটার কী হবে!

মূলত এই চিন্তা করেই তিনি কলম্বাসকে পশ্চিমে পাঠানোর জন্য ফান্ডিং করতে রাজি হলেন না। কস্ট-বেনিফিটে পোষাণোর কোনো সম্ভাবনাই নেই এমন প্রজেক্টে ইউরোপিয়ান রাজারা হাত দেয়া বাদ দিয়েছেন ফিফটিন্থ সেঞ্চুরির মাঝামাঝি থেকেই।

কলম্বাস যখন পর্তুগিজ রাজার কাছ থেকে ফান্ডিং পেলেন না, তখন তাকে যেতে হলো স্পেনের রানি ইসাবেলার দরবারে। তার পশ্চিম দিক থেকে ভারতে যাবার পাগলাটে পরিকল্পনাটা প্রথম প্রথম রানির ভালো না লাগলেও একটা পর্যায়ে এসে রানি ভাবলেন, এক দান জুয়া খেলাই যায়।

অন্ধকার বিপজ্জনক সাগরে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়া নাবিককে ফান্ডিং করা যে সে জুয়া না। এই জুয়া খেলতে ইউরোপ রাজি হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল দুটো।

এক নম্বর কারণ, ক্রুসেড আর রিকনকুইস্তায় খরচ করতে করতে ইউরোপের স্টকে সোনা রূপার অভাব পড়ে গিয়েছিল মারাত্মক রকম। ইটালিয়ান ব্যাংকগুলো পোপ আর সম্রাটদের চাহিদা মেটাতে মেটাতে মোটামুটি ফতুর। তার ওপর ইউরোপের মহাজন ছিল ইহুদিরা। তাদের কাছ থেকে ধার কর্জ নিতে নিতে ইউরোপের অর্থনীতি পুরোপুরি ইহুদিদের পকেটে চলে যাচ্ছিল।

তারপরও পূর্বে অটোমান আর পশ্চিমে বার্বারদের মোকাবেলা করতে সম্রাট ও চার্চের প্রয়োজন ছিল নতুন সোনা-রূপার মজুদের। যা দিয়ে তারা মুদ্রা বানিয়ে বড় সেনাবাহিনী পুষতে পারেন।

দুই নম্বর কারণ ছিল, মসলা।

ইউরোপের শীতকাল ভীষণ রকম লম্বা। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীত, এপ্রিল-মে যাকে তারা বসন্ত বলে, ওটাও নেহায়েত কম ঠান্ডা না।

মোট কথা, বছরে আটমাসই ইউরোপ থাকত ঠান্ডা। মধ্যযুগে এই আট মাসের ছয় মাস ঘর থেকে বের হওয়াই দায় ছিল। এসময়টার জন্য সবাই ঘরে খাবার মজুদ করে রাখত। তখনকার প্রধান মজুদ খাবার ছিল গোশত।

টানা ছয় মাস গোশতকে মজুদ করে রাখার পর তা খাবার উপযোগী করতে তাদের প্রয়োজন হতো মশলার। এই মশলা আমদানির মনোপলি ছিল ভেনিসের।

অটোমানদের ট্যাক্স দিতে দিতে ভেনিসের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

স্পেন-পর্তুগাল ভালোমতোই বুঝল, পূর্বদিক দিয়ে তাদের জাহাজকে অটোমানরা ব্যবসা করতে দিবে না। কিন্তু যেহেতু দুনিয়াটা গোল, আর আফ্রিকার পূর্বে ভারত, কোনোমতে আফ্রিকাটা ঘুরে পূর্বে পৌঁছালেই ভারতে যাওয়া সম্ভব।

এই ধারণা বাস্তবে রূপ দেয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপটা নেন পর্তুগিজ রাজা হেনরি দ্যা নেভিগেটর।

তিনি ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, জার্মানি, হল্যান্ড, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ছেঁকে চ্যাম্পিয়ন সব নেভিগেটর, নাবিক আর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আসেন। তৈরি করেন এক রয়্যাল মেরিটাইম স্কুল।

এই স্কুল থেকে বের হতে থাকে দারুণ বিজ্ঞানের সব আইডিয়া। গ্রিকো-রোমান আমলের নৌবিদ্যার সাথে তারা ইসলামিক সায়েন্সের ফিউশন ঘটায়। আল খাওয়ারিজমির সুরত আল আরদ, আল ইদ্রিসির তাবুলা রজারিয়াস, খাওয়ারিজমির অ্যাস্ট্রোল্যাব আর অ্যালজেব্রা, সেই সাথে আল বেরুনির ত্রিকোণমিতিকে তারা দারুণভাবে বশে এনেছিল। বছরের পর বছর খেটে অনেক ভুলত্রুটি শুধরে সেগুলোকে তারা দিয়েছিল তখনকার সময়ের সবচেয়ে অ্যাডভান্সড রূপ।
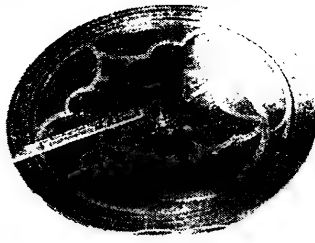
ইফিমেরিস

এর সাথে তারা ব্যবহার করতে শিখেছিল গ্রহ-নক্ষত্র দিয়ে সমুদ্রে নিজেদের অবস্থান বোঝার আরব প্রযুক্তি ইফিমেরিস।

হেনরি মারা গেলেও তার বংশধররা স্কুলের ফান্ডিং বজায় রাখলেন।

সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস তার প্রথম ডিমটা দিল ১৪৮০ সালের দিকে। দুই ধরনের বিশেষ জাহাজ বানিয়ে ফেলল পর্তুগিজ রাজা জনের মেরিন ইঞ্জিনিয়াররা। একটাকে বলা হতো 'ক্যারাভেল', আরেকটাকে বলা হতো 'নাও'।

ক্যারাভেল ছিল তখনকার সময়ের যেকোনো জাহাজের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতির। সামান্যতম বাতাসকেও এই জাহাজ কাজে লাগাতে সক্ষম ছিল।

ক্যারাভেলের এই তাক লাগানো গতির পেছনে মূল নায়ক ছিল পাল। এর আগ পর্যন্ত জাহাজে যে পাল খাটানো হতো সেগুলো ছিল চার কোণা। ক্যারাভেলই প্রথম জাহাজ যাতে তিন কোণা ল্যাটিন পাল ব্যবহার করা হয়।[১]
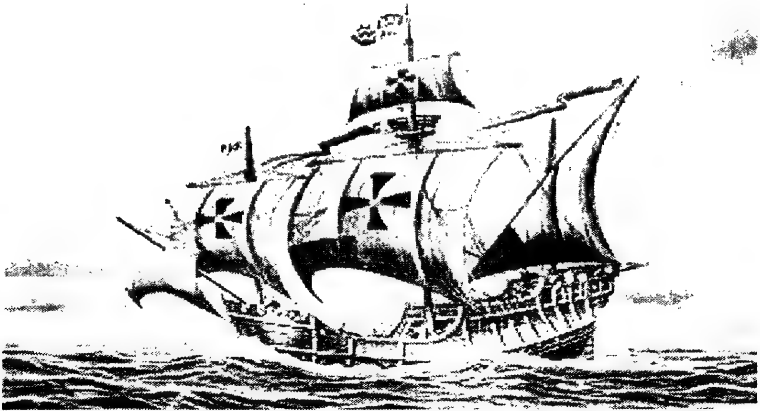
কলম্বাসের ফ্ল্যাগশিপ সান্তা মারিয়া ছিল একটা ক্যারাক, সাথে ছিল দুটি ক্যারাভেল পিন্টা ও নিনা।

Campbell, I.C., 1995. The lateen sail in world history. Journal of World History, pp.1-23.

আর নাওগুলো ছিল একেকটা দানব। একেকটা নাও বহন করতে পারত পাঁচ শ থেকে দুই হাজার টন পর্যন্ত বিপুল ওজন। যা তখনকার যুগে ছিল এক বিস্ময়। বড় বড় কামানগুলো অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যেত নাওয়ের ভেতরের কম্পার্টমেন্টে।

সেই সাথে ইউরোপের পশ্চিমে তখন আবিষ্কৃত হয়েছিল যুগান্তকারী এক ফুড প্রযুক্তি।

তখনো মানুষ জানত না যে, লবণ দিয়ে শুকিয়ে মাসের পর মাস ধরে খাবার তরতাজা রাখা যায়। যখন এই প্রযুক্তি পর্তুগিজরা পেয়ে গেল তখন তাদের দূর দূরান্তে অভিযান চালাতে আর একটা মাত্রই বাধা রইল, সেটা হলো খরচ। এই খরচটা তখনকার স্পেন-পর্তুগালের রাজারা দিতে রাজি হয়েছিলেন বলেই দুঃসাহসী নাবিকেরা বারবার বেরিয়ে পড়েছেন সমুদ্রজয়ে।

১৪৮৯ তে বার্থেলোমিউ ডায়াজের কেইপ অফ গুড হোপ জয় করার পর থেকে ১৫০০ সালে ক্যাব্রালের ব্রাজিলে নোঙ্গর করা, এর মধ্যে পর্তুগিজ-স্প্যানিশরা আবিষ্কার করে ফেলে পৃথিবীর দুই নতুন দিগন্ত, পূর্ব আর পশ্চিম তারা আবিষ্কার করে সম্পদে পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ অজানা এক মহাদেশ, যার নাম তারা দিয়েছিল নতুন পৃথিবী।

ইউরোপ যেভাবে নতুন করে জগতটাকে আবিষ্কার করেছিল তার মূলে ছিল রেনেসাঁ যুগের সবকিছুকে নতুন করে দেখার আগ্রহ। আর এই আগ্রহের জন্ম দিয়েছিল তাদের তীব্র প্রয়োজন। ক্রুসেড করে করে, আর মসলার ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়ে, দুই শ বছরের ব্ল্যাক ডেথকে মোকাবেলা করে ইউরোপের এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প চিরদিনের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসে।

ইউরোপ কেন মুসলিমদের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করে ঘুরে দাঁড়াতে পারল, মুসলিমরা কেন পারল না, এর পেছনের মূল কারণ তিনটা।

এক. প্রয়োজন।

দুই. নতুন করে জগতকে জানার ইচ্ছা।

তিন. রাজনৈতিক উদ্যোগ আর সবকিছুকে কস্ট বেনিফিট মডেলে ফেলার বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা।

গ্লোবালাইজেশান

এক

গ্লোবালাইজেশনের শুরুটা ভালো কিছু দিয়ে হয়নি।

পৃথিবীতে প্রথম যে জিনিসটা গ্লোবালাইজড হয়েছে, তা হলো রোগজীবাণু।

নেটিভ আমেরিকানরা ছিল দারুণ সুস্থ আর চটপটে একটা জাতি।

শীত আসলে আগুন পোহাও আর জমানো খানাদানা খাও। বসন্তে শিকার করো, গ্রীষ্মে চাষবাস করে শরতে ফসল ঘরে তোল। আবার শীত এলে সেগুলো খাও- এই ছিল তাদের সহজ সরল জীবন।

আটলান্টিকের এপারের জীবন আর ওপারের জীবন ছিল একেবারেই আলাদা।

নেটিভ আমেরিকানদের সহজ সরল জীবনে ছিল না বড় বড় খামার, ছিল না কাউন্ট-কিং-মনার্কদের অত্যাচার।
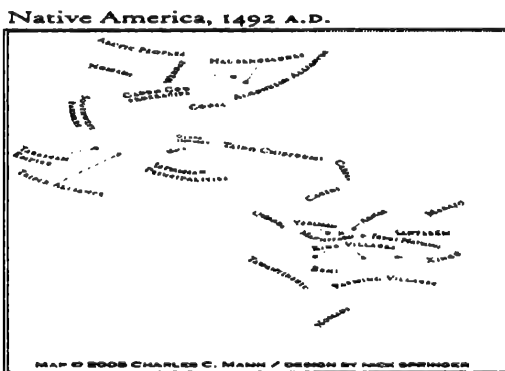
ইউরোপিয়ানরা আমেরিকায় আসার আগে আমেরিকার
বিভিন্ন অঞ্চলে এভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত
বিভিন্ন আদিবাসী গোত্র।

গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ লাগলে এক গোত্রের হাতে আরেক গোত্র সাফ হতো ঠিকই। কিন্তু তা রোজ রোজ হতো না।

এক গোত্রের চেয়ে আরেক গোত্রের বাসস্থান ছিল যথেষ্ট পরিমাণ দূরে, এত বেশি দূরে যেন জায়গা জমি নিয়ে খুব বেশি বিবাদ না হয়।

তারা বুনো ধান খেত, তারা টোম্যাটো আর রেড চিলি ফলাত। তাদের হাতের কাছেই ছিল থরে থরে আলুর ক্ষেত। ছিল কফি, আনারস আর কলা-কমলার বাগান, কোনোটাই খুব বেশি ইন্জিনিয়ার্ড না।

যেখানে আলুটা আগে থেকেই ফলত, তার আশেপাশেই কিছু আলু ফলানো হতো। খুব বেশি এলাকা জুড়ে না, মহান প্রকৃতি রাগ করবেন বলে। যেখানে কমলার বাগান, তার আশেপাশে সামান্য কিছু এলাকা জুড়ে জঙ্গল সাফ করে বাগানটা একটু বড়ই করা হতো স্রেফ, আর কিছু না। গোত্রের বাইরে খুব একটা যাওয়া হতো না, তাই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এসব বাগানকে খুব একটা বড় করার চিন্তাও তারা করেনি।

প্রকৃতির ওপর ছড়ি না ঘুরিয়েই হাজার হাজার বছর ধরে তারা সুখে শান্তিতে টিকে ছিল আটলান্টিকের ওপারের মহাদেশ আমেরিকাতে।

তাদের কাছে সোনা-রূপা খুব বেশি দামি কোনো জিনিস ছিল না। তাদের বড় বড় শহরও তেমন ছিল না।

শহর গড়ে না উঠায় তাদের মধ্যে সেভাবে রোগ ব্যাধিও ছড়ায়নি।

তাদের সর্দি-কাশি ছিল না, জ্বর আসত কালে-ভদ্রে। ডায়রিয়া, কলেরা, ডিপথেরিয়া, হাম, গুটি বসন্ত, জলবসন্ত, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, টাইফয়েড এগুলোর কোনোটাই তাদের ছিল না, ছিল না প্লেগ বা যক্ষ্মা।

কলম্বাস যখন আমেরিকা পৌঁছালেন। তখন ইউরোপ থেকে তিনি তাদের জন্য তিনটি জিনিস গিফট হিসেবে নিয়ে গেছিলেন।

এক. গানপাউডার।

দুই. শান্তির বাণী বাইবেল।

তিন. রোগজীবাণু।

কলম্বাসের সাথে থাকা আফ্রিকান নিগ্রোরা নিয়ে গিয়েছিল ডেঙ্গু। আর ইউরোপিয়ান সাদা মানুষরা নিয়ে গেছিলেন ডেঙ্গু ছাড়া ওপরে বর্ণিত বাকি সব রোগের জীবাণুগুলো।[১]

প্রথম দফা সফরে কলম্বাসের সঙ্গী সাথিরা আর কিছু করুক বা না করুক একটা কাজ ভালোমতোই করেছিল, ধর্ষণ।

---

[১]. Nunn, Nathan; Qian, Nancy (2010). "The Columbian Exchange: A History of Disease, Food, and Ideas". Journal of Economic Perspectives. 24 (2): 163–188.

তাদের কাছ থেকে পাওয়া জীবাণু নেটিভ মেয়েরা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল যার যার গ্রামে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এক এক করে রোগগুলো ছড়িয়ে যায় প্রথমে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। তারপর সেন্ট্রাল আমেরিকা, সেখান থেকে সমানে উত্তরে আর দক্ষিণে।

একের পর এক নেটিভ আমেরিকান উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জলবসন্ত, ডেঙ্গু, টাইফয়েড আর প্লেগে। তাদের শরীরের ডিফেন্স মেকানিজম এত বছর ধরে যে শত্রুর মোকাবেলা করে অভ্যস্ত। এবার তারা সেগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন শত্রুর সামনে পড়ল, ফলাফল ছিল খুবই নির্মম।

১৪৯২ থেকে ১৫৩৮ এই ৪৬ বছরে যেখানেই ইউরোপিয়ানরা গেছে সেখানেই নেটিভরা মরে সাফ হয়ে গেছে। এই মৃত্যুর কারণ যতটা না গানপাউডার বা আর্টিলারি, তার চেয়ে অনেক বেশি সংক্রামক রোগ।

বেশিরভাগ এলাকাতে নেটিভদের ৯০-৯৫% জনগোষ্ঠী মারা গেছে শুধু এক গুটিবসন্তে।[২]

পাপ যে বাপকেও যে ছাড়ে না তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল ১৪৯৪ সালে, যখন স্প্যানিশ আর্মি ইতালি আক্রমণ করল। নেটিভ আমেরিকান মেয়েদের পাইকারীভাবে ধর্ষণ করে তারাও নগদ কিছু রোগজীবাণু পেয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল সিফিলিস।[৩]

নেটিভদের যৌন আচরণ ছিল বল্গাহীন। যে কারণে তাদের ভেতর বহু আগে থেকেই এই রোগ বেশ ভালো সংখ্যায় ছিল। কলম্বাসের সাথে যাওয়া নাবিকরা এই রোগ ইউরোপে নিয়ে যায়। তারপর থেকে এই ব্যাধি ইউরোপিয়ানদের সাথে সাথে সফর করে গোটা পৃথিবী। শেষমেশ নেটিভ আমেরিকান থেকে রুদ্র মুহাম্মাদ শহিদুল্লাহ, কাউকেই ছাড়েনি সিফিলিস।
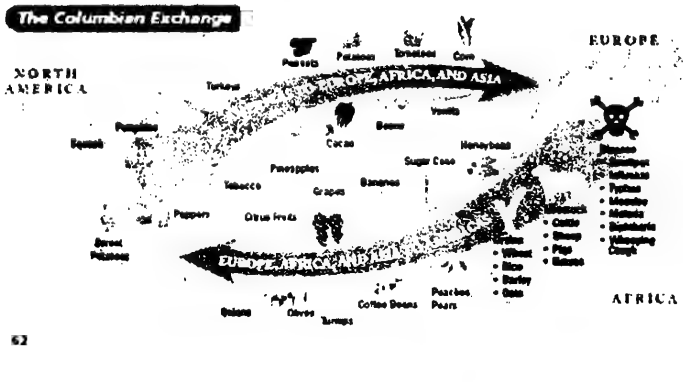
এই ছবিটা কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

---

২. প্রাগুক্ত(১)

৩. Farhi. D; Dupin. N (Sep–Oct 2010). "Origins of syphilis and management in the immunocompetent patient: facts and controversies". Clinics in dermatology. 28 (5): 533–8. doi:10.1016/j.clindermatol.2010.03.011. PMID 20797514.

যাকে বলে একেবারে পারফেক্ট গ্লোবালাইজেশন।

গ্লোবালাইজেশানের প্রথম প্রোডাক্ট রোগজীবাণু হলেও পরবর্তী প্রোডাক্টগুলো ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

আজ থেকে পাঁচ শ বছর আগে আপনার-আমার যেসব পূর্বপুরুষ এই ভূমিতে থাকতেন তারা কখনো মরিচ, আলু, কলা বা কমলা দেখেননি। তারা কফিতে চুমুক দেননি এমনকি তামাকও টানেননি, ভুট্টা বা রাবার তো দেখেনইনি।[৪]

এই জিনিসগুলো স্প্যানিশ-পর্তুগিজরা বয়ে এনেছে আমেরিকা থেকে। সেখান থেকে এসেছে ইউরোপ-মিডল ইস্ট-আফ্রিকা হয়ে এই ভারত-চীন-ইন্দোনেশিয়াতেও।

শুধু যে আমরা পূর্বের মানুষরাই নিয়েছি, তাদের কিছুই দেইনি, তা না।

আমরা তাদের পরিচয় করে দিয়েছি গরু, ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, মুরগি, হাস, বেড়ালের মতো পোষা প্রাণীর সাথে।[৫]

আমাদের কাছ থেকে ওরা পেয়েছে ধান-গম, বিভিন্ন সবজি আর ফল। কিন্তু যত দিনে পেয়েছে, তত দিনে ওরা মরে শেষ।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণহত্যা ডেকে এনেছে কোনো যুদ্ধ নয়, গ্লোবালাইজেশন।

নদীর এপার যখন ভাঙে, ওপারটাতে তখন গড়ার পালা চলে। আটলান্টিকের এক পাড়ে যখন মানুষ মরে সাফ হয়ে যাচ্ছিল, অপর প্রান্তে বদলে গেল দৃশ্যপট।

আলু ছিল ইউরোপের আবহাওয়ার জন্য এক নিখুঁত ফসল। সেই সাথে টোম্যাটো, মরিচ, আখ আর কফিতে ইউরোপ সয়লাব হয়ে গেল মাত্র এক শ বছরের ভেতরেই। সাথে যোগ হলো ভুট্টাও।

যে ইউরোপিয়ানরা দুবেলা দুমুঠো ঠিকমতো খেতে পেত না তারা এবার দুবেলার জায়গাতে চারবেলা খেতে লাগল। আলু আর ভুট্টা গোটা ইউরোপের ডেমোগ্রাফিতে নিয়ে এল পরিবর্তন। ইউরোপের মেয়েদের পিরিয়ড শুরু হতে লাগল ফিফটিন্থ সেঞ্চুরির চেয়ে প্রায় দুই বছর আগেই, যা ১৫৫০-১৭৫০ এই দুই শ বছরে দরদর করে বাড়িয়ে দিল ইউরোপের জনসংখ্যা।

---

৪. Ley, Willy (December 1965). "The Healthfull Aromatick Herbe". For Your Information. Galaxy Science Fiction. pp. 88–98.

৫. Michael Francis, John, ed. (2006). "Columbian Exchange—Livestock". Iberia and the Americas: Culture, Politics, and History: a Multidisciplinary Encyclopedia. ABC-CLIO. pp. 303–308. ISBN 978-1-85109-421-9.

আমেরিকাতে নেটিভদের ধ্বংসস্তুপের ওপর নতুন জনপদ গড়তে নির্যাতনের স্টিম রোলার চলেছে আটলান্টিকের এপারের আরেক মহাদেশের অসহায় মানুষের ওপরেও। সেই মহাদেশের নাম আফ্রিকা।

গ্লোবালাইজেশান ইউরোপ-এশিয়াকে অনেক কিছুই দিয়েছে। নষ্ট করেছে আমেরিকা আর আফ্রিকার প্রাণ ও প্রকৃতির এক বিরাট অংশ।

ভাতের সাথে যখন আমরা আলুভর্তা খাই, অথবা বিকেলে যখন কফির মগে চুমুক দিই, সাড়ে পাঁচ কোটি সরল নেটিভ ইন্ডিয়ান আর অসহায় আফ্রিকান মানুষগুলোর আত্মার কথা মনে করে আমাদের তাই একটা হলেও দীর্ঘশ্বাস ফেলা উচিত। প্রতিটি প্রার্থনায় তাদের জন্য রাখা উচিত অন্তত একটা মুহূর্ত।

এই মানুষগুলোর কোনো দোষ ছিল না।

নতুন এক পৃথিবীতে

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পৃথিবীটা খুব দ্রুত বদলে যেতে শুরু করল।

প্রায় দেড় শ বছর ধরে একের পর এক দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর যুদ্ধে বিপর্যস্ত ইউরোপে আবার জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে থেমে যায় ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে চলতে থাকা বিখ্যাত হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার। এই লড়াইয়ে ফ্রান্সের জয়ের মাধ্যমে তিনটা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠতে থাকে।

এক নম্বর পরিবর্তন ছিল গানপাউডারের ব্যবহার। গানপাউডার জিনিসটা চীনাদের আবিষ্কার হলেও এটা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে মোঙ্গলদের মাধ্যমে।

মোঙ্গলরা চীনাদের প্রযুক্তি কেবল ব্যবহারই করেছে, একে উন্নত করার কৃতিত্ব বেশিরভাগই মামলুক ও ইউরোপিয়ানদের। কোনো এক অজানা কারণে পরবর্তী সময়ে মামলুকরা গানপাউডার ব্যবহার বাদ দিয়ে দেয়। কিন্তু ইউরোপে গানপাউডার হয়ে উঠে জনপ্রিয় এক বিস্ফোরক।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে কামান ও বন্দুক প্রচলিত হয় ইউরোপে। ১৪৪০-এর দশকে এসে কামানই হয়ে উঠে যুদ্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ে অটোমানদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল আর্টিলারি বাহিনীর বিশাল কামান ব্যাসিলিকা, আর ম্যাচলক বন্দুক চালানোতে দক্ষ জানিসারি বাহিনী।

হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারের শেষ যুদ্ধ ব্যাটল অফ ক্যাস্টিলিয়নেও ইংলিশদের পরাজয়ের প্রধান কারণ ফ্রেঞ্চদের কামান ও বন্দুকের ব্যবহার। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রায় সব ইউরোপিয়ান সেনাবাহিনী যুদ্ধে কামান ও বন্দুক ব্যবহার করতে শুরু করে।

প্রথম দিককার বন্দুককে বলা হতো আর্কবুজ বা ম্যাচলক। আর্কবুজের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল তার অসাধারণ ভেদন ক্ষমতা। মোটা ধাতব পাতের বর্মকেও নিমেষে ছিদ্র করে বেরিয়ে যেতে পারত ম্যাচলকের অত্যন্ত ভারী বুলেট। যা হেভি ক্যাভালরিকে ম্যাচলকধারী ইনফ্যান্ট্রি

সৈনিকদের সহজ শিকারে পরিণত করে। একইভাবে যেকোনো শহর বা দুর্গ অবরোধে শত্রুর শক্তিশালী দেয়ালকে প্রায় বিনা প্রাণক্ষয়ে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হিসেবে সবার ওপরে চলে আসে কামানের নাম। এর ফলে আরেকটা পরিবর্তন আসে যুদ্ধের ময়দানে, তা হলো ক্যাভালরির গুরুত্ব কমে যেতে শুরু করে।

এখান থেকেই সূচনা হয় দুই নম্বর পরিবর্তনের। ইউরোপের সেনাবাহিনীগুলোর ক্যাভালরির উৎস ছিল মূলত অভিজাত সামন্ত পরিবারগুলো। তারা প্রত্যেকে ঘোড়া পালত, সেই সাথে ঘোড়সওয়ারদের পৃষ্ঠপোষকতাও তারা করত। লড়াইয়ের ময়দানে ক্যাভালরির গুরুত্ব কমে যাওয়া এবং ম্যাচলক-কামানের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় ইউরোপের রাজরাজড়াদের পেশাদার সেনাবাহিনী তৈরি করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। ফলে সামন্ত ব্যারন-লর্ড-ডিউকদের গুরুত্ব কমে যেতে থাকল, দাপট কমে গেল আরও একটা গোষ্ঠীর, নাইট।

একটা সামাজিক শ্রেণির কদর কমে গেলে সেই জায়গা অন্য কাউকে দিয়ে পূরণ করে নিতে হয়। ইউরোপের কিং-মনার্কদের পেশাদার সেনাবাহিনী গড়তে প্রয়োজন ছিল কাঁচা পয়সার আর তাই ইউরোপে ব্যবসায়ীদের কদর রাতারাতি বেড়ে যেতে লাগল। ব্যবসায়ীরা কিং-মনার্কদের ধার দিতে শুরু করল মোটা অঙ্কের টাকা। এতে রাজনীতিতে ক্রমেই তাদের প্রভাব বাড়তে লাগল।

একই সাথে রাজদরবারে কদর কমে যাওয়ায় সামন্ত অভিজাত পরিবারগুলোতে শুরু হলো টাকার টানাপোড়ন। এখানেও ঋণ দেয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তৈরি করে নিল ইউরোপের বণিকরা। এই কাজে চ্যাম্পিয়ন ছিল ভেনিস, জেনোয়া, মিলান আর ফ্লোরেন্সের মতো ইতালিয়ান নগর রাষ্ট্রগুলো। ফ্রেঞ্চ, ডাচ আর ব্রিটিশরাও ধীরে ধীরে এই খেলার কায়দা-কানুন শিখতে লাগল। এভাবে ইউরোপে শুরু হলো মার্কেন্টাইলিজম, আর জন্ম হলো ব্যাংকের। পরের শতাব্দীগুলোতে ইউরোপের আসল শাসকে পরিণত হয় এই ব্যবসায়ীরাই।

তৃতীয় পরিবর্তন ছিল আরও গভীর। ফ্রান্স থেকে ইংলিশদের বিতাড়ন ইউরোপে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। প্রায় এক শ পনেরো বছর ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চদের ভেতর যে কট্টর 'আস ভার্সাস দেম' তৈরি হয়, তা টিকে আছে এখনো। এই একই সময়েই স্পেন ও পর্তুগালে তীব্র মুসলিম ও ইহুদিবিদ্বেষী ক্যাথলিক জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয়।

আবার গোটা পঞ্চদশ শতাব্দীতেই ক্যাথলিক চার্চের অধিকাংশ পোপরা ছিলেন ইতালিয়ান বা স্প্যানিশ। জার্মানরা এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেতরে ভেতরে ক্রমেই ফুঁসছিল।

ইউরোপের সমাজ খুব একটা বদলাচ্ছিল না। কিন্তু সুপ্ত এই আগ্নেয়গিরির নিচে বইছিল পরিবর্তনের ম্যাগমা।

ইউরোপের বাইরেও বইছিল পরিবর্তনের বাতাস।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সাবেক মোঙ্গল ইলখানাত ও চাঘাতাই খানাত এবং উত্তর ভারত নিয়ে গড়ে উঠা সুবিশাল তাইমুরি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। ইরান প্রথমে আক কয়ুনলুদের অধীনে চলে গেলেও উজুন হাসানের মৃত্যুর পর ক্রমেই পরিষ্কার হতে থাকে, আক কয়ুনলুরা এই বিশাল আয়তনের সাম্রাজ্য ধরে রাখতে অক্ষম।

ওদিকে উত্তরে, মধ্য এশিয়ার গভীরে তাইমুরের বংশধরদের মধ্যে শুরু হয়েছিল তীব্র ক্ষমতার লড়াই।

উত্তর ভারতের ক্ষমতায় আসছিল লোদিরা। আর মোঙ্গলদের অধপতিত বংশধরদের চীনছাড়া করে চীনে বিশাল এক সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল মিংরা। সত্যিকারার্থে পঞ্চদশ শতাব্দীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য ছিল মিং সাম্রাজ্য; কিন্তু এর অন্তর্মুখী নীতি একে ক্রমেই বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

মধ্যপ্রাচ্যে এ সময় নতুন এক মেরুকরণ শুরু হয়। এককালের প্রবল প্রতাপশালী বাহরী মামলুক সালতানাতের ক্ষমতায় জুড়ে বসে সার্কাশিয়ান বুর্জি মামলুকরা। একের পর এক তাদের মধ্যে অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানে ক্রমেই ক্ষয়ে যেতে থাকে মামলুক সালতানাত। বিপর্যয় নেমে আসে সাধারণ মানুষের কৃষিকাজ আর ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর।

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ নাগাদ ধীরে ধীরে ভারত মহাসাগরে পাল তোলে পর্তুগিজ জলদস্যুদের জাহাজ। মশলার ব্যবসার দখল আরব ও ভেনিশীয় বণিকদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে থাকে পর্তুগিজরা। এদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা মামলুকদের ছিল না। না তারা গড়েছিল কোনো শক্তিশালী নৌবহর, আর না ছিল তাদের আর্টিলারি।

ফলে মামলুক সালতানাত ক্রমে আরও দুর্বল হয়ে ওঠে, নৈতিক ও অর্থনৈতিক, দুভাবেই।

ইসলামি জাহানের নেতৃত্ব দিতে এ সময় ক্রমেই আগ্রহী হয়ে ওঠে অটোমানরা। ওদিকে উজুন হাসানের ভেঙে পড়া আক কয়ুনলু সালতানাতে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শিআবাদের নতুন এক সংস্করণ, সাফাভি মতবাদ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বোঝা যাচ্ছিল না পৃথিবীটা আসলে কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

একদিকে ভেঙে পড়ছিল হাজার বছরের পুরনো মধ্যযুগীয় ইউরোপের ক্ষমতা কাঠামো। সেখানে তৈরি হচ্ছিল নতুন ক্ষমতাবানদের একটা শ্রেণি; যারা শুধু ক্ষমতার উৎসের দিক থেকে নয়, চিন্তার দিক থেকেও নতুন।

ওদিকে ভারত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়ছিল ইউরোপের হিংস্র, কিন্তু ক্ষুরধার মগজের ক্যাথলিক অভিযাত্রীর দল। তাদের একহাতে ছিল ম্যাচলক, অন্যহাতে বাইবেল। ভারত মহাসাগরের উপকূলের বেশিরভাগের মালিক মুসলিমদের সাথে এদের সংঘাত দিনকে দিন রক্তাক্ত রূপ নিচ্ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে ঘনিয়ে আসছিল খিলাফতের অধিকার নিয়ে এক ত্রিমুখী লড়াই।

সামনে ষোড়শ শতাব্দী নিয়ে আসতে যাচ্ছে রেনেসাঁ, আর একটা অনিবার্য বিশ্বযুদ্ধ।

Biblographi

1. Weatherford, J.M., 2004. Genghis Khan and the making of the modern world. Broadway Books.
2. Boyle, JA.1997.Genghis Khan: The History of the World Conqueror. Manchester University Press.
3. Onon, U. ed., 2001. The secret history of the Mongols: The life and times of Chinggis Khan. Psychology Press.
4. Marshall, R., 1993. Storm from the East: From Ghengiis Khan to Khubilai Khan. Univ. of California Press.
5. Turnbull, S., 2014. Genghis Khan & the Mongol Conquests 1190–1400. Bloomsbury Publishing.
6. চেঙ্গিজ খান-ভাসিলি ইয়ান(অনুবাদ) ,বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
7. Amitai-Preiss, R., 2005. Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-1281. Cambridge University Press.
8. Finkel, C., 2007. Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire. Hachette UK. Finkel
9. Inalcik, H., 1973. The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300–1600, translated by N. Itzkowitz and C. Imber (New York, 1973).
10. İnalcık, H. and Quataert, D. eds., 1994. An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge University Press.
11. Goffman, D., 2002. The Ottoman empire and early modern Europe. Cambridge University Press. 12. Quataert, D., 2005. The Ottoman Empire, 1700-1922. Cambridge University Press.
13. Imber, C., 2009. The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. Palgrave Macmillan.
14. Ágoston, G. and Masters, B.A., 2010. Encyclopedia of the ottoman empire. Infobase Publishing. 15. Freely, J., 2009. The Grand Turk: Sultan Mehmet II-Conqueror of Constantinople and Master of an
15. Lord, K., 1977. The Ottoman Centuries–The Rise and Fall of the Turkish Empire. Jonathan Cape, London.

16. Uyar, M. and Erickson, E.J., 2009. A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. ABC-CLIO.
17. Croutier, A.L., 1989. Harem: The world behind the veil . New York: Abbeville Press.
18. Peirce, L.P., 1993. The imperial harem: Women and sovereignty in the Ottoman empire. Studies in Middle Eastern Hist., Oxford University Press.
19. Babinger, F., 1992. Mehmed the Conqueror and his Time (Vol. 96). Princeton University Press.
20. Kia, M., 2011. Daily life in the Ottoman Empire. ABC-CLIO, Greenwood University Press.
21. Ahed,A. Kamal, Atlas of he Islamic Conquests, Darussalam Global Leader In Islamic Book
22. Travels of Ibn Batuta,pdf
23. Kennedy, P., 1987. The rise and fall of the great powers: economic change and military conflict from 1500 to 2000.
24. Ágoston, G., 2014. Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450–1800. Journal of World History.
25. First Application of Total Quality Management in the Ottoman Empire:Ahi Organization, Buket Karatop, Aynur Gul Karahan, Cemalettin Kubat Empire. The Overlook Press.